সই...

সম্পাদনা

নবনীতা দেব সেন • সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সম্পাদনা

নবনীতা দেব সেন ◆ সুচিত্রা ভট্টাচার্য

পুষ্প

SOI

COLLECTED SHORT STORIES

EDITED BY : NABANEETA DEV SEN ◆ SUCHITRA BHATTACHARYA

Rs. 150=00

প্রচ্ছদ ঃ দীপালি ভট্টাচার্য

প্রকাশক ঃ ভারতী দত্ত

'পুষ্প' প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী, ১৩ ব্লক 'বি' বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০০৫৫।।

বর্ণ গ্রন্থনে ঃ ছবি গ্রাফিকস্, ১৬, ব্লক 'বি' বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০০৫৫।।

মুদ্রণে ঃ জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা - ৭০০০০৯।।

[চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সাতাশ 'এ' ব্লক বাঙুর এভিন্যু ফ্ল্যাট নং ছয় কলকাতা - সাত লক্ষ পঞ্চান্ন]

১৫০=০০

উৎসর্গ

যে মেয়েরা লেখেন—

নিবেদন

'সই'য়ের জন্মলগ্নেই স্থির হয়েছিল যে সই থেকে আমরা সকলে মিলে একটি বারোয়ারি উপন্যাস রচনা করবো। গদ্যলিখিয়ে আর পদ্য লিখিয়ে, নবীন ও প্রবীণে হাত মিলিয়ে। কিন্তু সেই পরিকল্পনাটি বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে বহু সময় লেগে যাচ্ছিল- ইতিমধ্যে 'পুষ্প'র আশিস দত্তর কাছ থেকে একটি প্রস্তাব এলো 'সই'য়ের কাছে. 'বড় গল্প' সংকলনের জন্য বড় গল্প তো কেবল গদ্যকারদের ঝুলিতেই আছে। কিন্তু কবিরাও যে যুক্ত হতে চাইলেন? তাঁদের পকেটে তো বড় গল্প নেই। ছোটো ছোটো গল্প যদিও বা আছে। আমাদের নীতি তো বাদ দেবার নয়। তাই চেষ্টা করেছি সকলকেই রাখতে। অতএব বইটির চরিত্র হয়েছে মিশ্র, নিয়মিত ও অনিয়মিত গদ্যলেখকদের একইসঙ্গে দেখা যাবে এখানে। অনেকে মূলত কবি অনেকেরই এটিই প্রথম সংকলিত গল্প। এই গ্রন্থে অধিকাংশ গল্পেরই উপজীব্য মেয়েদের অভিজ্ঞতা। স্বাদে বিষয়বস্তুতে, আয়তনে গল্পগুলি বিচিত্রে ভরা।

এখানে কয়েকজন আছেন, যাদের পূর্বসূরী হিসেবে আমরা সঙ্গে রেখেছি। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতমার জন্ম ১৮৯৪তে এবং কনিষ্ঠতমার জন্ম ১৯৩১এ জীবিত থাকলে এঁরা আজ আমাদের মধ্যে থাকতেন। এঁদের কেন এনেছি? কেননা আমরা কেউ ভূঁইফোঁড় নই। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়েই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে পা ফেলেছি আমরা। আর এখানে যে মাত্র ছ'জনকে বেছে নিয়েছি আমাদের অজস্র শ্রদ্ধেয়া পূর্বসূরীদের মধ্যে তার কারণটি যারপরনাই সরল। এই ভালো বাসা বাড়ির বৈঠকখানায়, যেখানে 'সই'য়ের জন্ম এরকম, এককালে সেখানে প্রচুর সাহিত্যিক আড্ডা বসেছে এবং এইঘরে এঁদের যাতায়াত ছিল অবারিত। এ বাড়িতে অতি পরিচিত এই প্রিয় মুখগুলিকে আমরা বাদ দিতে পারিনি। আমরা চাই তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই 'সই'য়ের পথচলা শুরু হোক।

অগ্রজাদের আমরা একটি পৃথক গুচ্ছে রেখেছি। মেয়েদের কলমকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গুরুত্ব এনে দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সকলকেই সঙ্গে রাখার ইচ্ছে আছে একে একে পরবর্তী সংকলন গুলিতে তাঁদেরও আনবো।

১৮৯৪ প্রায় একশো বছরের বাঙালি মেয়েদের সমাজ জীবনের ছবি এখানে ধরা পড়েছে। কিছু নবীন, কিছু প্রবীণ, কিন্তু সকলেই মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি একদিন বাংলা সাহিত্যে আমাদের স্বাক্ষর থাকবে। সইদের মধ্যে প্রবীণতমার জন্ম ১৯০৮ এ, কনিষ্ঠার এ। এঁরা জন্মেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, কেউ পূর্ববাংলায়, কেউ আসামে, কেউ বিহারে, কিন্তু সকলেরই কর্মস্থল শেষপর্যন্ত পশ্চিমবাংলা, কলকাতা।

'সই' পশ্চিমবাংলার লেখিকাগোষ্ঠীর প্রথম সংগঠন। সাহিত্যের বাইরে আমাদের কোনো ধরণের আনুগত্য নেই। 'সই'য়ের জন্ম এ, নৈনানে একটি আন্তর্ভারতীয় লেখিকা সংগঠনের তিনদিনের সম্মেলনের পর। সেখানে দেখি ভারতবর্ষের দশটি অঞ্চলে দশটি ভাষাতে সভা হয়ে গেছে, মেয়েদের কলম ধরার অসুবিধা নিয়ে প্রায় সব ভাষাতেই লেখিকাগোষ্ঠী আছে---কেবল বাংলাতেই নেই। সেদিনই স্থির হোলো 'সই' চাই। দিন দশেকের মধ্যে ৩০শে নভেম্বর সূচনা হলো 'সই'য়ের। নৈনানে যাঁরা উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতাতে এসে তাঁদের মধ্যে অনেকের আর উৎসাহ রইলো না। আবার যাঁরা নৈনানে ছিলেন না, এমন অনেকেই আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। এখন আড্ডা জমজমাট। 'সই' নামটির তিনটি দিক আছে।

এক তো 'স্বাক্ষর'।

তারপরে, 'সখী'।

আর শেষ, কিন্তু গুরুত্বে কম নয়, 'সহ্য করি'।

'ভালো-বাসা'
৭২, হিন্দুস্থান পার্ক
কলকাতা-৭০০০২৯

নবনীতা দেব সেন
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সূচী

অগ্রজা

সই

অগ্রজা

তারা রূপবতী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তারা তিনটি রূপবতী কন্যা।

নাম হল চিত্রকূটবাঈ, অহল্যাবাঈ, পম্পাবতীবাঈ।

রামায়ণভক্তের দেশে নামকরণে রামায়ণেরই নানা পুণ্য নাম নেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার দেওয়া নাম কি ছিল তাদের কেউ জানে না। তারাও জানে না বোধহয়। কবে বেচাকেনা কিংবা দুর্ভিক্ষের দিনে কৈশোরেই পরিত্যক্ত হয়ে এই রাজ্যের শুদ্ধান্তঃপুরে বা 'হারেমে' এসেছিল কারুর জানা নেই।

যদিও রাজকন্যা বা রাণী নয়। কিন্তু রূপেও তাদের চেয়ে এরা কম রূপবতী নয়। এবং নাচগানের পটুত্বেও কম নয়। বাকি থাকে রাজপ্রাসাদবাসের ভাগ্য। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য! সেটা বিধাতার কলমের ব্যাপার।

সেকথা যাক। সেদিন সবে ভোর হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে গোপালজী লাডলীজী (শ্রীরাধা) গঙ্গাজী রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে মঙ্গল-আরতির শাঁক, ঘন্টা, কাঁসর, কাঁসি বেজে থেমেছে।

শহরের সাতটা তোরণের মাথায় মাথায় নহবৎখানাগুলোতেও প্রথামত ভোরের রাগিণী আলাপ হয়ে থেমেছে। কিছু দোকান-পসার খুলেছে। কিছু বেলা হলে খুলবে। তখনও ঝাঁপ দরজা তোলেনি দোকানীরা। শীতের সকাল রোদ্দুরে ঝলমল। কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা।

অকস্মাৎ পাঁচিল-ঘেরা শহরের ভেতরের আবার এক দৃঢ় অন্তঃপুর প্রাচীরবেষ্ঠনীর এক অত্যন্ত নোংরা প্রান্তে যেখানে অন্তঃপুরের ময়লাজলের পয়প্রণালীপথ, সেইখানে শাবল, গাঁতি, কোদাল, কুড়ুল, খন্তা, হাতুড়ি নিয়ে একদল মজুর জড়ো হল।

আর তাদের আগে পিছনে রাজপ্রাসাদের কর্মচারি (কামদার) নায়েব নাজির

কোতোয়ালসাহেবদেরও সমাগম হচ্ছে দেখা গেল। কাছাকাছি অনেকগুলো অন্ত্যজজাতীয় হাড়ি, বাগদী, ডোম (বলাই, মীনা) -শ্রেণীর লোকও রয়েছে।

চারদিকে কৌতূহলী জনতা জমছে। সাতসকালে রাজপ্রাসাদের পাঁচিল ভাঙে কেন? এবং তা আবার অন্তঃপুরের 'রাওলা'র দেওয়াল। মূর্খ দর্শক তারা। আশপাশের হোমরাচোমরা গম্ভীরমুখ সরকারি কর্মচারিদের প্রশ্ন করবার ভরসা তাদের নেই, শুধু তাদের জন্য কখনো একটা চৌকি-চেয়ার এনে দিচ্ছে, কখনো বাঁধানো বট-অশথ গাছতলাগুলো রোয়াকের পাশ ঝেড়ে বসবার জায়গা করে দিচ্ছে। এবং নিজেরা সেইখানে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা জানা ও শোনার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ঐ মহামান্য কর্মচারিরা নীরব।

কাজেই চুপিচুপি জল্পনা-কল্পনা চলে জনতার দলে জনান্তিকে ও প্রকাশ্যে। কেউ বিজ্ঞের মতো বলে, 'মহলে সাপ বেরিয়েছে মনে হচ্ছে। তাই দেওয়ালের মধ্যে তার কোথায় বাসা আছে খুঁড়ে দেখছে সব।'

তার চেয়ে আরেকজন বলে, শীতকালে জাড়ার দিনে সাপ? পাগল নাকি? তারা এখন সব 'রসোড়া'র মহলে (রান্নামহল) উনুনের তলায় ঘুমচ্ছে। সাঁপ শ্যাপ মে কদেই কোনে নিকলে' (সাপ শীতকালে কখনোই বেরোয় না), জানিসনে।'

'তবে আস্ত দেওয়াল ভাঙে কেন?' একটা বুড়ো বলে, 'রাম জানে কেন ভাঙে।' যেখানটা ভাঙা হচ্ছে সেটা একহারা দেওয়াল। তার মানে, যেখানে যেখানে পাহারারত সান্ত্রীরা থাকে প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে দুই দেওয়ালের প্রাচীরের মাঝখানে ছোট ছোট সরু লম্বা ঘরের সারি থাকে সিপাইদের ব্যারাকের মতো। তাতে তারা স্ত্রী পরিবার নিয়ে থাকে। সেগুলোর দরজা কিন্তু বাইরের দিকে। অন্তঃপুরের দিকে যদি থাকে তাহলে তা চাবি দেওয়া এবং প্রধান খোজা আর প্রধান 'কামদারে'র হাতে সে চাবি।

কিন্তু সেখানটা ভাঙা হচ্ছে না। হচ্ছে নর্দমার জল যাবার পথের পাশে একটা জায়গা। সেটার পাশে মেথরাণীদের ঘর। খানিকটা ভাঙা হয়ে গেল।

শীতের সকাল। রোদ্দুরের জোর নেই অথচ বেলা হয়েছে। ভাঙা দেয়ালের মধ্যে থেকে 'হারেমে'র বাড়িটার হলদে রঙয়ের ছোট ছোট 'ঘুলঘুলি'-খচিত জানলাদরজাহীন একটা অংশ চোখে পড়ে।

কৌতূহলী উৎসুক জননেত্র উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। চিররহস্যময় রাজপ্রাসাদের 'খিস্‌সা' রূপকথার মতো রাজার বাড়িতে রাজকন্যা রাজরাণীদের কারুকে হঠাৎ যদি ওখানে দেখতে পাওয়া যায়।

না! বেরিয়ে এল কয়েকটা নানাবয়সী নারী। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ঐ ভাঙা পথ থেকে। তারা হল কয়েকটা মেথরাণী এবং অন্তঃপুরের ঝি দাসী। যারা পর্দান সীন নারী রূপবতী কন্যা সখীর দল নয়—হারেমবাসিনী নয়। সাধারণ গৃহস্থ নারী মাত্র। পরিচারিকা সেবিকাশ্রেণীর মেয়ে।

তাদেরও মুখ স্তব্ধ গম্ভীর। অবগুণ্ঠনের নিচে যেটুকু দেখাতে পাওয়া গেল। বাইরের জগতের কৌতূহলী বর্ষীয়সী কয়েকজন নারী আধ-ঘোমটা দিয়ে পুরুষদের পাশ কাটিয়ে তাদের কাছে দাঁড়াল। ইচ্ছা যদি অন্তঃপুরের গণ্ডিতে ঐ পথে একটিবারও ঢুকতে পারে! যদি কোন রাজরাণী 'পর্দায়েত' (পদস্থ 'রক্ষিতা' নারী) পাত্রী, সখীদের দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভাঙা দেওয়ালের সামনে কাছাকাছি স্বয়ং কোতোয়ালসাহেব এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চৌকীদারের 'পাহারাতিদের' দল। সে ব্যূহ ভেদ করার সাধ্য বা ভরসা কারুরই নেই। মেয়েদের তো নেই-ই।

মেথরাণীরাই লাল নীল হলদে রঙয়ের ওড়না নানারঙের কাঁচুলী ও ঘোর খয়েরী, নীল রঙের মলিন ঘাগরাপরা একে একে বেরিয়ে এল। এবং মেয়েদের দল একে একে মেয়েদের কাছেই জড়ো হতে লাগল। হোক সে মেথরাণী বা 'টহলনী' (দাসী)।

স্বল্প ও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্যে ওদেশের প্রথামতোই একচোখ বের করে তারা একদিকে এসে দাঁড়ায়। চুপি চুপি প্রশ্নোত্তর চলে।

'কাই হুঁয়াছে' (কি হয়েছে), 'সাপ বেরিয়েছে? 'চোর ঢুকেছিল রাত্রে বেরুতে পারেনি?' তাহলে দেওয়াল ভাঙবে কেন! 'কোই গুজর গয়ি? বাইয়া' (বাইরা কেউ মরে গেছে?) 'কারুর অসুখ?'

প্রশ্ন কিন্তু সে যাই হোক দেওয়াল ভাঙার সঙ্গে ঐসব সমস্যা খাপ খাচ্ছে না।

একজন বয়স্কা মেথরাণী বললে, 'কি যে হয়েছে তা তো আমরা জানি না। 'মোরী' গেট নর্দমার ছোট দরজা দিয়ে সকালে জমাদার সাহেবরা আমাদের সুরূপরায়ের 'রাওলা'য় যেমন কাজ করতে ঢুকিয়ে দেয় ঢুকেছি...।'

কাছাকাছি একটা গালপাট্টা পরা চৌকিদার ছিল। ধমক দিলে, 'কাঁই বাত বনা রহি। গম যা (বাজে গল্প করছিস। থাম) চুপ র‍্যা।' (চুপ করে থাক)।

চুপ আর কি কেউ সহজে করে।

তারা কেউ অশ্বত্থতলায়, কেউ আর একটু দূরে কোন দেওয়ালের ধারে দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর জনান্তিকে কথাবার্তা চলতে লাগল।

হঠাৎ ভিড় চকিত হয়ে উঠল।

একটি 'ঢাক ডোল' শব বহনের খাটিয়া বেরিয়ে আসছে দেখা গেল। হলদে বা লাল চাদর ঢাকা নয়, সৌভাগ্যবতী নারী-শবদেহের রক্তপীত পবিত্র আবরণী নয়—ময়লা সাদা চাদর ঢাকা সাধারণ খাটিয়া। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে স্তম্ভিতমুখে দেখল। না। একটা নয়। আরেকটা আসছে তার পিছনে একটু দূরে। এবং বিমূঢ় চোখে আবার দেখল আরও একটা। পিছনে দেখা যাচ্ছে।

জনতা দর্শকরা স্তম্ভিত। একসঙ্গে তিনটে? তিনটি দেহ। একদিকে একসঙ্গে তিনজন। কার-কার? আর সকলেরই সুবূপরায়ের রাওলাতে মৃত্যু? কি হয়েছিল 'হায়জা'? 'মাতা'? (কলেরা-বসন্ত) কি করে এ মৃত্যু হল? কারো প্রশ্ন করার সাহস নেই। সকলে সভয়ে ভাঙা পাঁচিলের পথের দিকে চেয়ে। শহরের বয়স্ক নরনারীদের রাজপুরীর বহুরহস্যময়-হারেমের অনেক কাহিনী শোনা এবং জানা আছে, তারা মূক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কমবয়সীদের মধ্যে গুঞ্জন চলে, 'কাঁই হো গয়া রে। কৈঁয়া মরি?' (কি করে মরল, কি হয়েছিল)? বোধহয় অপদেবতার ভুতপ্রেতের কাণ্ড। তা নাহলে একরাত্রে এক বাড়িতে তিনজন মরে! রাত্রে ভূতে গলা টিপে মেরে গেছে। হারেমের সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে তো কত লোক কত ভূত দেখেছে।

পনেরো কুড়িজন জোয়ান মানুষ 'বলাই' 'মীনা' জাতীয় (ডোম হাড়ি) অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ — সেই খাটিয়াগুলো বহন করে বাইরে এনে রাখল। কোতোয়ালসাহেব আর মুন্সী-কামদার রাজকর্মচারি এবং অন্তঃপুরের কর্মচারির দলও জমেছেন।

তাদের হাতে টাকার থলে। এবং দেশী 'দারুর' (মদ্য), গোটা ৩০/২৫ ছোটবড় বোতল নিয়ে চৌকিদারের পাহারাদারের দলও এসে দাঁড়িয়েছে। জনপ্রতি দু'বোতল হিসাবে। খাবে। বাড়ি আনবে। যা খুশি।

অকস্মাৎ একটা সুতীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আকাশ-বিদীর্ণকারী অমানুষিক ত্রস্ত চিৎকার শোনা গেল, 'আরে বারে! মর্যো রে! আরে বারে!' (ওরে বাবারে! মরে যাবো রে! বাপরে)। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি কালো-কেলো বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় পাগড়ি, গায়ে মেরজাই, আঁটো ধুতি পরা যুবক একটা ঐ খাটিয়ার পাশ থেকে তীরবেগে ভিড় ঠেলে জনতাকে ধাক্কা দিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে ভিড়ের পিছনে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার চিৎকারে বাহকদের আরও দু-একজন শবদেহের ঢাকা সরিয়ে দেখল। এবং তৎক্ষণাৎ তিনখানা 'ঢাক ডোলে'র বাহকদল থেকে আরো ৪/৫ জন পালালো।

চৌকিদার বা সেপাই পুলিসরা কর্মচারিরাও থতমত খেয়ে গেল প্রথমটা। তারপর কেউ-বা তাদের ধরে আনতে গেল, কেউ ডাকাডাকি করতে লাগল। কোতোয়ালসাহেব এবং বড় কর্মচারিরা তাদের ইঙ্গিত করলেন, মৃদুস্বরে আদেশও দিলেন ভালো করে দেহগুলি ঢেকে দিতে।

যে বাহকটি প্রথমে চেঁচিয়েছিল, তার 'ঢাক ডোলে'র (খাটের) অর্ধেকটা আবরণ সরে গিয়েছিল। টলমল পায়ে ভাঙা পথে এসে নামানোর সময় দেওয়ালের ধাক্কা লেগে — কারণ তাদের ঐ সকালেই প্রচুর মদির পানীয় পান করানো হয়েছে। বহনকাজের জন্য টাকা এবং 'দারু'র অভাব হবে না বলেই তাদের ঘুম ভাঙিয়ে ভোরের ঘুমন্ত 'কলালে'র দোকান জাগিয়ে (শুঁড়িখানা), সেখানে বসিয়ে 'দারু' পান করানো হয়েছে। এবং সঙ্গেও সকলের জন্যই যদি পথেই খেতে চায় বা দাহ করার সময়ে যদি শ্মশানে বসেই খেতে চায় তার জন্যও প্রচুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওপরওয়ালার হুকুমে চৌকিদার কামদারের কাছে সেই টলমলে দেহে ও পায়ে খাট নাবানোর সময় প্রথমে সেই লোকটিই দেখতে পায়, একখানি কালো পোড়া হাত। আর একখানি কালো মুখের একটি পাশ। হারেমের কোন রূপবতী রাজকন্যার মুখ নয়, দেহ নয়।

তার চিৎকারে অন্য খাটের বাহকরাও এই খাটের বাহক ও সবারির নিজেদের বাহিত খাটের আবরণ সরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। এবং দেখবার সঙ্গেই উৎকট বিকট ভীত চিৎকারও করে। আর পালায়ও আর কয়েকজন। অন্য খাটের কয়েকজন যারা দেখতে পায়নি তারা হতবুদ্ধি হয়ে পালিয়ে যাবার এবং দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল। পারল না। পুলিস-চৌকিদার ততক্ষণে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

ষোলো-সতেরোজন থেকে কয়েকজন পালিয়েছে। বাকি কজন সকালবেলাই প্রচুর পান করে নেশায় অপ্রকৃতিস্থ। এবং সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়াল পুলিসের ভয়েও ভীত। তারা দূরে দূরে সরে বসবার চেষ্টা করতেও লাগল। আর বলতে লাগল শ্মশানে যাবার আগেই যারা পুড়ে মরে আছে তারা সব অশরীরী ভূত অপদেবতা হয়ে রাত্রে ওদের ঘাড়ে চেপে গলা টিপে মেরে ফেলবে। ওরা এই অপমৃত দেহ বহন করবে না। স্বয়ং হুজুরসাহেব (রাজা) এবং মহারাণীজী বললেও না। বহন করতে পারবে না এদের। এরা এখনি ভূত হয়ে গেছে। তারা রাজরোষের ভয়ে ভূতের প্রেতমূর্তির রূপে রাত্রে দেখবার ভয়ে, কোতোয়ালসাহেবের শাসনের ভয়ে একসঙ্গে সমান অভিভূত হয়ে গেছে। শুধু কাঁদছে, বলছে — 'আরে বারে। কোনে যাঁউরে। কোনে মাঙ্গু রূপেয়ারে। (ওরে বাবারে। যাব না রে। টাকা চাই না রে।) একসঙ্গে তিনজনেই কি করে পুড়ে গেছে রে।'

অর্ধেক সংগৃহীত শববাহক পালিয়েছে, যে ক'জন আছে নেশায় আচ্ছন্ন। ভয়ে বিমূঢ়। অপদেবতার ভয়, তার রাত্রে আবির্ভাবের ভয়, রাজরোষের ভয়, টাকার-পানীয়ের লোভকে কোথায় ঠেলে চেপে দিয়েছে।

রৌদ্র বাড়ে, বেলা বাড়ে। জনতা বেড়েছে। কমেনি। জল্পনাও বাড়ে। এই জনতার দলে মেথরাণীদের দলই বক্তা। আর উচ্চ-নিম্ন ব্রাহ্মণ বেনিয়া রাজপুত নরনারী শ্রোতা। এখানে ওখানে গাছতলায় নর্দমার ধারে কারুর বাড়ির উঠানে প্রাঙ্গণে গুঞ্জন চলে।

জানে। তারা জানে। অনেক কিছু ব্যাপারই জানে। কিন্তু কোতোয়ালসাহেবরাও তো সামনে বসে আছেন দেখছ তো। চোখটিপে কাছাকাছি এসে ফিস ফিস করে গলা নামিয়ে বলে, 'এই বলছি শোনো। ব্যাপার হল গিয়ে সেদিন সুরূপরায়ের রাওলাতে এক জলসা ছিল। মাজীসাহেবরাও এসেছেন। তাঁদের সখীদের গান গাইতে বলা হয়েছে। মহারাণী আর অন্য তিন রাণী এলেন। তাঁদের সখীরাও নাচ গানটান করবে।

সারারাতের জলসা। সবাই উসখুস করছে, ঘুমে চোখ ভরা। কিন্তু রাজা আর রাণীরা পর্দায়েত পাশোয়ানরা তো মদ খাচ্ছে আর ঠায় বসে আছে। ওদের যেন আলিস্যি নেই। আর গানও তো হচ্ছে খুব চমৎকার, সব রাধাকৃষ্ণের গান। সেসব আমাদের মনে নেই, মীরাবাঈ সুরদাসজীর গান। সুরূপরায় হঠাৎ বললেন, 'আজকে হুজুরসাহেব দেখবেন কোন রাণীর সখীরা ভালো নাচগান শিখেছে।' এরকম বলা বা পাল্লা দেওয়া-দেওয়ি তো 'মহলের' নিয়ম নয়।

হুজুরসাহেব, রাজা একটু অবাক হলেন। কিন্তু রূপবতী সুরূপরায় তো যা ইচ্ছে করে আজকাল। হুজুরসাহেবই তো তাকে বাড়তে দিয়েছেন। রাজা বললেন, 'তা গান হোক না। ভালো-মন্দর কথা পরে কোনসময় ভাবা যাবে।'

এল চিত্রকূটবাঈ, কি রূপ! আর অহল্যা-পম্পাবাঈও এল। আমরা তো 'ভাঙ্গী', দূর থেকে দেখছি।

তাদের সে যেমন গান তেমনি নাচ আর তেমনি কি রূপ। কখন কোথা দিয়ে সকাল হয়ে দশটা বেজে গেল! আমরা কাজে যাব, হুজুরসাহেবও দরবারে যাবেন। কারুরই যেন মনে নেই সেকথা। সে এমন নাচগান। এমন রূপ।'

একজন : 'কি হল? নাচগানের সঙ্গে আজকের এই তিনটে মেয়ের কি সম্পর্ক? এরা কে?'

আর একজন : 'এরা কারা? সেই চিত্রকূট-ঋষ্যমূকবাঈরা?

'না, এতে ঋষ্যমূকবাঈ নেই।'

অন্য কে একজন বলে, 'কিন্তু আসল কথা হল সুরূপরায়েরও তো বয়স বাড়ছে। রূপ-যৌবন কমছে' —সহসা পিছন থেকে কে মোটা ভারি গলায় ধমক দিলে। 'কি গল্প বানাচ্ছিস্। যা কাজে যা।'

নারীর দল সভয়ে চুপ হয়ে গেল। মেথরাণীর দলও ঝাঁটা হাতে করে কাজের ভান-ভঙ্গি করে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল। কৌতূহলের আর গল্পের নেশা ধরে গেছে মনে সকলের। সবাই চুপি চুপি বলে তা তিনজন পুড়ে মরল কি করে!

কেউ, 'সুরূপরায়ের কত বয়স রে ভাই। কেমন দেখতে রে? সহিসের মেয়ে ছিল নাকি সে আগে?'

কেউ বলে, 'তা দেওয়াল ভেঙে ওদের বার করল কেন?' একজন বুড়ী বললে, 'ওরা তো সেই গণিকা, ওরা যতই হোক মঙ্গল সদয় রাজপথের তোরণ দিয়ে ওদের বার করার নিয়ম নেই। সেপথে শুধু রাজপরিবারের শবই বেরোয়।' এবারে দেখা গেল আবার একদল জোয়ান যুবকদের। পলাতক তারাই হয়তো কেউ কেউ — অথবা অন্য লোক। যাই হোক, ঘটনা সবটা না জানিয়ে এবং টাকার লোভ আর প্রচুর পরিমাণ 'দারু'র লোভ দেখিয়ে তাদের আনা হয়েছে।

জনতা মূঢ় নীরব মুখে শবদেহ ছোঁয়ায় অশুচি হবার ভয়ে অপমৃত্যু মৃতদেহীর আক্রোশ ও কোপে রাত্রে নিজেদের ঘরে প্রেতরূপে আবির্ভাবের ভয়ে ভীতভাবে রাম-নাম স্মরণ করতে করতে অনেকটা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে শবযাত্রার আয়োজন দেখতে লাগল। যত ভয় তত কৌতূহল তাদের।

তিনটি খাটে তিনটি পরিচয় খ্যাতি সম্পর্ক নামহীন, সামাজিক সম্পর্কের, মানমর্যাদার পরিচয় হীন তিনটি কন্যা — কালও যারা অসামান্য রূপবতী অপূর্ব নৃত্যগীতপটীয়সী রাজনেত্রমোহিনী ছিল, সঙ্গিনীদের মধ্যে ঈর্ষার পাত্রী ছিল, তাদের অঙ্গারমূর্তিতনু শায়িত। গতকালও যারা 'রূপরায়, বসন্তরায়, সুরজরায়, সুরূপরায়দের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে পারত; পর্দায়েত পাশোয়ান হয়ে মহামান্য 'রায়' উপাধি লাভ করতে পারত। রাণীদের পরেই যে উপাধির সম্মান ও স্থান সেই রক্ষিতার পদ। যদিও ঐখানেই সমাপ্তি সে মান-সম্মানের। ঐটুকুই শুধু। কন্যা নয়। ভার্যা নয়। জননী নয়, বোন নয়। কিছু নয়, শুধু ভোগ্যা, শুধু পণ্য নারী। যে-কোন পুরুষের ভোগ্যা। এক্ষেত্রে গজ ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট রূপ-যৌবনবতী নারী। গণিকা বহুভোগ্যাদের দলের মেয়ে তারা।

যাদের জন্মদিনের কথা কেউ জানি না, কোন জননী, কোন পিতা, পরিজন সেই রূপবতী কন্যাকে বুকে নিয়ে কি ভেবেছিলেন, কি করবেন ভেবেছিলেন,

অথবা মোটেই কোন পিতামাতা ছিলেন কিনা কারুর জানা নেই। পথে পাওয়া শিশু কিনা তাও জানা নেই।

শুধু একটি চিরকালের পরম ও কঠোর সত্য এই যে তাদের পাশে কোন পিতা ব্যাকুল শোকাকাতর মুখে দাঁড়িয়ে নেই। কোন শোকার্ত জননী দুহিতার মৃতদেহ আলিঙ্গন করে রোদন করবেন না। কোন বিয়োগ-কাতর পতি মৃতার হাত ধরে বিচ্ছেদের আকুল বেদনায় মুখের দিকে চেয়ে নেই। কোন মাতৃহীন সন্তান এসে শেষ প্রণতি জানিয়ে যাবে না।

এবার সভয় শঙ্কিত মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল পরম যাত্রার পরম বাণী 'রাম নাম সত্য হ্যায় সত্য হ্যায়।' এসে পড়ল শ্মশান। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইহলোকের ও পরলোকের সামাজিক আনুষ্ঠানিক শেষকৃত্য — স্বর্গকামনা লোকান্তরিতাদের সদগতি কামনা করার জন্য কেউ ছিল?

নাঃ। কোথায় তাদের ইহলোকের সাথী সঙ্গী পরিজন, প্রিয়জন! কোন স্বজন কেউ তো ছিল না। কেউ তো নেই। কোথায় তাদের রূপমুগ্ধ রাজা! কোথায় লালজীসাহেবরা? অতবড় প্রসাদের কারুর কি তাদের জন্য একবিন্দু চোখের জল পড়েছিল? না! এবং না। তাদের পরলোক কোথায় পৃথিবীর সমাজের মানুষের জানা নেই। পিঙ্গলা অহল্যা উর্বশী মেনকাদের স্বর্গ বা নরক — মর্ত্ত্য জীবনের পর স্বর্গ কোথাও ছিল? অপ্সরাদের পরলোকও কোন স্বর্গে? সতীনারী পতি পুত্রবতী সতীনারীদের সেই পুণ্য স্বর্গে এদের জায়গা আছে কি? সেকি শাস্ত্রকথিত ভয়াবহ নরক? অথবা সুখ-স্বর্গ। সতীলোক। মরণের পরও জাত শ্রেণী কুল সৎ-অসৎ, সতী অসতী, পতিতা গণিকা বিচার থাকে কি? কিন্তু জগতে এদের শ্মশানও তো আলাদা, পৃথক। এবং ওদের সবায়ের জাত একটাই। দেখতে দেখতে কোন বিশেষ জাতিহীন সেই দেহগুলি নিঃসম্পর্কীয় নিম্নশ্রেণীর স্কন্ধে বাহিত হয়ে 'গন্ধি' নালার শুষ্ক মরু বালিময় পথ ধরে — চৌকিদার পুলিস কোতোয়াল কামদারসাহেবদের তত্ত্বাবধানে এক অন্ত্যজশ্রেণীর মহাশ্মশানের এলাকা পার হয়ে, এক গণিকা পতিতা সম্পর্কহীন চিরকালিনী ভোগ্যানারীদের জন্য নির্দিষ্ট আরেক মহাশ্মশানে এসে পৌঁছল। যাদের মৃতদেহের বাইরে আনার পথও পৃথক। শ্মশানও পৃথক। শাস্ত্র মন্ত্র, বস্ত্র, সোনা-রূপা, ব্রাহ্মণ গঙ্গোদক মুখাগ্নি শেষকৃত্যের নানা কিছু কৃত্য কি তাদের হয়? হল কি? কেউ জানে না।

আর চিতা নির্বাণ 'তিয়া'? তিনদিনের লৌকিক ক্রিয়া? তৃতীয়দিনের পারলৌকিক শান্তিক্রিয়া?

বেলা পড়ে এল। সব কর্মচারি ও প্রহরী চৌকীদারের দল ফিরে এল। শোক নয়, দুঃখ নয়, —মহা আতঙ্ক, ভয় নিয়ে অপমৃতাদের ভৌতিক আবির্ভাবের ভয়ে ইষ্টনাম, দেবতার নাম স্মরণ করতে করতে। কোথায় কখন ঘরে পথে অন্ধকারে তারা এসে দাঁড়াবে অঙ্গারমূর্তিতে জ্বালাময় দেহ নিয়ে সবাই ভাবে। খুব নির্ভীকরাও ভাবে।

আর হারেমের ভিতর রূপবতী সুন্দরী যুবতী নারী সখীদের দল স্তম্ভিত আতঙ্কে একসঙ্গে জড়সড় হয়ে বসে থাকে — তাদেরও ঐরকম এক অপমৃত্যুর ভয়ে। দিনে ও রাত্রে ও সন্ধ্যায়ও। আকস্মিক ঐ মৃত্যুর কারণ — তাদের কাছে খোজারা বলেছে— শীতের রাত্রে আগুনের গামলা নিয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিল, বিছানায় আগুন লেগে গেছে। কিন্তু 'জন-জিহ্বা' হারেমবাসিনীদের কানে পৌঁছে দেয় কারা তাদের তিনজনের মাথার চোটী (বেণী) একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল রাত্রে। আর লেপ-বিছানা দিয়ে মুখ চেপে রেখেছিল। ঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল বন্ধ ছিল। রাত্রে পা টিপে টিপে তারা তাদের ঘরে ঢুকেছিল। পাশের ঘরের সখীদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কিসের যেন গোঙানোর শব্দে। তারা ভেবেছিল অপদেবতা প্রেতিনীর ডাক। ভৌতিক ব্যাপার তারা শুনেছে চিরকাল সকলের কাছে,—সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে তাদের আস্তানা আছে। কিন্তু একঘরে অনেক সখীই তো থাকে।

সেদিন কিন্তু চিত্রকূটবাঈদের ছোট একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল। শ্রোত্রীরা নিষ্পন্দ ভীতমনে ভাবে।

ছোট ছোট বালিকা সুন্দরী পাত্রীরা যারা অত বোঝে না, ভীত কল্পনার চোখে তারা সর্বত্র সন্ধ্যারাত্রে শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, ছাতে সুড়ঙ্গপথের কোণে কোণে মিটমিটে প্রদীপের আলোয় দেখতে পায় পম্পাবাঈ চিত্রকূটবাঈকে অহল্যাবাঈকে জরিদার সবুজ ওড়না হলদে ঘাগরা পরা নাচের জলসার দিনের সাজে। হাতে পায়ে মেহেদীর ফুলকারী রূপার নূপুর মল মুরাঠা পায়ে। হাতে কঙ্কণ পৈঁছা। ভয়ে দলছাড়া হয়ে চলে না তারা।

শহর নির্বাক, রাজা নীরব। হঠাৎ শোনা গেল ভয়হীন মেথর যুবকরা গান বেঁধেছে। ডোমপাড়া মেথরপাড়াতে 'কলালে'র দোকানে গান রচিত হয়েছে।

'গোরী গোরী ছোরীয়াঁ রে। (গৌরী গৌরী মেয়েরা রে)

গোরী গোরী বাঈয়াঁ রে। কিন্তু দেখতে পেলাম রাজবাড়িতে মরা দেহ নিতে ওরে ভাই, গোরী নয় ওরে ভাই, সব কালি কালি ছোরী রে। (মেয়ে)

'অরে গোরী গোরী বাঈয়াঁ রে —

কালি বনি কৈঁয়ারে। — কালি হুয়ি কৈঁয়ারে।'

(কালো হল কি করে)

ধুয়াতে দেয় পাশোয়ানজীর নাম।

যে যুবকটি দেখেছিল সেই একটি দেহকে। তা মুখে শোনা বিবরণ নিয়ে গান। শহর ভরে যায় গানে। ব্যঙ্গের দুঃখের সুরে জনতা জেনে, না-জেনে সেই গান গায়।

প্রথামত সেইদিনই ভাঙা প্রাচীর গাঁথা হয়ে গেছে। মেথরাণীরা যে যার কাজকর্ম করছে সহজভাবেই।

তবু সুরূপরায়ের কানেও গানের কথা পৌঁছয়। রাগে আগুন তিনি। ওরা কে? কারা এমন গান গায়! এত আস্পর্ধা কার! শ্মশান-ফেরত শববাহকরা এসে বসেছে দোকানে সন্ধ্যাবেলায়। পাত্রের পর পাত্র ভরে খাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

শহরের শান্ত নিরীহ ধর্মভীরু নরনারী গানে রচিত ঐ ব্যঙ্গময় করুণ কাহিনী আড়ালে অন্তরালে দুঃখিত মনে শোনে। সুরূপরায়ের নিস্ফল রাগের কথাও শোনে ব্রাহ্মণ বেনিয়া রাজপুত— সবাই শোনে। অনেকে জনান্তিকে দুঃখিত মনে থাকে। আর আর মেয়েরা সভয়ে চোখের জল মোছে।

কতকাল ধরে কত মরেছে এমন নারী। কত হারেমের কত শুদ্ধান্তঃপুরে। ক'জনের বা ইতিহাস জানা আছে— কারুর ভোগের মহা-রাজপথে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল।

সেইসব কালের ক্ষণিক পথে আমি শুধু তাদের তিনজনকে দেখেছিলাম মাত্র। দেখেছিলাম আশ্চর্য রূপ। শুনেছিলাম আশ্চর্য কণ্ঠে গান। দেখেছিলাম অপূর্ব নৃত্য। সে রূপ গান নাচ বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সম্ভব নয় বর্ণনা করা। শুধু মনে হয়েছিল 'আনারকলি' নূরজাহানের চেয়ে তারা রূপবতী ছিল। ফৈজীবেগম, সিরাজের সব বেগমের চেয়ে রূপবতী ছিল নিশ্চয়।

যমের অরুচি

রাধারাণী দেবী

।। এক ।।

'ক্ষেন্তি, অ-ক্ষেন্তি, ওলো শতেক-খোয়ারি হারামজাদি! কানের মাথা খেয়েছিস কি?'

'ক্ষ্যান্ত যে ঘাটে গেছে মা, চাদর আর বালিশের ওয়াড়গুলো সাবান দিতে। কি বল্‌চো?'

'সে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গেলেই আমি নিশ্চিন্দি হই। এমন সর্বনাশীদেরও পেটে ধরেছিলুম, — মাগো।'

'কি হয়েছে মেজদি?'

'মা তোকে ডাকচেন, তাই?'

'মা আমাকে ডাকচো? আমি যে ঘাটে ছিলুম।'

'এদিকে আয় একবার সর্বনাশী। দেখবি তোর বেড়ালে কি সর্বনাশ করে গেছে। রাত্তিরে চিঁড়ে দিয়ে খাবার যে দুধটুকুন ওঁর জন্যে রেখেছিলুম, তোর রাক্কুসী-বেড়াল তা খেয়ে শেষ করে রেখে গেছে। আবাগি, তোর বেড়াল নিয়ে তুই সুদ্দু বিদেয় হয়ে যা, তাহলে আমি বাঁচি। আর যে আমি পারিনে, সেই ন'টার সময় দুটি ভাত মুখে দিয়ে ট্রেন ধরেছেন, সারাদিন আফিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে বাড়ি ফিরছেন, — ঘরে আজ তো ক্ষুদ-রত্তিটুকুও নেই, পরশু মাসকাবার হলে চাল কেনা হবে। — দুধটুকু রেখেছিলুম আজকে রাত্তিরের মতো, চিঁড়ে ভিজিয়েই দুধটুকু দিয়ে খেতে দেব, তা সর্বনাশীর বেড়াল সে দুধটুকু ঢাকনা উল্টে ফেলে খেয়ে গেছে।'

'মা, ক্ষ্যান্তকে বকে আর কি হবে—'

'চুপ কর, হতভাগি, চুপ কর। তুইও যেমন, তোর ক্ষ্যান্তও তেমনি। এমন

হাড়-হাবাতিদের পেটে ধরেছিলুম, ভিটেমাটি উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। পেটের শত্রুর বাড়া শত্রু নেই রে,— আপনার শত্রু আপনিই পেটে ধরে মানুষ করেছি। তোদের যদি পেটে না ধরতুম, তাহলে আজ এত দুর্দশা হতো না। শ্বশুরের ভিটে উচ্ছন্নে যেতো না,— গাঁয়ে পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হতো না!— সর্বস্বান্ত হয়ে দেনা করে বে দিলুম, তাতেও স্বস্তি নেইকো,— ছ'মাসের মধ্যেই সব খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে মুখ পুঁছে ফিরে এলেন একজন,— আর একজন দিন দিন হাতির মতো বেড়ে উঠছেন, আমাদের গলায় দড়ি দেবার জন্যে।'

'কি হয়েছে? এত বকাবকি কিসের? কিরে, সবাই চুপচাপ রইলি যে। চারু, কি হয়েছে? মেয়েদের বকছিলে বুঝি তুমি?'

'আমার মরণ হলেই বাঁচি বাপু, আর সহ্য হয় না। ওদেরও তো মৃত্যু নেই। এই কষ্ট সহ্য করেও এই লাঞ্ছনার মধ্যেও ক্ষেন্তি কি খেয়ে, কি মনের সুখে দিন দিন অত ঢেঙা আর মোটা হচ্চে বলো দেখি?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ক্ষেন্তি মোটা ঢেঙা হচ্চে তার জন্যে তোমায় অত ভাবনা করতে হবে না। যতসব বাজে কাণ্ডকারখানা।— মিছিমিছি বাচ্চাদুটোকে তুমি শক্ত কথা শোনাচ্চ কেন বলো দেখি? তোমার তো এমন স্বভাব ছিল না মনোরমা! আজকাল তোমার মেজাজ আশ্চর্যি বদলে গেছে দেখতে পাই। আগে কখনও তোমার মুখ দিয়ে কড়া কথা বেরোতে শুনিনি তো। এই দারিদ্রে ও দুর্দিনে তুমি সুদ্ধ যদি ধৈর্য হারিয়ে বসো, তাহলে আমিই বা কোথায় যাই, আর ঐ অভাগা কচি মেয়েদুটোই বা বাঁচে কি করে?

'ওগো, আমি যে আর পাড়ার লোকের বাক্য-যন্ত্রণা সইতে পারছিনে। আজ মিত্তিরজ্যাঠা, পরেশ চাটুয্যে আর গোবিন্দকাকা এসেছিলেন। আমায় ডেকে নানান্ কথা শুনিয়ে গেলেন। বললেন, আসছে অঘ্রানের মধ্যে ক্ষেন্তির বিয়ের ব্যবস্থা না করলে ওঁরা তার প্রতিকার করতে বাধ্য হবেন। পাড়ার গিন্নিদের বাক্য-যন্ত্রণায় ঘাটে তো বেরুবার জো নেই।'

'পাড়ার গিন্নিদের বাক্য-যন্ত্রণার শোধ তাই কি ওদের ওপর দিয়ে তুলে নিতে চাও? যদি এইই না সহ্য করতে পারবে মনোরমা— তবে বাংলা দেশে মেয়ের "মা" হয়েছিলে কেন?'

'ওগো, শুধু কি ওদের গঞ্জনাই দিয়ে থাকি, "মা" হয়ে নিজের মুখে, পেটের মেয়ের মৃত্যুকামনাও যে করেচি— কিন্তু এ যে কত কষ্টে— তা কেউ বুঝবে না গো, কেউ বুঝবে না।'

।। দুই ।।

'মেজদি ভাই, — সাবু আর নেই, মার সাবু কি করে হবে?'

'মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আর কি হবে ভাই, একবার কাকিমাদের বাড়ি যা,— না, না, থাক, তোর গিয়ে কাজ নেই, আমিই যাচ্ছি,— মন্টুর এই ফোড়াটা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে যাই। তুই বরং মা'র জন্যে এই কাঁচা বেলটা উনুনে পুড়িয়ে রাখ, আর নুনগুলো গলে যাচ্ছে, রোদ্দুরে বার করে দে।'

'এই কটা দিন কি করে যে চলবে মেজদি, ভাবনা হচ্চে। বাবা তো শনিবারে মাইনে পাবেন।'

'হুঁ—'

'ক্ষ্যান্ত, চারু, কি হচ্চে তোমাদের?'

'এসো মণিদা। ক্ষ্যান্ত, জলচৌকিটা উঠোনে নামিয়ে দে তো মণিদাকে!'

'তারপর? কি খবর তোমাদের? মাসিমা কেমন আছেন আজ? মন্টুবাবুর ফোড়া এখনও শুখোয়নি নাকি? দেখি,— অনেকটা কেটেছে দেখচি! ও কি মন্টুবাবু? তোমার চোখে জল যে? পুরুষমানুষের কান্না লজ্জার কথা!'

'না, না— কৈ কাঁদিনি তো? হ্যাঁ মেজদি, আজকে কি আমি কেঁদেচি?'

'না, না— কে বলে তুমি কেঁদেচো? দেখি ভাই, পা-টা একটু সোজা করো তো,— ভালো করে তুলোটা ঠিক করে দিই—'

'মেজদি, আমিই তাহলে চললুম কাকিমাদের ওখানে— বেলা হয়ে যাচ্চে, বাবা এসে হয়তো ভাত চাইবেন। আমি ভাতটা চাপিয়ে গেলুম, তুমি দেখো।'

'শোন্ ক্ষ্যান্ত,—আমার কাছে আয় একবার।—'

'কি তোদের কথা রে চারু? যা আমার সামনে বলতে পারছিসনে, কানে কানে বল্‌ছিস!'

'আমি বল্‌বো মণিদা, আমি বল্‌বো? ছোড়দি কাকিমাদের বাড়ি মার জন্যে সাবু ধার করে আনতে যাচ্ছে কিনা, তাই মেজদি—'

'তুই চুপ কর দেখি ফাজিল ছেলে! সব কথাতেই ওর কথা কওয়া চাই। মেজদি, তুমি আদর দিয়ে দিয়ে মোন্টোটার মাথা খেয়েছ। দিন দিন ওর বুড়ো-পণা বাড়ছে।'

'হ্যাঁ, আমি বুড়োপণা করি বৈকি? আর, তুমি বুঝি খুব ভালো? আমি তো ফাজিল ছেলে, আর তুমি যে বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, সব্বাই বলে—'

'মন্টু, চুপ কর্ শীগ্‌গির। বড় বোনের মুখের ওপর পাল্টা-জবাব করা! ইস্কুলে লেখাপড়া করে এই বুঝি তোমার শিক্ষা হচ্চে? বড় বোনকে অপমান করা! ছি, ছি, আজ তুমি ছোড়দিকে ওরকম করে যা ইচ্ছে বলচ, দুদিন বাদে আমাকেও তাহলে অমনি করে বলবে তুমি!'

'অ্যাঁ—অ্যাঁ—দ্যাখো না মেজদি, ছোড়দি দিনরাত্রি খালি খালি বকে, "মেজদি আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথা খাচ্চে।" ওকে বুঝি তুমি আদর দাও না? আমারই যত দোষ?— আমি তোমার মুখের ওপর কক্ষনো জবাব করেছি কি? কক্ষনও কোরবো না।'

'ছোড়দিকে কড়া কথা বললে মেজদিকেও বলা হয়, ছোড়দিকে অপমান করলে মেজদিকেও অপমান করা হয়। "দিদি" সবই এক। বুঝেছ ভাই? আর কখনও এমন কোরো না, কেমন? ক্ষ্যান্ত, তুই আর দাঁড়াসনি ভাই, বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

'আমিই তোমাদের ভাই-ভগিণী বিরোধের হেতু, কি বলো ক্ষ্যান্ত?'

'না না মণিদা, তা কেন? মন্টুটা যত বড় হচ্ছে, তত দুষ্টু হয়ে উঠছে।'

'চারু, মাসিমা আজ কেমন আছেন?'

'তেমনিই আছেন মণিদা! জ্বর কমেনি, তবু আমাশাটা কাল থেকে কম মনে হচ্ছে। ক'দিন আর মোটে বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না, বড্ড বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

'হুঁ, আমাশায় কাহিল করে বেজায়, তার ওপর অত হাই-টেম্পারেচার! কবরেজ জ্যাঠাই তো দেখচেন?'

'হ্যাঁ।'

'মেসোমশায় কোথায়?'

'বাবা কাল মনোহরপুরে গেছেন ক্ষ্যান্তর সেই সম্বন্ধটার জন্যে। আজ সকালে তো ফেরবার কথা,-- এখনো ফেরেননি।'

'মনোহরপুরে সেই দোজবরে সম্বন্ধ তো? সেটা কিন্তু বিশেষ সুবিধার নয়। পাত্র সুবোধ মিত্তির বড় বদ লোক। বয়সও প্রায় চল্লিশ কিম্বা চল্লিশের কাছাকাছি হবে।'

'গোবিন্দজ্যাঠা, মিত্তিরমশাইরা যেসব সম্বন্ধ এনে দিয়েছেন আর দিচ্চেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শাসাচ্ছেন, আসচে অঘ্রানের মধ্যে বিয়ে দিতে না পারলে আমাদের সঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহার বন্ধ করতে বাধ্য হবেন,--- সেই কাশ রুগী গোবর্ধন ঘোষের হাতে সত্যি সত্যি কি করে বাবা, বাপ হয়ে মেয়েকে সম্প্রদান করবেন? গোবর্ধন ঘোষ যে বাবার বাপের বয়সী, তার হাতে দেওয়ার চেয়ে ক্ষ্যান্তকে গঙ্গায়—'

'উঃ! আমাদের দেশে এই পণপ্রথা ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজে কি ভীষণ সর্বনাশা মূর্তি ধরে দাঁড়াচ্ছে, তলিয়ে ভাবতে গেলে বুক কেঁপে ওঠে। সমাজ এই ভীষণ অনাচারের কিছুমাত্র প্রতিকার করছে না, পাথরের মতো নিশ্চল

হয়ে শুধু চেয়ে আছে,—সমাজে এই কর্তব্য ত্রুটিজনিত মহাপাপের ভবিষ্য প্রায়শ্চিত্ত কি যে নির্দিষ্ট আছে তা ভগবানই জানেন।'

'এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি মণিদা! ভগবানের রাজত্বে অন্যায় করে অব্যাহতি কেউই পায় না। তার শাস্তি, তার প্রায়শ্চিত্ত আছেই—একদিন আগে আর পাছে! এই ভীষণ অত্যাচার কসাইবৃত্তির শাস্তি আমাদের জাতকে আমাদের সমাজকে ভুগতে হবে না? এত বড় হিন্দু মহাজাতটা যে আজ উৎসন্নে যেতে বসেছে, তার মূল কারণ— দুর্বলের উপর জুলুম ও ঘৃণা; আর নারীর উপর অত্যাচার নয় কি? দরিদ্র ও দুর্বলকে অস্পৃশ্য জাতি করে রাখা আর মেয়েমানুষকে মানুষের সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, একটা জড় পুতুল, ভোগের সামগ্রী করে রাখা, এই-ই আমাদের জাতের সবচেয়ে বড় মহাপাপ! আর এই পাপেই তার ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয়েছে। ক্ষ্যান্ত ঘরে আছে বলে, সমাজ-কর্তাদের আহারে তৃপ্তি নেই, নিদ্রায় স্বস্তি নেই, এত ভাবনা! গোবর্ধন ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে ছ'মাসের ভিতর আমার মতো হাত খালি করে থান পরে আবার বাপের কাছে ফিরে এলে তখন আর কিছু ক্ষতি হবে না। অসহায় দুর্বলের উপর এমনধারা অত্যাচার আর কতদিন পৃথিবী সহ্য করবেন জানি না।'

'দ্যাখো চারু, আমার মনে হয়, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার সঙ্গে আমাদের বিবাহ বিধি প্রচলিত হলে, আর অসবর্ণ বিবাহটাও রীতিমতো প্রচলিত হয়ে গেলে, এই পণপ্রথাটা অনেকটা খর্ব হতে পারে। অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতি বা সভাসমিতি বক্তৃতাতে প্রকৃত কার্যকরী ফল যে কিছু ফলবে তার আশা হয় না।'

'মণিদা, চেষ্টা করলে কার্যসিদ্ধি হয় না, এ আমি বিশ্বাস করি না। যাঁরা সামান্যমাত্র সহজ চেষ্টা করলেই দেশের এই বিশ্রী অনাচার ও উৎপীড়নটা বন্ধ করতে পারেন, তাঁরা নিজেদের ছোট মনের হীন-স্বার্থের খাতিরে কোনোদিন সে চেষ্টা করেননি, অথচ তাঁরাই সমাজে শিক্ষিত উন্নত ভদ্র বলে পরিচিত, আর তাঁদেরই উপর ভবিষ্যৎ সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তুমি কি বলতে চাও মণিদা, দেশের শিক্ষিত ছেলেরা যদি বিবাহে অস্বাভাবিক পণ গ্রহণ করাটা ঘৃণা বলে মনে করে এবং তারা আন্তরিক বিরুদ্ধবাদী হয়ে আপন জীবনে তার প্রতিকার করতে দৃঢ় বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কি পণপ্রথা দিনকে দিন এমনি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে? "সমাজ" কাদের নিয়ে? দেশের যুবারা যদি আন্তরিক ঘৃণায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁরা পণ্যদরে টাকার ওজনে তাঁদের

জীবনের সহধর্মিণীকে গ্রহণ করে নিজের মনুষ্যত্ব ও পত্নীর সম্মানের অবমাননা ঘটাবেন না, তাহলে কার সাধ্য তা রোধ করতে পারে? শিক্ষিত বা উপার্জনক্ষম ছেলেদের বাপমায়ের অতিরিক্ত বাধ্য, সুবোধ শিশুটির মতো হয়ে উঠতে দেখি— শুধু বিবাহ আর পণ নেওয়ার সময়েই। বাবা-মা যদি অন্যায়ই করেন এবং সে অন্যায় যদি কেউ বুঝতে পেরেও সমর্থন ও সাহায্য করে, তবে তার মতো কুসন্তান আর দ্বিতীয় নেই, এই আমার বিশ্বাস।'

'চারু, তারা হয়তো সব সময়েই নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে সুযোগ পায় না,— কারণ—'

'মণিদা, আমি বিশ্বাস করি না ভাই। যারা "কালো মেয়ে" বিবাহ করবো না স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, অল্পবয়স্কা মেয়ে বিয়ে করবো না, কিম্বা কেউ কেউ বা "গরীবের মেয়ে বিয়ে করবো না" বলে আপত্তি জানিয়ে বেশ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারে,— তারা কর্পদকমাত্র "পণ গ্রহণ না করে বি.্র করবো" এই কথাটি বলবার বেলায়ই বুঝি ভীত সুবোধ সলজ্জ হয়ে ওঠে? শ্বশুরের বুকের শোণিত-শোষণের বেলায়ই দেখি তাদের মাতৃভক্তি আর পিতার বাধ্যতা হঠাৎ উপ্‌চে ওঠে! ছিঃ! জানো মণিদা, বাংলার মেয়েরা মানুষের আকারে জন্মেও জন্তুমাত্র হয়ে থাকে। তোমরা সেই "সার্সি"র মতো তাদের নিজেদের হীন স্বার্থ যন্ত্র-চালিত ইতর শ্রেণীর বন্য জন্তু পর্যায়ভুক্ত করে রেখেছ ভাই—তাদের মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের উপর দিয়ে এই অসম্মান অবমাননার জাঁতা অহর্নিশি পেষণ চলছে। তা না হলে সাধ্য ছিল না তোমাদের, আমাদের নিয়েই সমাজের বুকের উপর এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠান করো! যাঁদের রক্তমাংস ও জীবন হতে এই রক্তমাংসের দেহ ও জীবন লাভ করি, যাঁদের অপার স্নেহে ও আত্মত্যাগে পরিপুষ্ট হয়ে বেঁচে বড় হয়ে উঠি, যাঁদের চেয়ে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জন ও হিতার্থী সংসারে দুর্লভ, সেই বাপ-মায়ের বুকের ছুরি বসিয়ে,—মাকে নিরাভরণা ও বাপকে দেনার দায়ে জীবন্মৃত পথের ভিখারী করে, যে ব্যক্তি নিজের ঘড়ি ছড়ি জুতোপাঞ্জাবি আংটি এসেন্স অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য কড়ায়-গণ্ডায় নিখুঁত করে বুঝে নেয়, সেই ঘৃণ্য নীচ-চেতাকে পিতামাতার দুঃখের হেতু সংসারের শত্রুকে "মানুষ" কখনও অনাবিল প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে জীবন সমর্পণ করতে পারে না! এই সমস্ত অনাচার মেয়েরা যদি বুঝতে পারে, সেই ভয়েই সেই স্বার্থেই তাদের মানুষের সব প্রকার অধিকার ও উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত করে, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যন্ত্র পুতুলমাত্র করে রেখেছ তোমরা! মেয়ে জন্মালেই আমাদের দেশে বাপমায়েরা আতঙ্কে শিউড়ে

ওঠেন কেন? কার জন্য এই নিরপরাধ সদ্যোজাতা বালিকা বাপমায়ের আনন্দভাজন সন্তান হয়েও আতঙ্কের বিষয়, দুঃখের বিষয় হয়ে ওঠে? জন্মমাত্রই বাপমায়ের বিমর্ষ মুখের হতাশ দীর্ঘশ্বাস তার কচি অঙ্গে এসে স্পর্শ করে, সে কার জন্য? সন্তান হয়ে বাপ-মার গলগ্রহ ও শত্রু হয়ে ওঠে কন্যা— সে কার রক্ত শোষণের আশঙ্কায়? কে সেজন্য দায়ী? যে বিবাহ করে সেই-ই নয় কি? মণিদা, সেই নিষ্ঠুর আত্মসুখসর্বস্ব স্বার্থপর স্বামীর উপর "মানুষের" নির্মল ভক্তি, সুগভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেম কখনই জন্মাতে পারে না। তবে যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশ বা মানুষের উচ্চ বৃত্তিগুলি উন্মীলিত হয়নি, ভালো-মন্দ, ন্যায় অন্যায়, ন্যায্য-অন্যায্য, কর্তব্য-অকর্তব্য এ সম্বন্ধে ধারণা বা বোধশক্তিই জন্মায়নি, তাদের কথা স্বতন্ত্র।'

'চারু, আমাদের সমাজে বহু অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পুরুষরা যে তা মোটে দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না তা নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে ও বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত নিজেদের অনুষ্ঠিত পাপ, অত্যাচার ও অন্যায়ের স্তূপের বিরাট দেহের দিকে চেয়ে ভয়ে ও দুর্বলতায় তার এর প্রতিকার করবার ইচ্ছা জাগলেও তা পারছে না। আজ তাই বর্তমান যুগের এই জীবন সমস্যায় এ দেশের পুরুষরা এই "জ্যান্ত পুতুল" মেয়েদের নিয়ে কিছুমাত্র তৃপ্ত ও সুখী হতে পারছে না। অথচ নিজেদের কৃত অন্যায় ও অপরাধের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে,— নারী এই অজ্ঞানতা রূপোর কাঠির দীর্ঘবর্ষ-ব্যাপী ঘুম ভেঙে শিক্ষা ও জ্ঞানোৎকর্ষের সোনার কাঠির পরশ পেয়ে চোখ মেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক, এ ইচ্ছা প্রাণের তলে তলে জাগলেও তা মুখ ফুটে বলতে পারছে না বা তার জন্য প্রয়াস করতে সাহসী হচ্ছে না। যদি তারা ঐ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী স্তূপীকৃত অত্যাচারের কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে? আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি চারু, তোমাদেরও চোখে আজ এই সহনাতীত অন্যায়টা কি জ্বলন্তভাবে ফুটে উঠেছে! সর্ববিধ শিক্ষা ও উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত রাখলেও; এই চিন্তাশক্তি ও বিদ্রোহিতা তোমার মধ্যে কে জাগিয়ে তুলেছে জানো? সে এই পুরুষদেরই চরম অত্যাচার. স্ত্রীকে প্রকৃত "জীবনসঙ্গিনী" বলে যে গ্রহণ করতে চায়,-- সে কখনও গহনা ও টাকার ওজনে তাকে আনতে পারে না, ঠিক কথা। এতেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবাদের প্রকৃত শিক্ষার উৎকর্ষ ও মনের উৎকর্ষ আজও ঘটেনি। তাহলে—'

'চুপ করো মণিদা, ক্ষ্যান্ত আসছে। ও ছেলেমানুষ, ওর সামনে এসব সম্বন্ধে আলোচনা করা ঠিক নয়।'

।। তিন ।।

'ও চারি,— কোথায় গেলিরে— উনি এসেছেন, পা ধোবার জল দে,—'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, চারু আসছে। অহোরাত্র মেয়েদুটো খেটে খেটে সারা হয়ে গেল! এইবারে ওরা যদি ব্যারামে পড়ে তাহলেই অন্ধকার। চারুটা তো রোগা হাড়সার হয়ে গেছে। ওর দিকে চেয়ে দেখলে আমার বুকের ভিতরটা যেন ফেটে যায়! উঃ— নারায়ণ— ক্ষ্যান্ত, তোর মেজদিদি কোথায় রে?'

'মেজদি বাগানে নারকোল পাতা কুড়িয়ে আনতে গেছে, কাঠ নেই কিনা; বাবা, আপনি একটু বসুন, আমি এখানেই হাতমুখ ধোবার জল এনে দিচ্ছি।'

'তাই এনে দে, ঘাটে আর যেতে পারিনে মা।'

'ওগো, সারাদিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয়নি? মুখ যে বড্ড শুকনো দেখছি।'

'সুবলগঞ্জ থেকে ফেরার সময় নকীবপুরের কাছারিতে একটা ডাব খেয়েছি। আহা-হা, তুমি আবার উঠে এলে কেন? তুমি শুয়ে থাকো, পড়েটড়ে গিয়ে আবার নতুন উপসর্গ জোটাবে কি? আমি খাবো অখন, ক্ষ্যান্ত, চারু ওরা আছে, আমার জন্যে তোমায় অত ব্যস্ত হতে হবে না।'

'না আমি এই বাইরের দাওয়াটায় একটু বসি। আজ এ-বেলা জ্বর একটু কমেছে মনে হচ্ছে। সারাদিন না খেয়ে না নেয়ে রোদ্দুরে ঘুরে এলে, যে-জন্যে গেলে তাও বোধ হয় কিছু হয়নি? হা— দামোদর, আর কত দুঃখু দেবে?'

'দুঃখু এখনই বা কি আর হয়েছে মনো, এর পরে হয়তো সপরিবারে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিম্বা না খেয়ে উপোস করে মরতে হবে।'

'সুবলগঞ্জে কিছু হলো না বুঝি? তারা তো মেয়ে পছন্দ করে গেছল!'

'মেয়ে তো পছন্দ হয়েছিল,— সব জায়গাতেই ঐ চাক্‌তিরই খাঁক্‌তি! মনোহরপুরের সম্বন্ধটাই শুধু টাকার গোলমাল বেশি করেনি। কিন্তু জেনেশুনে একটা অসচ্চরিত্র আর সন্দিগ্ধ পুরুষের হাতে মেয়েটাকে কি করে জন্মের মতো সঁপে দিই? মনোহরপুরে খবর নিলুম, সবাই-ই বললে,— "সুবোধ মিত্তির আর পক্ষের বৌটাকে সন্দেহ-বাইয়ে বড় যন্ত্রণা দিয়েছে। ঘরে চাবি দিয়ে তাকে বন্ধ করে রেখে তবে বেরুতো। অবস্থা থাকলেও ঐ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির জন্যে একটা ঝি পর্যন্ত রাখত না। তার নিজের ভাই এলে, দেখা করতে দিত না।" জেনেশুনে এই ভীষণ প্রকৃতির লোকের হাতে মেয়েটাকে কি করে জ্যান্ত জবাই করতে দিই? নইলে সুবোধ মিত্তির দোজবরে হলেও বয়স চল্লিশের উপর নয়, অবস্থাও ভালো, আর তিন-চারশো টাকার মধ্যে রাজী হয়েছিল; কিন্তু সে তো ছেড়ে দিতে হলো।'

সুবলগঞ্জের এ-সম্বন্ধটিও দোজবরে, তবে এত খাঁই কচ্চে কেন?'

'খাঁই করে কেন? আমাদের উদ্ধার করবে বলে। ছেলেপিলে সুদ্ধ দোজবরে পাত্রই কম টাকায় নিতে চায় না, তা ও পাত্রটির আবার ছেলেপুলে নেই। আর দোজবরে একবরে! সর্বস্ব খুইয়ে দেনা করে চারুকে তো প্রথমপক্ষ বি-এ পড়ছে ছেলে দেখে দিয়েছিলুম,— এখনও ওর বিয়ের চারশো টাকা বাকী! তা সবই তো মিছে হয়ে গেল! ওরকম কেবলমাত্র পাত্রটির উপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না দিয়ে চারুটাকে যদি একটু মোটা ভাতকাপড়ের সংস্থান দেখে দিতুম, তাহলে আমি অবর্তমানে হয়তো ওকে পথে দাঁড়াতে হতো না! আর, বাঙালীর ঘরে দোজবরে একবরে সবই সমান, তবে বয়সে একেবারে বুড়ো না হলেই হলো।'

'তা সুবলগঞ্জের এরা কত চাইছে?'

'বললে গহনা বরাভরণে ও নগদে সবসুদ্ধু আটশোর কমে কিছুতেই হবে না।'

'তুমি কত বলেছিলে?'

'আমি পাঁচশো পর্যন্ত উঠেছিলুম, তারপর জবাব দিয়ে চলে আসতে হলো। নারায়ণ—নারায়ণ!'

'হ্যাঁ গা, পাঁচশোই বা পাবে কোথায়? চারুর বিয়েরই চারশো টাকা দেনা আজও শোধ হয়নি। আমার গায়ে আর একটুকরো সোনা নেই, খানকতক তক্তাপোষ, কাঠের সিন্ধুক আর খান দুচ্চার কাঁসা পেতলের বাসন ছাড়া ঘরেও তো এমন কিছু নেই যে বিক্রি বা বন্ধক দিয়ে টাকার উপায় করবে! বিম্‌লির বিয়েতে আমার গায়ের সমস্ত গয়না আর ঘরে যা কিছু দামী জিনিস ছিল সবই গেছে, চারুর বিয়েতে জমিজমা যেখানে যেটুকু ছিল সব ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে উল্টে আবার দেনার দায়ে মাথা বিক্রি হয়ে রয়েছে। তা তুমি কি সত্যিই ভিটে বেচে ক্ষ্যান্তর বে দেবে?'

'উপায় কি আর? ভিটে তো এদিকেও যাবে, ওদিকেও যাবে। বৃন্দাবন সার— দেনা কি তুমি শোধ হবে ভেবেচো? ভিটে বিক্রি ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দেনা শোধ করে বাকি টাকাটায় ক্ষ্যান্তর যদি একটা উপায় হয়ে যায়, ভাবচি।'

'হ্যাঁগা, আমরা সত্যিই কি তবে গাছতলায়—'

'উপায় নেই মনো, উপায় নেই। সবই প্রারব্ধ কর্মের ফল! দামোদর যদি গাছতলায় দাঁড়ানোই বিধান করে রেখে থাকেন তা এড়াবার সাধ্য কি!'

'বাবা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন, আমি ভাত বাড়ছি। মা, তুমি এই ভর সন্ধেবেলা দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছ কেন? হিম লেগে জ্বর বাড়বে যে! তুমি কি আজ নিজেই বেরিয়ে আসতে পেরেচো?'

'নিজেই আস্তে আস্তে উঠে এসেছি একটু, দিনরাত্রি ঘরের ভিতর আর ভালো লাগে না।'

'তোমার গা দেখি মা? নাঃ, কপালটা তো বেশ গরম রয়েচে। চলো, ঘরে শুইয়ে দিইগে। তোমার সন্ধেবেলাকার ওষুধের অনুপান কি? পানের রস আর মধু, না মা?'

'কি জানি মা; চারুই সারাদিন ওষুধ খাওয়ায়, কোন সময়ের কি অনুপান সেই-ই জানে। চারু কোথায় গেল?'

'মেজদি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে বড্ড কাহিল-পানা হয়ে পড়েছে! রগের কাছটা একটু কেটে গেছে ইঁট লেগে। তবুও সে উঠে আসছিল তোমায় ওষুধ খাওয়াতে আর বাবাকে ভাত দিতে! আমি আসতে দিইনি তাকে, জোর করে ও-ঘরে শুইয়ে রেখে এলুম।'

'কে রে ক্ষ্যান্ত?— কে পড়ে গেছে? চারু নাকি? অ্যাঁ?'

'না, না বাবা, কিছু হয়নি; আপনি খাবেন চলুন।'

'চারু কোথায়? কোথায় তোর মেজদি, হ্যাঁরে?'

'বাগানে নারকোল পাতা কুড়িয়ে এক বোঝা পাতা আর কাঠের টুকরো নিয়ে আসছিল, হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ভির্মি লাগার মতো হয়ে গেছল! এখন বেশ ভালো আছে, আমি তাকে উঠতে মানা করে ও-ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি।'

'কেন এমন হলো বল তো? ওগো, এইমাত্র আমি তোমায় বলছিলুম না, চারুটা বড্ড কাহিল-চেহারা হয়ে পড়েছে।'

'সারাদিন এই হাড়ভাঙা খাটুনি, আগুন-তাতে দু'বেলা রান্না, ভাবনা-চিন্তা, ভালো করে নায় না, খায় না— এই সতেরো বছর তো মোটে বয়স,— এত পেষণ কি করে সয় ঐ কচি-হাড়ে? আমি বড় কঠিন প্রাণ মা, তাই এইসব চোখের উপর দেখে সহ্য করচি। ক্ষ্যান্ত, চারুকে আমার কাছে এ-ঘরে এনে শুইয়ে দে, আমার প্রাণটা বড় অস্থির হচ্চে।'

'হ্যাঁরে, ইঁট লেগে কপাল কেটে গেছে বলছিলি না? ঘরে যদি দুধ থাকে তো একটু গরম করে খাইয়ে দিতে হতো।'

'আজ যে মেজদির একাদশী, বাবা,—'

'ওহ্— ভগবান্! আহা হা, তাই জন্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে— দামোদর, আর কত পরীক্ষা করবে!'

'ক্ষ্যান্ত, তুই আজকে রাঁধলিনে কেন মা? আজ ওকে খাটতে দিলি কেন?

'না মা, রান্না তো আজ আমিই করেছি। মেজদি আমাকে রাঁধতে দিতে চায়নি, আমি জোর করে তাকে হেঁসেল থেকে তুলে দিয়েছি। রান্না তো ভারী, সিম-বেগুনের ঝোল, আর ওলভাতে-ভাত। মেজদিকে আজ সংসারের কাজও

কিছু করতে দিইনি, ও আজ রান্নাঘরের পাশের দিকে ঐ শাকের চারা আর লঙ্কা বেগুন গাছগুলোতে সারাদিন রোদ্দুরে বসে কাটারি দিয়ে বাখারি কেটে কেটে বেড়া দিয়েছে। আমি বললুম, মেজদি, আজ থাক, তা বললে আজ আমার কাজকর্ম নেই, ছাগল গরুতে গাছগুলো খেয়ে গেলে, ভাত খাওয়ার মুশকিল হবে। তারপর কাকীমাদের সাত সের মুগ এনে কাল বালি-খোলায় ভেজে রেখেছিল, আজ সেগুলো যাঁতায় ভেঙে ডাল তৈরি করে পাঠিয়ে দিলে। কাকিমা একসের ডাল আমাদের দিয়েচেন। সারাদিন অত খাটুনির পর আবার সন্ধেবেলা নারকোল পাতা আনতে গিয়েছিল, মাথা ঘুরে পড়বে না তো কি?'

'ক্ষ্যান্ত আমার খিদে নেই, তোরা খেয়েদেয়ে নিস্, ও-ঘরে আমার বিছানাটা ঝেড়ে দে একটু, শুয়ে পড়ব।'

'বাবা, আপনি সারাদিন কিছু খাননি,—দুটি ভাত মুখে দেবেন চলুন। বাবা—'

'না মা, আমার সত্যিসত্যিই আর খিদে নেই। আমি শুতে চললুম, আমায় আর ডাকাডাকি করে বিরক্ত করিসনে।'

'মা, ওমা, বাবা যে না খেয়ে শুতে চলে গেলেন! কি করবো? সারাদিন একটি ডাব খেয়ে আছেন, আর কিছু খাওয়া হয়নি যে—'

'আমি আর কি করবো মা—আমি— আর যে পারিনে, দেহে মনে আমার আর এক বিন্দুও সামর্থ্য নেই— আমায় তোমরা আর জড়িও না— হা ঠাকুর,— আরও কত মনে আছে তোমার।'

।। চার ।।

'মেজদি, ঘুমুলে?'

'উহুঁ—'

'মেজদি—'

'কি বলছিস?'

'না মেজদি, কিছু না।'

'এত রাত অবধি জেগে কি ভাবছিস?'

'কিছু না।'

'আচ্ছা ঘুমো।'

'মেজদি, মন্টুকে দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে তুমি মাঝখানটায় মন্টুর জায়গায় এসে শোও না ভাই আমার কাছে—'

'যাচ্ছি। এই মন্টু—দেখি, দেখি,— এই যে— তোমায় ভালো করে

শুইয়ে দিচ্ছি ভাই। কৈ ক্ষ্যান্ত, আয়, কাছে আয়। কি হয়েছে রে? সমস্ত দিন আজ তোর মুখখানা অত ম্লান শুকনো শুকনো দেখচি কেন?'

'কৈ, কিছু না তো মেজদি!'

'ক্ষ্যান্ত, মাথাটায় কি জটাই পাকিয়ে রেখেছিস্। মাগো, চুলগুলো যেন পাখির বাসা হয়ে রয়েছে। ক'দিন আমি চিরুনি নিয়ে ডাকিনি কিনা,— দেখি কাল মাথাটা সাবান দিয়ে না হয় ঘষে দোবো। হ্যাঁরে, মাথাটা মেজদির বুকের ভেতর গুঁজে দিয়েও মেজদির কাছে শোওয়ার সাধ কি তোর মিটছে না? তাই অমন করে জড়াচ্ছিস কচি ছেলের মতো? মন্টু জেগে থাকলে এতক্ষণে মারামারি বাধাতো।'

'মেজদি, তোমাকে এমনি করে জড়িয়ে তোমার বুকের ভেতর মাথা গুঁজে শুলে আমার যেন আর কোনও কিছু ভয় থাকে না ভাই!'

'কেন, ভয় কিসের ক্ষ্যান্ত?'

'কিছু না মেজদি, আমার মাঝে মাঝে কেমন যেন আপনা আপনি বিনা কারণে ভয় করে— কি জানি।'

'আজ ক'দিন ধরেই তোকে কেমন মনমরা দেখচি, আমার কাছে লুকুচ্ছিস কেন ভাই? কি হয়েছে বল না? আমার কাছে লজ্জা কি দিদি, বাবার কষ্ট দেখে বড্ড দুঃখ হয়েচে, না?— হ্যাঁ, আমিও তা বুঝতে পেরেছি। মনে কষ্ট করে ভেবে কি করবি ভাই? তোর আর অপরাধ কি— অপরাধ আমাদের সমাজের, আর অদৃষ্টের।'

'মেজদি, আমার জন্যেই বাবার এই যন্ত্রণা— আমি যদি না থাকতুম, তাহলে—'

'না রে না, তুই না থাকলেও কষ্ট কিছু কম হতো না। সে বরং তোর চেয়ে আমিই বেশি দুর্দশা ও কষ্টের কারণ বাবা-মার। যাক, ওসব কথা ভেবে মন-খারাপ করে কিছু লাভ নেই। ঘুমো,—আমি তোর মাথা চুলকে দিই।

● ● ●

'ও ভাই মেজদি?'

'অ্যাঁ--- কিছু বলছিস কি ক্ষ্যান্ত?'

'না না, কিছু নয়, তুমি ঘুমোও।'

'ক্ষ্যান্ত, তোরা এখনও কথা কইছিস? অনেক রাত হয়েছে, ঘুমো, অসুখ করবে যে! দুটো বেজে গেল।'

'এই যে ঘুমই মা—'

।। পাঁচ ।।

'অন্নদাপিসি, বাবা তো প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, এই মাসের মধ্যেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। কি করবেন, ওঁর কি বিয়ে দেবার অনিচ্ছা? পাত্র না পেলে কি করবেন?'

'পাত্র পাবেন নাই-বা কেন? এই তো রামদাদা সেদিন একটা সম্বন্ধ এনে দিয়ে গেলেন!'

'রামখুড়ো, মিত্তিরমসাই, গোবিন্দজ্যাঠা ওঁরা যা সম্বন্ধ এনে দিচ্ছেন, আর যেখানে দিতে বলছেন, সেখানে জেনেশুনে বৈধব্যদশা ও সধবার বৈধব্যের বাড়া অবস্থায় কি করে মেয়েকে সঁপে দেন? ওঁরা যে দুটি সম্বন্ধ এনে দিয়ে অঘ্রানের মধ্যেই বিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে গেছেন, সে দুটি পাত্রের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে. গলায় পাথর বেঁধে নদীর জলে ডুবিয়ে মারা ভালো।'

'তা বাছা, তোমাকে তো তোমার বাপ এত নেকাপড়া শিখিয়ে এত টাকাকড়ি খরচা করে, জমিজমা সর্বস্ব বন্দক দিয়ে পেরথম্ পক্ষ জোয়ান ছেলের সঙ্গে বে দিলেন, তবে বছর না ঘুরতে তোমারই বা অমন দশা হলো কেন? বিধবা-সধবা থাকা মেয়েমানুষের কপালের লেকন। যার কপালে "রাঁড় ডণ্ড" নেকা আছে স্বয়ম্ বিধেতাপুরুষ এসেও তা খণ্ডোন কত্তে পারে না! আর যার এয়োতের জোর থাকে, সে বুড়ো তেজবোরে স্বোয়ামিকে নিয়ে ঘরকন্না করে ছেলেপুলে রেখে হাসতে হাসতে ড্যাংডেঙিয়ে চলে যায়! ঐ যে শরৎ ঘোষালদের মেজো পুঁটি,— তার তো পিতেমোর বইসী তেজবরে বরেতে বিয়ে হয়েছিল! এখনও কেমন শাঁখা সিঁদুর নিয়ে সুখে সচ্-চন্দে ঘরকন্না কচ্চে। পেটে সন্তান হয়নি, ভালোই হয়েছে, সতীন পো সতীন ঝি জামাই বৌ নাতিনাতনি কিছুরই তো অভাব নেই। সেদিন মেজো নাতনির বিয়ে হলো ঘটা করে। তোমার সঙ্গে একসঙ্গেই তো বিয়ে হয়েছিল! তুমিই বা এমন জোয়ান-স্বোয়ামিকে হারিয়ে বসে রইলে কেন, আর সেইই বা বুড়ো-স্বোয়ামি নিয়েও হাতের নোয়া নিয়ে রয়েছে কেন? সবই অদেষ্টো মা অদেষ্টো! মেজো পুঁটির ফি বছর পুজোয় এক-একখানা ভারী গয়না হয়! কৈ পেরথম্ পক্ষের মাগেদের তো অমন সুখ সচ্চিন্দি দেখলুম না কারো?— উমেশ মল্লিকের সঙ্গে বে হলে ক্ষেন্তি খেয়েপরে দু'খানা ভালো গয়না গায়ে দিয়ে 'জন্ম সাথোক' কত্তে পেতো। এখানে তো এই হাঁড়ির হাল আছে! আর বয়সও তো পেরায় তিন চার ছেলের মা হবার মতো হয়ে গেছে! অতবড় মেয়ে আর কোন্ ভরসায় তোমার বাপ এখনও বুকের উপর রেখেছে? রংটুকুও যদি তোমার মতো হতো,— তাও বা কথা ছিল, রং ময়লা, টাকা

দেবার ক্ষ্যামতা নেই, "জর্জ ম্যাজিস্টর" জামাই খুঁজচেন কিসের জোরে?— গাঁয়ের লোক ভালোরই চেষ্টা করেছে, তাকে যদি তোমরা "মন্দ" বলে ধরে নেও, সে আলাদা। কিন্তু এও বলে দিয়ে যাচ্চি মা,— এই "অগ্ঘানে" বে দিতে না পারলে মিত্তিরমশায়ের মায়ের ছেরাদ্দ'য় তোমাদের ডাক পড়বে না ঠিক হয়ে গেচে। এই চুপি চুপি শুনিয়ে গেনু।'

'পিসি,— বাবা যে ক্ষ্যান্তর বিয়ের জন্যে পাগলের মতো হয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর কষ্ট কে বুঝবে?'

'কি জানি বাছা, তোমার বাপের কেমনতর পাগল হওয়া? যারা নিতে চাইচে, সেখানে মেয়ে দিচ্ছেন না, অথচ আবার পাগলও হচ্চেন! পাড়ায় যে এদিকে কথা রটেচে, তার খপব রাখো? আমরা যে নিন্দেয় কান পাততে পারচিনে! ভালো কথা বলতে এলে তোমরা "মন্দ" বোঝো,— আমাদের দরকার কি মা,— ভাই ভাজের মোতন দেখি, নিন্দে শুনে সেইজন্যে "পেরাণডা" কর্কর্ করে— এই্ই যা। তা এখন চন্নু মা, আজ আবার নক্ষ্মীজনাদ্দনের ওখানে "পেল্লাদ-চরিত্তির" কথা হবে। আমাদের নিবেরণ কথকমশাই এসেচেন কি না?— হ্যাঁ চারু, আঁচলে ধরে আছিস ওগুলো কি র‍্যা? কাঁচালঙ্কা নাকি? বাড়ির গাছে ফলেচে বুঝি— তা ঝাল আছে তো? আমাদের পোড়া গাছদুটোয় লঙ্কা ফলে খুব, কিন্তু সে মিথ্যে, একরত্তি ঝাল নেইকো তেতে। আমি আবার একটু ঝাল নইলে গেরাস মুখে তুলতে পারিনে। —দিবি? তা দে না মা, গোটাকতক বেগুনে দিয়ে দেখব অখন, কেমনতর ঝাল? ছুঁসনে বাছা, আলগোছে এই আঁচলের কোণেই ঢেলে দে। চললুম তাহলে। তোমার মা তো তোমার খুড়ীর বাড়ি গেছেন, তাঁকে বোলো আমি এসেছিনু।— থাক থাক— পেন্নাম কত্তে হবে না, পায়ে হাত দিও না, এইমাত্তর কাপড় কেচে আসচি। কি আর আশীর্বাদ করবো মা, ওপরটা তো এমন সোন্দর, কপালের ভেতরটা যে এমন ছাইভরা কে জানত? এমন জগোদ্ধাত্তরীর মোতোন রূপ সবই "ছাইভস্ম" হয়ে গেল — হরি বলো— হরি বলো— তাই তো বলি গো, সবাইয়ের কাছে— চারুর আমাদের কোনখানটায় বিধবার নোক্ষণ আছে? হাতপায়ের গড়নটি যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ! অদৃষ্টটা এমন মন্দ কেন হলো?— গতরটা সুখে থাক্ মা— ধম্মে মতি হোক্— হরি বলো, — হরি বলো।'

● ● ●

'মেজদি— মেজদি— শীগগির এসো, সর্বনাশ হয়েছে—'

'কি হয়েছে রে মন্টু? অমন করছিস কেন?'

'ছোড়দি গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে গেছে, মেজদি গো—'

'অ্যাঁঃ! সে কি রে! কোথায় সে? কোথায় সে?'

'মণিদা তাকে তুলে এনে আমাদের বাইরের ঘরে শুইয়েছেন— উঁ হু হু হু — মেজদি গো, ছোড়দিকে মোটে চেনা যাচ্চে না। কি ভয়ানক দেখতে হয়ে গেছে — উহ্! কি হবে ভাই?'

'চুপ চুপ, ব্যস্ত হ'সনে — চল শীগ্‌গির— মাকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে আয়—'

● ● ●

'ক্ষ্যান্ত, ক্ষ্যান্ত, মা আমার, —কেন এমন কাজ করলি মা। ও হো হো— হো—'

'চুপ করুন মাসিমা, শান্ত হোন। অস্থির হয়ে কোনো লাভ নেই।'

'ওহ্! কি সর্বনাশ হলো মণিদা! কেন এমন বুদ্ধি হলো ওর। আজ ক'দিন ধরেই সারারাত ও ঘুমোয় না, ছটফট করে, সারাদিন শুকনো মুখে আমার আড়ালে আড়ালে সরে থাকে, আমি বুঝেও বুঝতে পারিনি, হায়, হায়, হায়! মণিদা, তুমি কি করে ধরে ফেললে? ও কি বাঁচবে? কিন্তু এমন ভীষণ অবস্থা হয়ে বেঁচে থেকে যে আরও যন্ত্রণার জীবন হবে।'

'সে এখন পরের কথা, এখন তো ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে; ভয় নেই, মারা যাবে না, কারণ বেশি গভীরভাবে পোড়েনি। আর বুক ও পেট খুব সামান্য পুড়েছে, চামড়া মাত্র। আমি মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলুম! মেসোমসাইকে ক্ষ্যান্তর জন্য একটি পাত্রের কথা বলে যাবো এই ভেবে আসছি,— বাগানের ও-পাশটা থেকে দেখতে পেলুম ক্ষ্যান্ত কি যেন একটা জিনিস কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে মজুমদারের ঐ ভাঙা বাড়িটার পশ্চিমদিকের ঘরটায় ঢুকে, ভিতর থেকে দোর বন্ধ করে দিলে। ভর সন্ধেবেলাতে ক্ষ্যান্তকে ঐ বাড়িতে অমনভাবে ঢুকে দোর বন্ধ করতে দেখে একটু আশ্চর্য হলুম, ওখানে যাবো কিনা ভাবচি, এমন সময়ে, একটু পরেই দরজার ফাঁক দিয়ে আগুনের আলো দেখতে পেয়ে, —দৌড়ে গিয়ে দরজায় দু-তিনটে সজোরে লাথি মারলুম। পচা দরজা ভেঙে পড়ে গেল তখুনি— ভিতরে দেখি ছেঁড়া মশারির মতো কি একটা জিনিস গায়ে জড়িয়ে সেইটের উপর কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলচে, আর সারা ঘরময় ছুটোছুটি করছে।'

'উহ্— উহুহু-হু মাগো— কেন এমন তোর বুদ্ধি হলো? আমার অনাদরের

জন্যেই কি অভিমানে প্রাণ খোয়াতে গিয়েছিলি মা? ওরে, আমি মা হয়ে তোর মৃত্যুকামনা করেছি বলেই কি সেই দুঃখে তুই প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিস? ও মা ক্ষ্যান্ত,— আমার বুকের ভেতরটার দিকে চেয়ে দেখ একবার— আমি তোকে ভালোবাসি কিনা—'

'মণিদা, অজ্ঞান হয়েও এত কাতরাচ্ছে কেন ভাই? ওকি অজ্ঞানেও যন্ত্রণা টের পাচ্ছে?'

'যন্ত্রণা টের পাচ্ছে বৈকি, এ কি কম যন্ত্রণা! বুঝতে পারলে কেউ এমন কাজ করে!'

'মণিদা, ক্ষ্যান্ত যদি বাঁচে, তবে আমাদের এ-গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। আর, তা করতেই হবে।'

'পরের কথা পরে হবে চারু, ঘরে বোধ হয় অয়েল ক্লথ নেই? দেখি, খানকতক খুব কচি কলাপাতা এনে বিছানাটায় বিছিয়ে দিতে হবে। মেসোমশাই এখনো অফিস থেকে ফিরলেন না যে। সন্ধের ট্রেনের সময় তো হয়ে গেছে।'

'বাবা সন্ধের ট্রেনেই প্রায় আসেন, না হলে ন'টার ট্রেনে আসেন। উঃ, মণিদা, কিরকম ছটফট করছে ও! ঐ যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই বাবা আসছেন।'

।। ছয় ।।

'গাঙ্গুলিমশাই, কায়েতপাড়ার খবর শুনেচেন?'

'হ্যাঁ। বিভূতি সেনেদের তো?'

'ছি ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি, কি কেলেঙ্কারি! অতবড় বুড়োধাড়ি মেয়ে ঘরে পুষে রাখলে এসব ব্যাপার যে ঘটবেই এ তো জানা কথা। এইজন্যেই হিন্দুশাস্ত্রে গৌরীদানের বিধি লিখে গেছেন! বাবা, ঋষিরা কি কম বিবেচনা করেই বলে গেছেন,— স্ত্রীলোক বাল্যকালটি বাপমায়ের শাসনে থাকবে, তারপর যৌবনে পদার্পণ করলেই স্বামীর শাসনের মধ্যে থাকবে, শেষে বৃদ্ধকালে বৈধব্যাবস্থায় পুত্রের অধীনে কাল কাটাবে— এর ব্যতিক্রম ঘটালেই ব্যভিচার আসবে। তা আজকাল মেয়েরা যৌবন পেরিয়েও বাপের ঘরে থুমড়ো হয়ে বসে থাকছে, এসব কুকীর্তি ঘটবে না কেন বলুন?'

'আমাদের "দ্বোয়ারি" বলছিল, সে প্রায়ই নাকি সন্ধের দিকে ক্ষেন্তি ছুঁড়িকে মজুন্দোরদের ঐ পোড়ো বাড়িটায় যেতে দেখেছে! আর চক্কোবর্ত্তীদের ঐ মণে ছোঁড়াটা তো প্রতিদিনই সন্ধেবেলা বিভূতি সেনের বাড়ি গিয়ে, ঐ সোমত্ত সোমত্ত ছুঁড়িদুটোর সঙ্গে ইয়ারকি দেয়।'

'আচ্ছা, মণেটা তো শুনি রামকেষ্ট মিশনে নাম লিখিয়ে সন্ন্যেসী হয়েছে, বে-থা করলে না, আজকাল আবার মোটা চট-কাপড় পরে গাঁধি-মহাত্মার দলেও ঢুকেছে,— এত পাশটাশও তো করলে— শিক্ষিত ধার্মিক ছেলে বলে এত সুনাম— তা ওর এ কিরকম ব্যাভার, কি প্রবৃত্তি?'

'আরে, দেশ উদ্ধার করে আর পরোপকার করে বেড়ালেই বা, তা বলে কি আর রামকেষ্টর পুথিতে লেখা আছে— পরের বাড়ির সোমত্ত বিধবা আর আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে ইয়ারকি দিও না? বিয়েই করতে বারণ শুধু।'

'সত্যি সত্যি, বিভূতি সেনেদের বাড়ি মণের এত আত্মীয়তা কিসের? ওরা কায়েত, মণে বামুন। ছি, ছি, ছি, কি ব্যভিচার!'

'আরে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, যে যেমন কর্ম করবে তার ফলও ঠিক তেমনিই হবে। এখন ভুগুন বিভূতি সেন! গোবর্ধন ঘোষ— চারখানা গাঁ জুড়ে যার অতবড় তেজারতির কারবার— তাকে জামাই পছন্দ হলো না?'

'কি হয়েছে চাটুয্যেমশাই? কার কথা বলছেন?'

'ঐ তোমাদের ''পবিত্রানন্দ'' না ''শুদ্ধানন্দ'' যার নাম হয়েছে, হরিশ চক্কোত্তীর ব্যাটা মণি চক্কোত্তী।'

'কে মণিদা? হ্যাঁ, তা কি হয়েছে তাঁর?'

'বিভূতি সেনের মেয়ে পুড়ে ম'লো, মণির এত মাথাব্যথা কেন? তুই না ব্রহ্মচারী, তোর তো স্ত্রীলোকের মুখদর্শন নিষেধ, বিশেষত স্ত্রীলোক। এই বুঝি সব ব্রহ্মচর্য হচ্চে?'

'গাঙ্গুলিমশাই, কি বলছেন আপনি? অমন কথা মুখেও আনবেন না। মণিদার মতো ছেলে আমাদের গাঁয়ে আর একটিও দেখাতে পারেন? ওরকম দেব-চরিত্রের মানুষ কটা হয়? ছি ছি ছি, ওঁর সম্বন্ধেও এমন কথা আপনারা উচ্চারণ করতে পারছেন? অতবড় স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, উদারচিত্ত ছেলে আমাদের জেলার মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে দাও ''স্বার্থত্যাগী'', ''পরোপকারী''! ভিক্ষে করে পরের টাকায় অমন সবাই মড়কে, দুর্ভিক্ষে, বানে, পরোপকার করতে ছুটতে পারে! হুজুগে মেতে রোজগারপাতি না করে অমন সকলেই স্বার্থত্যাগ করতে পারে।'

'দেখুন গাঙ্গুলিমশাই, মুখ সামলে কথা কইবেন। সবাইকে নিজেদের চরিত্রের লোক ভাববেন না। মণিদা দেশের কাজে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। অতবড় পি. আর. এস. পাশ করেও গ্রামের চাষাভূষোদের সঙ্গে খালি পায়ে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গ্রামের উন্নতির জন্যে নিজের সব উৎসর্গ করেছেন। আর চরিত্র? ওঁর মতো লোকের

পায়ের ধুলোও যেদিন এই গাঁয়ের লোকেরা পাবে, সেদিন গাঁ উদ্ধার হয়ে যাবে জানবেন।'

● ● ●

'দেখলে হে চাটুয্যে! যত্‌নেটার কি চোট্‌পাট্‌ আস্পদ্দার বুলি! ফাজিল ছোকরা, কলকাতা থেকে কটা পাশ করে এসে ভারী বক্তৃতা করতে শিখেছেন। আমাদের বোঝাতে আসে কিনা, কে মহাপুরুষ স্বার্থত্যাগী? ব্যাটা আমার সমাজসংস্কারক দেশ-উদ্ধারকারী! ওর বাপ আজও এখনও আমাদের এক ধমকে ভড়কে যায়! ছুঁচো ব্যাটা!'

'জানেন গাঙ্গুলিমশাই, বে-থা না করে পরের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যদি ইয়ারকি মেরে সাধু সেজে বেড়ানো যায়, তা মন্দ কি? যাই হোক, ক্ষেন্তিটা মরেনি তাহলে, বেঁচে উঠেছে?'

'আরে, তুমি তাও বুঝি শোননি? বাঁচবে না তো কি? ঐ মণেই তো বাঁচিয়েছে।— আচ্ছা, সন্ধের আঁধারে মজুন্দোরদের পোড়ো বাড়িটায় ক্ষেন্তিই না হয় "আত্মহত্যে" করতে গিয়েছিল বুঝলুম,— কিন্তু সেই ভর সন্ধেবেলা মণেটা সেখানে কি দরকারে গিয়েছিল? ও যে তাকে বাঁচিয়ে আনলে, ও কি করে এ-পাড়া থেকে টের পেলে ক্ষেন্তি ও-পাড়ায় ঐ পোড়ো বাড়িতে দোর বন্ধ করে পুড়ে মরছে?'

'ঘোর কলি! ঘোর কলি! পাপ চারপো পূর্ণ হয়ে এসেছে এবার। "যেমন কর্ম তেমনি ফল"—বীভৎস চেহারা হয়েচে। কি আর বলব! সমস্ত চুল ভুরুটুরু পুড়ে গেছে। গায়ের চামড়া সব পুড়ে কুঁচকে গেছে, মাঝে মাঝে লাল দগ্‌দগে ঘা,--- সে অতি বিকট দৃশ্য!'

'যাই হোক, সমাজের বুকের উপর এতবড় একটা ব্যভিচার চলবে, এটা তো ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়! এর একটা প্রতিবিধান তো করা উচিত!'

'নিশ্চয়ই, তাতে কি সন্দেহ আছে?'

'চলুন, কায়েতপাড়ায় মিত্তিরমশাইদের ওখানে একবার যাওয়া যাক। দেখি, এতবড় কাণ্ডটা তাঁরা কি মীমাংসা করেছেন।'

'হ্যাঁ, চলুন না, চলুন না, যাওয়া যাক। আরে ছ্যাঃ, দেখলেন তো, অমন ছুঁড়িতে যমেরও অরুচি।'

লজ্জা শরম

আশাপূর্ণা দেবী

বেলা চড়তে না চড়তে রোদ এমন চড়ে উঠেছে যে মা বসুমতী তেতে আগুন, বাতাস বইছে যেন আগুনের হলকা ছড়িয়ে। আকাশটা যেন একখানা ঝকঝকে ইস্পাতের পাতের মত জ্বলছে। তার কোথাও কোনখানে মেঘের ছিটে তো দূরস্থান, একটু ঘোলাটে ছায়া পর্যন্ত নেই। অথচ আষাঢ়েরও অর্ধেক যায় যায়।

'এবার খরা হবে', ভবিষ্যৎবাণী করছে কেউ কেউ। ...পুকুরের জল নেমে যাচ্ছে হু হু করে, বাঁধানো ঘাটের শেষ তলানি সিঁড়িটা পর্যন্ত এবড়ো থেবড়ো ইঁটের সঞ্চয় নিয়ে জেগে উঠেছে। যেন কঙ্কালের হাড়পাঁজরা।

এই ঘাটে নেমেই ঘড়া ঠুকে ঠুকে জল নিচ্ছিল নন্দ গড়াইয়ের বৌ। বড় ঘড়াটা ডুবছে না, তাই মেলার বাজারে কেনা হাল্কা পাতলা শখের ছোট ঘড়াটাকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বড়টাকে ভরে তুলছিল।

কেশবের বিধবা বোনটি এসে দাঁড়াল ঘটি গামছা নিয়ে। কেশবের বোন কট্টর বিধবা, তার রান্না খাওয়া এই ঘাটের জলে চলে না, রোজ এক ঘড়া করে গঙ্গাজল আসে তার জন্যে। ঠিকেদার কেশবের অধীনে লোকজন খাটে বিস্তর, নানা ধরনের লোক, তাদেরই কাউকে দিয়ে জলটা আনিয়ে দেয় কেশব। গঙ্গার ধারেই তো রবারের কারখানা বসছে, কারখানা বাড়িটা বানাবার কাজের ঠিকেদারি পেয়েছে কেশব।

তা বিধবা বোনটাকে কেশব খুবই পুজ্যি করে বলতে হবে। এতো কে করে? গরবিনী বিধুমুখীর তাই এই পচা ঘাট থেকে জল ভরবার দায় নেই। আসা শুধু চানের জন্যে। তাও নিত্যস্নানটুকুই। যোগে যাগে পালে পার্বণে বিধবা বোনকে গঙ্গাস্নানের সুযোগ সুবিধেও করে দেয় কেশব।

হয়তো মাল বওয়া গরুর গাড়িতে চাপিয়ে, হয়তো বা রীতিমত পয়সা খরচা

করে সাইকেল রিক্সা চাপিয়ে। অথচ সংসারে বিধুমুখী নাকি ভাজের মাথায় মাথায় পা দিয়ে হাঁটে, নিজের শুদ্ধাচারের রান্নাটুকু করে নেওয়া বাদে, কুটো ভেঙে দুটো করে না, সারাক্ষণ পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়িয়ে দুনিয়ার খবর সংগ্রহ করে বেড়ানোই তার কাজ। বিশুদ্ধ তাহানির ভয়ে বিধুমুখী উদয়াস্ত তসরের কাপড় সেমিজ পরে বেড়ায়, কাজেই তার গতিবিধি অবাধ! সে নিত্যি সকালে ঘনশ্যামের স্টেশনারি দোকানে গিয়ে খবরের কাগজ শুনে আসে, সন্ধ্যায় লাইব্রেরী ঘরের দরজায় ঢুঁ দিয়ে ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুদের মারফৎ কলকাতার খবর শুনে আসে, বি. ডি. ও অফিসের জোয়ারদার বাবুর কাছে বসে দেশের ধান চালের, চাষ বাসের, আর উন্নতির অবস্থা ব্যবস্থার কথা শুনে আসে।

আরো একটা সোর্স আছে তার খবর জানবার। সেটি হচ্ছে কেশব ঠিকেদারের অ্যাসিস্ট্যান্ট নেপাল। নেপালকে তো প্রায় রোজ একবার করে আসতেই হয় কেশবের কাছে। সক্কালবেলা এসে নির্দেশনামা নিয়ে গিয়ে কাজে লাগে, কেশব একেবারে খেয়ে দেয়ে বেলায় যায়।

তা নেপালের ওই সক্কালবেলার প্রাতরাশটি এ বাড়িতে বাঁধা। বৌদির হাতের চা আর বিধুদির হেঁসেল থেকে ছুঁড়ে মারা বেগুনি কি কুমড়ো ফুলের বড়া, কলাই ডালের ফুলুরি কি পোস্তর চাপড়ি তার কাছে নাকি অমৃত সমান। কেশবের কাছেও প্রশ্রয় আছে তার। কেশবই একসঙ্গে বসে খেতে খেতে হাঁক পাড়ে, কই গো, নেপালকে আর এক গেলাস চা দাও না। এখন খাটতে যাবে। বিধু, তোর রেখে যদি আর দুখানা বড়া বাড়তি হয়তো ইদিকে ছুঁড়ে মার।

নেপাল বলে, না না, আপনি খান।

কেশব বলে, আমার যদি হজম হত, তাহলে কি আর তোমায় সাধতাম ব্রাদার।

মনে মনে বলে, দাদন দিয়ে রাখছি। এখন 'ব্রাদার' বলছি, এরপর 'সান-ইন-ল' বলব। কেশবের সবেধন নীলমণি মেয়েটা এখন গোকুলে বাড়ছে, তাই গোপন ইচ্ছেটি কারো কাছে ফাঁস করে না কেশব। শুধু বৌকে আর বোনকে বলে, ছেলেটা খুব কাজের, আর বিশ্বেসী, ওকে একটু তোয়াজে রাখা ভাল। তা বৌ মাথায় কাপড় টেনে ওই ঠক করে এক গেলাস চা বসিয়ে দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু না জানলেও বিধুমুখী বিধিমতেই তোয়াজ করতে জানে। করেও। তাই বিধুদির রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে নেপালের গল্প আর ফুরোয় না।

কেশব এক একবার তাড়া দেয়, অ বিধু তোর গপ্পো থামা। ওর কাজের বেলা বয়ে যাচ্ছে।

বিধু ভ্রুভঙ্গী করে বলে, আমি গপ্পো করছি, না ন্যাপলা গপ্পো করছে?

তারপর হেসে বলে, বেলা হবে না. সাইকেল যা চালায় তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সে তো সাইকোলনের বেগে।

নেপাল তাড়াতাড়ি বিধুমুখীর গঙ্গাজলের খালি ঘড়াটা সাইকেলের পিছনে বেঁধে নিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে যায়। কাল সকালে আসবার সময় ভরে নিয়ে আসবে, এই ব্যবস্থা। আসা মাত্রই জলটা ঘরের বড় ঘড়ায় ঢেলে নেয় বিধু। পাড়ার কিছু অনুগতজনকে প্রয়োজনমত গঙ্গাজল সাপ্লাই করে তাদের মাথা কিনে রাখে।

নন্দ গড়াইয়ের বৌ তেমনি একজন মাথা বিকোনো পড়শী বিধুমুখীর। তাই ওকে ঘাটে আসতে দেখেই তটস্থর ভঙ্গীতে বলে. ঠাকুরঝির যে আজ দেরী?

বিধুমুখী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে, সক্কালবেলাই যে দাদার সেই পাপ সে জোটে। তাকে বিদেয় না করে তো বেরোতে পারি নে। এখন গুচ্ছির কলাই ডালের ফুলুরি গিলিয়ে তবে এলাম।

গড়াইয়ের বৌ পায়ে গড়ানোর সুরে বলে, ধনি্য বাবা, এতও পার। তাও নিষ্পরের জন্যে—

বিধুমুখী হাতে পায়ে তেল ডলতে ডলতে বলে. নিষ্পরের জন্যে খাটতে আমার ভারী দায় পড়েছে গড়াই বৌ! করি সোদর ভাইয়ের জন্যেই। বৌ তো অকর্মার ঢেঁকি। আর দাদার ওই চায়ের সঙ্গে যত ভাজাভুজিতেই মন। আগে তো ওই সব দিয়েই পেটমোটা করে বেরেকফাষ্ট সেরে কাজে বেরোত। এখন আর পেটে সয় না তাই পাঁউরুটি খেয়ে মরতে হয়। ওই মুখরুচি করতে দু-একখানা। তা কপাল গুণে নেপাল মিলেছে, ও ছোঁড়াও ভাজাভুজির যম! তাই দাদার এত পছন্দ।

গড়াই বৌয়ের জলভরা হয়ে গেছে, কাঁখে ঘড়া তবু দাঁড়িয়ে থাকে, বিধুমুখীর নাওয়া না হতেই চলে যাওয়া? সেটা 'অস্‌সেহ্য'। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নাওয়া দেখতে দেখতে বলে. ঠাকুরঝির গড়নখানা দিয়েছিল বটে ভগমান। মুনির মন টলে।

থাম লক্ষ্মীছাড়ি! মরণ!

আহলাদে আহলাদে গলায় রাগ দেখায় বিধুমুখী, তোদের মুখে ও ছাড়া আর কথা নেই। একবেলা গঙ্গাজলে হবিষ্যি গিলে গিলেও তো পোড়া গতরকে টসকাতে পারিনে।

বিধুমুখীর কেবলমাত্র একবেলা গঙ্গাজলে হবিষ্যি গেলার অন্তরালবর্তী রহস্য পাড়ার কারো অজানা নয়। কেশবের ঘরের দুধেলা গাইটার উপস্বত্বের অধিকাংশই যে নিরিমিষ ঘরে চালান হয়। আর সকালের ওই ভাজাভুজির

অধিকাংশই কৌটোয় ভর্তি হয়ে শিকেয় তোলা হয়ে যায়। তা' কেশবের হাবাগোবা বৌটার মারফৎই সকলের গোচরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু কেশবের বোনকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই।

শুধু গঙ্গাজলই নয়, অসময়ে টাকাকড়িও সাপ্লাই করে সে। সুদটা একটু চড়া, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ঘরে ঘরে বৌ-ঝিরা স্বামী পুত্তুরকে লুকিয়ে কি মহাজনের কাছে দৌড়বে সুদ কমের আশায়?

বিধুমুখীর নিটোল গঠনভঙ্গিমা দেখতে দেখতেই বোধ হয় আর একটা বিপরীত ছবি মনে পড়ে যায় নন্দর বৌয়ের। তাই হঠাৎ বলে ওঠে, তুমি তো বিশ্বভুবনের সব খবরই রাখো ঠাকুরঝি, পা-কাটা বাঞ্ছার শুঁট্‌কি বৌটা কাল থেকে বি. ডি. আফিসের ধারে কাছে অমন আগুন খাগীর মতন ঘুরে মরছে কেন বল তো? কেষ্ট বলছিল বি. ডি.ওর পিয়ন নাকি কী চাই জিজ্ঞেস করেছেন, তাকে রাস্তা থেকে ইঁট তুলে মারতে গেছিল। ওদিকে বাঞ্ছা নাকি ঘরে পড়ে চেল্লাচ্ছে, কাল থেকে খাওয়া জোটেনি, ঘরে হাঁড়ি চড়েনি। ব্যাপারটা কী? গরমের তাতে ক্ষেপে গেল নাকি ছুঁড়ি?

বিধুমুখী অবজ্ঞায় মুখ বাঁকিয়ে বলে, মরুণী।

নন্দর বৌ বোঝে, প্রশ্নের উত্তর আছে বিধুমুখীর। এটা বিধুমুখীর আস্তে আস্তে ভাঙার একটা চাল।

তাই দরকারের অধিক আগ্রহ দেখিয়ে বলে, জানো তাহলে? বরের সঙ্গে কোঁদল করে জব্দ করে রেখে গেছে বুঝি? আহা, পা খোঁড়া মনিষ্যি।

কী শাস্তি।

বরের সঙ্গে কোঁদল নয়—

বিধুমুখী মুখ বাঁকিয়ে বলে, রঙ্গিনী কোঁদল করতে গেছিলেন বি. ডি.ও জোয়ারদারের সঙ্গে।

ওমা আমি কোথায় যাব। ...গালে হাত দেয় নন্দর বৌ, জোরদারবাবুর সঙ্গে কোঁদল করতে গেছিল পা-কাটা বাঞ্ছার বৌ?

বাঞ্ছারামের নাম এখন ওই বিশেষণটার সঙ্গে এমন যুক্ত হয়ে গেছে যে। 'পা কাটা বাঞ্ছা' ছাড়া শুধু বাঞ্ছা আর বলে না কেউ। তা না বলুক, বাঞ্ছারামও একদা ওই বি. ডি. ও অফিসেরই একজন পিয়ন ছিল। ফাইল বগলে নিয়ে মদগর্ব চালে জোয়ারদারের আগের অফিসার চক্কোত্তীবাবুর সাথে সাথে ঘুরে বেড়াত। এখন যেমন মদনদাস যায়। মদনদাস ইঁট খেতে খেতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

ভাগ্যচক্রে এখন বাঞ্ছারাম পা দুটো হারিয়ে ঘরে পড়ে। অফিসের বাগানের মাটি কোপাতে কোপাতে পায়ের ওপর কোদালের কোপ। ...ছোটলোকের

মরণ, সেই পায়ে শুধু একটু রেড়ির তেলে ভেজা ন্যাকড়া বেঁধে ছিষ্টি কাজ করা। করতে করতে পা পেকে পচে যাকে বলে গ্যাংগ্রীন। ...অতঃপর আর কী? দু-মাস হাসপাতালে থেকে হাঁটুর নীচে থেকে বাদ দিয়ে ঘরে ফিরে এসে, পড়ে পড়ে মাথা খোঁড়া। সেই তো হাসপাতালে যেতেই হল, আগে যদি যেতিস এমনটা হত? ...হতভাগা বলে বটে, নাকি প্রথমেই গিয়েছিল সদর হাসপাতালে, তাকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিয়েছিল। ...আরে বাবা, খেদিয়ে তো দেবেই, দূর দূর করেই তো খেদিয়ে দেয়। কোন হাসপাতালে আবার তোদের মতন হতভাগা দরিদ্দিরে দাতব্যর রুগীকে জামাই আদরে 'এসো হে, বোসো হে, ভাত খাও হে' করে? তা সেই 'দূর দূর'টা মেনে নিয়ে মান করে চলে এলে চলবে? হাতে পায়ে পড়বি, কাকুতি মিনতি করবি, সাধ্যমত এদিক ওদিক কিছু পয়সাকড়ি ছাড়বি, তবে না ঢুকে পড়তে পারবি? তা নয়, বাবু কিনা 'আর দাইড়ে থাকতে নারছি, জ্বর এসে গ্যালো' বলে ঠিকরে চলে এলেন! ...হল তো? পেলে তো তেজের ফল?

হ্যাঁ, এই সবই বলেছে সবাই তখন বাঞ্ছাকে।

কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। যে যাবৎ ওই হতভাগা পা কাটা বাঞ্ছা হামা দিয়ে দিয়ে ঘরের দাওয়ায় এসে বসে সেখানেই নাওয়া খাওয়া করে, আবার হাঁটু ঘসতে ঘসতে ঘরে গিয়ে চাটাই পাতা বিছানাটায় শুয়ে পড়ে। ...সরকারি অফিসের নিয়ম কানুন কর্মরত অবস্থায় অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায়, কিছু কিছু পেন্সন পায়, তাই কিছুটা চলে, যৎসামান্যই অবশ্য। তা যেমন দান তেমন দক্ষিণা, যেমন বিয়ে তেমন আলপনা, যেমন চাকরি তার তেমনি পেন্সন। তবু নেই মামার জায়গায় কানা মামা। তার সঙ্গে বৌটার উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির রোজগারটা যোগ হয়, এই ভাল।

তা 'উদয়াস্ত' বললেও ঠিক বলা হয় না। 'উদয়ের' অনেক আগেই উঠে পড়ে বাঞ্ছার বৌ, আর 'অস্তে'র অনেক পরে তবে একটু গা ছড়ায়।

সদা সর্বদাই লোকের চোখে পড়ে, পা কাটা বাঞ্ছার হাড্ডিসার বৌটা কি না কি কাজ করে বেড়াচ্ছে। ঘাটে দেখ লোকের বাড়ির বাসন মাজছে, ক্ষার কাচছে। মাঠে দেখ ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়চ্ছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, কাদের যেন কাঠ কাটছে, কাদের যেন জল বইছে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজের সংসারের জন্যে রসদ সংগ্রহ করছে।

কোথায় বেওয়ারিশ কচু ঘেঁচু ডুমুর কাঁকুড় আপন সুখে বাড়ছে, কোথায় পুকুর ধার আলো করে শুষুনি কলমি লকলক করছে, বাঞ্ছার বৌয়ের নজর ঠিক সেখানে।

বাঞ্ছার বৌ মানেই, সাতজন্ম তেল না পড়া নারকেল ছোবড়ার মত লালচে লালচে রুক্ষু রুক্ষু নুড়ো বাঁধা চুল, খড়ি ওঠা আর শিরা ওঠা হাত পা, ছেঁড়া কুটি কুটি একখানা শাড়ির ভগ্নাংশ যা তা করে অঙ্গে জড়ানো, এবং ঘাড়ে কাঁখে কি কোঁচড়ে ওই 'সংগ্রহভার'। ...এই বাঞ্ছার বৌ।

মেয়েটার অবশ্যই কোন কালে একটা নাম ছিল, কিন্তু তা নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে? গ্রামে ঘরে শ্বশুরবাড়ির বৌদের কারই বা 'নাম'টা চালু থাকে? বড় বড় লোকের বাড়িতেই থাকে না, তা বাঞ্ছারামের মত হতভাগ্যর বৌয়ের। আগে উল্লেখ করা হত—শুধুই 'বাঞ্ছার বৌ' বলে, অতঃপর 'পা কাটা বাঞ্ছার বৌ।'

অর্থাৎ আগে দেখলে শুধুই 'দুঃখী' বলে বোঝা যেত, এখন বোঝা যায় 'হাড় দুঃখী' বলে। তবু এত দুঃখের মধ্যেও 'আগুন খাগী'র মূর্তি নিয়ে কবে ঘুরে বেড়িয়েছে বাঞ্ছার বৌ? ...আর ওই বি. ডি. ও অফিসের ধারে কাছেই বা কেন?

আর কেন?

সবজান্তা বিধুমুখী গামছা ঝাড়া দিয়ে তেল চকচকে চুলের গোছা মুছতে মুছতে বলে, আর কেন? পা গেছে বলে গরমেন্ট থেকে যে মাসোয়ারা দেয় বাঞ্ছাকে, দৈবগতিকে তাই বুঝি দুমাস বাকি পড়েছে, তার জন্যে মুখপোড়া বাঞ্ছা দুবেলা জোয়ারদারবাবুর কাছে তাগাদা পাঠাচ্ছে। দেখো আক্কেল। গরমেন্ট থেকে বাকি ফেলে রেখেছে তো জোয়ারদার কী করবে? ...তবু খুব নাকি দয়ার শরীর মানুষটার, তাই নিজে বাড়ি বয়ে গিয়ে বাঞ্ছাকে বলে এসেছিল, সঙ্গে তো টাকা নেই সন্ধের পর একবার যাস দিকি, দেখি কতটা কি করতে পারি? তা বাঞ্ছার তো আর সে খ্যামতা নেই—

হ্যাঁ, হতভাগার যে সে খ্যামতা নেই সেটা তো সকলেই জানে। সবজান্তা বিধুমুখী হয়তো আরো বেশি জানে। জানে আর কোন ক্ষমতা না থাকলেও সংসারে আরো একটা খাওয়ার মুখ বাড়াবার ক্ষমতা রাখে বাঞ্ছারাম দাস, এবং সেই ক্ষমতার প্রকাশে বাঞ্ছার বৌ বরকে বলেছে, এরপর একবেলাও জুটবে নি, তা খ্যাল রেখো। ...কিন্তু একথা কি জানে বিধুমুখী, দয়ার শরীর জোয়ারদারবাবুও এক নজরে বাঞ্ছার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে ওই কথাই শুনিয়ে দিয়েছিল।

বৌটা তো বেড়ার দরজাটা খুলে দিয়েই তার খাটো কাপড়ের ছেঁড়া আঁচলটুকু টেনে টুনে লজ্জা নিবারণ করবার চেষ্টা করতে করতে প্রায় ছুটেই পালিয়েছিল, তবু জোয়ারদার গলা খাঁকারি দিয়ে দাওয়ায় উঠে বাঞ্ছাকে ডেকে বলেছিল, কী রে বাঞ্ছা, বলি, ওই ছোঁড়াটা কে রে যাকে দিয়ে তাগাদা পাঠিয়ে পাঠিয়ে আমার মাথার চুল খেয়ে ফেলছিস?

আধখানা শরীরে ঘসটে এসে বাঞ্চা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেই মাটির ধুলো জিভে চেটে হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, আজ্ঞে, মাথার চুল? কী যে বলেন। জোড় হস্তে মাপ চাইছি বাবু। আপনাকে ত্যক্ত করতে ইচ্ছে ছেল না আমার, কিন্তু কী করবো, পেটের জ্বালা যে কত জ্বালা।

জোয়ারদারের মুখটা ব্যঙ্গে কুঁচকে গিয়েছিল, তবু তো জ্বালার ওপর জ্বালা বাড়াতে ছাড়ছিস না।...দেশের যত ধান চাল তো এই তোরা ছোটলোকরাই বিনসাতি করে চলেছিস। যাদের ঘরে মা লক্ষ্মীর আমাপা ভাঁড়ার, তাদের ঘরে একটা বৈ দুটো দেখি না, আর তোদের মতন এই হাভাতে হাঘরে লক্ষ্মীছাড়াদের ঘরেই খাওয়ার মুখের গুণতি নেই। বেড়েই চলেছে।

বলা বাহুল্য বাঞ্চা হেঁট মুণ্ডে এ অপবাদ সহ্য করে নিয়েছিল।

বিধুমুখীর কী জানা আছে এরপর জোরদারবাবু কীরকম শেয়ালের হাসি হেসে বলেছিল, সে যাক, তোর সংসার তুই বাড়াবি, দুবেলার বদলে একবেলা খাবি, সে হচ্ছে তোর বিজনেস। তবে এই বলে রাখছি তোর এই আহ্লাদের অ্যালাউন্স এবার বন্ধ হবে। গরমেন্টের টাকা এত সস্তা নয় যে তোদের মতন অকাল কুষ্মাণ্ডদের বসিয়ে খাওয়াবে। বলি, পা দুটোই নয় গ্যাছে, হাত দুটো তো যায় নি? আর হাতই হচ্ছে কাজের অস্তর।

বাঞ্চা কাতর বদনে বলেছিল, আমি কোন কাজটা করতে পারবো বাবু? পঙ্গু মানুষ!

তা পারবি কেন? পারিস কেবল—জোয়ারদার একটা অশ্লীল মন্তব্য করে বলে উঠেছিল, চেষ্টা থাকলে হাত দুটো দিয়েই অনেক হয়। কেন, ঘরে বসে মাদুর বুনতে পারিস নে? খেজুর পাতার চাটাই?

ওসব মালপত্তর আমায় কে জোগান দেবে আজ্ঞে?

কেন, তোর ওই সোহাগী বৌ-ই দেবে।

বাঞ্চা অবাক হয়েছিল, ও কোথা পাবে?

আরে বাবা, বুদ্ধি থাকলে আবার পাবার অভাব? পরিবারটা তোর দেখছি নির্বুদ্ধির ঢেঁকি। যাক গে—সন্ধের পর যাস একবার। দেখি কী করতে পারি?

আমি? আমি যাবো?

আকাশ থেকে পড়েছিল বাঞ্চা।

জোয়ারদার বলেছিল, ও তাও তো বটে। তা ছেলেপুলে কাউকে পাঠিয়ে দিস রে বাপু।

ছেলেপুলে।

তাতেও হতাশায় মাথা নেড়েছিল বাঞ্চা। আমার ছেলে দুটো তো এজ্ঞে

মাটির সঙ্গে কথা কইছে। কী বা বয়েস। তাও যে দুটো এখন এখেনে নেই। তাদের পিসি নে গেছে নিজের কাছে।

আরে মোলো!

জোয়ারদার দাওয়া থেকে নামতে নামতে বলে, এ হতভাগা যে দেখি কেবল কথা কাটান করে। কেউ না থাকে তো পরিবারকেই পাঠিয়ে দিবি। পুরো না হোক কিছুটা টাকা দিয়ে দেব। আর মদনাকে দিয়ে কিলো চারেক চাল আনিয়ে রাখব। তা এখন তো আঁধার পক্ষ চলছে। মেয়েছেলে একা পারবে তো যেতে?

চাল! কিলো চারেক চাল! তাছাড়া টাকা!

আরো একবার মাটির ধুলো চেটে বাঞ্ছা বলেছিল, পারবে নি মানে? ওর ঘাড় পারবে। ওর আবার আলো আঁধার। ...রাতের অন্ধকারে আনাচ কানাচ ঘুরে বেওয়ারিশ বাগানের কলাটা মূলোটা কুড়োতে যায় না? শেষ রাত্তিরে উঠে ডোবার ধারে উটকে গুগ্‌লি হাতড়াতে যায় না? ঘোষের পুকুরে গামছা ছ্যাঁকা দিয়ে তিত্ পুঁটি ধরে না? হুঁঃ। ওর পেরাণে ভয় ভিৎ নাই বাবু। আপনি আজ্ঞে চালটা মাপিয়ে রাখুন গে। আর টাকাটা—

আচ্ছা আচ্ছা।

জোয়ারদার রাস্তায় পা দিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, তবে বড্ড ভর সাঁজে পাঠাস নে। আমার আবার তখন সন্ধে আহ্নিক আছে। সে সময় গিয়ে ফ্যাচ ফ্যাচ করলে রাগ চড়ে যেতে পারে।

জোয়ারদার অদৃশ্য হতেই রান্নার চালা থেকে বেরিয়ে এসে বাঞ্ছার বৌ কড়া গলায় ভেঙিয়ে বলে ওঠে, 'ওর ঘাড় পারবে। ওর পেরাণে ভয় ভিৎ নাই।' নেই সে কথা বলতে গেছি তোকে গলা ধরে? আমি যেতে টেতে পারব নি। ওই মুখপোড়া বাবুটার চাওনি ভাল না।

কী বললি হারামজাদি!

চেঁচিয়ে ওঠে বাঞ্ছা। পা না থাক গলাটা ঠিক আছে তার। বরং পায়ের অভাব পোষাতে আরো জোরদার হয়েছে। কাজেই সেই জোরটা কাজে লাগায় বাঞ্ছা।

অমন দেবতার মতন বাবুকে এই কথা বলছিস হারামজাদি? জিভ খসে যাবে না? মনিব হয়ে চাকরের বাড়ি বয়ে এসে টাকা দেবার কথা বলে গেল, দেখেছিস এমন তোর চোদ্দ পুরুষে?

যাব না।

তোর বাবা যাবে, চোদ্দপুরুষ যাবে।

বৌটা তবু এক বগ্‌গা ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকায়। বলে, দিনমানে যাব। রাতটুকু যাক না।

কিন্তু সে কথা ধোপে টেঁকে নি।

বাঞ্ছা প্রায় ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাকে।

বলেছিল, মানুষের মন না মতি। রাত পোয়ালে যদি মন ঘুরে যায়, যদি না দেয়!

কিন্তু গেল তো গেলই বৌ, ফেরার নাম নেই।

কাঠবেড়ালীর মতন তো হাঁটে লক্ষ্মীছাড়ি, যেতে আর আসতে কতটুকুনই বা সময় লাগবে? চালটা আর টাকাটা নিতেই বা কতক্ষণ? ...তার মানে এখনো জপতপ করছে জোয়ারদারবাবু। ...বসে আছে মাগী হা পিত্যেসী হয়ে।

কিন্তু ক্রমশই উচাটন হতে থাকে বাঞ্ছা।

মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল একা পড়ে আছে সে। ...ছেলেদুটোকে যখন পিসি ক'দিনের জন্যে নিয়ে গেছল, তখন বরং হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বাঞ্ছা, যাক, তবু দুচার দিনের চাল বাঁচল। এখন মনে হচ্ছে ছেলেদুটো থাকলেও দুটো কথা কয়ে বাঁচতাম।

ক্রমশঃই উত্তপ্ত হতে থাকে লোকটা। আর কিছু নয়, রাতের আঁধারে লোকের বাড়ির আনাচে কানাচে ঢুঁড়ে চুরিবিত্তি করছে। ... বললে আবার বলে কিনা, করবো না তো তোর পেটের মদ্যি রাত দিন যে রাবণের চিলু জ্বলতেছে, তাকে কী দিয়ে নেবানো হবে শুনি? পা ঘুচিয়ে ঘরে বসে থেকে—শুদু তো ওই পেটেরই বাড়-বাড়ন্ত দেকি। খালি খাই খাই। তোর জন্যেই চুরি চামারি।

কিন্তু আজ আর সেসব কথা মানবে না বাঞ্ছা, আঁচল থেকে টাকা কটা কেড়ে নিয়ে দেবে ঢিপিয়ে। আক্কেল নেই হারামজাদি তোর? মানুষটাকে শুধু দুটো চাল ভাজা ঠেকিয়ে চলে গেছিস, মনে নেই?

কথার জোগান দিয়ে চলছিল বাঞ্ছা মনে মনে, স্বপ্নেও ভাবেনি অর্ধেক রাত কাবার করে বাড়ি ফিরে সেই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটা বাঞ্ছাকেই ঢিপোতে বসবে।

হ্যাঁ, তাই ঘটেছিল।

ভাবতে ভাবতে আর রাগতে রাগতে বাঞ্ছার যখন একটু ঢুলুনি এসেছে, হঠাৎ ওই মেয়েমানুষটা আগুন খাগীর মূর্তিতে গজরাতে গজরাতে এসে দুহাতে দমাদ্দম কীল বসাতে শুরু করে দিয়েছিল আর এক নাগাড়ে বলে চলেছিল, তোর জন্যি! এই তোর জন্যি! নক্কীছাড়া মড়া! তুই ক্যানো পাঠালি আমায়! ক্যানো পাঠালি? তোর পোড়া পেটে আগুন ধরুক।

না, এ খবর জানা নেই সবজান্তা বিধুমুখীর। সে জানে গরমেন্টের ঘরের

টাকা বাকি পড়ার অপরাধে নির্দয়ী জোয়ারদার বাবুকে বাড়ি বয়ে গিয়ে গাল মন্দ শাপ-শাপান্ত করে এসেছে বাঞ্ছার বৌ, আবার খুন করবে বলে শাসাচ্ছে।

কী সরবোনাশ! বল কী গো!

শিউরে উঠে নন্দ গড়াইয়ের বৌ। গালে হাতটা ঠেকিয়েছে কী ঠেকায়নি, হঠাৎ ভয়ানক একটা সোরগোল উঠল কোথায়। আর কোথাও নয়, রাস্তায়। আগুনখাগী মাগীটাকে চৌকীদার আর অন্য পাঁচজন মিলে ধরে বেঁধে হিঁচড়ে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাচ্ছে, তাই আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে মাগী! অবশ্য যদি ওই হাড়িয়ার মেয়েটাকে ওই বিশেষণটা দেওয়া চলে। ...কিন্তু ওই খুনে মেয়েমানুষটাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবে না তো কী রাস্তায় ছেড়ে রেখে দেবে? পাগলা কুকুরকে কেউ পথে ছেড়ে রাখে?

বি. ডি. ও অফিসের জোয়ারদারবাবু আর তার পিয়ন, দু'দুটো মানুষকে যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল, সে কার জন্যে? ...টাকা বাকি আছে বলে তুই দু'দুটো মানুষকে ইঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিবি?

কিন্তু খলের তো ছলের অভাব নেই। তাই ওই শয়তান মেয়েমানুষটা এত বড় দোষ করে নিজেই আকাশ ফাটিয়ে চিল্লাতে চিল্লাতে চলেছে— ও মা গো, এ পিথিবীতে কী ধমমো নেই গো! হতভাগা নক্কীছাড়া উনুনমুকো মড়া, 'ট্যাকা দেব, চাল দেব'। বলে ভোগা দে ডেকে নে-গে, রাত ভোর আটকে রেখে ধম্মো খেলো, ইজ্জৎ খেলো, বুকে বাঁশ ডললো, শেযে গলা ধাক্কিয়ে বার করে দেলো। ...ও মাগো, পেটের বাচ্চাটা আমার আর নড়তেছে না গো। আমি কি করি গো। নিব্বংশ হবি রাক্কোস পাজী, নিব্বংশ হবি।...

'গগনভেদী' শব্দটার মানে বোঝা যাচ্ছে।

ওই রোগা পট্‌কা শুঁটকি মেয়েটার গলা থেকে এমন শানানো শাঁখের মত আওয়াজ বেরোচ্ছে কী করে তাই আশ্চয্যি! লোক জড় হয়ে যাচ্ছে পথের ধারে ধারে।

দুহাতে কান চাপা দেয় কট্টর বিধবা শুদ্ধাচারিণী বিধুমুখী। ছি ছি ছি। গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! এই সব কুচ্ছিৎ কথা মুখ দিয়ে বার করছে ছুড়ি? লজ্জা নেই? শরম নেই? হায়া নেই? ধম্মো গেল! ইজ্জৎ গেল! এই বলে বলে ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছিস! বলি এতে তোর খুব ইজ্জৎ বাড়ছে? মেয়েছেলে বলে কথা। কিল খেয়ে কিল চুরি করে বসে থাক, তা নয়, নিজের মুখে নিজে চুনকালি মাখাচ্ছে। সাধে বলছি গলায় দড়ি?

ভিজে কাপড়ের উপর ভিজে গামছাখানা জড়িয়ে রাস্তার নোংরা জঞ্জাল এড়িয়ে এড়িয়ে ডিঙি মেরে মেরে বাড়ির দিকে এগোয় বিধুমুখী।

ছ'বছর পরে

আশালতা সিংহ

।। এক ।।

সকাল বেলায় উঠিয়াই সুনীতি স্নানটা সারিয়া নেয়। কারণ কলিকাতার ভাড়াবাড়ীর কলের জল সাড়ে ন'টা বাজিতে না বাজিতে বন্ধ হইয়া যায়। অমনি একবার মন্ত্র-স্মরণ ও আহ্নিকটা সারিয়া লইলেও ভালো হয় কিন্তু সময় হয় না। ছেলেদের মর্ণিং স্কুল আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের স্টোভ ধরাইয়া চা করিয়া দিতে হয়। ছোটমেয়ে মালিকা এই বৈশাখ মাস হইতে শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাকে হাতে হাতে সমস্ত জোগাড় করিয়া না দিলে মন্ত্র না বলিয়া দিলে পূজায় ভুল করিয়া বসে। সে বেচারা স্কুলের বাসের প্রথম ক্ষেপে যায়; একদিকে শিবপূজার মন্ত্র বলে, আর একদিকে সমস্ত মন উৎকর্ণ হইয়া থাকে কোন মুহূর্তে মোটরবাসের ভেঁপু বাজিয়া উঠিবে। বেচারী স্কুলের বাসের ফার্স্ট ট্রিপের মেয়ে—অনুনয় করিয়া মাকে বলে, মাগো এমন পূজা আর পারিনে। না হয় এই মর্ণিং স্কুলটা হয়ে গরমের বন্ধ আসুক তখন—

কিন্তু যদিও আধুনিককালের আধুনিক-শিক্ষিতা মা, তবুও চির যুগযুগান্তের সংস্কার এখনও যায় নাই। মেয়ে শিবপূজা করিবে, আর সেই তপস্যার বলে সর্ববাঞ্ছিত স্বামী মিলিবে। তাই মুখে মেয়েকে সস্নেহ ভর্ৎসনায় বলেন, তাই কি হয় মা, বৈশাখ মাস যে পুণ্যমাস। এই মাসেই পুজো করতে হয়, নইলে আর করবে কখন। ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলিয়া গেলে স্বামীকে আর একদফা চা, ডিমের ওম্‌লেটও টোস্ট দিয়া, ঠিকে ঝিকে বাজারের পয়সা বুঝাইয়া দিয়া, ভৃত্য রামটহলকে টেবিল চেয়ার ঝাড়িয়া মুছিয়া বিছানা তুলিয়া ঘর-দ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার উপদেশ দিয়া সুনীতি একটু অবসর পায়। সেদিন সেই অবসরে সেলাইয়ের কলটা পাড়িয়া মেয়ের জন্য নূতন ছাঁটের একখানা ফ্রক সেলাই করিতে বসিয়াছে এমন সময় চাকর একখানা চিঠি দিয়া গেল। সুনীতির

ছোট বোন সুধীরা লিখিয়াছে, "দিদি, আমি একমাসের জন্য শ্রীরামপুর থেকে বাপের বাড়ী এসেছি। সহজে কি আসা হতো। বাবা নিজে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে ব'লায় তবে ওঁদের পাঠানো মত হয়েছে। আমার বিশেষ অনুরোধ তুমিও একবার এই সময় এস। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমার বিয়ের সময়ে তুমি তো ছোটখোকার নিউমোনিয়া বলে আসতে পেলে না। এখন যদি একবার এস, তবে আমার সঙ্গে আর ওঁর সঙ্গে—দু'জনের সঙ্গেই দেখা হয়। সামনে ছেলেদের গরমের ছুটিতে স্কুল কলেজ বন্ধ হবে। জামাইবাবুও দীর্ঘ ছুটি পাবেন। এখন যদি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও তুমি না এস তবে দুঃখিত হব ভারি। কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয়, তবু বোনে বোনে দেখা হয় না। একথাটা তুমি মানো না কি? তাহলে ভেবে দেখ, এখন যদি না এস তাহলে হয়তো আর দীর্ঘকাল দেখা হবে না।—"

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে সুনীতির মন সংসারের এই নিত্যকর্মের গণ্ডী পার হইয়া কোথায় কতদূরে চলিয়া গেল। মনে পড়িতে লাগিল শৈশব এবং কৈশোর কালের কত কথা। আজ ছ'সাত বছর সে বাপের বাড়ী যায় নাই। যখনই যাইবে মনে করিয়াছে তখনই একটা না একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কখন ছেলেদের পরীক্ষা, কখন কোন একজন খোকার অসুখ, নয়তো নিজের শারীরিক অসুস্থতা কিংবা স্বামীর কাজের ভীড়। ক্রমশঃ পিতৃগৃহের ছবি একটা অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলি জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া সুদূর স্বপ্নের মত হইয়া গেছে। আজ আবার ছোট বোন সুধীরার চিঠি আসিয়া যেন সেই কুয়াশার জাল বিদীর্ণ করিয়া দিল।

কত কি দৃশ্য চোখের সুমুখ দিয়া নিরন্তর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সেই ভাবনা চিন্তাহীন কিশোর বয়সের দিনগুলির ছায়াস্মৃতি ভারাক্রান্ত মনে ঘনাইয়া আসিল।

মার্বেলে বাঁধানো বিস্তৃত পূজার ঘর। এখন যেমন ছোট মেয়ে মালিকা তাড়াতাড়ি শিবপূজা সারিয়া স্কুলের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, একদিন সুনীতিও তেমনি গৃহসংলগ্ন বাগান হইতে অজস্র চাঁপাফুল পাড়িয়া আনিয়া একাগ্রমনে শিবপূজা করিত। তরুণ মনে কত কামনা কত আশা জাগিয়া উঠিত। একটি ভক্তিবিনম্র সুরের সহিত কিশোরী হৃদয়ের সেই কামনা দেবতাচরণে নিবেদিত হইত। তারপর স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গ্রীষ্মদিনে সেই ভাইবোনদের সঙ্গে আনন্দের জটলা করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া। বাড়ীর কাছেই গঙ্গা। সেখানে কত সাঁতার দেওয়া, কত গল্প, কত জল্পনাকল্পনা। গঙ্গার গর্ভ অবধি সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী নামিয়া গেছে। তীরে বহুকালের ঝুরি নামানো প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছ। অশ্বত্থ বেদীমূল কোন এক ভক্ত বহু খরচ করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া সেখানে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্নানার্থীরা স্নানের উদ্দেশ্যে যাইবার সময় মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি করিয়া

যাইতেছে। সূর্য্যাস্তের রাঙা আভা পশ্চিম দিকের অলিন্দে আসিয়া পড়িয়াছে; বাগানের পুষ্পে সমাচ্ছন্ন চাঁপাগাছের চুড়াটা বারান্দার রেলিংয়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেখানে মুগ্ধ বিধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা কোন কিশোরীর ছবি; সুনীতির জীবনে আজও কি সেই মেয়েটির দৃষ্টি-স্মৃতি একেবারে মুছিয়া যায় নাই?

কিন্তু অতীতের পথ বাহিয়া এই স্বপ্ন দেখা হয়তো বড় মধুর, অথচ সংসারে সে সময় বড় একটা মিলে না। বাইরে ঝিয়ের উচ্চ চিৎকার শোনা গেল, "মা কোথা গেলে গো। নিমকি বেলে দিতে হবে না? বামুন ময়দা মেখে সেই কতখন থেকে বসে আছে। বাবুর চায়ের জল যে ফুটে ফুটে মরে গেল!"

চিঠিখানি হাতে করিয়া সুনীতি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া আসিল। কিন্তু নিমকি বেলিতে, চা করিতে, পান সাজিতে, সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজের মাঝেও আজিকার গ্রীষ্ম-প্রত্যূষের এই নির্মল নীল আকাশটি তাহাকে দূর অতীতের আর এক বিমল প্রভাতের আলোতে, তাহার ছোটবেলাকার ভুলিয়া যাওয়া অবহেলিত অতীতের শতস্মৃতিমাধুর্য্যের মধ্যে লইয়া যাইয়া ফেলিতে লাগিল। যে কোন কারণেই হোক এবারে তাহার বাপের বাড়ীর যাওয়ার পথে বড় একটা বিঘ্ন ঘটিল না। কেবল মালিকা দু একবার আপত্তি করিয়াছিল, "না মা, ওদিনে যাওয়া হবে না। সেদিন যে আমাদেব লীলাদি চাকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে স্কুলে খুব ধুমধাম কাণ্ড। কেমন ফেয়ারওয়েল হবে বলে আমরা কত সব ঠিক করেছি। বাঃ রে, না..... আর মোটে দুদিন পরে গেলেই তো পার। স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে।"

কিন্তু মালিকার এই ক্ষীণ আপত্তিতেও যাওয়ার তারিখ বদলায় নাই।

।। দুই ।।

অনেকদিন পরে দুই বোনে দেখা। আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু দু'জনেই বুঝিতে পারিল---স্মৃতির সৌন্দর্য্যে অবগাহন করিয়া তাহারা ঠিক যে বস্তুটি পাইবার আশায় উতলা হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেই বস্তুটি আর নাই। অতীত জীবনটা কল্পনার মধ্যে আছে, কিন্তু ঠিক তাহারই মাঝে ফিরিয়া যাইবার আর পথ নাই। দুই বোনে সঙ্গী-সাথী জুটাইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেল। সুধীরা বলিল, "দেখ দিদি, ঐ পাথরটার উপর বসে আমরা সূর্য্যাস্ত দেখতাম। ..... ঐ যে বটগাছের গুঁড়িতে আমরা স্নান করতে এসে পাথরের কুচি দিয়ে নিজের নাম লিখে দিয়ে যেতাম তোমার মনে আছে? আজকাল ঐ যে কি নাম ভুলে যাচ্ছি—খুব বড়লোক একজন মাড়োয়ারি ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির পাশে কাপড় ছাড়বার ঘর তৈরী করে দিয়েছে। এসব তুমি দেখনি দিদি। কি করেই বা দেখবে, কতদিন আস নি।"

সেই গঙ্গা, সেই অশ্বত্থতরুমূল, বাগানের সেই চাঁপাগাছ—সবই সেই আছে, কিন্তু—সুনীতি ব্যথিত বিস্মিত হইয়া ভাবে, সেইদিনগুলিতে আর প্রবেশাধিকার নাই। গঙ্গার জলে নামিয়া মনে পড়িয়া যায়, আসিবার সময় ঠাকুরটাকে বার বার করিয়া বলিয়া আসিয়াছে—বাবকে যেন দুইবেলা বাজারের জলখাবার কিনিয়া আনিয়া ধরিয়া না দেয়। দুখানা নিমকি করিয়া দিবে, পাঁপড় ভাজিয়া দিবে। হালুয়া তৈয়ারী করিতেও শিখাইয়া দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে হতচ্ছাড়া ঠাকুর আর কি কথা শুনিবে। এখন আর কাহাকে ভয়। জানে যে বাবু সদাশিব মানুষ। হাজার অসুবিধা হোক, কথাটি কহিতে জানেন না।

সুধীরার স্বামী কলিকাতার আইন কলেজে পড়েন এবং তৎসহিত কোন এক এটর্ণি আফিসে শিক্ষানবীশ। কলেজ যদি বা গরমের ছুটিতে বন্ধ হইয়াছে এটর্ণি-আফিসে ছুটি মিলে নাই। সুধীরা বাগানের ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্নায় পদচারণা করিতে করিতে ভাবে, এই তো বাপের বাড়ী আসিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলাম। সেই আসিয়াছি। সবারই সঙ্গে দেখা হইয়াছে। ছেলেবেলাকার যে দৃশ্য যে গন্ধ যে স্মৃতি মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া উতলা হইয়া উঠিয়াছিলাম, এখন তাহাদেরই মাঝে আসিয়া পড়িয়াছি তবুও সমস্ত মন ভরিয়া ন'ই। এমনই কি হয়!

সুনীতি অনেকদিন পরে আসিয়াছে, কত বন্ধু বান্ধবেরা অহর্নিশি দেখা করিতে আসিতেছে। ছোট ভাইরা অনেকদিন পরে দিদিকে কাছে পাইয়া কত রকমের আব্দার করিতেছে। একদিন তাহাদের লইয়া চড়িভাতি করিতে হইবে। এই গরমে? ..... বাঃ তা হইলই বা। গঙ্গার ধারে সেই আমবাগানের মাঝে পোড়ো বাড়ীটার কথা দিদির মনে নাই নাকি? সেখানে আগে কতবার বনভোজন করা হইত। নিজের হাতে দু-একটা রাঁধিয়া বাবাকে ভাইদের খাওয়ানো। সুধীরার আগে যে ভাইটি তাহার নাম নির্ম্মল। তাহাকে শেষবারে দেখিয়াছিল তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। এখন আর তাহাকে চেনাই যায় না। এবারে বি-এ দিবে। শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় তাহার সঙ্গে মাঠের পথে বেড়াইতে যাইতে যাইতে কত কথা হয়। সমস্তই নতুন লাগে। এ যুগের তরুণদের প্রবল দেশাভিমানবোধ, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, তাহাদে ফিলজফি নির্ম্মলের কথাবার্তায় রূপ ধরিয়া বাহির হইয়া আসে। কি সুন্দর নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে নির্ম্মল। এ সমস্তই সুনীতির কাছে নূতন। কারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে, ঘরের কাজকর্ম সারিয়া যে খুব একটা পড়াশোনার ভিতর দিয়া বর্হিজগতের পরিবর্তন এবং আন্দোলনের সহিত যোগ রাখিবে সে সময় বা সে শিক্ষার সুযোগ তাঁহার নাই। পরিবারে যাহাদের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহাদের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়াই বাহিরের ঐ প্রকাণ্ড জগতটার ঘোমটা খসিয়া যা একটু স্বরূপ উদঘাটিত

হইয়া পড়ে। কিন্তু সে উপায়ও তাহার ছিল না। স্বামী তাহার অনেকটা সেকালের ধরণের, কোন এক মার্চেন্ট আফিসের বড়বাবু। মোটা টাকা মাহিনা পান। কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিধা চাল ও নিরীহ প্রকৃতির। মানুষের মনের যে সকল সূক্ষ্ম দিক আছে—অফিসের বিরাট খাটুনির পর আর তাহা ল্ইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ পান না। সুনীতির ছেলেরা ছোট, স্কুলে পড়ে। স্কাউট্, স্পোর্ট্স, আর স্কুলের প্রাইজ এবং ফুটবল ম্যাচের কথা ছাড়া অন্য কিছু লইয়া বড় একটা আলোচনা করে না। তাই নির্ম্মলের কথার আড়ালে আর একটা অপরিচিত জগতের সন্ধান সে পায়। অজানা এক বৃহৎ জগতের মর্ম্মরধ্বনি যেন শোনা যায়।

তিনজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। সন্ধ্যার দিকে নির্ম্মল কিছুতেই ছাড়ে না। রোজই প্রায় টানিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। মাঠের উপর ক্ষীণ চন্দ্রালোক পড়িয়া কেমন অবাস্তব মনে হইতেছে। সারি সারি ঝাউগাছ বাতাসে আন্দোলিত হইয়া মর্ম্মর শব্দ উঠিতেছে।

সুধীরা কোন কথায় কান দেয় নাই, কারণ তাহার মন কথার মধ্যে ছিল না। মনের মধ্যে কেবল ছিল একটি সুমিষ্ট এবং করুণ বিরহের ব্যাকুলতা—একটি গানের সুর মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল। (আজি) চাঁদিনী যামিনী মধুর সমীরণ। যে ভদ্রলোক দশটা চারিটা কেবলই এটর্ণি আফিস করিতেছেন এবং বাড়ী ফিরিয়া দশ পাতা ভর্তি একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলা ছাড়া অসম সাহসিক আর কিছুই করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার প্রতি ঈষৎ অনুকম্পা মিশ্রিত অভিমানে মন ভরিয়া উঠিতেছে।

সুনীতি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা নির্ম্মল, আজ-কালকার মেয়েদের সম্বন্ধে তোর কি মনে হয়? কি জানি মাঝে মাঝে ভয় লাগে, আমাদের মেয়েরা বড় হয়ে উঠচে, তাদের যেকালে বাস সেকাল সম্বন্ধে জেনে রাখা ভালো।" রেসকোর্সের প্রকাণ্ড মাঠের একটা বড় পাথরের উপর রুমাল পাতিয়া বসিয়া নির্ম্মল কহিল—"এইবারে খুব শক্ত একটা প্রশ্ন করেছ বড়দি। একালের মেয়েদের সঙ্গে আমার এমন কিছু মিশে দেখবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু মনে হয় ভালোবাসার ক্ষেত্রে তারা বড় স-মনস্ক। আর একটু অন্যমনস্ক না হ'লে আন্তরিক সম্বন্ধ হতে পারে না। তুমি হয়তো অবাক হচ্চ। তোমাদের যুগে ছোট ভাই এমন একটা কথা অসঙ্কোচে দিদির সামনে হয়তো উচ্চারণই করতে পারত না।"

"কিন্তু তুমিতো জান, দিনকাল বদলে গেছে। এ যুগে মন খুলে আলোচনা সবাই করে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয়, আধুনিককালে স্ত্রী-পুরুষে অবাধ মেলামেশার ফলে মেয়েরা অনেক জায়গায় সেই নির্লিপ্ত দূরত্ব সেই সহজ সম্ভ্রমবোধ রাখতে পাচ্ছে না; সে বোধ সমস্ত সংযম আর শালীনতার মূল কথা।"

সুনীতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা মেয়েরা এই যে এত মেলামেশা করচে এতে তাদের জ্ঞানের প্রসার হয়তো বাড়ছে, কিন্তু তাদের মনের নির্জ্জনতা আর প্রশান্তি কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না? সে জিনিসটা তাদের কাছ থেকে পুরুষরা একান্তভাবে আশা করে।"

নির্ম্মল বলিল, "তুমি যা বলচ সেটা আমার মনেও অনেকবার আনাগোনা করেছে। সত্যিই তাই, কারণ তোমাদের কাছ থেকে পুরুষ জাতি যা দাবী করে সেটা এক সঙ্গে স্কুল কলেজে পড়াও নয়, এক সঙ্গে তর্ক বা এক সঙ্গে চাকরী করাও নয়। একটা সর্ব্বব্যাপী প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতাই তাদের সব চেয়ে বড় চাওয়া তোমাদের কাছে।"

সুধীরা অসহিষ্ণুকণ্ঠে কহিল, "এইবার বাড়ী চল না দিদি। তোমরা দু'জনে এক জায়গা হলেই সুরু হবে যত উচ্চাঙ্গের আলোচনা। এমন সুন্দর রাত্রিতে বেড়াতে এসেও কি রাজ্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালো লাগে তোমাদের?" তাহারা বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়িল।

যাইতে যাইতে নির্ম্মল একটু ভাবিত সুরে কহিল, "কিন্তু বড়দি, একথাটা যে কতদিক থেকে ভাবা যায়, এত উল্টো-পাল্টা জিনিস রয়েছে এর মধ্যে। মেয়েদের স্বাধীনতার আরও একটা রূপ দেখা গিয়েছে—দেশের কাজে তাদের নির্ভীকতায়, তাদের দুঃখ সহ্য করবার অপরিসীম ক্ষমতায়। সত্যি সবটা জড়িয়ে ঠিক বুঝতে পারিনে।"

সুনীতি নিঃশব্দে পথ চলিতেছিল। তাহারও অবাক লাগিতেছিল, মেয়েরা এখন আর শুধু গৃহস্থালীর তদারক এবং কুটনো কোটা রান্না করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দেয় না। তাহাদের জীবনে কত বৈচিত্র্য আসিয়াছে। অবশ্য ভালো না মন্দ, এক নিঃশ্বাসে সুনীতি তাহা বলিয়া দিতে পারে না। অস্ফুট চাঁদের আলোতে রাস্তার দু-পাশের গাছগুলা আলো অন্ধকারের সংমিশ্রণে কি এক রকম অদ্ভুত লাগিতেছে। পীচ্ ঢালা রাস্তায় মাঝে মাঝে তীব্র হেড্‌লাইট ঝলসাইয়া দিয়া এক একখানা মোটর গাড়ী চলিয়া যাইতেছে।

।। তিন ।।

রাত্রি প্রায় একটা বাজে—সুধীরা এবং সুনীতি এক ঘরে শোয়। এখন তাহাদের গল্পের গুঞ্জন থামে নাই। অনেকদিন পরে বাপের বাড়ী আসিয়া সুধীরা ভুলিয়া গিয়াছে সে শ্বশুর বাড়ীর বৌ-তাহাকে বেশি কথা বলিতে নাই জোরে হাসিতে নাই, অত্যধিক প্রগলভতা করিতে নাই। সুনীতি ভুলিয়া গিয়াছে, একটা বড় সংসারের সে গৃহিণী। সকাল হইতে সংসারটাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য

নানা ভাবনা তাহাকে ভাবিতে হয়। অনেক কালের পথ বাহিয়া দুই বোনে জীবনের প্রথম প্রভাতের অম্লান আনন্দলোকের তটে যাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সুধীরা মৃদুকণ্ঠে বলিতেছে, "এমন পাগলও হয় দিদি! একদিন আমি অফিস যাওয়ার সময় ঘরে আসতে পারিনি, নীচে আটক পড়েছিলুম। শাশুড়ি কি একটা বরাত করেছিলেন, সারতে দেরী হয়ে গেল। সে কী রাগ! তিনদিন সময় লেগেছিল আমার রাগ ভাঙ্গাতে। ....তারপরে সেদিনের কাণ্ডটা শোন নি বুঝি? আটাশে বোশেখ আমাদের বিয়ে হয়েছিল না, ওর এখন খুব ইচ্ছে সেইদিনটা এখানে আসে। প্রায় প্রত্যেক বছরেই এই দিনটিতে আমরা এক জায়গায় থাকি। কিন্তু এবারে শ্বশুরের মত ছিল না। এটর্ণি অফিসে রীতিমত মাইনের মত করে বোনাস্ দেয়, কামাই করা কিছুতেই চলবে না। আমিও তাই জানতুম। হঠাৎ দেখি আটশে রাত্রি বেলায় এসে হাজির। ওমা, এই প্রচণ্ড গরমে দুপুর বারোটার গাড়ী ধরে সারাদিন ট্রেনে চরম কষ্ট করে আসবার কি দরকারটা পড়েছিল! তুমিই বলো ত? কিন্তু সে কথা বলতে গেলে অভিমানের আর শেষ থাকবে না। কাজেই চুপ করে রইলেম।"

সুনীতি একটুখানি হাসিয়া কহিল, "অনেক দিনের কথা আমার ঠিক মনে নেই। একটা কথা মনে আছে, বিয়ের পরে উনি তখন কলকাতায় পড়তেন, আমি বাপের বাড়ীতে রয়েছি। একদিন তিনটে চিঠি এ'ল এক সঙ্গে। আমার কাকা চিঠিগুলো ডাক পিয়নের কাছ থেকে নিয়ে আমাকে দিতে এসেছিলেন। হেসে বল্লেন, তুমি কিন্তু সবাইকে হার মানালে মা। এক সঙ্গে তিনখানা চিঠি আসতে আমি আগে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি তো লজ্জায় মরে গেলুম। কত দিনের কথা। কিন্তু মনে হয় যেন এই সেদিন.....।"

ওঘর হইতে মা অনুযোগের সুরে একবার বলিলেন, "এখনও এত রাত অবধি তোরা এত কি গল্প করছিস? রাত হয়নি না কি? সবই যে তোদের বাড়াবাড়ি। আজই তো আর দু'জনা দুদিকে পালাচ্ছিস নে। গল্প যা বাকী আছে কাল হবে।"

গল্প করিতে করিতে কখন তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মনে নাই। ঘুম ভাঙিয়া গেল প্রবল ঝড়ের শব্দে। মাঝ রাতে ঝড় উঠিয়াছে। সারাদিন জ্যৈষ্ঠের তীব্র দাহনের পর গঙ্গার ওপার হইতে বালি উড়াইয়া বৃষ্টির সিক্ত গন্ধ বহন করিয়া শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই সুনীতির মনে পড়িয়া গেল, এখনই রামটহলকে উঠাইতে হইবে। অফিস ঘরের শার্সি দরজাগুলা আগে বন্ধ করুক। নতুন সেক্রেটারিয়েট্ টেবিলখানা নয়তো ধূলায় নষ্ট হইয়া যাইবে। অফিসের যত

জরুরি পত্র তাঁর ঐ টেবিলটার উপরেই আছে। ঘুমের ঘোর একটুখানি কাটিতেই স্মরণ হইল, না সে তো তার চির পরিচিত অভ্যস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে নাই। এ যে কয়েকদিন হইল বাপের বাড়ীতে আসিয়াছে। মা ইতিমধ্যে সোরগোল করিয়া বিজলীবাতি জ্বালিয়া সমস্ত ছেলে মেয়ে কটাকে উঠাইয়া একটা ঘরে জড়ো করিয়াছেন। বেশি জোরে ঝড় বহিলে বা বিদ্যুৎ চমকাইলে তাঁহার ভয়ের আর অবধি থাকে না।

নির্ম্মলের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া বলিল, "এস বড়দি পশ্চিমের বারান্দায়। সেখান থেকে গঙ্গার চরের উপর কেমন করে বালির ঝড় বইছে, চমৎকার দেখা যাবে।"

পশ্চিমের বারান্দায় সুনীতি আসিয়া দাঁড়াইল। চাঁপাগাছের ডালপালাগুলো ঝড়ের দোলায় প্রচণ্ড দুলিতেছে। এত ফুলও কি হইয়াছে গাছটায়। তীব্র গন্ধে সমস্ত স্থানটা সুরভিত। একটুখানি গন্ধের ইঙ্গিতে কত স্মৃতি মনে পড়িয়া যায়। এই চাঁপা ফুল তুলিয়া ছোট বেলায় শিব পূজা করিত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম শোয়ার ঘরে বেলাদি আর বুণুদি এই চাঁপাফুল তুলিয়া সাজাইয়া দিত, বিছানায় ছড়াইয়া রাখিত। তখন গাছটা এত বড় ছিল না। বৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে। গঙ্গার ওপারের বালুচর জলের ধারায় অস্পষ্ট হইয়া দেখা যাইতেছে। অতীত দিনের গন্ধ দৃশ্য কত কথাই মনে পড়াইয়া দেয়। কিন্তু দীর্ঘ ছ'বছর পরে এই শৈশবের লীলাক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া সুনীতি করুণ বিস্মিত দৃষ্টিতে ধারাসিক্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া আলিঙ্গন করিতে চায় জীবনের প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলিকে। কিন্তু মাঝখানে বিদীর্ণ রেখা পড়িয়াছে। একটা অদৃশ্য বাধা—বোঝানো যায় না, ধরা ছোঁয়া যায় না, আড়াল করিয়া আছে। তাই দু'চোখে স্মৃতির তুলিকা টানিয়া চাহিয়া দেখা ছাড়া সর্ব্বতোভাবে আগেকার দিনের মত আর সেখানে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। বাপের বাড়ী আসিতে সাধও যায়, কিন্তু বেশি দিন থাকিতে গেলেই মনে টান ধরে। সে মনের হাজার তন্তুতে গৃহের আকর্ষণ জড়াইয়া গেছে। মাঝ রাত্রিতে ঝড়ের দৃশ্যে আগেকার মত সমস্ত মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত ছুটিয়া যাইতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় সেই একটি পরিচিত গৃহে এতক্ষণ কি হইতেছে, চাকররা যথাসময়ে ঘর দুয়ার বন্ধ করিয়াছে কিনা, পরের দিন সকালে উঠিয়া ধুলা ঝাড়িবে কিনা। হয়তো না দেখা শোনায় কাজের কতই ত্রুটি হইতেছে। এ সব চিন্তা সর্ব্বদাই আনাগোনা করিতেছে। আগেকার দিনের রহস্যময়ী সেই কিশোরীর পরিবর্তে চিন্তাক্লিষ্টা সংসারভারাক্রান্তা এক প্রবীণা জাগিয়া উঠিয়াছে। সংসারে এই কি চিরন্তন সত্য?

ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী

বাণী রায়

'Retro me Sathana'!– 'Get thee behind me, Satan.' যুগযুগান্ত হইতে লুব্ধ অন্ধ মানব শয়তানের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। শয়তানকে বিতাড়িত করিবার মন্ত্রও আবার সেই মানবের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা আশ্চর্য।

অমর নাট্যকার মার্লোর 'ডক্‌টর ফস্টাস্' নামক নাটকখানি খুলিয়া আরাম চেয়ারে বসিয়াছিলাম। ইংরাজি নাটকে আমার আস্থা নাই, কিন্তু বইখানি পড়িতেছি বাধ্য হইয়া। ডাক্তারী শাস্ত্রের সহিত সংযোগ না থাকিলেও এই পুস্তকখানির নাকি আমার সহিত সংযোগ আছে। আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু অভিজিৎ পশ্চিমের অখ্যাত শহরে সম্পাদকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যাইবার পূর্বে আমাকে বইখানি পড়িতে দিয়া গিয়াছে। হাসপাতালের মহিলা বিভাগ আজ বন্ধ। এতদিনে 'ফস্টাস্' পড়িবার অবকাশ হইল।

"Now hast thou one bare hour to live
And then thou must be damned perpetually...........
O, would I had never seen wertenberg, never read book!"

এসব কি কথা! সহসা বিদ্যুৎচমকে আমার পূর্বজীবন মানস চক্ষে খেলিয়া গেল।

দূর পল্লীগ্রামের দরিদ্র পিতার তৃতীয়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু অন্তরে ছিল দুর্বার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, নারীর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক নহে। মনে পড়ে প্রতিটি কুণ্ঠামলিন দিন, যখন হৃদয় চাহিত সীমার বহু উর্ধ্বের বস্তু। পারিপার্শ্বিক প্রতিমুহূর্তে বাঁধিয়া রাখিত সীমার গতির মধ্যে লৌহনিগড়ে। জমিদার কন্যা উৎপলার আগে পিছে দারোয়ান চলিতে দেখিয়া বহু দিন ঘাট হইতে জল টানিয়া আনিতে নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি। তাহার মূল্যবান বসনাদি দেখিয়া নিজের দেশী জোলার বোনা

কর্কশ বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়াছি। লেখাপড়া শিখিতে বসিয়া মাতার সহস্র ফরমাসে ক্ষুব্ধ অভিমানে বইখাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। অসহ্য অভিমান ও দুরন্ত জেদ তখন আমার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। আমার বয়স তখন বার।

আজ আমার রঞ্জিত অধরে যে অমায়িক হাস্য দেখিতেছ, ইহার মূল্য আমাকে দিতে হইয়াছে। অতিকষ্টে এই হাসি শিখিয়াছি। যখন হৃদয় বেদনা-বিক্ষোভে রক্তমোচন করিতেছে তখন এই হাসি অধরে ফুটাইয়াছি। অস্কার ওয়াইল্ডের 'রক্তগোলাপ'! তাই এই হাসি এত মোহনীয়।

আজ অলস বিরামে যে হাত দুইখানি বই ধরিয়া আছে, তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক নির্মিত নহে—আমিই তাহাদের গড়িয়াছি। এই শতদল-শুভ্র, নখর-রমণীয় হস্ত নির্মাণ করিতে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। শৈশবজীবনে অসংখ্য শ্রমসাধ্য কর্মপদ্ধতি আমার দুইখানি হাতকে কদর্য, ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি তাহাদের কবিতার মত মসৃণ ও কমনীয় রূপ দিয়াছি। এই হস্তে আমার অতীতের কোন ছাপই আজ লেখা নাই।

আমার নাম দীপান্বিতা চৌধুরী। আমি এম-বি পাশ করিয়া ডাক্তারী বিভাগে বড় পদ পাইয়াছি। আমার কোয়ার্টারে বাবুর্চি-খানসামা সহ জীবন যাপন করিতেছি। আমার পূর্বজীবন আজ বহুদূরে পড়িয়া আছে। তাহাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া পথ চলিতেছি—আমি একা।

আমি দীপান্বিতা চৌধুরী—আমার দুরাশাপ্রদীপ্ত জীবনের আত্মবিক্রয়ের ইতিহাস শুনিতে চাও? শোন—

বাংলার শ্যামশ্রী। জলে স্থলে আসন্ন আগমনীর উৎসাহ চাঞ্চল্য জাগরুক। আমার পিতার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজার ছুটিতে সখ করিয়া পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিলেন। তিনি কলিকাতায় উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী। সঙ্গে তাহার একমাত্র সন্তান অলকা।

অলকা এবং আমি সমবয়স্ক। তখন আমার বয়স তের। অলকা চিরকাল একা মানুষ, তাহার মন বন্ধুত্বের জন্য উৎসুক ছিল। আমার সহিত তাহার প্রীতিসম্বন্ধের প্রগাঢ়তা অচিরাৎ প্রত্যেককে বিস্ময়ান্বিত করিল। জ্যাঠামহাশয় ও জ্যাঠাইমা আনন্দ লাভ করিলেন। আমার মাতা পিতা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! নিজের ভাইবোনদের ওপরে কিন্তু দীপার একটুও টান নেই।"

অলকার উপরও আমার টান ছিল না। জগতে নিজেকে ছাড়া কাহাকেও ভালোবাসিতে শিখি নাই। প্রথমে অলকার প্রতি সম্ভ্রম হইয়াছিল। বিবর্ণ ডুরেশাড়ী-পরা আমার অসংস্কৃত মূর্তির পাশে তাহার সাহেবী দোকানের অরগ্যাণ্ডি ফ্রক, সাদা জুতা মোজা, রেশমের ফুল শোভিত যুগল বেণী, বৈষম্য সৃষ্টি করিত। সে

বৈষম্য সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যগোচর হইত আমার নিকটে। সেই বৈষম্যের জন্য অলকাকে সম্ভ্রম করিতাম। তাহার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া গর্ব অনুভব করিলাম।

(সেই ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে শয়তান দীপান্বিতাকে প্রথম প্রলুব্ধ করিল। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে সে প্রথম শয়তানের নিকট আত্মবিক্রয় করিল।)

প্রত্যহ রাত্রে অলকা ও আমি একঘরে শয়ন করিতাম। মেঝেতে অলকার আয়া শুইত। সেই রাত্রিগুলি আমার মন্ত্রসাধনার স্বার্থপর ভয়াবহতায় জ্বলন্ত। বশীকরণের মন্ত্রোচ্চারণে অলকাকে বুঝাইলাম— আমি ভিন্ন জগতে কেহ তাহার বন্ধু নাই। আমাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইয়া তাহার খেলা জমিবে না। আমি তাহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসি। একসঙ্গে আমরা যদি থাকিতে পারি তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে।

তহার ফলে কলিকাতায় ফিরিবার প্রারম্ভে অলকা আমাকে সঙ্গে লইবার জন্য আবদার করিয়া কাঁদিয়া হাট বসাইল। তাহার অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইলাম আমি। বিজয়োল্লাসদীপ্তচিত্তে—বাবা-মা, ভাইবোনদের দিকে একবারও না চাহিয়া—ধনী পিতৃব্যের লটবহরের অঙ্গীভূত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

(তাহার পরে দীপান্বিতার আত্মবিস্মৃতির ইতিহাস। টেবিলে বসিয়া অতি সন্তর্পণে স্বল্পমাত্রায় সাহেবী খানা তাহাকে অভ্যাস করিতে হইল। সেই দীপান্বিতা! প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টা যে প্রতিবেশীদের ফল পাকড় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ গৃহস্থালীর দৈনন্দিন আহার্য— থালা থালা মাছভাত, ধামাভর্তি মুড়িচিড়া দ্বারা অহরহ মুখ চালাইত। নিদারুণ ক্ষুধায় তাহার অন্ত্রমণ্ডলী অসাড় হইয়া গেলেও কখনও সে পল্লীসুলভ তাহার অবাধ রসনার উপযোগী প্রথায় প্রচুর আহার্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করে নাই। সে কি রাশভারী জ্যাঠাইমার ভয়ে, অথবা ভৃত্য পাচকদের অবজ্ঞা আশঙ্কায়? শুধুই তাহা নহে। অলকা স্বল্পমাত্রায় আহার করে, অলকা নাগরিকা! দীপান্বিতার আদর্শ নাগরিকা! সত্য সত্যই সে নগরজীবনের বাধা-বন্ধনকেও আদর্শের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছিল।

এলায়িত শাড়ীর আরাম-আলস্য ত্যাগ করিয়া, শক্ত বন্ধনীতে দেহ পীড়িত করিয়া, নূতন ছাঁটের হাঁটু পর্যন্ত ফ্রকে তের বছরের দীপান্বিতা খুকী সাজিল। মসৃণ মেঝের স্পর্শ লালসায় পদতল উৎসুক হইয়া উঠিলেও পায়ের জুতা সে কখনই মোচন করিত না। অলকা যদি বা খালিপায়ে বাড়িতে চলাফেরা করিত, দীপান্বিতা অন্ধ একাগ্রতায় পায়ের জুতা মোজা আঁকড়িয়া রাখিত। সোফা সেটিতে অনভ্যস্ত পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইয়া উঠিলেও দীপান্বিতা কখনও

বিছানার শিথিলতায় দেহকে মুক্তি দিত না। কোনদিক হইতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রবেশ করিলেই যেন তাহার রন্ধ্রপথে শনি দেখা দিবে। অলকার জীবন ঈশ্বরের দান, দীপান্বিতার জীবন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ঈশ্বর তাহাকে যে জীবন দিয়া বিশ্বে পাঠাইয়াছিলেন সে তাহা মানিয়া লয় নাই। মানুষের সহৃদয়তার সুযোগ লইয়া নিজের ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। শয়তানের সঙ্গে তাহার চুক্তি হইয়াছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে।)

অলকার প্রতি সম্ভ্রম আমার তাচ্ছিল্যে রূপান্তরিত হইল। তাহার সহিত আমি শিক্ষার সুযোগ পাইলাম। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া তাহাকে স্কুলে পাঠানো হয় নাই, ব্যয়সাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়িতেই হইয়াছিল।

যখন দেখিতাম আমার এক নিমেষের আয়ত্ত পাঠ্যবস্তুকে অলকা এক প্রহরেও আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না, তখন তাহার প্রতি অবজ্ঞা আসিত। মধুর সুরলয়ে আমার কণ্ঠ যখন বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীর সহিত ধ্বনিয়া উঠিত, অলকার ভাঙা গলা বেসুরে বাজিত। তবু শিক্ষকদের নিকট অলকা ছিল অলকা, আমি ছিলাম অজ্ঞাতনামা পিতার অবজ্ঞাত সন্তান। অলকা এতদিনে যাহা শিখিতে পারে নাই, এক বৎসরের মধ্যে আমি তাহা শিখিলাম। কিন্তু আমার জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা হইল না, কারণ এ বাড়িতে আমার কোন পৃথক মূল্য নাই; অলকার সহচরী হিসাবেই আমার মর্যাদা। অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এই একান্ত অর্থহীন ব্যবস্থায়। অলকার লেখা পড়া না শিখলেও চলিবে, কিন্তু আমি তো অলকার ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। আমার সমাদর জন্মের উপর নির্ভর করিতেছে না, করিতেছে শিক্ষার উপর। সেই শিক্ষা আমাকে ক্ষমতা দিবে। স্বীয় ক্ষমতায় জগতের, সমাজের শীর্ষদেশে পদক্ষেপ করিব আমি—দীপান্বিতা চৌধুরী।

পাশের বড় বাড়িতে ছোট ছোট ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিয়া লইলাম।

(সারাজীবন অপরের মনোরঞ্জন করিয়া চলিবার শিক্ষা দীপান্বিতার ভালই হইয়াছিল। সফরী নয়নে অব্যর্থ দৃষ্টি লইয়া কৃত্রিম বিনয়ে উপযুক্ত পাত্রে মনোযোগ অর্পণ করিয়া অতি সতর্কতায় সে চলিত। পঞ্চদশ বর্ষের কিশোরীর স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যে লাবণ্যমণ্ডিত, পরিপুষ্ট তনুদেহ, আরক্ত কপোল, সরস ওষ্ঠাধর দেখিয়া মনে করা শক্ত হইত যে ওই সৌকুমার্যের অন্তরালে বাস করিতেছে একটি স্বার্থপর, নির্মম অন্তকরণ। সে ছিল সর্পশিশু, জন্মমাত্রেই দংশন শিখিয়াছিল। তাহার কৈশোর অনাবিল সারল্যের অবদান নহে।

বারনম্বর ফ্ল্যাটের স্কুলশিক্ষয়িত্রী দীপান্বিতার মাসীমা হইলেন। দুই নম্বরের বিপত্নীক আমেরিকান জার্ণালিষ্ট হইল আঙ্কল্। দশ নম্বরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটির কন্যাকে সে দিদি ডাকিল। পাঁচ নম্বরের ধনী-ইহুদী ডাক্তারের পত্নীকে জানাইল সে জননী কর্তৃক পরিত্যক্তা। সুতরাং সাগ্রহে তিনি তাহার 'ম্যামী' হইলেন। যাহারা পল্লীগ্রাম হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া নগরীর রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়াছে, একমাত্র কন্যার সহিত সমান ভাবে তাহার মত আগাছার ব্যয়ভার বহন করিয়া যাইতেছে, তাহাদের কল্পিত নিষ্ঠুরতার অসংখ্য মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া দীপান্বিতা সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইল। লেখাপড়া, গান-বাজনা, সেলাই, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সাধারণ গুণাবলী সে প্রত্যেকের নিকট হইতে সুবিধামত আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার মুখে ইংরাজি ও উর্দু ভাষার কথা শুনিয়া তাহার জ্যাঠামহাশয় পর্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। সর্বোপরি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অবাধ মেলামেশা করিবার ফলে জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যে পালিশ দীপান্বিতার দেহমনে ছাপ ফেলিল, অলকা তাহা কোনদিন লাভ করিতে পারে নাই। তাহার লক্ষপতি পিতার লক্ষ মুদ্রা তাহা তাহার জন্য কিনিতে পারে নাই।)

যোলো বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পাশ করিয়া বৃত্তি পাইলাম, অলকা তখন থার্ডক্লাসের বই পড়িতেছে। সন্ধ্যার পর বসিবার ঘরে সকলে উপস্থিত ছিলাম। গলায় টনসিলের ব্যথা হওয়াতে একখানা পশমী স্কার্ফ জড়াইয়া নির্জীবভাবে অলকা কাউচে বসিয়াছিল। নিজের সাফল্যে বিজাতীয় হর্ষ গোপন করিয়া মুখে সহানুভূতির প্রলেপ মাখাইয়া আমি অলকার গলায় সেঁক দিবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। অলকার এই সমস্ত ব্যক্তিগত কাজগুলির ভার ছিল আমার উপরে। তাঁহার চিররুগ্না কন্যার ভার আমার হাতে দিয়া জ্যাঠাইমা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। তাই আশ্রিতার কর্তব্যবোধে এগুলি আমি করিতাম। ঘৃণায়, ক্রোধে মন যখন বিরূপ তখন মুখে হাসি আনিয়া অলকার রুক্ষ— স্বল্পাবশিষ্ট চুল বুরুশ দিয়া ঝাড়িয়া দিতে হইত। অপমানে, অভিমানে চোখে জল আসিলেও অলকার কাপড়-চোপড় পাট করিয়া, পায়ের জুতা গুছাইয়া রাত্রে শয়ন করিবার অনুমতি পাইতাম।

একটা অদ্ভুত--- তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন,--- "এবার দীপাকে ওর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।"

ভালমানুষ জেঠামহাশয় টাকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "পড়াশোনায় এত ভাল দীপা। ওকে আর একটু লেখাপড়ার সুযোগ দেবার ইচ্ছে আছে আমার।"

সেই তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জ্যাঠাইমা কর্কশ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন, "পরের মেয়ে, আর কতকাল এখানে থাকবে? অলকার আদর্শে মানুষ হ'লে তো ওর চলবে না।"

জ্যাঠামহাশয় ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, অলকার জন্যেই তো ওকে রাখা। একা একা মন খারাপ করে থাকলে যে অলকার অসুখ করে। তাছাড়া, স্কলারশিপ পেল মেয়েটা—"

জ্যাঠাইমা বিদ্রূপ-বিদ্বেষে কাংসকণ্ঠে ফাটিয়া পড়িলেন,—"স্কলারশিপ দিয়ে ওর কি হবে? বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে না? পড়বে তো বাসুনমাজা-ঘরলেপার বাড়িতে! অলকারও তো বিয়ে দিতে হবে।"

অলকার হাতে ফ্লানেলখণ্ড দিতে যাইয়া উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোকে জ্যাঠাইমার এই সহসাজাত বিরাগের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। অলকার শিরাবহুল, কাল-কর্কশ, শীর্ণ হাতের পাশে আমার হাত! উজ্জ্বল গৌরবর্ণের নিটোলতার উপর বিজলী ঝলকিয়া বলিয়া দিল, কেন জ্যাঠাইমা তাঁহার রূপস্বাস্থ্যহীনা মেয়ের পাশে আমাকে রাখিতে চান না। বুঝিতে পারিলাম—জ্যাঠাইমার এই বিরাগ একদিনের নহে, তিলে তিলে জাত, আজ প্রকাশ পাইয়াছে। আমাকে বাসন মাজিতে, ঘর লেপিতে সুদুর পল্লীর বিস্মরণীতে পাঠাইয়া তাঁহার অযোগ্য সন্তানের প্রাধান্য তিনি বজায় রাখিবেন। মনে হইল, এক মুহূর্তে ওই দাম্ভিকা রমণীর শিথিল-প্রাচীন কণ্ঠশিরা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধ করিয়া ফেলি। তবু চিরাভ্যস্ত সংযমে মনোভাব দমন করিয়া কোমল-করুণ মুখে মাথা নামাইলাম।

আবার চোখে পড়িল অলকার হাত- -বিশীর্ণ হাতখানি, কাউচের গদির উপর প্রাণহীন নিশ্চেষ্টতায় পড়িয়া আছে—যেন কোনও জীবনী শক্তি তাহার নাই। ঠিক! এই হাতেই তো আমার মুক্তি আছে। একদিন দারিদ্র-নিরাশার পাকগহবর হইতে আমাকে টানিয়া তুলিয়াছিল এই সাধারণ হাতছানি। আবার এই হাতের নিকটেই আশ্রয় চাহিলাম। অলকার হাতখানি সজোরে নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলাম। এক বিন্দু অশ্রু তাহার হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল।

অলকা চমকিয়া উঠিল। একবার আমার প্রতি চাহিয়া মাতার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল,— "মা,"—আর অলকার হস্ত প্রাণহীন নহে। অদৃশ্য ক্ষমতায় আবার সে আমাকে টানিয়া তুলিতেছে,—"মা, তুমি জান আমি দীপাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। আমার এখন এত অসুখ, আর এখন তুমি ওকে দেশে পাঠাবার কথা বলছো!"

(দীপান্বিতা কলেজে ভর্তি হইল। কিন্তু সে বুঝিল এ বাড়িতে তাহার কোন স্থান নাই। যদি অলকা কোনদিন তাহার উপরে কোন কারণে বিরূপ হয় তাহা হইলেই তাহার তাসের ঘর ভাঙিয়া যাইবে। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন দীপান্বিতা স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। তীক্ষ্ণ মেধা খাটাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণপদক কণ্ঠে লম্বিত করিয়া অধ্যাপনায় মাসের শেষে সামান্য অর্থের কামনা তাহার ঈপ্সিত

ছিল না। সে চায় অর্থ, প্রচুর অর্থ! অর্থ অমোঘ শক্তি। অর্থ তাহাকে ক্ষমতা দিবে। ক্ষমতালাভ দীপান্বিতার জীবনে একমাত্র আকাঙিক্ষত বস্তু। সুতরাং সে স্থির করল সে ডাক্তার হবে। এখনও মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ভাল পদ সে পাইয়া যাইতে পারে, নিজে চিকিৎসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারে। মান-সম্মান, ক্ষমতা সকলকিছু নিহিত রহিয়াছে চিকিৎসাশাস্ত্রে। কিন্তু, এই দীর্ঘ অধ্যয়নের খরচ কে তাহাকে জোগাইবে?

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে দীপান্বিতার স্থান এ বাড়িতে অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। এমন কি তাহাকে স্থান করিয়া দিবার আগ্রহ অলকারও দেখা গেল না।

দীপান্বিতা যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে তখন অলকার জন্য তাহার পিতামাতা একটি সুপাত্র সংগ্রহ করিলেন। সুপুরুষ, ধনী-যুবক। দুই একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। অলকা দীপান্বিতাকে ভালবাসে—কিন্তু দীপান্বিতা যে জীবনে কাহাকেও ভাল না বাসিবার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে! অকৃত্রিম সুহৃৎ অলকার সৌভাগ্যসূচনায় তাহার ঈর্ষা হইল। এই অপদার্থ মেয়েটির রূপগুণহীনতা সত্বেও তাহার জন্য মিনার্ভা গাড়ী হইতে মন্মথ-রূপ-জয়ী-তরুণ হীরকমণ্ডিত বেশে দেখা দেয়, আর সেই তরুণের জন্য অন্তরালে বসিয়া চা-খাবার সাজাইয়া দিতে হয় তাহাকে। ক্ষোভের, ঈর্ষার সুদীর্ঘ নিশ্বাস দমন করিয়া অলকার আসন্ন বিবাহের জল্পনা হাসিমুখে তাহার শুনিতে হয়। অলকার অনেক আছে, তাহার কিছু নাই। অর্থই ক্ষমতা। স্বামীর অর্থ পত্নীর কৃতিত্বের পথ সুগম করিবে। সুতরাং শয়তানের নিকট বিক্রীত আত্মা লুব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। নানা সুযোগ খুঁজিয়া ছলছুতায় দীপান্বিতা অলকার ভাবী স্বামীর নিকটে দেখা দিতে লাগিল, অলকার তুচ্ছ ত্রুটী-অপরাধ তাহার লক্ষ্যগোচর করিতে লাগিল। একদা অসতর্ক মুহূর্তে ভাবী স্বামীর বাহুপাশে দীপান্বিতার লাস্যভঙ্গি দেখিয়া অলকা বিবাহ ভাঙিয়া দিল। কিন্তু, দীপান্বিতার একটু ভুল হইয়াছিল। অলকার ভাবী স্বামী দীপান্বিতার সহিত প্রেম করিতে চাহিলেও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কেবলমাত্র অলকাকেই।

অসংখ্য মিথ্যা কথা বলিয়া নিজেকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতে পারিলেও জ্যাঠাইমা রায় দিলেন—আই-এ পরীক্ষার পরে দীপান্বিতাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এবারে অলকা প্রতিবাদ করিল না।)

আমার চাই এমন লোক যে আমাকে হতাশা হইতে রক্ষা করিবে। সেই পুরাতন দীন আবেষ্টনীতে প্রতিবেশীবর্গের উপহাসের পাত্র হইয়া অশিক্ষিত ভাই বোনদের সহিত জীবন যাপন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভবিষ্যতের স্বর্ণমণ্ডিত

চিত্র মুছিয়া ফেলিয়া, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া পানাপুকুরের পাড়ে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিব আমি—দীপান্বিতা চৌধুরী! যখন জানি আমি সামান্যা নহি, আমার জীবন অনন্য সাধারণ।

ব্যগ্র আগ্রহে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলাম—কাহাকে আবার পাইব? কাহাকে আশ্রয় করিয়া আবার স্বকীয়তা লাভ করিব? পরিচিত জনের সংখ্যা অসংখ্য; দুইটি মিষ্ট কথা, এক টুকরা কেক তাহারা আমাকে যোগাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমার হইবে না, আমি অনেক চাই।

অসহ্য মানসিক উদ্বেগে ছটফট করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে অলকার মামা রঞ্জন লাহিড়ী বোম্বাই হইতে আসিয়া ভগিনীর অতিথি হইলেন।

চল্লিশ বৎসরের অবিবাহিত, প্রচুর অর্থশালী, সিনেমা-প্রযোজক তিনি। বহুদিন পরে তিন মাসের জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

রঞ্জনের গৌরবর্ণ, রৌদ্র তাপে তাম্র, আকর্ণ-প্রশস্ত নয়নে বুদ্ধি প্রখর দৃষ্টি, আরক্ত বঙ্কিম অধরে শিথিল জীবনযাত্রার চিহ্ন।

"এ আমার আর একটি ভাগ্নী। ভালই হ'ল।"—বয়স্ক আত্মীয়ের দাবীতে রঞ্জন আমার গালে হাত দিয়া আদর করিলেন। তাঁহার প্রাণপ্রাচুর্যে, সহৃদয় ব্যবহারে, উচ্চ সঙ্গীতময় হাস্যে বাড়িখানি মুখের গুণ্ঠন খুলিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে অলকার মুখে হাসি ফুটিল, মামার আদরে সে আবার শিশুর জীবন ফিরিয়া পাইল। একমাত্র প্রিয় ভ্রাতাকে কাছে পাইয়া জ্যাঠাইমা আমার প্রতি বিদ্বেষও বিস্মৃত হইলেন।

অলকার মামা তাহার জন্য অজস্র উপহার আনিয়াছিলেন, আমিও তাহার অংশ পাইলাম। রঞ্জন লাহিড়ীর অতুল অর্থের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী অলকা। অলকার অনেক আছে, আমার কিছু নাই। তবু ভাগ্য এই অলকার উপরেই স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছে আমাকে বঞ্চিত করিয়া!

একমাস কাটিল। রঞ্জন কনিষ্ঠা স্নেহাস্পদা রূপেই আমাকে গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশে কাটাইবার ফলে অষ্টাদশ বর্ষীয়া আমি ও অলকা তাঁহার নিকটে বিদেশিনীর নজরে শিশুর সমতুল্য ছিলাম। প্রাণপণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া চলিতাম আমি। দেখিতাম তাহাতে জ্যাঠাইমাও সন্তুষ্ট হইতেছেন। রঞ্জনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সেবাযত্নের সমস্ত ভার আমার হাতে আসিল। অতি যত্নের সহিত তাঁহার কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার কাছে কাছে থাকিতাম। মনে আশা ছিল অলকার পূর্ণপাত্র হইতে দুইমুষ্টি তিনি আমাকে দিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়! তখনও জানিতাম না রঞ্জনের মত পুরুষ নারীকে যাহা দেন তাহা স্নেহের তাগিদে নহে।

ধীরে ধীরে রঞ্জনকে নিজের আসন্ন নির্বাসনের কথা জানাইলাম। তিনি

হাসিলেন,—"এতো ভালই দীপা। দেশে গাঁয়ে দিব্যি বিয়ে হয়ে যাবে। বই মুখস্থ করে লাভ কি?"

জ্বলিয়া উঠিলাম,—"আমার জীবনটা পাড়াগাঁয়ে পড়ে নষ্ট হোক আর কি!"

"শিশু তুমি, জীবনের কি জান?" উচ্চহাস্যে রঞ্জন আমার মাথায় আদরের আঘাত করিয়া বিছানায় পাশ ফিরিলেন।

অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্যের প্রতি সঙ্কুচিত চক্ষু প্রসারণ করিতে করিতে উত্তর দিলাম, "অনেক জানি, রঞ্জন মামা। জ্যাঠাইমা আর আমাকে পড়াবেন না। কেউ আমাকে একটু সাহায্য করলে আমি জানি একদিন বড় ডাক্তার হ'তে পারব।"

ভয়ের ভান করিয়া রঞ্জন বলিলেন, "সর্বনাশ! ডাক্তার হ'লে আর জানার কিছু বাকী থাকবে না যে! জ্ঞান তোমার মারাত্মক অস্ত্র হবে—" টেবিলে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। বামহস্তে অবহেলায় শায়িত অবস্থায় রঞ্জন টেলিফোন ধরিয়া ঔদাস্যজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যালো, কে?" দুই একটি কথার পরেই তাঁহার আলস্যজড়তা অন্তর্হিত হইল, মুখ বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরিবর্তিত কণ্ঠে তিনি কথা বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। এখন যাচ্ছি। যাবো না? কি আশ্চর্য! কত টাকা নিয়ে যাব? পাঁচশো? অল্ রাইট্।" টেলিফোন রাখিয়া রঞ্জন একলম্ফে ভূতলে নামিলেন, "কই, আমার আলমারীর চাবী কোথায়? দীপা, একটু তাড়াতাড়ি চা দাও। বেরুচ্ছি।"

"কোথায়?"

"আহা, বন্ধুর নিমন্ত্রণে—না, বান্ধবীর। তবে খরচটা বান্ধবী দেবেন না। পাঁচশো টাকা বার করে নেই।"

দেড়মাস প্রাণপাত পরিশ্রমে সেবা করিয়া সাহায্য লাভের উপযুক্ত পাত্র হইয়াও রঞ্জনের নিকটে সামান্য সাহায্যের আশা পাইলাম না। অথচ তাঁহার এক বান্ধবীর এক-রাত্রির চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তিনি অনায়াসে পাঁচশত টাকা খরচ করিতে চলিয়াছেন! আচ্ছা।

দুইমাস কাটিয়া গেল। রঞ্জন বিশেষ দৃষ্টিতে আমাকে দেখিলেন না। অলকার সঙ্গী হিসাবে সর্বপ্রথম সাক্ষাতে তাঁহার মন আমার যেরূপ ছবিগ্রহণ করিয়াছিল তাহাই অক্ষয় হইয়া রহিল। অস্থির হইয়া উঠিলাম। পরীক্ষার সামান্য কিছুদিন আর বাকী আছে। তাহার পরেই এ-জীবনের চির অবসান!

একদিন রাত্রি সাড়ে আটটায় রঞ্জন বাড়ি ফিরিলেন।—অলকা কই? আজ তোদের নটার শোতে ছবি দেখাব। যা, দীপাকে ডেকে সাজ করে আয় তাড়াতাড়ি।"

আমি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিলাম। অলকা ব্যস্তভাবে কাপড় পরিতে গেল।

"একি দীপা, বসে আছ কেন? ঘুম পাচ্ছে না কি? যা ছেলেমানুষ সব, শিশুর দল। সিনেমাতে আবার এরা ঘুমিয়ে না পড়ে!"

"আমি ছেলেমানুষ নই, শিশু নই। ভেবে দেখলেই বুঝবেন।" হতাশা-বিক্ষোভ-মথিত আমার কণ্ঠস্বরে রঞ্জন চকিত হইয়া একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা সজাগ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানী পৌরুষ দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া স্থির চুম্বকের লক্ষ্যে আমি চাহিয়া রহিলাম।

রঞ্জন অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিয়া সারা ঘর উত্তেজিত ভ্রমণে ঘুরিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলেন; নিম্নস্বরে বলিলেন, "So! you are a woman after all! তুমি শিশু নও?" আমার চিবুক ধরিয়া উজ্জ্বল আলোতে তিনি আমার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। অকম্পিত পল্লবে তাঁহার চোখের দিকে সগৌরবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলাম।

পরমুহূর্তে আমার অধরের উপর পুরুষের বাসনাময় সুদীর্ঘ চুম্বন অনুভব করিলাম।

(সেইদিন হইতে দীপান্বিতা আপন দেহের উপর শয়তানের চিহ্ন ধারণ করিল। তাহার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রতি মাসে রঞ্জন একখানি চেক পাঠাইতেন। এই ঋণের সুদ গ্রহণ করিবার জন্য মাঝে মাঝে রঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া 'স্যুট' লইয়া হোটেলে থাকিতেন। তখন সর্বপ্রকারে তিনি ক্রীত সম্পত্তি উপভোগ করিয়া যাইতেন। এই অদ্ভুত সম্পর্কে কোন বন্ধন ছিল না। দীপান্বিতা জানিত তিনি বিবাহে বিশ্বাস করেন না। তিনি জানিতেন তাঁহার টাকার প্রয়োজন ফুরাইলে সম্বন্ধও ফুরাইবে। শয়তানের অনুচর মেফিস্টোফেলিসের রূপ ধরিয়া তিনি ক্রমশঃ দীপান্বিতাকে অন্ধকারের রাজ্যে অগ্রসর করিতে লাগিলেন। সামান্য পার্থিব উন্নতির লালসায় আরও একটি প্রাণী নিজের আত্মা বিসর্জন দিল!

সেই হইতে আজ পর্যন্ত দীপান্বিতার জীবনের ইতিহাস অদ্ভুত— আশ্চর্য। আজ এই স্বস্তি-সাফল্যের আরাম-চেয়ারে বসিবার পূর্বে তাহাকে যে পরিশ্রম, যে কষ্ট করিতে হইয়াছে, তাহার ছাপ তাহার কমনীয়, যৌবন-মদির দেহে লেখা না থাকিলেও মনের পটে তোলা আছে। আফ্রিকার ভয়াবহ শ্বাপদসঙ্কুল হিংস্র অরণ্য তাহার ছাব্বিশ বৎসরের মন। কোন পর্যটক সে রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

ছোট ছোট অসংখ্য দীনতা হীনতা দ্বারা লব্ধ এই ক্ষমতা তাহার করায়ত্ত হইয়াছে। নিজের উচ্চ আকাঙক্ষা পূর্ণ করিবার পথে কোন বাধাই সে দাঁড়াইতে দেয় নাই। অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রবৃন্দের ক্রমান্বয়ে মনোরঞ্জন করিয়া সে স্বর্ণপদকজয়ী হইয়া ডাক্তার হইয়াছে। এই বড় চাকুরিটি সংগ্রহ করিবার জন্য উপর-ওয়ালার নিকটে তাহাকে আত্মদান করিতে হইয়াছে। শয়তানের নিকটে বন্ধকী আত্মাকে শয়তান উপযুক্ত ভাবে পথের নির্দেশ দিয়াছে সন্দেহ নাই।

—"Fuastus thou art damned!"

আজ রঞ্জনের সহিত সম্বন্ধ ফুরাইয়াছে। মাতা-পিতার অনুরোধক্রমেও দীপান্বিতা ভ্রাতাভগিনীদের নিজের কাছে আনিয়া রাখে নাই। তবে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য সে মাঝে মাঝে করে। উপযুক্ত বিদুষী কন্যাকে শাসন করিবার সাহস মাতাপিতার হয় নাই। জীবনের প্রথম সৌভাগ্য-তারকা অলকা আজ অস্তমিত। অলকার মৃত্যুর পরে শোকাচ্ছন্ন জ্যাঠামহাশয় ও জ্যাঠাইমা কাশীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সহসা ধর্মোন্মাদ গ্রহণ করিয়াছেন। আজ অতীত জীবনের কাহারও সহিত ডাক্তার দীপান্বিতা চৌধুরীর কোন সম্পর্ক নাই।)

আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি। আজ 'ডক্‌টর ফষ্টাস্', বইখানি হাতে নিয়া অভিজিতের কথা মনে হইতেছে। আমার সহপাঠিনী বান্ধবী অভিজ্ঞা রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অভিজিৎ। তাহার সহিত যখন প্রথম আলাপ হয় তখন অভিজিৎ সরকারী কলেজে ইংরাজি ভাষায় পাঠদান করে। প্রথম সাক্ষাতে অভিজ্ঞা পরিচয় দিয়াছিল,—"বড় কষ্টে দীপা ডাক্তারী পড়ছে দাদা।"

অভীজিৎ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া আমার আপাদ মস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, "কষ্টের চিহ্ন তো দেখা যাচ্ছে না।"

অভিজ্ঞা অপ্রতিভ হাস্যে বলিয়াছিল, "আহা, অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তাই বলছি। দীপার জিদ সে বড় ডাক্তার হবে ই, নাম করবে। ওর জ্যাঠাইমার ভাই কিছু সাহায্য করেন। ওই যে ফিল্ম ডিরেক্টর রঞ্জন লাহিড়ী—"

চকিতে অভিজিতের মুখের উপর কালছায়া ভাসিয়া আসিল। মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "ওঃ, তোমার বন্ধু তাহলে 'ডক্‌টর ফষ্টাস্' হবেন স্থির করেছেন।"

তাহার তিন বৎসর পরে ; দুই মাস পূর্বে অভিজিৎ বিদায় লইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইতে সে সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিল। আমার অজস্র নিষেধবাণী ও বিদ্রূপভাষণের উত্তরে অভিজিৎ বলিয়াছিল, "জানি, এখানে থাকলে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে। কিন্তু, আদর্শ আমার কাছে বড়। সবকারী গোলামী না করে দেশের শিক্ষার ভার কিছুটা নিলে মন্দ হয় না। জানি, তুমি এসব বুঝবে না। তবু দীপা, জেনে বেখ, মানুষের জীবনে পার্থিব সম্পদ শেষ কথা নয়।"

মার্লো-বিরচিত 'ডক্‌টর ফষ্টাস্' বইখানি হাতে দিয়া অভিজিৎ বলিল, "বহুদিন তোমাকে 'ডক্‌টর ফষ্টাস্' বলেছি, তুমি বোঝনি। বইখানা পড়ে দেখো দীপা। তোমার সব কিছু আমি জানি। এ বই তোমারই জীবন-কাহিনী। মার্লোর ফষ্টাসের কোনও আশা ছিল না, তোমার যদি এখনও কিছু থাকে! সেই আমারও জীবনের একমাত্র আশা। তোমার কাছে থাকবার সাহস নেই

আমার। ঈশ্বর শেষ মুহূর্তে যেন তোমাকে রক্ষা করেন।''

আজ এতদিনে 'ডক্‌টর ফষ্টাস্‌' পাঠ করিবার সময় হইয়াছে। বই খুলিতে কেবল মনে পড়িতেছে অভিজিতের উদার প্রদীপ্ত-মুখচ্ছবি। কিন্তু আবার সেই মুখকে আবৃত করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে আমার স্থাপিত 'সংস্কৃতি সমিতির' নবীন সভাপতি কুমার জ্যোতিরিন্দ্র দেবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য শাসিত স্ফীত, গৌর মুখখানি। অভিজ্ঞা তাঁহাকে চিনিত, আমার ক্লাবের জন্য অভিজ্ঞা তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রের টাকার অঙ্ক গণনার সীমার বাহিরে। তিনি অবিবাহিত, স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।

(ডাক্তার দীপান্বিতা চৌধুরীর কর্মজীবনে সাফল্য আসিয়াছে, এখন তাহার প্রয়োজন সামাজিক প্রতিষ্ঠা। রাজবংশের ধনী-মানী জ্যোতিরিন্দ্রকে বিবাহ করিতে পারিলে জীবনে তাহার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে না। জ্যোতিরিন্দ্র অভিজিৎ নহে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের মর্যাদার কণ্ঠে মালা দিয়া নামতঃ তাঁহার স্ত্রী হইয়া থাকিয়া অভিজিতকেও পাওয়া হয়তো চলিবে। অভিজিতকে বরণ করিলে কুমার জ্যোতিরিন্দ্রকে পাওয়া চলিবে না। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পরে জ্যোতিরিন্দ্রকে পাওয়া চলিবে না। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পরে জ্যোতিরিন্দ্র রাজা হইবেন। ডাক্তার দীপান্বিতা চৌধুরী তখন রাণী। সুতরাং বিবাহ জ্যোতিরিন্দ্রকে করিতে হইবে।

বিপদ হইয়াছে অভিজ্ঞা। অভিজ্ঞার বহ্নির মত পবিত্র, অসজ্জিত রূপ; তাহার মানসিক ঔৎকর্ষ; তাহার আদর্শবাদ, কুমার জ্যোতিরিন্দ্রকে মোহিত করিয়াছে। বিশেষতঃ অভিজ্ঞার দিক হইতে ঔদাস্য ও বাধা এই আকর্ষণকে আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। জ্যোতিরিন্দ্র অভিজ্ঞাকে বিবাহ করিতে উৎসুক।

অভিজ্ঞা আদর্শবাদী। জ্যোর্তিরিন্দ্রের শিথিলচরিতাদর্শ তাহার মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। প্রেমহীন বিবাহ সে বোঝে না। সে তাহার ভ্রাতারই মত নিজের আদর্শ বজায় রাখিতে প্রাণ দিতে পারে!

দীপান্বিতা লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে শিকারী বাজের দৃষ্টিতে। জ্যোতিরিন্দ্রের দীপান্বিতার প্রতি অমনোযোগ নাই, তবে লীলাসঙ্গিনীরূপে। দীপান্বিতার চর্মের উপর শয়তানের অধিকার যে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে! যাহার শয়তানের সহিত কারবার থাকে তাহার যে এই চিহ্ন বড় পরিচিত।

একমাত্র ভরসা অভিজ্ঞা। অভিজ্ঞা যদি শেষ পর্যন্ত কুমার জ্যোতিরিন্দ্রকে প্রত্যাখান করে তবে আহত চিত্তদাহ নিবৃত্তি করিতে তিনি দীপান্বিতাকেই আশ্রয় মানিবেন। কিন্তু দীপান্বিতা ভাবিতে পারে না যাহা লাভ করিতে সে অনেক কিছুই করিতে পারে তাহা তাহারি মত আর একজন নারী কি করিয়া ত্যাগ করিবে?)

'ডক্টর ফস্টাস্' পড়িয়া যাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন অনিচ্ছুক নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া আসিতেছে।

জার্মান ডাক্তার ফস্টাস্ ক্ষমতা ও পার্থিব সম্পদের লোভে শয়তানের সহিত চুক্তি করিয়া নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছিল। নির্ধারিত কাল পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মাকে চিরকালের মতো রসাতলে লইয়া গেল। ইহাই ফস্টাসের গল্প, এলিজাবেথ যুগের অমর নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো নাট্যকাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। ইহার সহিত আমার সাদৃশ্য কোথায়? কিন্তু, আশ্চর্য! এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে কেন আমি এত অস্থির, উন্মনা হইতেছি!

—"Why waver'st thou? O, something soundeth in mine ears; Abjure this magic, turn to God again."

বাংলার পল্লীগ্রামের শ্যাম-শ্রী। রজতধারায় তটিনী বহিয়া চলিয়াছে, দ্বিপ্রহরের খররৌদ্র মাথার উপরে। নদীর বেলাতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছের ঝাঁক নিক্ষেপ করিতেছে চারপাঁচটি বালক-বালিকা গামছা দিয়া ছাঁকিয়া তুলিয়া। তাহাদের আনন্দ হাস্যে তীরের বাঁশবন বাতাসে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। শীতল সমীরে শান্তির বাণী। একটি ছোট মেয়ের সুকুমার স্নিগ্ধ মুখের উপর আনন্দরশ্মি জ্বলিতেছে। ও কি আজিকার এই উগ্র নাগরিকা, পাপপুণ্যবিহীনা ডাক্তার দীপান্বিতা চৌধুরী?

পশ্চিমের ক্ষুদ্র শহর। লাল মাটির রাস্তা দিয়া নরনারী হাট হইতে সন্ধ্যায় পশরা বহিয়া ফিরিতেছে। বাংলোর প্রাঙ্গণে অজস্র পুষ্পপ্রাচুর্য। দূরে নীলমেঘের সহিত মিশিয়াছে নীলাভ পর্বতমালা। গলিত মুক্তার মত শুভ্র জ্যোৎস্না প্রেমের মাধুরী-স্বপ্নের পরিবেশ রচনা করিয়াছে। গৃহ-প্রত্যাগত সম্পাদক বারান্দার চিত্রিত খট্টাঙ্গে অর্ধশায়িত অভিজিৎ। তাহার পার্শ্বের তরুণীর সমস্ত মুখ উন্মীলন কমলের মাধুর্যে প্রেমস্পর্শের জন্য উন্মুখ। ও কি আজিকার এই কঠিন-দুরভিলাষিণী ডাক্তার দীপান্বিতা চৌধুরী?

এখনও সময় আছে।

'এখনও সময় আছে। দীপান্বিতা, পলায়ন কর।' কাহার আর্ত উপদেশবাণী আমার কর্ণে ভাসিয়া আসিল?

মনে মনে হাসিলাম। বই পড়িতে পড়িতে বেশ দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি। বই তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

"The stars move still, time runs, the clock will strike, the devil will come and Faustus must be damned.

O, it strikes, it strikes !"

হে ঈশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। আত্মত্যাগী অবতারের রক্তধারায় আকাশ প্লাবিত। সেই রক্তের একবিন্দু কি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না?

অসহ্য! সমাপ্ত পুস্তকখানি আতঙ্কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। নিদারুণ বিভীষিকার রূপ ধরিয়া আত্মদর্শন জীবনে প্রথম আমাকে দেখা দিল। অভিজিৎ, তুমি সত্যই বলিয়াছ ইহা আমারি জীবনকাহিনী। আমি ডক্টর ফস্টাস্। আর সময় নাই। আমার সমগ্র জীবনের উপর শয়তানের অধিকার জন্মিয়াছে। সহজ, সুন্দর জীবন আমার জন্য নহে। আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ঐ মনুষ্যনামধারী পশু, কুমার জ্যোতিরিন্দ্র দেব, অপেক্ষা করিয়া আছে ঐশ্বর্যের অনন্ত কারাগার।

সন্ধ্যা আসন্ন-রাত্রির অন্ধকার বক্ষে ধরিয়া নামিয়া আসিল! আজ সন্ধ্যায় ক্লাবের বিশেষ উৎসবে জ্যোতিরিন্দ্রের সহিত দেখা হইবে। আজ চরম চেষ্টা করিয়া দেখিব, তাঁহাকে আমার পাইতেই হইবে—যে কোনও মূল্যেই হোক।

সযত্ন প্রসাধনে তনুদেহ সাজাইবার জন্য দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। চির রসাতলে চিরকালের মত প্রবেশের পূর্বে শয়তানের উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইলাম। আমার উপায়ান্তর নাই।

—"My heart is too harden'd, I Cannot repent :—"
অনুতাপ-অশ্রুর দ্বারা স্বর্গরাজ্য অর্জন করিবার প্রবৃত্তিও এ হৃদয়ের নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রকে চাই-ই। কিন্তু, অভিজ্ঞা পথে থাকিতে নয়। অভিজ্ঞা! তাহাকে লইয়া কি করা যায়?

সহসা অম্লান সত্যের রূপে মনের মধ্যে আশ্বাসবাণী বাজিয়া উঠিল : অভিজ্ঞা কখনই আদর্শ বিসর্জন দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রকে বিবাহ করিবে না।

ঠিক! এই তো আশ্বাস। অভিজ্ঞার ওই আদর্শের উপরেই আমার আশ্বাস নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু, বিদ্যুৎচমকের উজ্জ্বল তীব্রতায় আমার মস্তিষ্কের দুই প্রান্ত আলোড়ন করিয়া আত্মচেতনা জাগিয়া উঠিল।—আমার এখনও আশা আছে। যে মহত্ত্ব নিজে বিসর্জন দিয়াছি, এখনও সেই মহত্ত্ব অন্যের উপর আরোপ করিতে পারিতেছি। মানুষের মহত্ত্বে আমি আজও বিশ্বাস করি। আজও আমার আশা আছে।

দীপান্বিতা, পলায়ন কর, পলায়ন কর। 'O lente, lente currite, noctis equi !' রাত্রির রথের ঘোড়া ধীরে চল। সময় একটু অপেক্ষা কর। দীপান্বিতা, পলায়ন কর, আশ্রয় খুঁজিয়া লও।

কোথায় যাইব? কোথায় পলায়ন করিব? আমার আশ্রয় কোথায়?

অভিজিৎ! সেই আশ্রয়ই আমাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। অভিজিৎ আমাকে ভালবাসে, কারণ পতিত আত্মার উদ্ধার যে তাহার জীবনের ব্রত!

কোনমতে এখনি অভিজিতের কাছে যাইয়া পড়িতে হইবে। টাইম-টেবিলের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলাম।

আর একমুহূর্ত বিলম্ব নহে। এখনও আমার আশা আছে। এই মুহূর্তে আমাকে পলায়ন করিতে হইবে।

খিদে

কবিতা সিংহ

রঞ্জাবতী দিদিমণিকে দেখলে গলির মোড়ের শীতলাদেবীর মন্দিরটার কথাই মনে পড়ে যায় সুমতির। মনে পড়ে গেলে যেমনি ভালো লাগে, তেমনি কেমন যেন ভয়-ভয় করে ওঠে।

নতুন এসেছিল স্বামীস্ত্রীতে। গলির মোড়ের লাল বাড়িটার একতলায়। ঠিকে কাজের ঝি সুমতি।

—দিদিমণি, ঠিকে লোক লাগবে তোমাদের?

ফিরে তাকালো রঞ্জাবতী। দিব্যি রোগা রোগা ছিমছাম চেহারাটা। বয়স কত আর হবে, বড় জোর বাইশ-তেইশ। লালপাড় শাড়িটা একেলে ধরনে পরা। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, আর হাতে এয়োতির শাঁখা। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে রঞ্জাবতীর চোখ। দুই বিন্দু দীপ্তি। সুমতির মনে হলো, এ তো তার নিচুচালা বস্তির কালি ওঠা ডিবরির আলো নয়, এ যেন বিদ্যুতের ঝিলিক্। রঞ্জাবতী দিদিমণি যেন ইস্পাতের ধার-দেওয়া তলোয়ার, ধরলেই দ্'ফাল হয়ে ছিঁড়ে যাবে সুমতি।

ততক্ষণে সুমতির দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক দেখে নিলে রঞ্জাবতী। তারপর এলোমেলো রাগে বাক্স-বেডিং-এর উপর বসে-থাকা ছিপছিপে দাদাবাবুকে ইংরেজী করে কী সব বললে। ইংরেজীটা বোঝে না সুমতি, তা বলে রঞ্জাবতীর মুখের প্রতিকূল অভিব্যক্তিটা বুঝতে কষ্ট হলো না সুমতির। কিন্তু দাদাবাবুই উত্তর দিলে শেষপর্যন্ত—

—আপাতত ওকেই রেখে দাও, তারপর না হয় খুঁজে-পেতে—

অতএব রঞ্জাবতীর বাড়ি আট টাকা মাইনের ঠিকে কাজটা পেয়ে গেল সুমতি।

সুমতিকে রাখতে ভালো লাগেনি রঞ্জাবতীর, এ কথা রঞ্জাবতীর চোখ দেখেই বুঝতে পারতো সুমতি। সত্যিই তো, সকাল বেলায় শাদা থান পরে

চন্দর লেনের গলি দিয়ে বেরিয়ে এলেই কি আর জোড়াবট বস্তির গন্ধটুকু মুছে ফেলা যায় শরীর থেকে? যতই ধোও না কেন, তোলা যায় চোখের কোলের কাজলরেখা আর হাজাধরা পায়ের আলতার দাগ।

তবু সরু ঘিঞ্জি বস্তিপাড়ার গলি ডিঙিয়ে রঞ্জাবতীদের হরি রায় রোডের উপর আসতেই ভাল লাগতো সুমতির, তার চেয়েও ভালো লাগতো রঞ্জাবতীর গুছন্ত সংসারটিতে ঢুকতে।

তারপর যখনই সন্ধ্যা হয়ে আসতো সব কাজ শেষ করে রঞ্জাবতীর ঘরের সামনের ছোট্ট দাওয়াটায় আয়না পেতে বসতো সুমতি। ভাঙা চিরুনি নিয়ে পরম যত্নে একটি একটি করে সাজাতে স্বল্প চুলের গুছিটা। পাতা কেটে বানানো খোঁপাটা বাঁধতে বাঁধতে বেলা গড়াতো।

তাঁতের শাড়ি পরে উঁচু করে খোঁপা বেঁধে কলতলা থেকে গা ধুয়ে বেরোতো রঞ্জাবতী, সুমতির দিকে তাকিয়ে হেসে বলত—তোর বয়স কত হলো রে সুমতি—

সুমতির শরীরের লজ্জাবোধটা প্রায় অসাড় হয়ে খসেই গিয়েছিল পঞ্চাশের বন্যার পর—তার ছয় ছেলের বাপের দেওয়া শেষ শাড়িটার সঙ্গে। তবু রঞ্জাবতীর চোখের রঞ্জন আলোয় তারই একটা ক্ষীণ শিকড়কে অনুভব করত সুমতি। আর শুকনো বুকের উপর থানের আবরণ টেনে দিয়ে আড়াল করে দিত রঞ্জাবতীর দেওয়া পুরনো সাটিনের ব্লাউজটাকে।

স্বামীর জলখাবারটি গুছোতে গুছোতে নাকের দুপাশে ঘৃণার বৃত্ত আঁকতো রঞ্জাবতী। —'কোন না তোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স হয়ে গেল, তুই এসব ছেড়ে দে সুমতি, কারো বাড়ি খাওয়া-পরার কাজ নে।'

মাথা নিচু করে গলির মধ্যে ঢুকতো সুমতি। নিচুচালা বস্তির ছোট ছোট ঘরের সামনে তখন উঁচু হয়ে বসেছে দিনের ঠিকে ঝিরা রাতের মোহিনী হয়ে। ঘরে এসে হাওড়া হাটের সাতরঙা ডুরে শাড়িটা পরতে পরতে ছয় ছেলেমেয়ের বাপকে ভাবলো সুমতি। খেতের কাজ সেরে ফিরলে তাকেও জলখাবার সাজিয়ে দিত একদিন। তবে টুকটুকে বৌ রঞ্জাবতীর মত তখন অমন লক্ষ্মী-লক্ষ্মী হাতে নয়। তারপর সব কথা স্মৃতি হয়ে মিশে যেত চেতনার অনেক তলায়। দরজা খুলে বাইরে এসে বসলে শুধু কেরোসিন ডিবরির শিখাটাই সত্যি হয়ে থাকত সুমতির চোখের সামনে।

শেষ পর্যন্ত আত্ম-পরিচয়ের শেষ পর্দাটাও খসে পড়লো সেদিন রাত্রে জোড়াবট বস্তির সামনে। রঞ্জাবতী দিদিমণি আর দাদাবাবু বুঝি রাতশোতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিল বস্তির রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে বলে। সবই

জানতো রঞ্জাবতী, তবু সেদিন অমন সোজাসুজি সব কিছু দেখে ফেলে ঘৃণাটা কণ্ঠপূর্ণ হয়ে উপছে পড়লো ঠোঁটের কিনারা দিয়ে।

পরদিন বিকেলে এঁটো বাসন মাজতে এসে শুনল সুমতি,

—তোর লজ্জা নেই রে সুমতি, পাপের ভয় নেই?—

—কী করবো দিদিমণি. পেট যে শোনে না,—

—খিদে? বুঝলি সুমতি, আত্মহত্যা করে মরে যেতাম. কিন্তু না. কখনও পারতাম না এমন হতে—

সুমতির বুকের মধ্যে একটা নিরুপায় বেদনা কেঁপে কেঁপে উঠলো। ভাবলো রঞ্জাবতী দিদিমণির ফরসা পা দুটো জড়িয়ে বলে ওঠে—ওগো দিদিমণি, থামো, থামো, পেটের জ্বালা কী তা তুমি জানো না।

কিন্তু না. সে কথা বলা যায় না। রঞ্জাবতী দিদিমণির খিদে পায় না, পেলেও তা সুমতির মত নির্লজ্জ সর্বগ্রাসী নয়। ভোরবেলা উঠে লোকের বাড়ির বাতিল-করা বাসি ভাতরুটি নিয়ে উবু হয়ে বসার কল্পনাটাও বোধহয় রঞ্জাবতী দিদিমণির স্মৃতিতে নেই।

মাথা নিচু করে কলতলায় নেমে গেল সুমতি। আর নজরে পড়লো একটিও এঁটো বাসন নেই কলতলায়। আরো নজরে পড়লো ছিমছাম ঘরটির সবুজ মেঝেতে স্বামীর ভাত ঢাকা দিয়ে রঞ্জাবতী দিদিমণি বসে আছে। লালপাড় শাড়ি আঁচল ছাপিয়ে এলো চুলের ঢাল। রঞ্জাবতীর সংসার এখনো অভুক্ত রয়েছে।

—দাদাবাবু এখনো ফেরেনি দিদিমণি—তুমিও কিছু মুখে দাওনি বেলা যে পাঁচটা বাজে—

মুখ তুলে তাকিয়ে মেখলা হাসলো রঞ্জাবতী।

রঞ্জাবতীর ঘরের দরজায় বসে অবাক ভাবতে বসলো সুমতির পেটের মধ্যে যে গভীর জারক রসের সৃষ্টি হয়, তারপর তা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামতে থাকে পাকস্থলীর দিকে, তারা যখন আহার্য না পায় কী দুর্দ্দম হয়েই না নাড়া দেয় বত্রিশ নাড়ীতে, অন্ত্রে অন্নাশয়ে। মাথা ঘুরে ওঠে, শুকিয়ে যায় তালু, বমি বমি ভাব ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। সেই আশ্চর্যবোধকে চেনে না রঞ্জাবতী দিদিমণি। কী মন্ত্রে চেনে না? রঞ্জাবতী মুখ তুলে কথা বলল—এ আর অবাকের কি, স্বামীর ভাত নিয়ে সব বৌ-ই বসে থাকে সুমতি, আমার মা কী করেছিলেন জানিস, সাবিত্রী ব্রত। চোদ্দ বছর স্বামীর এঁটো খেতে হবে। বাবা যখন কলকাতার বাইরে যেতেন, হাঁড়ি করে বাবার এঁটো তোলা থাকতো, সেই পোকা ধরা ভাত একদানা খেয়ে তবে মা ভাত খেতে বসতেন—

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সুমতি। মায়ের ঐতিহ্যের চালচিত্র পিছনে

নিয়ে রঞ্জাবতী দিদিমণি যেন সুমতিদের গ্রামের দশভুজা মূর্তির মত অনন্যা হয়ে গেছেন।

ঠিক এমনি সময়েই ঢুকলো দাদাবাবু। বাঁশপাতার মত নেতিয়ে গেছে মানুষটা। উঠে এলো রঞ্জাবতী—কী গো এত দেরী কেন তোমার— ছেড়ে দাও বাপু ঐ সেল্‌সম্যানের চাকরি।

চুপ করে খাটের উপর বসে পড়লো সুনীল—ছেড়ে দিতে হবে না, চাকরিই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে রঞ্জা—

ছায়ার মতো মিশিয়ে গেল সুমতি। ছুটে গিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলল গ্রোভ লেনের গলিতে গিয়ে। আবছা ভাবলো একবার, তবে কি এবার উপোস করবে রঞ্জাবতী দিদিমণি, আর উপোসের শেষ সীমায় এসে গলির মোড়ে মর্মরিকা হয়ে দাঁড়াবে কোনদিন? মনে মনে জিভ কাটলো সুমতি। সতীসাবিত্রী দিদিমণির নামে এ কী কথা ভাবছে সুমতি!

তারপরে আর একটা মাস রঞ্জাবতী দিদিমণির কোনো খবর রাখতে পারে নি সুমতি। রঞ্জাবতী দিদিমণির কাছ থেকে মাইনের টাকাটাও আনা হয়ে ওঠেনি। পাশের খুপরির গোলাপ বুঝি এটা-ওটা দিয়ে কোনো রকমে আবার খাড়া করে তুলল সুমতিকে। তারপর অসুস্থ শরীরেই আবার কদিন ডিবরি জ্বেলে বসলো সুমতি। কদিন পরেই টের পেল পেটে একটা প্রাণের কাঁটা খচ খচ করে জেগে উঠেছে। রঞ্জাবতী দিদিমণির কাছে আর না গেলেই নয়। আটটা টাকা পাওনা রয়েছে। টাকা হাতে নিয়েই ছুটতে হবে জোড়াবট বস্তির বগলাবাড়ীওলীর কাছে।

যা হোক একটা ওষুধ-বিষুধ পেতেই হবে। নইলে কেইবা কাজ দেবে ভরা মাসে, কেইবা দিয়ে আদিমকালের আনন্দ খুঁজতে আসবে সন্ধেবেলা।

অনেকদিন পরে রঞ্জাবতীর ঘরে গিয়ে বসলো সুমতি। একটা মাস যেন বন্যার মত চলে গেছে রঞ্জাবতীর গুছন্ত সংসারের ওপর দিয়ে। সব যেন ছন্নছাড়া লণ্ডভণ্ড। এই বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে সেই ছিমছাম সংসারটিকে আর চিনে নেওয়া যায় না। রান্নাশালের একধারে হাঁটু মুড়ে খেতে বসেছে রঞ্জাবতী অবেলার ভাত। দেখে মনে হলো খুব খিদে পেয়েছে রঞ্জাবতীর। লোলুপ হাতে বড় বড় গ্রাস মুখে পুরছে। অবাক লাগলো সুমতির রঞ্জাবতীর এই আসন না পেতে, জল না গড়িয়ে যেমন তেমন করে ভাত খাওয়া দেখে।

চারিদিকে তাকিয়ে আরো অনেক পরিষ্কার হয়ে এলো সুমতির কাছে। রঞ্জাবতীর হাতের চুড়ির ভার হালকা হয়ে এসেছে, শোয়ার ঘরে বিয়ের খাটখানা নেই, একপাশে একটা মলিন বিছানা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

তবু সুমতি টাকাটা চেয়ে ফেলল। মাত্র আটটা টাকা। রঞ্জাবতীর মুখখানি

তাতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সব বুঝতে পারলো সুমতি। কিন্তু সুমতির কোনো উপায় নেই। খুলেই বলল তার নিগূঢ় প্রয়োজনের কথা।

রঞ্জাবতী অবাক হয়ে তাকালো সুমতির দিকে। অঝোরে ঘৃণা ঝরে পড়লো তার টানা-টানা দুটি চোখ দিয়ে—। তখুনি আলমারি খুলে, ড্রয়ার- বাক্স হাতড়ে, নোটে খুচরোয় কোনোমতে আটটি টাকা ছুঁড়ে দিল সুমতির দিকে—সুমতি তুই মানুষ খুন করিস, তুই খুনী!

রঞ্জাবতীর তীব্র ভর্ৎসনায়, সুমতির বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো। জল এলো তার অনেক দিনের শুকনো চোখের কাজল-ঘেরা বিস্তারে। রঞ্জাবতীর দিকে তাকিয়ে যেন কৈফিয়ত দিয়ে উঠলো সুমতি,—দিদিমণি মানুষ কি আমি সাধ করে মারি,—পাঁচটি পোনাপুনি মানুষ করেছি একদিন, একদিন এই বুকেরই ধারা দিয়ে—

—কোথায় গেলোরে তারা—

—বানে ভেসে গেল গো দিদিমণি—একটু হাসল সুমতি। স্মৃতির মধ্যে থেকে কী যেন হাতড়ালো—যে কটা বাকি ছিল সে কটাও অকালে মরে গেল—

—পেটে যেটা এসেছে, সেটাকে না-হয় বাঁচিয়ে তোল,—

—পারবো না দিদিমণি, পারিওনি। এর আগে একটা একটা ছেলে এমনি করেই গেছে। মনে পড়লো সুমতির, কেমন কোলজুড়োনো সোনার চাঁদটি নিয়ে সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল কবছর আগে। আর কেমন করে শুকিয়ে শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে সেই ছেলেই মারা গেল। কলকাতার ফুটপাথে।

বাঁধ ভেঙে গেছে সুমতির। বন্যার মতো ছুটে আসছে বেদনার নিরুদ্ধ আবেগ। আহা, সে কি এ জন্মের কথা, না সাত জন্ম আগের দেখা স্বপ্ন! আজ যদি বিজন তাঁতীর বউ সেই সুমতিবালা সুমতির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, হয়তো সুমতি নিজেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। সুমতির গায়ে ছেলেমেয়ে হলেই ষষ্ঠীর আঁটন পড়ত ঘরের দেওয়ালের গায়ে, ছেলে হলে নিটোল নিখুঁত কড়ি দিয়ে গাছ বানাত দেওয়ালের গায়ে, মেয়ে হলে ঘর। সুমতিরও ছিল ছয়-ছয় ছেলে—মেয়ের ছটি গাছ-ঘর। সুমতির সোয়ামী। তাতে সাজানো থাকত ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার বাসন, আর রাস-চড়কের মেলা থেকে কিনে আনা ছেলেদের খেলনা,—বেনেবউ, মাটির রাধাকেষ্ট, কলসী কাঁখে বউ, লালপাগড়ি পুলিস। তার তলায় সমুদ্রের কড়ি দিয়ে নিজের হাতে গেঁথে ছিল সুমতি ছটি শিল্পকাজ। কি তাদের ডালের বাহার! ছিউলী পোয়াতী বলে ঘরে ঘরে নাম ছিল সুমতির। নতুন শিশু এলে ডাক পড়তো তার সবার আগে। সময় লগ্ন

দেখে নিপুণ চিকন হাতে কড়ির গাছ বুনে দিত সুমতি। চারিদিকে শঙ্খঘন্টা বেজে উঠতো, ধূপের গন্ধ উঠতো চারিদিক থেকে।

—বলেই চলেছে সুমতি,—আমার বড় খোকনটা ছোটখুকিকে রাগাত,—

—দেখেছিস আমার কেমন গাছ,—

মেয়ে কেঁদে উঠতো, —মাগো, আমার ঘরের চালে গাছ বানিয়ে দে—

যখন গ্রামের কোনো ঘরে কান্নার রোল উঠতো, ঠাণ্ডা হয়ে যেত কারো রক্তের ডিম, তখন ছয় ছেলেমেয়েকে বুকে চেপে ধরে ঘরে কপাট এঁটে ঝাঁপ টেনে বসে থাকতো সুমতি। আর যতই ভাবত ভাববে না, ততই যেন চোখে দেখতে পেত হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে মৃতশিশুর শোকে করুণ মা ঢেকে দিচ্ছে তার নাম করে গাঁথা কড়ি গাছটাকে। —শেষ কালে আমার কড়ির গাছও ঢেকে গেল দিদিমণি,—বলে চলল সুমতি। তার শীর্ণ গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে এক হঠাৎ উপচে ওঠা বালিভাঙা ফল্গু। বন্যায় ফেলে দিল তার দক্ষিণ দেওয়াল। একাকার হয়ে গেল ছেলে মেয়ে কড়ি পাতিল। সংসারের পর সংসার ভেসে চলল সাগরমুখী হয়ে। সুমতিরও সর্বস্ব ভেসে গেল বন্যার জলে—

অনেকক্ষণ চুপ করে রান্নাশালের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল সুমতি। তার নিচুচাল বস্তির খুপরির সামনে যথাসময়ে জ্বললো না কেরোসিন ডিবরির আলো। আর নতুন চোখে তার দিকে চাইল সেদিন রঞ্জাবতী দিদিমণি। সেই একটি সহানুভূতির কিরণরেখাতেই উজ্জল হয়ে উঠলো সুমতির কালো মনের অন্ধকার কোণ। নতুন সান্ত্বনা নিল সতী মেয়ের কথার আলোয়।

—আর যাই করিস সুমতি, ওই হাতুড়ে ওষুধগুলো খাসনি—মরে যাবি—

রঞ্জাবতীর দরজা পেরিয়ে এসে অন্ধকারের দিকে কান্নাভেজা হাসি ছুঁড়লো সুমতি—দিদিমণি বড় ছেলেমানুষ—আবোলা—

আবার পরদিন মুক্তোর মার মেয়ে মুক্তোকে দিয়ে ডেকে পাঠালো রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর ঘরে ঢুকে মনটা খুশির হাওয়ায় উচ্ছল হয়ে উঠলো সুমতির। মেঝেতে একরাশ কড়ি ছড়িয়ে বসে আছে রঞ্জাবতী—

—তোর কড়ির গাছ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে রে সুমতি, দে না আমায় একটা গাছ বুনে—

আনন্দে চোখ দুটো ঝলসে উঠলো সুমতির। দিদিমণির খোকা হবে। ঐ টুকটুকে ছিমছাম হাল্কা দিদিমণির।

লজ্জায় মাথা নামিয়ে তৎক্ষণে একটা ছিন্নভিন্ন শাড়ি সেলাই করতে বসে গেছে রঞ্জাবতী। আর তার চারিদিকে জ্যোতিষ্মান ধুলোর বিন্দু উড়ছে সূর্যের আলোয় সুন্দর হয়ে।

ঠিক সেই সময়েই দিশেহারা চোখ আর এলোমেলো চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকলো দাদাবাবু। ধূলিধূসর চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বলল—

—ভাত দাও রঞ্জা।

—ভাত,—মাথা নিচু করলো রঞ্জাবতী,—সুমতি যাক, দিই ভাত।

—থাক না সুমতি, হয়েছে কি তাতে, তুমি ভাত দাও,—

বুঝতে পারলো সুমতি। রান্নাশাল শ্মশানের মতো উদাস হয়ে আছে, কোথাও এক দানাও ভাত নেই।

—আমি যাই দিদিমণি, তুমি দাদাবাবুকে ভাত দাও। উঠে পড়লো সুমতি। অমূল্য রত্নগুলো গুছিয়ে নিল কোঁচড়ে—সন্ধ্যাবেলায় এসে তোমার কড়ির গাছ তৈরী করে দেব—

রঞ্জাবতীর সংসারের এই ছন্নছাড়া চেহারার মাঝখান থেকে উঠে যেতে যেতে নতুন সান্ত্বনার মোলায়েম মালিশ বুললো সুমতি নিজের শুকনো হৃদয়ে—সে আসছে। সে এলে হয়তো আবার সব ফিরে আসবে। স্তনবৃন্তের চারপাশে কচি ঠোঁটের স্পর্শের শিহরণ অনুভব করল সুমতি। ভাগ্যবতী মেয়ে রঞ্জা দিদিমণি। সতী সাবিত্রী। তার পরে দোলনা ঝুলবে কমাস পরে। লজ্জা লজ্জা মুখ করে দাদাবাবু কিনে আনবে রাঙা মশারি। কচি গলার আওয়াজ ভাসবে ঘরের হাওয়ায়। দুদিন পরে কচিকচি টুকটুকে খোকা-খুকুরা ঝগড়া করবে কড়ির গাছ নিয়ে। সুমতির জারজ ভ্রূণ তখন কোনো ম্যানহোলের তলায় কাদা বালির ভারে চাপা পড়ে গুমরে গুমরে মরবে।

কিন্তু এজন্যে পিঁপড়ে কামড়ানোর চেয়েও কম যন্ত্রণা অনুভব করে সুমতি। এ মৃত্যুকে সুমতি মেনে নিয়েছে। যেমন মেনে নিয়েছিল তার জীবনের প্রথম পরপুরুষের অন্বেষণকে।

যাবার সময় জানলা দিয়ে শেষ ছবি দেখে গেল সুমতি, সাবিত্রীসমান রঞ্জাবতী দিদিমণি। জানলার গরাদ ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। শুনে গেল সুমতি দাদাবাবুর এক চিলতে কথা—সন্ধেবেলায় আমাদের আপিসের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌কে আনব রঞ্জা। তিনি আশা দিয়েছেন পাবলিসিটি বা প্রোপাগাণ্ডায় তোমাকে রাখতে পারবেন হয়তো—তবে তোমার এই অ্যাডভান্সড্ স্টেজটার কথা বলিবলি করেও বলতে পারিনি - সন্ধেবেলায় রঞ্জাবতীর রান্নাশালের দেওয়ালে কড়ি গাছ তৈরী করে দিল সুমতি। বুকের সবখানি দরদ ঢেলে সাজালো সেই গাছ। চারপাশে তার কত অলক্ষিত শঙ্খঘন্টা বাজল, কত মাছ পদ্ম শঙ্খ-লতার দৈব জানালায় উঁকি দিয়ে গেলো তার সবচেয়ে ছোট কচি খোকাটার টুলটুলে মুখটা।

কে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের বাইরে এলো সুনীল আর রঞ্জাবতী।---দিদিমণি, তোমার গাছ হয়ে গেছে দেখে যাও---

সেদিকে আর দৃকপাত নেই রঞ্জাবতীর। কি মোলায়েম খোসামোদের দৃষ্টি রঞ্জাবতীর সুর্মাআঁকা চোখে। সিল্কের কাপড়ে রঞ্জাবতীকে যেন নতুন বস্তির বড় ধরানার রেশমী বিবির মতো দেখাচ্ছে। অমনি চুলে ফুল, গায়ে গন্ধ, পরনে ঝলমলে পোশাক। নতুন মানুষটি ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলে গেলেন,---আমি বড় দুঃখিত মিসেস রায়, আপনাকে যে কাজটা দিতে পারতাম সেটা বড় ঘোরাঘুরির কাজ, আপনার এই অ্যাড্‌ভান্সড্‌ স্টেজে তা গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

---সুমতি---গাড়িও ছেড়েছে রঞ্জাবতী দিদিমণিও এসে দাঁড়িয়েছেন সুমতির সামনে। কোনোদিকে দৃষ্টি নেই তাঁর, বুক থেকে খসে গেছে সিল্কের আঁচল, দ্রুত নিঃশ্বাসে থর থর করে কাঁপছে অনাগত নবীন গরুড়ের অমৃতকুম্ভ। চোখের কাজল ধুয়ে ধুয়ে পড়েছে গালেব উপর---তোদের বাড়িউলীর কাছে থেকে আমাকেও ওষুধ এনে দিতে হবে সুমতি,--- সুমতির হাত দুটো চেপে ধরে রঞ্জাবতী---

খানিকক্ষণ পাথর হয়ে রইল সুমতি। কি আশ্চর্য! সেদিন সুমতিকে বারণ করেছিল, অথচ আজ কিসের মন্ত্রে নিজেই আর ভয় পায় না হাতুড়ে ওষুধ খেতে---।

অনেকক্ষণ রান্নাঘরের দেয়ালে মাথা রেখে বসে রইল সুমতি। তার মনের মধ্যেকার ধারণার ছবিগুলো যেন চৈত্র-ঘূর্ণির শুকনো পাতার মতো ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে। পা দুটো আর যেন ওঠে না। তবু কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল সুমতি। থাবা থাবা মাটি দিয়ে ঢেকে দিল, শখ করে গড়া কড়ি গাছটাকে।

না, মাটির নিচে ম্যানহোলের গাঢ় পঙ্কিলতায় কোনো কড়ি বৃক্ষ নেই। সুমতির খোকনের পাশে রঞ্জাবতী খোকনও সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, কচি হাতপা নেড়ে খেলা করবে না।

নিজের নিচুচালা বস্তির খুপরির দাওয়ায় ঠিক রোজকার মতোই কেরোসিনের ডিবরি জ্বালাল সুমতি। রোজকার মতো কালি-কলঙ্ক লণ্ঠনের শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিপর্যস্ত চিন্তাটা থিতিয়ে থিতিয়ে পরিষ্কার হয়ে এলো। প্রাণ-সঞ্চরণের সেই পার্থিব কেন্দ্রকে শরীরের প্রতি স্নায়ু উদরের প্রতিটি লসিকা দিয়ে অনুভব করল, তারপর আরো খানিকটা সহানুভূতির ছিটে ফেলল ওর চিন্তায়,---

---আহা কি করবে দিদিমণি, ওরও তো খিদে পায়!

সই

বাঁশের ফুল

লীলা মজুমদার

এতক্ষণ মায়ার বুক ঢিপঢিপ করছিল; এবার পাহাড়ের মোড় ঘুরতেই দেখল কই তার মনের নিবাসটি তো এতটুকুও বদলায়নি। অমনি গত সতেরোটা বছর নিমেষের মধ্যে 'না' হয়ে গেল; তার আগেকার সতেরো বছর হুড়মুড় করে এসে বুক জুড়ে বসল। কত নিশ্চিন্তে ছিল তখন, কত শান্তিতে ছিল। কান্নায় কান্নায় ভরে গেল বুকটা, চোখ দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। সূর্যের ম্লান আলোর দিকে তাকাতেই রামধনু দেখল মায়া। এই তো তার বাড়ি, এ-ছাড়া আবার বাড়ি কোথায়?

কি আশ্চর্য, এই সতেরো বছরে বুকের ওপর দিয়ে জগন্নাথের রথ চলে গেল অথচ সারাক্ষণ এই তার প্রাণের নিবাস যেমনটি ছিল ঠিক তেমনিই আছে। সকালের রোদ সরু পাহাড়ে পথের মাটি ছোঁয়নি তখনো, ঘাসের ওপর শিশির জমে বরফ হয়ে আছে; আগেও যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে। মায়ার পায়ের চাপে সেগুলো মুটমুট করে ভাঙাতে লাগল। চেয়ে দেখল পথের পাশের সরু ঝরণার জলের ওপরটা আগের মতোই খুদে খুদে ঢেউসুদ্ধ জমে যাচ্ছে, তার তলা দিয়ে ফুসফুস করে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনের পাখি ডানা ঝাপটে নামবার জায়গা খুঁজতে লাগল।

পথের এক পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথুরে খোঁদলে তেমনি ফোঁটা ফোঁটা জল চোঁয়াচ্ছে; সে-জল জমে যাবার সময় পায় না। তেমনি মরা সরল গাছের গুঁড়িতে তাকের মতো ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে শীতে কালো হয়ে রয়েছে। এখন বড় শীত। ছোটবেলায় ঠাণ্ডা জলের কলের নিচে হাত ধরলে মনে হত কেটে যাচ্ছে।

শীত? কোথায় শীত? এই তো কেমন মায়ার বুকের জমা বরফগুলো গলে গিয়ে নদী হয়ে ছুটে চলেছে। আরেকটা বাঁক ঘুরতেই সেই অবিশ্বাস্য বাড়িটাও দেখা গেল। তার চার পাশের কুয়াশা তখনো মিলিয়ে যায় নি। মনে হচ্ছিল জানলা দরজা স্কাইলাইট চিমনি, সব নিয়ে আগেকার মতো শূন্যে ঝুলে

আছে আর চারধারের মাটি নিচু হয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। কই, কিছু তো বদলায় নি, সব যেমন ছিল তেমনি আছে। আঃ কি শান্তি, কি আরাম। কুলি-মেয়ের পিঠে মায়ার ছোট সুটকেস আর বিছানা। সে এবার এগিয়ে এসে পাহাড়ি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, 'স্কুলে যাবেন তো মিস-সাব?' মায়া চমকে উঠে লাল বাড়িটাকে দেখিয়ে দিল। পথ ছেড়ে চা-বাগানের ধারে ধারে পাথরের ধাপ ধরে নেমে সরু উপত্যকার ওপারে আবার পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাড়িটার রসুইখানার একেবারে সামনে গিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু সারি সারি বড় বড় পিপের মতো লোহার স্যালমাণ্ডারে এ সময়ে জল গরম হবার কথা, সে-সব কোথায় গেল? চেনা জিনিস দেখতে না পেলে মন কেমন করে।

তবে কি! তবে কি! এতক্ষণ পরে শীতের চোটে মায়ার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরে গেল। ঠাণ্ডা অসাড় হাতে ব্যাগ খুলে পোস্টকার্ডখানা বের করে আরেকবার পড়ে দেখল 'পত্রপাঠ চলে এসো। আমি বড় বিপন্ন। এস. গনজ্ঞালেজ।' তবে আবার কি! স্বয়ং বড় মেমসাহেব ডেকেছেন। কোন ভাবনা নেই। হঠাৎ মনে পড়ল বড়-মেমের তো এতদিনে আশির ওপরে বয়স হয়েছে। তাঁর তো বেঁচে থাকারই কথা নয়। চেয়ে দেখল বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। কিন্তু এই মাঝ-নভেম্বরে শীতে সে-তো থাকবেই। লাল করগেট ছাদ বেয়ে টুপ-টুপ করে হিম-গলা জল পড়ছে। ততক্ষণে ওধারের পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্য দেখা দিয়েছে, বাড়ির মাথায় ভিড় করা আটটা চিমনির চোঙায় রোদ লেগেছে। ছাদের ঈষৎ জমা হিম কতক্ষণই বা থাকে।

কুলি-মেয়ে বলল, 'জনি-বাবা ছাড়া আটটার আগে কেউ ওঠে না। বড্ড কুঁড়ে। এই সময়ে জনি এ বাড়িতে ও-বাড়িতে ওর মাকে খোঁজে।' নির্বোধের মতো কুলি-মেয়েটা হাসতে লাগল।

মায়া তো অবাক। 'জনিবাবা কে?'

''কেন, বুড়ি মেমের নাতনীর ছেলে। ওর মা ওকে ফেলে দু বছর হল পালিয়ে গেছে আর ও কিনা এখনো তাকে খুঁজে বেড়ায়।'

মায়ার বুকের মধ্যে কি যেন ধড়াস করে উঠল। 'জনির বয়স কত?'

'কি জানি, মিস-সাব, ছয়-সাত হবে। বড় দুষ্টু।'

মায়ার গলার মধ্যে টনটন করে উঠল। এগারো বছর আগেকার আরেকটা ছোট ছেলের মুখ মনে পড়ল। সে মায়ার মুখে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'মা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তুমি কোথায় গেলে?' দম বন্ধ হয়ে এল মায়ার, সতেরো বছর কখনো 'না' হয়ে যেতে পারে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে টেনে বেড়ায়। বুকের মধ্যে হু-হু করে।

হঠাৎ কোথা থেকে ছোটখাট একটা ঝড় এসে মায়ার বুকে আছড়ে পড়ল। 'মামি! মামি! কোথায় গেছিলে তুমি?' দুটো কনকনে ঠান্ডা হাত, এক মাথা রুক্ষ চুল, খড়খড়ে পুরু বোনা সোয়েটার গায়ে, কালচে লম্বা প্যান্ট পরা, নীল নীল ছাই রঙের চোখ অযত্নে মলিন, এ কাদের ছেলে? মায়ার বুকে মাথা ঘষে নোংরা ছেলেটা বলল, 'এনেছ আমার জন্য প্রেজেন্ট?' মায়া তার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'এনেছি, এনেছি চল আগে ঘরে ঢুকি।'

দোতলায় একটা জানলা খুলে গেল, তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল, 'জন ফের বেরিয়েছ?' কিন্তু জন ততক্ষণে হাওয়া। কুলি-মেয়ে পিছনের সবুজ দরজার সামনে সিঁড়িটুকু পেরিয়ে ঘন্টার দড়ি টানতেই দরজা খুলে গেল।

এ বাড়িতে যারা পায়ে হেঁটে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, তারা এই দরজা দিয়েই ঢোকে। আর যারা দশ মাইল ঘুরে মোটরে চড়ে কিংবা ঘোড়ায় চেপে বড় গেট খুলে ঢোকে তারা সদর দরজার ঘন্টি টেপে। এই নিয়মই বরাবর চলে আসছে, এতে অসম্মানের কিছু নেই। যার যা প্রাপ্য। মায়া চাকরী করতে এসেছে, এ দরজা দিয়ে ঢুকবে না তো কোথা দিয়ে ঢুকবে?

মোটা সোয়েটারের ওপর কালো কোট-প্যান্ট পরা একজন বেজায় বুড়ো লোক দরজা খুলতেই, কুলি-মেয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলল, 'মিস-সাবকে নিয়ে এসেছি বাটলার সাব।' লোকটি ভাঙ্গা গলায় বলল, 'গুড মর্ণিং। ওকে একটা টাকা দিয়ে বিদায় করে দিন। সাঁইলা আপনার জিনিস ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। আপনিও ওর সঙ্গে যান, আমি গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে চা পাঠাব। বড়-মেমসাব আটটায় ওঠেন।'

সাঁইলার সঙ্গে মায়া ঘরে গিয়ে দেখে খাটের ওপর জনি বসে আছে। 'কই দাও আমার নতুন বই।' সাঁইলা বলল, 'জনি-বাবা তুমি মিস-সাবকে দিক করছ আমি বড়মেমকে বলে দেব।' মায়া বলল, 'না না, আমাকে কিচ্ছু দিক করছে না। তুমি আমার গরম জল নিয়ে এসো।' জনিও আস্কারা পেয়ে লাল টুকটুকে জিভের একটুখানি আগা দেখাল।

সুটকেসের ওপরেই ছিল দুটো বই; মোটর, ট্রাকটর, ট্রেনের ছবি একটাতে, এরোপ্লেনের ছবি অন্যটাতে। জনির হাতে বই দিতেই সে বদলে গেল। চোখ ছল ছল করে উঠল ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, 'থ্যাঙ্কিউ'। তারপর বই ফেলে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি-আমি রোজ ভাবি তুমি আমার বই নিয়ে কবে ফিরে আসবে।'

মায়া ভাঙ্গা গলায় বলল, 'এই তো এসেছি।'

'আর চলে যাবে না?'

মায়া একটু ইতস্তত করে বলল, 'না।'

জনি বই খুলে মায়ার খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর গরম জল এল। মায়া হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে তৈরী হয়ে এল। মস্ত স্নানের ঘর। জানলার পাশে লম্বা আয়নায় নিজের লম্বা হাতা উলের জাম্পার আর স্ল্যাকসপরা চেহারাটি দেখে নিজেই চমকে উঠল। কোঁকড়া চুলগুলোকেও কান অবধি ছেঁটে ফেলতে হয়েছিল। দেখে কে বলবে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নয়। হাসি পেল মায়ার। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আবার কি? অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বললেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। ফরাসীরা তো কোন কালে হয় ইউকেতে নয় অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেছে। যারা আছে তাদের গায়ের রং মায়ার চাইতে কালো বই ফরসা নয়। বড়-মেম নাকি নেটিভদের ওপর হাড়ে চটা। দশ পুরুষ ধরে ওঁরা নাকি নেটিভদের ওপর কর্তৃত্ব করে এসেছেন, এই সব দুদিনের ইংরেজদের চাইতে অনেক আগে থেকে। ওঁরা নাকি খাঁটি পর্তুগীজ; সাড়ে তিনশো বছর আগে কুইলনের একরকম রাজা ছিল নাকি ওদের পূর্বপুরুষ। বেজায় বড়লোক ছিল, বড় বড় বোম্বেটে জাহাজ খাটত ওদের। অন্ততঃ তাই বলত মায়ার ছোটবেলাকার সহপাঠিনী গোয়েন এই বড় মেমের নাতনি। ভারী সুন্দর ছিল গোয়েন। আর তাই নিয়ে গর্ব কত!

সাঁইলা ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতেই জনি বই নামিয়ে বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে খাব মামি আগে যেমন খেতাম।'

সাঁইলা বলল, 'খানা কামরায় তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে চল শিগ্‌গির।'

জনি শুয়ে পড়ে বলল, 'খাব না, যাও।'

মায়া প্রমাদ গুনল। 'যাও না জনি, খেয়ে এসো। আমি তোমার গ্র্যানিকে বলব, এর পর থেকে তুমি আমার সঙ্গে খাবে।' কিন্তু মন বলছিল—জড়িও না, জড়িও না, যে কথা রাখতে পারবে না সে-কথা দিও না। ততক্ষণে কথাটা বলা হয়ে গেছে। কাষ্ঠ হেসে মনকে মায়া বলল, দুটি জিনিস ফেরানো যায় না, জ্যা-মুক্ত তীর আর বলে ফেলা কথা।

বাটলার এসে দরজায় দেখা দিল। জনি বাবার খাবারও এখানে নিয়ে আসছে। বড়-মেম তাই বলেছেন। টেবিলের হালচাল ওর শেখা দরকার। আমরা সারভেন্ট, আমরা কত শেখাব? উঠে হাত-মুখ ধুয়ে এসো জনি।

চারদিকের পাহাড়ের মাঝখানে জ্বলজ্বল করতে থাকে এই লাল করগেট ছাদের কাচের জানলায় মোড়া বাড়ি। লোকে বলত নাকি চারদিকে কুড়ি মাইল দূর থেকে এ-বাড়ি দেখা যায়, ছোট একটা আলাদা পাহাড়ের চূড়োর সবখানি জুড়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কিম্বা বৃষ্টিতে ভিজছে। শীতকালে যখন হিমালয়ের দিক

থেকে চব্বিশ ঘন্টা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইত তখনো সারা বছরের রোদের স্মৃতিমাখা কাচের জানলার ভিতরে গাঢ় লাল কম্বলের পর্দা টেনে আটটা চিমনি থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে এ-বাড়ির লোকেরা সুখে কাল কাটাত।

পাশের পাহাড় আরো উঁচু হলেও এ চূড়ো সাত হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। নাকি যে জানলা দিয়ে তাকানো যায় সেখান দিয়েই বরফের পাহাড় দেখা যায়। এত উঁচু থেকে দেখলে মনে হয় দিগন্ত আঁকড়ে ধরে বরফের পাহাড়ও গোল হয়ে ঘুরে এসেছে। দিনে কি ঘন নীল আকাশের রং, রাতে কি ঘোর বেগনি তার ওপর তারা খচিত; এত রাশি রাশি তারা পাহাড়ে না চড়লে দেখা যায় না।

বাড়িটা আরো খানিকটা পুরোনো হয়েছে, নইলে কোথাও এতটুকু বদলায় নি। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ি বাঁশের ঝোপ; কি তার শোভা। কত কাজে লাগত ঐ বাঁশ গাছ। গাঁটে গাঁটে কেটে চাল মাপা, দুধ বয়ে নিয়ে যাওয়া, কচি বাঁশের কোঁড় খাওয়া, এসব এখানকার লোকদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ ছিল। স্কুলে যে সব আয়ারা কাজ করত, পদ্মা, পম্পা, চন্দ্রমায়া তারা ছিল মায়ার নিত্য সঙ্গিনী। তারা এই 'লাল কুঠির' গল্পে পঞ্চমুখ। বড়মানুষির গল্প বলতে পারলে গরিবরা আর কিছু চায় না। অবিশ্যি পদ্মা পম্পারা কেউ যে গরীব একথা মায়ার তখন একবার-ও মনে হয় নি। কি মোটা মোটা রূপোর বালা পরত ওরা। চন্দ্রমায়ার কানের ওপর-নিচ ফুঁড়ে কি সুন্দর কাঁচা সোনার মাকড়ি পরা ছিল, নাকি ওর ঠাকুমার জিনিস। মায়াদের এক কুচি সোনা বা রূপো ছিল না। দশেরার সময়ে একবার লুকিয়ে মায়া পম্পাদের বাড়ি গিয়ে পায়া লাগানো ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে লস্যি খেয়ে এসেছিল। নিজেদের বাড়িতে তো এক কণা কাঁসা বা পিতল ছিল না। সব চীনেমাটি আর পুরনো এলুমিনিয়ম, স্কুলের বোর্ডিং-এর মেট্রন মিসেস অ্যাবটের দয়ায় পাওয়া। মানুষটি খুব দয়ালু ছিলেন। মা তাই কত কৃতজ্ঞ। মনে পড়তেই বুকের মধ্যে একটা পুরোনো জ্বলুনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মায়া চোখ ফিরিয়ে দেখল জনি কখন বইয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিলের ওপর ব্রেকফাস্টের বাসন তখনো পড়ে রয়েছে. কারিকুরি করা কাঠের ট্রেতে লেসের ঢাকনি পাতা, তাতে সোনালি পাড় দেওয়া মিহি চীনেমাটির বাসন। জানলার বাইরে বরফের পাহাড়ের সারি। চিমনিতে লোহার আংটায় কাঠকয়লা জ্বলছে, তার আঁচে ঘরটি গরম হয়ে আছে। মায়ার মার সেই দুটো ছোট ঘর গরম করতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হত।

আটটা বেজে গেছিল। জনির গায়ের ওপর সূক্ষ্ম হাতের কাজ করা সুন্দর সুন্দর রেশমের পুরোনো লেপটা টেনে দিয়ে, হ্যান্ডব্যাগটি হাতে নিয়ে মায়া

উঠে দাঁড়াল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চুল ছাঁটা স্ল্যাকস পরা অচেনা মেয়েটিও উঠে দাঁড়াল। অন্য সাজ পরলেই কি অচেনা হয়ে যায়? চেনার জগৎ শিরা ধরে নাড়ি ধরে টানাটানি করতে থাকে না?

এর আগে কখনো মায়া এ-বাড়িতে ঢোকেনি। ফটকের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখত কাঠের ফলকে সাদা হরফে লেখা 'দি রেড হাউস'। সবাই বলত লাল কুঠি। ঐ ফটক দিয়ে গরিব মানুষরা ঢুকত না। তাদের জন্য আরো দুটো গেট ছিল। গোয়েন বলত নাকি কোনো 'নেটিভ' কখনো বড় গেট পার হয় নি। রাজা মহারাজারা ছাড়া। তাদের তো আর ঠিক 'নেটিভ' বলা যায় না। তারা ইয়োরোপে বেড়াতে যেত। গোয়েনরাও নাকি ইয়োরোপীয়ান, পর্তুগালে বাড়ি, এদেশে ওদের জমিন্দারি, এটা কিন্তু ওদের বাড়ি নয়। সবাই ওদের বিষয়ে নানা কথা বলত।

আসলে এখানকার জীবনযাত্রা চলত ঐ লাল বাড়িটাকে ঘিরে। সরকারী খরচে স্কুল চলত। মায়ার এই দোতলার ঘর থেকে তার চিমনির ডগাগুলো দেখা যায়। ছেলেদের স্কুল, আর একটু দূরে মেয়েদের স্কুল। নাকি নেটিভদের আগে নেওয়া হত না। তখন স্কুলটার একটা আভিজাত্য ছিল। আজকাল ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়াতে আর ভাল কিছু বাকি রইল না। এই সব বলে দুঃখ করত গোয়েন। অথচ স্কুলের ছাদে বড় বড় করে লেখা ছিল 'বয়েজ হোম' আর 'গার্লস হোম'। মা বলত নাকি আসলে অনাথাশ্রম। ঐ সব ফ্যাশানেবল ছেলেমেয়েরা আসলে কেউ নয়, তবে হ্যাঁ, ওদের জন্য সরকার এখনো অনেক টাকা খরচ করে। শুনলে মেয়েরা নিশ্চয় চটে যেত। তবে শুনবে কোত্থেকে, মাকে তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য করত না। শেষ পর্যন্ত মা শাড়ি পরত। মা চাকরদের কাজ করত ঐ স্কুলে। রোজ সকালে আটটা না বাজতে গেট দিয়ে ঢুকে সোজা মিসেস অ্যাবটের কাজের ঘরে গিয়ে ছুঁচ সুতো সেলাইকল নিয়ে বসে পড়ত।

অবিশ্যি মার ঐ অনাথাশ্রম কথাটা একেবারে ঠিক নয়, কারণ কাছাকাছি চা-বাগানের মালিকদের ছেলেমেয়েরাও ঐ স্কুলে পড়ত, যেমন গোয়েন। গোয়েন বলত, ইচ্ছা করলেই আমার গ্র্যান্ডমাদার এই স্কুল দুটোকে কিনে টিচারদের সবাইকে চাকর বানিয়ে রাখতে পারে, তা জান? এখানকার গির্জাটা তো গ্র্যান্ডমাদারের বাবার টাকায় তৈরি, গ্র্যান্ডমাদারের খরচে চলে। এই গোটা পাহাড়ের ঢালটাই আমার গ্র্যান্ডমাদারের সম্পত্তি। চেরি-ফলের মতো বড় বড় মুক্তো পরে গ্র্যান্ডমাদার রোজ ডিনার খেতে বসে। গ্র্যান্ডমাদারের হিরে দেখলে চোখ ঝলসে যাবে তোমাদের। সব একদিন আমি পাব।

শুনে বন্ধুরা অবাক। 'সে কি, সব তুমি পাবে কেন? তোমার দিদিমার ছেলেরা আছে না? তাদের ছেলেমেয়েরা আছে না?'

তাতে গোয়েন হেসেই কুটোপাটি। 'ও মা, তাও জান না, আমাদের বংশের পুরুষমানুষরা বেশি দিন বাঁচে না। আমার বাবাকে কেউ চোখে দেখেছে? আমার আঙ্কল বলে কেউ আছে বলে কখনো শুনেছ? বিয়ে করে নিয়ে আসে বটে আন্টিরা, কিন্তু সব নিখোঁজ হয়ে যায়।'

'নিখোঁজ হয়ে যায়? মরে যায় নাকি?' 'তা যেতে পারে, বলা যায় না। মোট কথা তাদের আর চোখে দেখা যায় না?' বলে ফিক্ করে হেসে গোয়েন বলেছিল, 'তবে আসল কথা হল টাকাকড়ি হিরে মুক্তোগুলো নিখোঁজ হয় না। আমার গ্র্যান্ডমাদার প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব রাখে।' ভারি গাঁজাখুরি কথা বলত গোয়েন।

মায়া ভাবত পুরুষরা নিখোঁজ হয়, মেয়েরা কেউ কাজকর্ম করে না, শুধু বড়-মানুষি করে তবে কোত্থেকে আসে এত টাকা? গোয়েনকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করত, 'হেয়ার ড্রেসিং' ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে। গোয়েন অনিশ্চিতভাবে পাহাড়ের গা দেখিয়ে দিত, 'কেন, আমাদের চা-বাগান আছে না, নিচে আঙুরের চাষ আছে না?'

অবাক হয়ে মেয়েরা বলত, 'ও মা, চা বাগান তোমাদের হতে পারে, কিন্তু, বাকি সবতো মিঃ ফ্রান্সিস্কোর।' ঝপ করে উঠে পড়ত গোয়েন 'ঐ একই কথা। ওটা আবার একটা মানুষ নাকি। আসলে সবই আমাদের। আমার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদারের বাবার টাকা দিয়ে কেনা।' এদের বাড়ির বড়মানুষির গল্প মায়ার সমস্ত কৈশোরটাকে রঙিন করে রেখেছিল। এতটুকু হিংসা বা লোভ হয়নি কোনো দিন। সুদূরপরাহততে কি কারো লোভ হয় নাকি? বরং লোভ হত মেয়েদের পরনে কালচে নীল লম্বা হাতা কার্ডিগ্যানে, গরম মোজায়, খানা-কামরার কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়াতে। দিতেনও মিসেস অ্যাবট যথেষ্ট, মা সূক্ষ্ম সেলাই দিয়ে রিপু করে নতুনের মতো বানিয়ে দিত। সত্যি মেম বড় ভালো ছিল। নাকি আসলে মেম নয়, খৃশ্চান হয়ে মেম হয়েছিল। পম্পাদের কাছে শোনা।

উঃ, মা মরার আগে রাতটা কি ভয়ঙ্কর। কোনো দিনও ভুলবে না মায়া। মা ধুঁকতে ধুঁকতে বলেছিল, 'মিসেস অ্যাবেটকে ছাড়িস না; ও আমার মায়ের পেটের বোন। দুষ্টু লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মা-বাবা নেয় নি, কিন্তু পাদ্রীরা নিয়েছিল। হবে না কেন খৃশ্চান? তোর বাপ মরলে ও-ই না আমাকে এখানে আনল। খৃশ্চান হলাম না বলে এর বেশি করতে পারে নি। ও তোর মাসি। ওকে ছাড়িস নে। আমার হয়ে এল।' হয়তো প্রলাপ বকছিল, মিসেস অ্যাবট তো কখনো কিছু বলেন নি। তবে মায়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

সত্যি সত্যি বড্ড টপ করে মরে গেছিল মা। তখন শীতকাল, স্কুল বন্ধ। কে আবার মাকে দাহ করবে? গোরস্থানের বাইরে মাকে মাটি দিয়েছিল মিসেস অ্যাবট। মায়া কবরের পাশে একটা ফিকে বেগনি উইস্টিরিয়া লতা লাগিয়েছিল। এক বছরে সেটি ফুলে ফুলে ভরে গেছিল। একবার গিয়ে দেখে আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত ঐ মাসি ত্যাগ করলেও মরা মা তো আর তাকে ফেলতে পারবে না। মাসিই কি আর এত দিন আছে। কিন্তু থাকবে না-ই বা কেন, বয়স তো বড় জোর পঁয়ষট্টি হবে।

বাটলার এসে বলল 'বড়-মেম ডেকেছেন।' বড়-মেম। তখন শহরশুদ্ধ সবাই বলত, 'ব্ল্যাক উইডো', হয়তো ওঁর নেটিভ বিদ্বেষকে বিদ্রূপ করে, কিম্বা অন্য কারণে। এখনো হয়তো বলে। তবে স্থানীয় অবস্থাপন্ন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাসিন্দারা সবাই স্বাধীনতার পর এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ঐ নিয়ে মন্তব্য করবার লোকই বা কোথায়? আর 'ব্ল্যাক উইডো' মাকড়সার কথা এখানে জানেই বা কে! সবাই গেছে, কিন্তু বড় মেম কেন থেকে গেল? রহস্যের মূল তো সেইখানেই এবং সেই জন্যই মায়ার এতদিন পরে এখানে আসা। কে জানত জায়গাটা ওর জন্য এতদিন অপেক্ষা করে রয়েছে। একতলার একটা পূর্বমুখী বড় ঘর। মায়ার দেখা এ-বাড়ির নকসায় ঠিক যেমন আঁকা ছিল। ঘন ভরা রোদ; মেঝেতে গমের মতো পাটকিলে রংয়ের গালচে, দেয়ালে পুরোনো চীনে বাসন ঝোলানো, ঘরের মাঝখানে ছাদ থেকে ঝুলছে স্ফটিকের ঝাড়বাতি। খোলা জানলা, হলুদ পরদা সরানো সেই দিকে পাশ ফিরে বড়-মেম প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে, সিংহাসনের মতো উঁচু পিঠ দেওয়া চেয়ারে বসে আছেন। এ ঘরের পাশেই বিশাল বৈঠকখানা।

আশি বছর বয়স। তিনি যে এত সুন্দরী মায়া সে-কথা ভুলেই গেছিল। কি ফরসা রং, লালচে চুলে একটুও পাক ধরেনি; সবুজে চোখ ফিরোজার মতো; কুড়ি বছর আগে স্কুলের বার্ষিক সম্মেলনে একবার যেমন দেখেছিল তেমনি উজ্জ্বল, যেন নীল-সবুজ আলো ঠিকরোচ্ছে। কালো মানুষ এ মেয়ের ভালো লাগবেই বা কেন। গালচের ওপর পায়ের শব্দ হল না। বড়-মেম প্রবেশদ্বারের দিকে চেয়ে বললেন, 'কাছে এসো, তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, আমি দেখতে পাই না।'

এ-সবই জানত মায়া, তবু ঐ অপরূপ মুখ থেকে অমন কথা শুনে শিউরে উঠল। 'চমকালে নাকি? আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।' মায়া তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বড়-মেম ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বস, সামনের ঐ ছোট কালো চেয়ারে বস, আরাম পাবে। ব্রেকফাস্ট খেয়েছ?'

মায়া এত সকালে ব্রেকফাস্ট পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। বড়-

মেম বললেন, 'যাট বছর আগে ঘড়িতে চাবি দিয়ে দিয়েছিলাম, এখনো তাই চলছে। চাবি ফুরিয়ে গেলে কি হবে জানি না। হয়তো বাঁশগাছে ফুল ফুটবে। জান তো ফুল ফুটলে বাঁশ বাঁচে না।' বলেই কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, 'দেশটাতো উচ্ছন্নে গেল, তাই আমার শেষ কাজটা এবার করতে হয়। আমার স্মৃতিকথা লিখতে পারবে তো; এই দেরাজে ডাইরি, নোট-বই, চিঠিপত্র সব রয়েছে, নির্ভয়ে খুলে দেখতে পার। একটা বয়সের পর সব মানুষের ব্যক্তিগত গোপন কথা জনসাধারণের সামগ্রী হয়ে যায়। তারিখ দেখে দেখে সব গুছিয়ে নিও; তাছাড়া আমার যেমন যেমন মনে আছে সব বলে যাব। পারবে তো লিখতে? তুমি না সাংবাদিকের কাজ করেছ?'

মায়া জানাল সে পারবে। আর কিছু জানতে চাইলেন না বড়-মেম। এরা আশ্রিতদের আর বেতনভোগীদের নামও জানা দরকার মনে করে না। কিন্তু বড়-মেম হঠাৎ বললেন, 'কি বলে ডাকব তোমাকে? চিঠিতে লিখেছিলে এম. পাল। এম মানে কি?' মায়া চমকে উঠে বলল, 'মায়া।' 'ও আবার কোন দেশী নাম হল?' মায়া বলল, 'রাশিয়াতে আছে ঐ নাম।' 'হুম, শুনতে মিষ্টি। তাহলে জানলার সামনের বড় ডেস্কের কাগজপত্র নিয়ে কাজ শুরু করে দাও। কিন্তু জনিকে কখন পড়াবে? সকালে তো স্কুলে যায়। কেউ বোধহয় ওর দেখাশুনো করে না। মা-টি তো একটা লক্ষ্মীছাড়ী। ছেলেও নাকি সবাইকে জ্বালাচ্ছে। এ-ঘরে ঢুকতে মানা করেছি! কত কাল আসেনি আমার সামনে। তুমি একটু দেখো, নইলে একটা জন্তু বনে যাবে।'

বড়-মেম উঠে দাঁড়ালেন। পাতলা পাতলা সুন্দর গড়ন, বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। কানের গলার হাতের হিরেগুলো ঝকঝক করে উঠল। পোশাকটা কুড়ি বছর আগের ফ্যাশানের। কোথা থেকে এসে ওঁর হাতের কাছে আধবুড়ি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আয়া কায়া নিয়ে বলিষ্ঠ একখানি হাত তাঁর কনুইয়ের নীচে রাখল। খুব ফরসা নয়। কিন্তু সে-ও নাকি পর্তুগিজ, গোয়াতে প্রবাসী, শ-তিনেক বছর ধরে।

দরজার কাছে পৌঁছে বড়-মেম থেমে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, অদ্ভুত হেসে বললেন, 'আমার ফুলের বাগান দেখেছ? ফাদার চাওড্রির ছেলেরা সেখানে এই শীতে গোলাপ ফুল ফোটায়। দেখে এসো সময় পেলে। সকালটা সেখানে কাটাই। দরকার হলে সেখানে যেও। লাঞ্চ খাবে আমার সঙ্গে। ফাদার চাওড্রি একজন অতিথি নিয়ে আসবেন।'

'আর জনি?' 'জনি! জনি দিনের বেলায় স্কুলে আর রাতে প্যান্ট্রিতে খায়। ওর বাপের গায়ের রং কুচকুচে কালো ছিল। মরে-টরে গেছে হয়তো এতদিনে।

এ বংশের মেয়েদের যারা বিয়ে করে তারা কি বেশি দিন বাঁচে নাকি। জনি খানা-কামরায় কেমন করে বসতে হয় জানে নাকি।' নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে মিসেস গঞ্জালেজ চলে গেলেন। মায়া বলতে পারল না আজ রবিবার জনির স্কুল নেই, চিন্তিত মনে খাতার পর খাতা খুঁজতে লাগল।

সব দেরাজ টেনে খুলে খুঁজে দেখতে লাগল মায়া। বাস্তবিক পুরনো ডাইরি আর নোটবই, চিঠিপত্র আর হিসাব খাতা ছাড়া কিছু নেই। আর কি যে থাকতে পারে তা ত মায়া ভেবে পেল না। শুনে এসেছিল টাকাকড়ির ভার স্থানীয় ছিল ব্যাঙ্কের হাতে। তারা হিসাবপত্র রাখে, ইনকাম ট্যাক্স দেয়, সবাইকে মাইনে দেয়, চা-বাগানের ম্যানেজার থেকে মজুরদের পর্যন্ত। তাদের নাকি ঢাকবার কিছু নেই, কাগজপত্র খুলে ধরে দিয়েছে। মায়ার হাসি পেল। অন্ধ বুড়ি, শূন্য বাড়ি, পড়ন্ত অবস্থা, এখানে চোরা-চালানের কি ইঙ্গিত থাকতে পারে? তবে সে-সব প্রশ্ন ওর করবার কথা নয়। এদিকে ষাট বছরের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা খুব সহজ নয়। এর ভিতরেই কোনো ইঙ্গিত থাকাও বিচিত্র নয়। তারিখ দেখে দেখে মায়া কাগজ সাজাতে বসল।

চোখের সামনে যেন একখানা উপন্যাস তৈরি হতে লাগল। মায়াও তাতে ডুবে যেতে লাগল। ১৯১৫ সালে গঞ্জালেজ সাহেবের সঙ্গে বিয়ের পর কর্নিলিয়া যখন এ-বাড়িতে এসেছিলেন এ-বাড়ির গিন্নি তখন কর্নিলিয়ার মা পেটুনিয়া। এ-বাড়ির জামাইরা আইন মতে শ্বশুরবাড়ির পদবী নিত। প্রথম দিনের ডিনার পার্টির গোলাপি কাগজে সোনালি অক্ষরে লেখা খাদ্য তালিকা পেল মায়া, সে-বছরের হিসাবের খাতায়, ঐ তারিখের খরচের সঙ্গে সুতো দিয়ে সেলাই করা। নাকি ময়ূর রোস্ট খেয়েছিল বাইশজন অতিথি! প্রত্যেককে একটা করে, সোনার জিনিস উপহার দেওয়া হয়েছিল।

১৯১৫ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছিল। সময়টা খুব ভালো ছিল না। ঐটুকু ঐ চা-বাগান। পাহাড়ের গায়ের ফুল-বাগিচা তো সে তুলনায় সে-দিনের, ফাদার চাওড্রির কীর্তি। তাঁকে চিনত মায়া। সত্যিকার কিছু পাদ্রী ছিলেন না। আসলে ডাক্তার বিয়ে-থা করেন নি, গরিবদের ছেলেদের ওষুধপত্র দেওয়াতে, সেবা করাতে, পথ্যের ব্যবস্থাপনাতে, লেখা-পড়া শেখানোতে, চাকরি দেওয়াতে এত উৎসাহ, তাই সবাই বলত ফাদার। ফাদার তো এখানকার খুদে গির্জার আজকাল প্রধান পৃষ্ঠপোষক; গঞ্জালেজদের তো পড়ন্ত অবস্থা, তারা নিশ্চয় কিছু দেয় না। যদিও এই ঘরের ঐ একটা সত্যিকার স্ফটিকের ঝাড়বাতির দামই হয়তো পঁচিশ হাজার টাকার কম নয়। তাতেই হয়তো গির্জার তিন বছরের খরচ চলে যায়। পাদ্রীকে আর কতটুকু মাইনে দেয়।

পুরনো কথাটায় আবার ফিরে আসতে হল। এতসব দামি জিনিস এরা কিনল কি করে? গোয়েন বলত নাকি ওদের হিরে মানিকের পাহাড় আছে, কোনো লুকনো জায়গায়, ওরা নাকি শুধু ইন্ডিয়া কেন, ইংল্যান্ডটাকেও কিনে ফেলতে পারে। একদিন গোয়েন মালিক হয়ে সব বেচে দিয়ে প্যারিসে গিয়ে থাকবে। এদেশে আজকাল মানুষ থাকে নাকি! কিন্তু মুস্কিল হল যে এমন আইন করেছে যে টাকাকড়ি বিদেশে নিয়ে যেতে দেয় না।

মায়ার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল। গোয়েনের ঐ পুরনো কথাতেই তো মিসেস গঞ্জালেজের এ-দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু পুরনো আসবাবে ভরা এই পুরনো বাড়িতে সেরকম ঐশ্বর্যের চিহ্ন কোথায়, যার জন্য তদন্তকারী পাঠাতে হয়? তদন্তকারী.... মায়ার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জনি। 'ও মামি! আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আবার চলে গেছ!'

জনির মুখের দিকে তাকাল মায়া। ছয়-সাতের বেশি বয়স হতে পারে না। গায়ের রং ফর্সা বাঙালীর মতো, মুখখানা হয়তো সুন্দর হলেও হতে পারে, কিন্তু এমন ধূলোমাখা মূর্তি মায়া কম দেখেছে। মায়া হেসে বলল, 'চল, তোমাকে গরম জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিই। তারপর আমার ঘরে তোমার লাঞ্চ দেবে।' মায়া উঠে পড়ল। প্রথম সকালে ঢের কাজ করা গেছে। জনিকে বলল, 'এত রোগা কেন তুমি? চল তোমার ঘরে।' জনির ঘর দেখে কান্না পায়। মস্ত ঘর, মস্ত জোড়া খাট, মস্ত আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ঘর জোড়া গালচে পাতা। একটা বইয়ের আলমারিতে জনির যাবতীয় সম্পত্তি কাপড়চোপড়, স্কুলের বই, হকি স্টিক, বল, একটা লোম-ওঠা খেলার ভালুক। এক ঝলক হেসে জনি সেটা তুলে নিয়ে বলল, 'এই দেখ, আমি যখন ছোট ছিলাম, তুমি আমার বার্থ-ডেতে দিয়েছিলে! ড্যাডি....' জনি যেন ধাঁধায় পড়ে থেমে গেল। মায়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। জনি বলল, 'এখন আর আমার বার্থডে হয় না। আমি বড় হয়ে গেছি।'

মায়া বলল, 'কে বলেছে তুমি বড় হয়ে গেছ। এই তো আমার কোলে কেমন এঁটে যাচ্ছ।'

শেষ পর্যন্ত লাঞ্চটা খাওয়া হয়নি। ফাদার চাওড্রির নাকি কি জরুরি কাজ পড়ে গেছিল। মিসেস গঞ্জালেজ অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন। মস্ত খানা-কামরায় জনি আর মায়া পাশাপাশি বসে মহানন্দে অন্য লোকের জন্য রান্না করা নানা রকম উপাদেয় জিনিস খেয়েছিল। টেবিলে বসে কেমন আচরণ করতে হয়, জনিকে তার প্রথম পাঠ দেওয়া গেল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাবান গরম জল দিয়ে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে দেখাচ্ছিলও অন্য রকম। তার

ওপর ভারি রসিক ছেলেটা। তবে ঐ, মায়াকে কিছুতে ছাড়তে চায় না। খালি বলে, 'তুমি আমাকে ফেলে চলে যেও না। আমার রাতে ভয় করে।'

'ভয়? কিসের আবার ভয়? এ-বাড়ি এমনি শক্ত করে তৈরী যে বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না।' 'না, তবে দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসে দুষ্টু ছেলেদের ধরতে পারে তো। মেগ বলেছে।'

মায়া চটে গেল। 'মেগ? মেগ আবার কে?' বাটলার কান খাড়া করে শুনছিল, বলল, 'ঐ যে বড়-মেমের সঙ্গে থাকে। জনি-বাবা শোবার সময় দুষ্টুমি করলে ওকে ওই বলে ভয় দেখায়।' মায়া জনিকে বলল, 'শুনলে তো, মিছিমিছি বানিয়ে বলে মেগ। দেয়াল থেকে কেউ নেমে আসে না। আজ থেকে তোমার আমার ঘরের মাঝের দরজা খুলে রাখব—বাঁ হাতে কাঁটা ডান হাতে চামচ।'

দুপুরে মেঘ করে বেজায় শীত পড়ল। জনি নতুন বই নিয়ে মায়ার ঘরে আংটার সামনে গালচের ওপর ঘাড় গুঁজে পড়ে রইল। বড়-মেম নাকি সাড়ে তিনটেয় ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে বসে চা খান। মায়া এই অবকাশে পড়ার ঘর, খাবার ঘর, বসবার ঘর, তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। দেখল প্রথম দর্শনে অতটা বুঝতে পারেনি, এ বাড়িটা যদিও এমন সব দামি দামি জিনিস দিয়ে সাজানো, যা কোটিপতি ছাড়া কেউ কিনতে পারে না, কিন্তু সে সবই অনেক দিন আগে কেনা. যা যেখানে আছে সেখানে দাগ পড়ে গেছে। কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখবার জায়গা আছে বলেও মনে হল না। তবে ওসব হল বিশেষজ্ঞের কাজ এবং সার্চ ওয়ারেন্ট না আনলে ও-সব তদন্ত করাও বে-আইনী।

তিনটের সময় মায়া আবার কাগজপত্র নিয়ে বসল। ১৯১৫ সালের ১লা মার্চ কর্নিলিয়া ও সিলভেস্টার গঞ্জালেজের একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল। হলদে হয়ে যাওয়া খুদে একটা খবরের কাগজের কাটিং। মেয়ের নাম এমিলিয়া। খাতায় ৮ই মার্চ তারিখের হিসেবের সঙ্গে হ্যামিলটনের বাড়ির একটা বিলের রসিদও ঝুলছিল—হিরের লকেট বাবদ চার হাজার টাকা। এ বাড়ির জীবন যাত্রা মনের মধ্যে রূপ ধরতে লাগল, কিন্তু সে সবই খরচের হিসাব, ক্ষয় হবার কাহিনী। জমার ইঙ্গিত কোথাও নেই। হয়তো গোয়েন যা বলত তাই সত্যি, বোম্বেটে পূর্বপুরুষদের জমানো টাকায় ওদের বড়মানুষি। তার সঙ্গে ভারত সরকারের কতটুকু সম্বন্ধ। আশি বছরের বুড়ি তার মায়ের সম্পত্তি যখন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল তখনি নিশ্চয় তার মাশুল যা দেবার দিয়েছিল। ব্যাঙ্কের হাতে টাকা-কড়ির ভার, এখনো নিশ্চয়ই ট্যাক্স দেওয়া হয়।

কলকাতায় যেটাকে দুঃসাহসিক অভিযান বলে মনে হয়েছিল, এক দিনেই

তার উপর কেমন ঘৃণা ধরে যাচ্ছিল। বাটলারের সঙ্গে জনি এল। বড়-মেম মায়াকে আজকের মতো কাজ বন্ধ করে ওর সঙ্গে চা খেয়ে জনিকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলে পাঠিয়েছেন।

জনি বলছিল, আমি প্যান্ট্রিতে খাই রোজ। মায়া তাকে ধরে মিসেস গঞ্জালেজের বাগানে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাশে বেতের চেয়ারে বসল। পড়ন্ত রোদে বাগানটা ভরে ছিল, তার এতটুকু উষ্মা ছিল না। বড়-মেমের পরনে লোমের কোট; যতো মিঙ্ক, কে জানে মায়ার তো আর ও-সব চেনার কথা নয়। জনি মায়ার ওপাশে এমন নিঃশব্দে বসেছিল যে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

মিসেস গঞ্জালেজ বললেন, 'জনি এসেছে? গুড আফটারনুন জনি।' জনি নীচু গলায় বলল, 'গুড আফটারনুন ম্যাডাম'। নিজে মায়ের দিদিমাকে ম্যাডাম বলে জনি, ঐ রকমই শেখানো হয়েছে। অথচ যদ্দুর মনে হচ্ছিল বাড়িতে নোকর-চাকর ছাড়া এই দুটি মাত্র বাসিন্দা। নিজের রুমাল দিয়ে জনির কপালের ঘাম মুছিয়ে মায়া ওর প্লেটে একটা বড় গোলাপি পেস্ট্রি তুলে দিল। এ সব জিনিস বাড়িতে মেগ তৈরী করে, বড়-মেম বললেন। আগে নাকি সে প্যারিসে কেকের দোকানে কাজ করত। বাটলারও কিছু নেটিভ নয়, খাঁটি পর্তুগীজ বংশ, বড়লাটের বাড়িতে কিছু দিন কাজ করেছিল। এ-সব শুনে মায়া তো হাঁ।

রোদ পড়ে যায় তাড়াতাড়ি, কাজেই চা সেরেই বেরিয়ে পড়তে হল। কোথায় যাবে বলে দিতে হল না। মায়ার পা দুখানি আপনা থেকেই সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে সেই বড় চেনা পথটি ধরল। জনি সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চলল। 'একটা কুকুর বাচ্চা থাকলে বেশ হত না মামি?' 'নেই বুঝি তোমার?' 'না ম্যাডাম দেবে না। বলে জন্তু জানোয়ার বড্ডো নোংরা।'

মাথার ওপর দিয়ে তীরের ফলার আকারে বুনো হাঁসের পাল দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের দিকে দেখিয়ে জনি জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা নোংরা?'

কিন্তু মায়ার মুখে কথা নেই। মেয়েদের বোর্ডিং-এর পিছনে কে জানে কবে ধস নেমেছিল। মিসেস অ্যাবটের ছোট বাড়ির এবং তার গায়ে লাগা আরেকটি আরো ছোট বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। পুরনো ধস, জনির সে-বিষয়ে জানবার কথা নয়। ধড়াস্ করে উঠেছিল বুকটা, তারপরেই মনে হল এই ভালো, যা গেছে তা একেবারে যাকগে। সেই ছোট ছেলেটার স্মৃতিও যেন মনের মধ্যে কেমন কোমল হয়ে এল। বোর্ডিং-এ থাকতে চায় নি সে, জোর করে মায়া তাকে রেখে এসেছিল, নইলে মায়া সারা দিন কাজে ব্যস্ত, কে তাকে আগলাবে। শেষ মুহূর্তে ছুটে এসেছিল মায়া। তাকে জড়িয়ে ধরতেই

সে বলেছিল, 'তুমি এসেছ, মা? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? যাক সব বাঁধন, পায়ের বেড়ি খসে পড়ুক।'

জনি ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'ফাদারের আপেল বাগানে গেলে ওরা আপেল দেয়।'

'কেন বাড়িতে তুমি আপেল খাও না?'

'খাই মামি, কিন্তু এগুলো গাছে হয়।'

মায়া অবাক হয়ে চেয়ে দেখে পাহাড়ের মাথা থেকে নীচের উপত্যকা পর্যন্ত ধাপে ধাপে ফলের গাছ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আগে এ-সব কিছু ছিল না, শুধু সরু সরু বাঁশের ঝাড় ঝোপঝাপ পাথর। আশ্চর্য মানুষ ফাদার চাণ্ডদ্রি, দেশ কোথায় কেউ জানে না, নাকি আসলে ডাক্তার। পাহাড়ে পাহাড়ে ওষুধ দিয়ে বেড়ায়। মায়ার মাকেও কত ওষুধ দিয়েছে আর সে-ই কিনা এক পাল বেকার ছোকরার সাহায্যে ন্যাড়া পাহাড়ে এত ফল ফলিয়েছে। থাকেও না সব সময়, তিন মাস রইল তো চার মাস ট্যুরে।

মা বলত নাকি বাঙালী, কলকাতায় ডাক্তারী করত, কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে ঘরবাড়ি ছাড়া। মনে হল এই তো বেশ আছে, সংসার করলে এর চাইতে ভালো কি করতে পারত? সংসারে বিশ্বাস নেই মায়ার। ঐ তো মিসেস অ্যাবট কেমন উদয়াস্ত কাজ করতেন মেশিনের মতো, চালাতেন দুটো বোর্ডিং। মার কথাই যদি সত্যি হয়—তখন বিশ্বাস হত না, এখন মনে হল সত্যি হতেও পারে—তবে মাসির সংসার ভাঙ্গার ফল তো ভাল হয়েছিল, নইলে চুঁচড়োয় সেই গোঁড়া হিন্দু বাড়িতে রান্নাঘর আর আঁতুরঘরেই না ওর জীবন কাটত! মা নিজেও কম কষ্ট পায় নি! বাবা মলে নাকি লাঞ্ছনা সইতে না পেরে দিদিকে লুকিয়ে চিঠি লিখেছিল। অমনি মিসেস অ্যাবট নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়া করে মাকে নিয়ে এসেছিলেন। মায়াকে কোলে নিয়ে এক কাপড়ে মা এসে এখানে উঠেছিল। আর কারো দয়া চাইতে হয় নি।

একবার শীতের ছুটিতে মিসেস অ্যাবটের সঙ্গে ওরা কোন্নগরে পাদ্রীদের আশ্রমে গিয়েছিল। মা একদিন সরু একটা গলিতে মস্ত এক বাড়ি দেখিয়ে বলেছিল ঐ নাকি মায়ার ঠাকুরদার বাড়ি, ঐখানে বাবা চোখ বুজেছিল। বাবা মরাতে মনে হয় জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছিল মা, শাপে বর হয়েছিল। কাজ চালাবার মতো ভাঙা ভাঙা ইংরেজি শিখেছিল মা। মায়ার সঙ্গে সর্বদা বাংলাতেই কথা বলত, মায়াকে বাংলা লিখতে-পড়তে শিখিয়েছিল। কিন্তু মিসেস অ্যাবটের মুখে ইংরিজি ছাড়া কিছু শোনা যেত না—গোপনে মার সঙ্গে হয়তো বাংলা বলতেন—কিন্তু গাউন পরতেন, ফরসা রং রুক্ষ লালচে

চুল, বড়দিনের পার্টিতে সকলের সঙ্গে খ্রীষ্টমাস ট্রির চারদিকে বড়দিনের গান গেয়ে নাচতেন।

জনি খানিকটা ছুটোছুটি করে ফিরে এসে বলল, 'ডেড ম্যানদের এখানে পোতা হয়।' হাঁটতে হাঁটতে ওরা গীর্জার কাছে পৌঁছে গেছিল। গির্জার পাশে সমাধিক্ষেত্র, সেখানকার গাছপালার কত যত্ন, সারি সারি কবরের মাঝখানে নুড়ি বিছানো সরু পথ। আর সমাধিক্ষেত্রের দেয়ালে বাইরের পোড়ো জমিতে এক জায়গায় ঝরনার জলের মতো উইস্টিরিয়া লতা ডাল-পালা ছড়িয়ে আছে। এত শীতেও তাতে চীনে লণ্ঠনের মতো থোপা থোপা বেগুনি ফুল ঝুলে আছে। নিজের হাতে পোতা লতাগাছের বাহার দেখে মায়ার গলা টনটন করে উঠল। যাদের দেখাশুনোর কেউ থাকে না তারা কিসের জোরে এত সুন্দর হয়?

জনি বলল, 'রাতে কবর খুলে ওরা উঠে দুষ্টু ছেলেদের খোঁজে জান মামি।'

মায়া ওর হাত ধরে বলল, 'মোটেই খোঁজে না, সব বাজে কথা।'

রাতে খাবার পর মিসেস গঞ্জালেজ মায়ার প্রথম দিনের কাজের কথা শুনে মহা খুশী। তার পরের বছর হার্মিয়োনি জন্মেছিল! ভারি সুন্দরী দুই মেয়ে আমার। নোট বইতে লিখে নাও যার যেখানে জমি মাপা থাকে সে সেইখানে মাটি নেয়। কর্ণিলিয়া আছে ক্যালিফোর্ণিয়ায়, হার্মিয়োনি আছে প্যারিসে। কেন থাকবে ইয়োরোপের লোকেরা এদেশে? হার্মিয়োনির মেয়ে গায়েন্ডালিনও প্যারিসে বিউটি পার্লার খুলেছে, শুনি নাকি মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে। শুধু বিউটি পার্লার করে কি না কে জানে, যা চালাক মেয়ে। একটু থেমে বললেন, 'সব লিখে নিচ্ছ তো? ঐ গোয়েন হল জনির মা। আর জনির বাবা একজন নেটিভ, কুচকুচে কালো। নাকি বৈজ্ঞানিক, ইন্ডিয়ান বৈজ্ঞানিক শুনলে আমার হাসি পায়! আগে ওসব লোককে আমরা 'বাবু' বলতাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। তবে খুব ভালো হিসাব কষতে পারত। এখন শুনি সিমলার ঐ রাজবাড়িতেও নাকি নেটিভদের আড্ডা। কি বাড়ি কি বাগান! দূরে রূপোর সুতোর মতো কি একটা নদী দেখা যায়। এতদিনে দিয়েছে বোধ হয় সব নষ্ট করে—যা বলছি সব লিখে নাও মায়া—একজন দেশ-প্রেমিক পর্তুগীজ মেয়ের মনের কথা।'

বুড়ির চোখে ঘুম ছিল না। তাঁর কথা শুনে শুনে মায়া স্তম্ভিত, কোনো দিনও তিনি বোধ হয় এই মাটির পৃথিবীতে বাস করেননি। কিন্তু তাঁর অনর্গল বুকনির মধ্যে যে কথা শুনতে মায়ার এখানে আগমন তার এতটুকু

হদিশ পাওয়া যায়নি। দশটার সময় যেই মিসেস গঞ্জালেজ হঠাৎ কথা বন্ধ করে সদ্য ঘুম থেকে জাগার মতো করে অপরূপ দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকালেন, অমনি দরজার ছায়ার পিছন থেকে নিঃশব্দ চরণে তাঁর চির-সঙ্গিনী মেগ এসে কনুইয়ের নিচে হাত রাখল। হয়তো মাইনেভুক্তদের হাত ধরা তিনি পছন্দ করেন না। মেগের দিকে চেয়ে হঠাৎ মায়ার মনে হল ঐখানে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতেও পারে।

যাবার আগে ঘরের বড় তেলের বাতি নিঁভিয়ে দিল মেগ। টর্চের সাহায্যে যে যার শোবার ঘরে গেল। ফল-বাগানের কর্তৃপক্ষ নিজেদের জন্য বিজলি তৈরি করে বাড়তি বিদ্যুৎ স্কুলবাড়ি লালকুঠি আর কাছাকাছি গোটা চারেক চা-বাগানে দিয়ে থাকে। রাত নটায় ওদের মেসিন বন্ধ হয়। তখন টর্চ আর তেলের বাতি। এসব হালের ব্যবস্থা। আগে সবাই তেলের বাতিই জ্বালাত কিম্বা মোটা মোটা মোমবাতি। গির্জায় একসঙ্গে মানুষের সমান উঁচু দশটা মোমবাতি জ্বলত।

রাত দশটায় এখানে মাঝরাত। ঘরে এসে জানলার মোটা লাল কম্বলের পর্দা সরিয়ে মায়া দেখল পাহাড়ের ঢাল ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু চা-বাগানে মিটমিট করে দু-তিনটে আলো জ্বলছে। কোথায় একটা শীত লাগা কুকুর ডাকছে। পাশের ঘরে লেপ গায়ে দিয়ে মস্ত বড় জোড়া খাটে একলা ছোট্ট জনি ঘুমিয়ে কাদা। দু ঘরের মাঝে দরজার পাশে লাল ঘেরাটোপ দেওয়া ছোট্ট একটা রাতের বাতি জ্বলছে। মায়ার বুকটা হু-হু করে উঠল।

শুয়ে শুয়ে মনে পড়ল ঐ স্কুল দুটি বড় ভালো। কেমন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয় মানুষকে তাই শিখিয়ে দেয়। মেয়েদের যেই পনেরো বছর বয়স হয় সবাইকে একটা না একটা ব্যবসা শেখানো হয়। যার যেমন পছন্দ। হেয়ার ড্রেসিং, বিউটি কালচার, দরজির কাজ, ক্যানটিনের কাজ, লন্ড্রির কাজ, স্টেনোগ্রাফি আর টাইপ করা, যাদের পড়াশুনোয় মন তারা এখান থেকে পাস করে অন্য জায়গায় কলেজে পড়তে যায়। একা দাঁড়াবার পাঠ দিয়ে দেয় এরা। আর মেয়েগুলোর মন খালি কেমন সাজবে কে দেখবে কাকে বিয়ে করবে সেই দিকে। আছেই বা কে পাহাড়ের এই ছোট্ট শহরে? এক ঐ ছেলেদের স্কুলের কচি কচি দাড়ি-গজানো বড় ছেলেগুলো। সাহসী মেয়েরা তাদেরই লম্বা লম্বা প্রেমপত্র লিখে হাত পাকাত। বোর্ডিং-এর আয়ারা চিঠি চালাচালি করত, সামান্য কিছু হয়তো হাতে পেত আর অনেকখানি রস।

ঝড়ের মুখে কুটোর মতো সেই সব মেয়ে কোথায় উড়ে পড়েছে কে জানে। তাদের একজনের সঙ্গেও মায়ার যোগাযোগ নেই। কারো সঙ্গে তার

স্নেহের বন্ধন গড়ে ওঠেনি। মা? মার সারাক্ষণ শরীর খারাপ, খালি খিটখিট করত। মিসেস অ্যাবট বড় দয়ালু ছিলেন কিন্তু মায়ার সঙ্গে কথাই বলতেন না। মা মারা গেলে ওকে বোর্ডিং-এ ফ্রিতে ভরতি হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও মায়া জানে না। ঐ মেগের নিশ্চয় স্কুলের টিচারদের বাড়িতে যাওয়া-আসা আছে নইলে কার সঙ্গে মেশে ও? ও জানতে পারে? হাই তুলে ভাবে মায়া, ভালোবাসা? ভালোবাসা কাকে বলে? ভালোবাসা আবার কি? শুধু একটা মনের অবস্থা, খালি একটা জ্বরের মতো, সেরে গেলে তার কিছুই থাকে না। কিছুই থাকে না কি? একটা ছোট রোগা ছেলেও না যে নাকি ছয় বছরও বাঁচে না। ঘুমের ঘোরে টের পায় মায়া কে একটা ছোট ছেলে খচমচ করে ওর খাটে উঠে লেপের নিচে সেঁদিয়ে রোগা রোগা দুই হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে—অমনি কোথায় একটা ফাঁকা ভরে যায়। মায়া ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙাতেই মায়া চেয়ে দেখে পাশের ঘরে জনি নিজেই কাপড়-চোপড় পরে তৈরী হচ্ছে। ওকে দেখেই একগাল হেসে বলে, 'আমি স্কুলে যাচ্ছি, মামি, তুমি কিন্তু চলে যেও না।' মায়া মাথা নেড়ে বলে, 'না যাব না। কখন ফিরবে?' 'তিনটের সময়।' 'কার সঙ্গে যাচ্ছ?'

'ডি সুজা রোজ আমাকে ব্রেকফাস্ট দেয়; স্কুলে পৌঁছে দেয়। কিন্তু বলে নাকি বুড়ো হয়েছে তাই ওর পা ব্যথা করে।'

আরো পরে সাঁইলা এসে স্নানের জল দিয়ে যায়। বাটলার নিজে ওর ব্রেকফাস্ট এনে দেয়। বলে, 'হ্যাঁ, জনিকে স্কুলের গেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছে। অথচ জনি একলাই পাড়া চষে বেড়ায়। ওর মামিকে খোঁজে। আজ আর যায়নি। মিস সাবকেই মামি ঠাউরেছে। মামির মুখ ভুলে গেছে।'

মায়া জিজ্ঞাসা করল, 'ওর বাবা নেই?'

বাটলার একটু ঘাবড়ে যায়, 'না মানে আমি তো কখনো দেখিনি। এখানে তিন বছর আছি, এর মধ্যে কখনো আসেনি। হয়তো মরে গেছে। সার্ভেন্টদের বেশি না জানাই ভালো।' এই বলে যেন ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু বলতে পারত নেহাৎ সার্ভেন্ট বলে বলতে পাচ্ছে না এমন একটা মুখ করে মায়ার ট্রে নিয়ে বাটলার চলে গেল। মায়া তার রিপোর্ট লিখতে বসল।

পরে মিসেস গঞ্জালেজের সঙ্গে সকালের সেশন শেষ করে ঐ রিপোর্ট নিয়ে স্থানীয় ছোট্ট ডাকঘরে গিয়েছিল। ঐ তার প্রথম ভুল। এখানকার ডাকঘরের কর্মীরা এখানকার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। চিঠি ওজন করে টিকিট দিতে দিতে ওর দিকে চেয়ে কালো উঁচু দাঁত মেম বলল, 'তোমাকে না

কোথায় দেখেছি?' মায়ার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। হেসে বলল 'কোথায়? আমি তো কাল ক্যালকাটা থেকে এসেছি।' মেম ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কি জানি, খুব চেনা মনে হচ্ছিল। আমারি ভুল হবে।' কোনো মতে কাজ সেরে মায়া ফিরে এল। খামের ওপর ঠিকানা দেখে মেম কি ভাববে? কি আবার ভাববে, বললেই হবে আমার ফ্রেন্ড ঐখানে কাজ করে। এদের তো সবার দুটো-একটা ফ্রেন্ড থাকে। কিন্তু যদি জানাজানি হয়ে যায়, যদি বড়-মেম ওকে ছুটি দিয়ে দেয়, তাহলে জনির কি হবে? অবাক হয়ে যায় মায়া, এক গঙ্গা দুঃখ পার হয়ে এসেও কিনা বুকের মধ্যে ছোট পাখি কাঁদে। কিন্তু জনির জন্য ভাবলে চলবে কেন, এখানকার কাজ তো বড় জোর দুমাসের। ততদিনে তদন্ত নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে, মায়ার এখানে থাকবার কোনো কারণ থাকবে না। ভাবে মায়া তাহলে ওর মা-বাবার খোঁজ নিতে হয়, নিদেন ওকে কোনো ভালো বোর্ডিং-এ রাখতে হয়, মিসেস গঞ্জালেজের কাছে কথাটা পাড়তে হবে। বলতে হবে ও ছেলে ভালো করে মানুষ না হলে গঞ্জালেজ নামের অসম্মান হবে না?

অনেক বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ফেলল মায়া। ছোট মেয়ে জন্মাবার এক বছর পরে ডাইরিতে লেখা—'বাবার মতো সিলভেস্টারও চলে গেল। যাক, গঞ্জালেজদের কোনো অবলম্বন দরকার হয় না। টাকাকড়ি তো আর নিয়ে যায় নি।' ব্যস ঐ পর্যন্ত, এরপর আর কোথাও সিলভেস্টারের উল্লেখ নেই। মায়া শিউরে উঠল, সাধে কি ওকে ব্ল্যাক উইডো বলত লোকে। কিন্তু অমন সুন্দরী ধনী স্ত্রীকে ছেড়ে গেলই বা কেন সে?'

সতেরো বছর আগেকার কথা মনে করবার চেষ্টা করল মায়া। স্কুলের মেয়েরা বলত নাকি স্ত্রীর মেজাজ সইতে না পেরে দেদার টাকাকড়ি হিরেমতি নিয়ে একেবারে সাউথ অ্যামেরিকা চলে গেছে সিলভেস্টার। সেখানে নাকি তার মস্ত ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার কারবার। তার নাকি সোনার সংসার সুন্দর ছেলেমেয়ে!

মিসেস গঞ্জালেজের মেয়েরা ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখেছিল। ডাইরিতে তাদের কথা আর কিছু নেই। মায়া পাশে টিক দিয়ে রাখল, রাতে তাদের বিষয় জানতে হবে। ভাবতে লাগল মানুষ কেন ডাইরি রাখে? সুখের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য? সুখের কথা কি মনে করিয়ে দেবার দরকার থাকে? নাকি দুঃখের কথা? মিসেস গঞ্জালেজের ডাইরি সুখদুঃখবর্জিত ঐশ্বর্যের ইতিহাস। কিন্তু আসল রহস্যটিই বাদ পড়ে গেছে, ঐ ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়। মেয়েদের প্রত্যেক জন্মদিনে হিরের গয়নার হিসাব আছে। দশ আর এগারো

বছর বয়স হলে পর বিলেতের বোর্ডিং-এর খরচের হিসাব আছে। ছুটিতে মনে হল এদেশে আসত। তারপর দশ বছরের হিসাব বাদ দিয়ে একেবারে গোয়েনের কথা।

অবাক হয়ে ভাবে মায়া, কি চায় মেয়েরা সংসারের কাছ থেকে? সুখী হতে চায়? কি করে সুখী হতে হয়? ছোটবেলায় মনে পড়ে পম্পা পদ্মারা নিজেদের বেকার মাতাল স্বামীদের গালি দিত, বলত, 'এখন খুব সুখে আছি। স্কুল থেকে ঘর পাচ্ছি, রসদ পাচ্ছি, কেমন কাপড় কিনছি, গয়না গড়াচ্ছি।'

মিসেস অ্যাবটের বাড়ির মৌসমী ফুলের বাগানে জল দিতে দিতে মায়া জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নিজেদের বাড়ি নেই তোমাদের? ছেলেপিলে নেই?' *'এইতো আমাদের বাড়ি, আবার বাড়ির কি দরকার? কেমন সারাতে হয় না, ট্যাকসো দিতে হয় না। আর ছেলেপুলে মানেই শুধু ঝামেলা। আমার গুলোকে বোধ হয় ওদের ঠাকুমা দেখে। পম্পার তো হলই না কিছু।'* তবু সুখী ছিল না ওরা; সুপুরুষ স্বজাতি দেখলেই কান খাড়া করত। পম্পা মাদুলী নিয়েছিল, লামাদের কাছ থেকে হাত দেখাত।

মিসেস অ্যাবটই কি খুব সুখী ছিলেন? মা মারা গেলে পর তবে মায়ার সঙ্গে গল্প করতেন ছুটির দিনে ডেকে পাঠিয়ে, লম্বা শীতের ছুটিতে। সন্ধে হতেই খাওয়া-দাওয়া চুকে যেত, তারপর তাঁর ছোট বসবার ঘরের গনগনে আগুনের সামনে বসে উল বুনতেন। মায়াও তাঁর হাতে পড়ে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। 'জওয়ান'দের জন্য খাঁকি উলের সোয়েটার, টুপি, কম্ফর্টার। বলতেন সারাক্ষণ খাটবে মায়া, তাহলে আর আক্ষেপ করার সময় থাকবে না। দেখ, না থাকাই মানে সুখ! শুধু নিজের জন্য কাজ করে কি কেউ সুখী হয়? অন্য লোকের জন্যও করতে হয়। তারা যত অচেনা ততই ভালো। তাহলে তাদের কাছ থেকে কেউ কিছু প্রতিদান আশা করে না। কিছু আশা না করলেই কেউ দুঃখও পায় না।

কাঁটা চালাতে চালাতে আড়চোখে মুখ দেখত মায়া। মোটা-সোটা ফরসা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আধা-বয়সী মহিলা; সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে পায়ের কব্জি দুটো ফোলা-ফোলা; লোমের জুতো খুলে আগুনের দিকে পা মেলে দিয়ে বকে যেতেন মিসেস অ্যাবট। মায়া শুধু হাঁ হুঁ করে যেত, হয়তো দুটো একটা প্রশ্ন করত। এই নাকি তার নিজের মাসি। যাকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা রক্ষা করতে পারেনি। পরে পুলিশে উদ্ধার করে এনে দিলে নেয়নি ওরা। নিজের মা বাপও নেয়নি। তাহলে নাকি ছোট বোনের বিয়ে হত না। ছোট বোন মানে মায়ার মা।

উদাস নয়নে হিমালয়ের দিকে চেয়ে মায়া ভাবে—তা না হয় বিয়ে নাই হত। তাতে কিই বা কার এসে যেত। কতই বা সুখ পেয়েছিল বিয়ে করে মা। বাবা নাকি কাজকর্ম করত না মদ খেত। হ্যাঁ অবিশ্যি তা হলে মায়াও জন্মাত না। তাতেই বা কার কি এসে যেত? মায়া না জন্মালে কার কি ক্ষতি হত? এই তো মাসি, এও কখনো বলে না, 'মায়া আমি তোর মাসি, আয় কাছে এসে বোস।' ওঁর নাকি দুটো ছেলেমেয়ে ছিল। মুখের ওপর ওরা দোর বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই শুনে বুড়ো পাদ্রী ওঁকে নিয়ে গিয়ে মিশনে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মা বলত, 'সেই যে গাউন পরল ইংরিজি বুলি শিখল আর কখনো ছাড়ল না। কেনই বা ছাড়বে। এখানে কেমন সুখে সম্মানে আছে। আমাদের কেমন সুখে রেখেছে। বলে সব নাকি যিশুর দয়া। তা হতেও পারে। ঠাকুর দেবতারা কি করেছে ওর জন্য!'

যিশু সুখে রেখেছে? সুখ আবার কি? দুঃখ দেবার লোক না থাকাই কি সুখ? মায়া যিশুকে মানে না।

মেগ এসে বলে, 'ম্যাডামের শরীর ভালো নেই, মিস পল এবেলা উঠবেন না। আপনার লাঞ্চ ডি-সুজা ট্রেতে করে এখানে দিয়ে যাবে।'

মায়া উদ্বিগ্ন হয়, 'কি হয়েছে মিসেস গঞ্জালেজের?' মেগ করুণ হেসে বলল, 'কি আর হবে? বৃদ্ধ, বয়স হয়েছে। ওঁর আশির ওপরে বয়স হয়েছে; শীতকালে ওঁর মেডিটারেনিয়ানে যাওয়া অভ্যাস ছিল, এখন আর এক্সচেঞ্জও পাবেন না, টাকাকড়ি কমে এসেছে যদিও সে কথা মানবেন না—'

মায়া বলল, 'বসো না পাঁচ মিনিট, মনে হচ্ছে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।' সহানুভূতির কথা শুনে মেগ গলে যায়। 'সারা রাত ঘুমোইনি, কখন ম্যাডাম কি চেয়ে বসেন। অথচ ওঁর দুই মেয়ে দুই জামাই নাতনি সবাই আছে। বড়দিনে পাঠাবে সব কার্ড, দেখবেন। এসে একবার মুখ দেখে যাবে না। নাকি সবাই বড়লোক। জনির মা কার্ডও পাঠায় না। রূপসি বলে ভারি গর্ব। বুড়ি চোখ বুজলে ছেলের কি হবে ভাবেও না।'

মায়া বাধা দিয়ে বলল, 'ওর বাবা নেই?' 'আছে বৈকি। নাকি তার বেশ নাম-ডাক। কালো রং বেঙ্গালী হিন্দু, কি আর বলব যার যেমন পছন্দ। ইংল্যান্ডে দেখা অমনি ভালোবাসা অমনি বিয়ে। এক বছর বাদে জনি জন্মাল। তারপর কি হল জানি না। এসব আমার সময়ের আগে। কিন্তু তিন বছরের জনিকে নিয়ে এখানে মা-টি এল, এক বছর রইল, তারপর বলা নেই কওয়া নেই ছেলে ফেলে একেবারে কিনা প্যারিস! এ আমার নিজের চোখে দেখা। যেটুকু পারি ওর যত্ন করি; সময়ই পাই না, ভারি দুষ্টু হয়ে উঠছে। ভয় দেখিয়ে কাজ করাই।'

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ওর বাবার কাছে ওকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।' মেগ হাসল 'এখান থেকে নড়বে নাকি! বলে ওর মামি এখানে ফিরে এসে নাকি ওকে নিয়ে যাবে। আর বাপের তো নামও জানি না। ম্যাডাম জানলেও জানতে পারেন তাই বলে হিন্দু বাপের কাছে গঞ্জালেজদের বংশধরকে কি আর যেতে দেবেন? সবচেয়ে মজা হল মায়ের মুখ ভুলে গেছে, আপনাকেই ওর মামি ঠাউরেছে।'

মেগ চলে গেলে মায়া ভাবে আর কি উপায় হতে পারে? বড়-মেম আর কদিনই বা বাঁচবেন? ছেলেটাকে তার বাপ নিয়ে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। গঞ্জালেজদের বংশধর না আরো কিছু। আর মিসেস গঞ্জালেজও কিছু জনির সত্যিকারের অভিভাবক নন।

একা একা ট্রেতে সাজানো সুন্দর বাসনে মায়া লাঞ্চ খেল। একবার গিয়ে সামনের লনে দাঁড়াল, বরফের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখল। ভাবল এখানকার লোকেরা কি সংসারী হবে? এখানে কি ঘটি-বাটি খাট পালঙ্কের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে? মার ছোট্ট বাড়িটি তকতকে পরিষ্কার ছিল কিন্তু দরকারী জিনিস ছাড়া একটি বাড়তি জিনিস ছিল না। মাঝে মাঝে মায়া রান্নাঘর থেকে আনা চাটনির বোতলে জল ভরে তাতে লম্বা এক ছড়া বুনো গোলাপ ডাল-পাতা সুদ্ধ সাজিয়ে জানলার ওপর বসিয়ে রাখত। মনে হত সমস্ত বাড়িটাকে বুঝি কে সাজিয়েছে।

মা গেলে মায়া পড়াশুনো নিয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দু-বছরের মধ্যে একসঙ্গে স্কুল ফাইনাল আর সেক্রেটারিয়েল পরীক্ষা পাশ করে ফেলেছিল। মাঝে মাঝে মার খুদে বাড়িটার পাশ দিয়ে ঘুরে আসত মায়া। মিসেস জেকব্‌স বলে একজন হাসিখুশী দক্ষিণি খৃশ্চান মহিলা থাকতেন। তিনি ফুলে ফুলে বাড়িটাকে ভরে রেখেছিলেন।

নিজের নোটবই বের করে মায়া তারিখ মিলিয়ে ডাইরি আর হিসেব খাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে লিখে যেতে লাগল। মনে হল এ যার জীবনী তার নিজের তো কোনো সন্ধানই নেই ঐসব কাগজপত্রে। ঘটনা দিয়ে কি জীবনী হয় নাকি? আচ্ছা, কতদিন লাগবে এই অদ্ভুত জীবনী শেষ করতে? তদন্ত শেষ হলেই হয়তো সেখান থেকে বলবে, তোমার আর ওখানে থাকার দরকার নেই। ই-ই-ই-ক্! মায়া আঁৎকে উঠল।

দুটো ছোট ছোট কর্কশ হাত মায়ার চোখ টিপে ধরেছিল। হেসেই কুটোপাটি জনি। 'বল তুমি ভয় পেয়েছ মামি? ই-ই-ক করে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলে না?' মায়া তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, 'সত্যিই তাই যাচ্ছিলাম। বেজায় চমকে দিয়েছিলে।'

জনি বলল, 'আমি সবাইকে বলেছি আমার মামি ফিরে এসেছে। আমার জন্য প্রেজেন্ট নিয়ে এসেছে। কাল বই দুটো নিয়ে যেতাম কিন্তু বাড়ির জিনিস স্কুলে নিলে মিস্‌রা রাগ করে। নিয়ে নেয়, ফিরিয়ে দিতে চায় না।'

'খিদে পায়নি জনি?' জনি ওর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'পেয়েছে। কিন্তু এখন যে বাটলার ম্যাডামের চা দেয়। আমি পরে খাই।'

কিসের একটা ঢেউ মায়ার অন্তরকে প্লাবিত করল। ঢোক গিলে বলল, 'ইস, তাই বুঝি? চল তো দেখি আমার সঙ্গে, দেখি তুমি পরে খাও না এখনি খাও। তার আগে বরং হাত মুখ ধুয়ে এসো।'

জনি হাত-মুখ ধুতে গেলে মায়া কাগজপত্র তুলে রেখে ডি-সুজার কাছ থেকে জনির জন্য প্লেট বোঝাই কেক স্যান্ডউইচ এনে নিজের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। জনিকে ঘাড় থেকে নামাতে পেরে এরা সবাই খুব খুশী। ডি-সুজা নাকি আগে চৌরঙ্গীর কোন বড় হোটেলে কেক পুডিং করত। ম্যাডাম ডাকতেই চলে এসেছিল। নাকি পর্তুগীজদের পরস্পরকে ঠেকা দিতে হয়।

বিকেলের মিষ্টি রোদটুকু পাবার জন্য মিসেস গঞ্জালেজ তাঁর নিজের ছোট বাগানটিতে লোমের কম্বল দিয়ে পা ঢেকে বেতের গোল চেয়ারে বসেছিলেন। এখানে হিমালয়ের কনকনে বাতাস এসে পৌঁছয় না; বাড়ির দক্ষিণ কোণে আড়াল করা, ভারি আরামের জায়গাটি।

মায়া এসে পাশে বসতেই বললেন, 'সমস্ত জীবনটাই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে মায়া, চোখ নেই তবু সব স্পষ্ট দেখতে পাই।' মায়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'এবেলা একটু ভালো লাগছে তো?' 'আমার আবার ভালো লাগালাগি কি মায়া? যখন যা বলি তাই হয়। কেউ বাধা দেয় না। বাধা দেবার কেউ নেই। সবাই যে যেখানে পারে সরে পড়েছে, খুদে জনি ছাড়া। আমাকে দুঃখ দেবার কেউ নেই মায়া, ভালো লাগবে না তো কি?'

তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কাউকে ভালোবেসো না, বুঝলে। যতদিন আমার ভালবাসার মানুষ ছিল কেবলি দুঃখ পেয়েছি। এখন তারা সব খসে পড়েছে, আপদ গেছে। আসল দুঃখ কোথায় জান? আমাকে হিংসা করবার কেউ নেই, আমাকে 'হেট' করবার কেউ নেই। আজ আমি গজমতি পরেছি লক্ষ্য করেছ? একদিন আমার খানা-কামরার ত্রিশটা চেয়ারের পনেরোটাতে বসে পনেরোজন মেয়ে আমার হিরে মুক্তোর দিকে চেয়ে পারলে আমাকে দগ্ধ করে ফেলতো। সেই ছিল আমার সবচেয়ে সুখের সময়। জনি কিছু বলে না আমার বিষয়ে?'

'কই না তো।' 'মেগ বলেছিল তোমাকে নাকি ওর মা বলে ঠাউরেছে। তা তুমি কি আমাদের গোয়েনের মতো রূপসি? ওর মা লিখেছে দু-দুজন বেজায় বড়লোক ওর পিছন পিছন ঘোরে।' মায়া হঠাৎ সাহস করে বলে ফেলল, 'জনির বাবার কাছে ওকে দিয়ে দিলেই তো সবচাইতে ভালো হয়। তিনিই যখন ওর গার্জিয়ান।' বড়-মেম চটে গেলেন, 'কি যে বল! একজন ব্ল্যাক হিন্দুর কাছে জনি মানুষ হবে, সে ভাবা যায় না। তুমি কি করে কথাটা তুললে তাই ভেবে পাচ্ছি না। মেগকে ডাক আমার শীত করছে।'

বড়-মেম নিজের ঘরে চলে গেলে, মায়া গরম জামা গায়ে দিয়ে জনিকে সংগ্রহ করে বেড়াতে বেরুল। 'জনি, হিল্-স্টোর বলে একটা দোকান আছে নাকি?' শুনে জনি মহা খুশী। 'আছে মামি, যাবে সেখানে? এই বড় বড় কাচের গুলি পাওয়া যায়। তার ভিতরে রংচঙে সুতোর মতো কি।'

মনে পড়ল সেই গুলি একটা মস্ত বোয়মে সাজানো থাকত। কিছুই বদলায়নি তা হলে। খালি নিজে ছাড়া। তখন যেন এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচত। পরীক্ষা পাস করে একটা জলপানি পেয়েছিল মায়া। কলকাতায় মিশনের হেপাজতে সেক্রেটারীর কাজের আরো ডিপ্লোমা নিয়েছিল। নিজে পড়ে বি-এ পাস করেছিল। তারপর এক বড় কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিল। একবারও এখানে ফিরে আসেনি। মিসেস অ্যাবট ছুটিতে কোন্নগরে গেছিলেন। ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই শেষ দেখা। মায়া মিশন ছেড়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিল, শাড়ি পরা ধরেছিল, কপালে কুমকুমের টিপ দিয়েছিল। মাসি রেগে চতুর্ভুজ! 'বল কে তোমাকে কুপথে নিয়ে যাচ্ছে, মায়া? এতে তোমার সর্বনাশ হবে। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। আমি—আমি—' এই প্রথম মিসেস অ্যাবটকে কাঁদতে দেখেছিল মায়া। তবু তার মুখ দিয়ে একবর্ণ বাংলা বেরোয়নি। আজ পর্যন্ত মাঝে মাঝে মায়ার সন্দেহ হয় ঐ কি তার সত্যিকার মাসি, তাই কখনো হয়? মনটা ব্যথায় ভরে গেছিল। মুখে তবু চাবি দিয়ে রেখেছিল। রবির কথা বলতে পারেনি। রবি তার সহকর্মী, তার ভালোবাসার মানুষ। তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

রবিকে বিয়েও করেছিল মায়া, এক বছর ঘরও করেছিল। ওর বাড়ির লোকেরা মিশনের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। রাহুল জন্মাবার আগে সেই যে রবি লক্ষ্ণৌ গেল মা-বাবার কাছে, আর ফিরল না। বিলেতে কি চাকরি নিয়ে চলে গেল। রাহুলকে মায়া একলা মানুষ করতে লাগল। একলা? না, একলা তো নয়। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটে পার্শী ভদ্রমহিলা বুড়ি মিসেস বোমানজি সারাদিন রাহুলকে রাখতেন, মায়া চাকরি করত। সেই মিসেস

বোমানজি চোখ বুজলে পর রাহুলকে পাঁচ বছর বয়সে মায়া বোর্ডিং-এ দিয়েছিল। যাবার সময় রাহুল কেঁদেছিল, যেতে চায়নি। সেই কান্নার ঋণ এতদিন মায়ার মনে জমেছিল।

জনি বলল, 'মামি, তুমি কথা বলছ না কেন? কাঁদছ নাকি?' মায়া চোখ মুছে বলল 'কাঁদব কেন? চোখে হাওয়া লাগছে।' রবি যাবার পর আর কাকেও ভালোবাসেনি মায়া। কাজে কেবলি উন্নতি করেছে। ক্রমে নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব হয়েছিল। কাজে-কর্মে, বলতে হবে আনন্দেই বছরের পর বছর কেটে গেছে। যে কাকেও ভালোবাসে না তার আবার কিসের ভয়? খালি ঐ দুনিয়ার যেখানে যত ছোট ছেলে দুঃখ পায়, কষ্ট পায় তারা মায়াকে রাতে ঘুমোতে দেয় না, কেবলি ঘুমের ওষুধ খেতে হয়।

এ-রকম দোকান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সবুজ সদর দরজার ওপরে গোলাপলতা উঠেছে। দরজা খুললেই ভিতরে টুংটাং করে ঘন্টা বাজত। অমনি ভিতরের ঘর থেকে মুখ মুছতে মুছতে মিসেস অ্যাবটের বন্ধু মিস ফিলোমিনা হাসিমুখে বেরিয়ে আসতেন। হিসেব কষতে পারতেন না, যা তা বিল লিখতেন। খদ্দেররা সবাই তাঁকে জানত, বিল্ শুধরে টাকা শোধ করত। তিনি কি আর আছেন?

জনি ছুটে গিয়ে বেল টিপতেই সেই চেনা টুংটাং সুর কানে বেজে উঠল। ভিতরের ঘরে কে যেন চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল। পরদা সরিয়ে মিস ফিলোমিনা হাসিমুখে ঘরে এলেন। মায়ার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। লোকে কত কি বলত, নাকি রোমান ক্যাথলিক নান ছিলেন—নানের জীবন সইতে না পেরে পালিয়ে গেছিলেন। কোন্নগরে পাদ্রীদের কাছে গিয়ে প্রটেস্ট্যান্ট হয়েছিলেন। সেই ইস্তক মিসেস অ্যাবটের সঙ্গে ভাব। জনি কাচের গুলির বোয়মের কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। যার আব্দার শুনবার লোক নেই সে কার কাছে আব্দার করবে? মায়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে ওকে এক ডজন গুলি, এক ঠোঙ্গা লজেঞ্চুস টফি কিনে দিল। জনির চোখ ছলছল করে উঠল, ফিকে একটু হাসল।

মিস ফিলোমিনার চোখ দুটি চড়াইপাখির চোখের মতো চকচকে। গোলগাল বেঁটে মানুষটি বিল লিখতে দুটো ভুল করলেন। মায়া শুধরে নিয়ে টাকা দিতে গেলেই, খপ করে ওর হাতখানি ধরে বললেন, 'তোমাকে আমি নিশ্চয়ই চিনি।' মায়ার মুখ লাল হয়ে উঠল। কত লজেঞ্চুস খেয়েছে মিস ফিলোমিনার দয়ায়। 'ওটা গোয়েনের ছেলে না?'

জনি এগিয়ে এসে মায়ার হাত ধরে বলল, 'হ্যাঁ। আমার মামি ফিরে এসেছে। আমার জন্য প্রেজেন্ট আনতে গেছিল।' মিস ফিলোমিনা একটু

হকচকিয়ে গেলেও, এককালে যারা ব্যর্থতার সমুদ্র লঙ্ঘন করে শুকনো ডাঙায় এসে উঠতে পারে, তারা কতকগুলো নতুন শক্তি পায়। জনির চুল নেড়ে দিয়ে বললেন, 'মিসেস অ্যাবটকে না দেখেই চলে যাবে নাকি?'

জনির হাত ধরে যন্ত্রচালিতের মতো মায়া মিস ফিলোমিনার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে ভিতরের ঘরে গেল। সেখানে জানলার কাছে ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে যিনি শুয়ে ছিলেন তাঁকে মায়া খুব চেনে। তিনি মাথা ঘুরিয়ে মায়ার দিকে ফিরে স্পষ্ট বাংলায় বললেন। 'মায়া, আয় কাছে আয়, ভগবান আমার সব গর্ব খর্ব করে দিয়েছেন, আমি উঠতে পারি না।' মিস ফিলোমিনাও বোধহয় বাংলা বোঝেন, ইংরিজিতে বললেন, 'ল্যান্ডস্লাইডের সময় স্পাইন জখম হয়ে গেছিল। সরকার পেনশন দেয়।'

মায়া আস্তে আস্তে তাঁর পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ফিরবার সময় সমস্ত পথ মায়া জনির সঙ্গে গল্প করেছিল। মনের কোন সূক্ষ্ম বোধ ওকে বলে দিয়েছিল জনির অবচেতনায় একটা অস্বস্তি, একটা নিদারুণ আশঙ্কা জমেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনে হাসতে হাসতে বাড়ি পৌঁছেছিল। মেগ নিচের ঘরে ছিল। বলল নাকি ফাদার চাওড্রি এসেছিলেন। সরকার থেকে ফল-বাগান নিয়ে নিচ্ছে, সে বিষয়ে কথা হয়েছে। ভালোই হবে ম্যাডাম কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। হিরে মুক্তো ঝাড়বাতি আর, আবলুস কাঠের আসবাব খেয়ে তো প্রাণ বাঁচে না। মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা তো ভুলেও কোনো খবর নেয় না। হিল-ব্যাঙ্ক থেকে কড়া চিঠি এসেছে অত খরচ করলে চলবে না। তহবিল প্রায় চাঁচাপোঁছা। ম্যাডাম চিঠিটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিলেন, মেগ তুলে রেখেছে। বাস্তবিক ম্যাডামের এবার একজন অভিভাবকের দরকার হয়ে পড়েছে, মিস্ পল আসাতে মেগের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে। গোয়াতে ওর ভাইবোনেরা থাকে, সেখানে ফিরে যেতে পারলে ও বাঁচে। কিন্তু জনির তো খাবার শোবার সময় হয়ে এল।

মায়া বলল, 'আমি দেখছি। তুমি বরং ম্যাডামের কাছে থাক। আছেন কেমন?' 'খুব ভালো। খুব খুশী। জমির টাকাগুলো এতক্ষণে বোধহয় মনে মনে খরচও করে ফেলেছেন। ফাদার চাওড্রি ওঁকে দেখে গেছেন। বেশি কথা বলতে বারণ করে গেছেন। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, চিকেন সুপের সঙ্গে খাইয়ে দিয়েছি, নইলে খাবেন নাকি কখনো! বলেন ঘুম তো জীবন থেকে সময় চুরি করে নেয়, কেন ঘুমোতে বল? ভারি বাঁচার শখ। এদিকে তিরাশি বছর বয়স, চোখে প্রায় কিছুই দেখেন না, বেঁচে থাকার কি দরকার তাও বুঝি না।'

ততক্ষণে জনির খাওয়া হয়ে গেছে, জনি নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছে। মায়া অবশ্য জানে যে মাঝরাতে কখন উঠে আসবে সে। মায়া শুধু বলল, 'জনির একটা ব্যবস্থা না হওয়া অবধি ওঁকে বাঁচতেই হবে।' মেগ বলল, 'ফাদার চাওড্রিকে ম্যাডাম কি যেন বলেছিলেন, পরে জনিকে ছেলেদের স্কুলের বোর্ডিং-এ দিয়ে দেওয়া হবে।' মায়া মুখ তুলে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'মিসেস গঞ্জালেজকে এতক্ষণ একা ফেলে রাখা আমাদের উচিত হচ্ছে না।' মেগ যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে বিদায় নিল।

মায়া ঘুমন্ত জনির খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বোর্ডিং-এ? যে ছেলে রোজ মাকে খোঁজে তাকে বোর্ডিং-এ? তাই কখনো হয়? উদ্ভ্রান্তের মতো ভাবতে লাগল কি করতে পারে। আসলে এ-সব তার কাজ নয়। কিন্তু— কিন্তু ফাদার চাওড্রি নিশ্চয় একটা উপায় করে দিতে পারবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কোট পরে, মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে ডি-সুজাকে বলল, 'আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে, আমার খাবার আমার ঘরের টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখো।' ডি-সুজা বলল, 'তা কেন মিস? আমার দশটা অবধি ডিউটি। বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে। আগে ম্যাডাম দশটার সময় ওভালটীন খেতেন।' হাসি পাচ্ছিল মায়ার। এ ক'দিন যাকে ভয়ে এড়িয়ে চলেছে, আজ কিনা নিজেই যেচে তার বাড়ি যাচ্ছে। বাড়ি অবিশ্যি ঠিক নয়। কারণ গির্জার পিছনে মিশনের ছোট আপিসের সঙ্গে লাগোয়া ঘরে ফাদার চাওড্রি বরাবর থাকতেন। এখনো তাই থাকেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। কেউ খালি হাতে কখনো ফিরত না তাঁর কাছ থেকে। যে যা চাইত তাকে তাই দিতেন। অন্যায় করলে বেজায় বকতেন, নাকি কঠিন সব সাজাও দিতেন। সতেরো বছরে কি মানুষের মন বদলায়? হয়তো অভ্যাস বদলায়, মায়ার যেমন বদলেছে। কিন্তু মন বদলায় কি? কই সেই যে কিশোরী মায়ার মন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াত, যা খুঁজছে তা পেত না কি খুঁজছে বুঝতে পারত না। এখনো তো এই চৌত্রিশ বছরের আধ-বুড়ো মায়া তেমনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ঐ তো ফাদার চাওড্রির ঘরে আলো জ্বলছে। পাশেই একটা নতুন লম্বা ঘর, সেখানে লোক আছে বোঝা গেল।

অর্কিড ঝোলানো বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনে ফাদার চাওড্রি নিজেই বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় ঝোলানো ছোট্ট আলোর নিচে দাঁড়ানো মায়াকে দেখে বললেন 'এসেছ তাহলে মায়া! ভাবছিলাম কবে আসবে।'

মায়া বলল, 'আমি—আমি—আপনি—।' ফাদার চাওড্রি বললেন, 'আর বলতে হবে না। আমি সব জানি। পাছে চিনে ফেলি, তাই আস নি তো?

সলোমন চেনা লোকের সামনে দেখা দিতে বারণ করেছিল, এই তো? ওর বোধহয় ভয়, আমি তোমাকে চিনতে পারলে ওর চোরা-কারবারি তদন্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে। ওর আর পদোন্নতি হবে না—সে যাক গে। আজ তোমাদের বাড়ি গেছিলাম জান তো? এখানে মস্ত অর্চার্ড হবে, তিনশো বেকার ছেলে খাটবে, ফ্রান্সিস্কোর পেনশন হবে, নতুন কমিটি বসবে, বিশেষজ্ঞরা এসেছেন কাগজপত্র দেখতে মাপ-জোক করতে—ভালো খবর না?'

মায়া আধা হেসে আধা কেঁদে বলল, 'খুব ভালো খবর।'

ফাদার চাওড্রি বললেন, 'কিছু ভাবনায় পড়েছ না? এসো আমার ঘরে।'

ঘরটি তেমনই আছে, কাঠের টেবিলে কয়েকটা বেতের চেয়ার, দেয়াল-ভরা বই, তালা বন্ধ লোহার আলমারি। সতেরোটা বছর যেন কিছুই নয়। মায়া কম্পিত পদে ফাদার চাওড্রির পাশে বসে একবার ঢোক গিলে তাঁকে গত সতেরো বছরের ইতিহাস বলে ফেলল। কিছু বাদ দিল না।

সব শুনে মৃদু হেসে চাওড্রি বললেন, 'এসবও কি তোমার তদন্তের মধ্যে পড়ে নাকি? বলেছে না সলোমন এখান থেকে নেপালে তিব্বতে যাওয়া ভারি সহজ, ছোট জায়গা কারো নজরে পড়ে না, একটা থানা পর্যন্ত নেই, এখান থেকে চোরা-চালানের যেমন সুবিধা তেমন আর কোথাও নেই। নিরীহ নাগরিক সেজে আইন ভঙ্গকারীরা নির্বিঘ্নে বছরের পর বছর ব্যবসা চালাচ্ছে—কেমন এ-সব বলেছে কিনা সে? স্বীকার কর যে আরো বলেছে যে ঐ গঞ্জালেজদের পূর্বপুরুষেরা বোম্বেটে ছিল, তাদের বংশধররা সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে, আর এইখানে সকলের দৃষ্টির আড়ালে ওদের পুরনো একটা ঘাঁটি।'

মায়া দু হাতে চোখ ঢেকে বলল, 'আপনি কি সবজান্তা? ....কিন্তু জনির কি হবে?' কেন জনির একটা ব্যবস্থা না হওয়া অবধি তুমি তাকে আগলাতে পারবে না? ছোটবেলা থেকে তো খুব মনের জোর দেখিয়েছ। মিসেস অ্যাবট....।' এই বলে ফাদার চাওড্রি থামলেন। উঠে পড়ে বললেন, 'এইসব হাত-বদলের ব্যাপার চুকলে ওষুধপত্র নিয়ে লম্বা ট্রেকে চলে যাব পাহাড়ের মধ্যে। ও হ্যাঁ, জনির কথা বলছিলে না? ম্যাডামের কোনো খেয়াল নেই, তাই তার বাবাকে খুঁজে আনতে হবে? দেখি কি করা যায়। কিন্তু ম্যাডামের যে একটি দেখাশুনার লোক দরকার সেটা লক্ষ্য করেছ? চল, তোমাকে পৌঁছে দিই।'

বাইরে বেরিয়ে ফাদার চাওড্রি বললেন, 'আমাদের নতুন অফিসটা দেখে যাও। বারো বছর ধরে বাগানটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে এসেছি, এখন যদি সত্যি দাঁড়ায়।'

মনে আছে ছোটবেলায় টিচাররা বলতেন, 'সতেরো বছরের বেশি বয়সের কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে বাপ-মায়ের ঘাড়ে বসে খায় না।' যারা কলেজে পড়তে যায় তাদের কথা আলাদা যারা খুব বড়লোক তাদের কথাও বাদ। কবে বিয়ে হবে বলে কেউ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে না। এ মেয়েরা কাজের মূল্য জানে। সবাই কাজ করে নিজের খরচ চালায়, তাতে কোনো লজ্জা নেই, বরং সম্মান আছে, বাস্তবিকই তাই।

ঐ দুটি স্কুলে কত রকমের কাজ শেখানো হত। ডিপ্লোমা নিয়ে কেউ বসে থাকত না। কত জায়গায় ওর, কত ভালো কাজ করেছে। মিসেস অ্যাবট কেবলি বলেছেন---"কাজ কর, কাজ কর, কাজের মতো কিছু নেই। নিরাশা ক্ষতি ব্যর্থতার সময় থাকে না সর্বদা কাজ করলে। দেখ না আমি কেমন কাজ করি। কোথাও এতটুকু ফাঁকা থাকলে অমনি সেটা কাজ দিয়ে ভরে দিই। এই ছত্রিশটা ঝাড়নে দেখ তো শুতে যাবার আগে ক্রস-স্টিচ দিয়ে স্কুলের নাম লিখে দিতে পার কিনা। —হ্যাঁ যা বলছিলাম অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সর্বদা কাজ করে। যিশুর তাই নির্দেশ। অবিশ্যি আমি লক্ষ্মীছাড়া বাউন্ডুলেদের কথা বলছি না—লাল সুতো নাও মায়া ডবল করে, তাহলে ছিঁড়বে না।"

'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান' শুনে মায়ার একটু হাসি পেয়েছিল। 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান' আবার কি, শতকরা নব্বুইজন তো মায়ার চেয়ে ঢের কালো। তবে এ-কথাও সত্যি যে গায়ের রং দিয়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হয় না। ও একটা মনের অবস্থা, একটা দৃষ্টিভঙ্গী। ওদের দেখাদেখি মায়াও সমস্তক্ষণ কাজ করত। কাজ করতে ভালো লাগত। ওদের গল্প শুনতে মজা লাগত। কি নিখুঁৎ সেলাই ধোলাইয়ের কাজ করত ওরা, কি খাসা কেক বিস্কুট তৈরি করত। স্বচ্ছন্দে দুই স্কুলের রুটির চাহিদা মেটাত। কি ফূর্তিতে কাজ করত। আর কেবলি বয়ফ্রেন্ডদের-গল্প আর সাজগোজের চিন্তা। অথচ কোথায় যে বয় ফ্রেন্ডদের সঙ্গে দেখা হত, একটুখানি লিপস্টিক কিনবার পয়সাই বা কোথায় জুটত ভেবে পেত না মায়া।

প্রতি মাসে দ্বিতীয় শনিবার ছুটি থাকত। সেদিন পালা করে দল বেঁধে দু-একজন টিচারের সঙ্গে কুড়িজন মেয়ে হেঁটে মোটর রোডে গিয়ে সারা দিনের মতো পাহাড়ের সদর শহরে কাটিয়ে আসত। বড় মেয়েরা সারা সপ্তাহের কাজের জন্য হাতখরচ পেত, তাই দিয়ে এটা ওটা কিনে আনত। ছোট মেয়েদের প্রতি মাসে দুটো টাকা হাত-খরচ দেওয়া হত, তাই দিয়ে যা হয় কিনত। ঐ দিনটি ছিল যেন একটা বিশেষ উৎসবের দিন। মায়া যখন মার কাছে ছিল, তখন সব পয়সা মার হাতে দিয়ে দিত। কি সামান্য মাইনে পেত মা, কি-ই বা কাজ জানত লেখা-পড়ার ধার ধারত না। মিসেস অ্যাবট

বলতেন, 'ঐ স্কুল ফাইন্যালটা দিয়ে, এখান থেকে টিচার্স ট্রেনিংটা নিয়ে নিলে আর তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না।

মার কোনো উৎসাহ ছিল না। তখন তিনি বলতেন, 'না হয় ক্লাশ এইটের বার্ষিক পরীক্ষাটা দাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাহলে জুনিয়র ট্রেনিংটা নিতে পারবে।' মা খালি বলত, 'আমার একটা ছেলে থাকলে এত কষ্ট সইতে হত না।' মিসেস অ্যাবট রেগে যেতেন, 'তাই না আরো কিছু, ছেলেটা বখে যেত।'

এ দেশী খৃশ্চানরা তখন গাউন পরলেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হয়ে যেত। তবে গোয়েন সত্যিই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল। ছেলেদের স্কুলে ক্লাশ টেনে একটা ছেলে ছিল, চমৎকার ক্রিকেট খেলত সে-ই নাকি গোয়েনের বয়-ফ্রেন্ড। পড়াশুনাতে ও খুব ভালো ছিল, গাউনিং এর ক্লাসে সোনার মেডেল পেয়েছিল। পরে পাস করে, স্কলারশিপ পেয়ে কোথায় যেন চলে গেল। মায়া আর তাকে দেখেনি। লম্বা কোঁকড়া চুল ছেলে, ভারি ভালো দেখতে, রংটাও বেশ কালো। কিন্তু কে-ই বা তেমন ফরসা ছিল। কত ছল করেই না গোয়েন তার সঙ্গে দেখা করত। এদিকে বাড়িতে গ্র্যান্ডমাদার তো জানতে পারলে আস্ত রাখবেন না। গোয়েনের তাই বড় ভয়, নাকি কলমের এক আঁচড়েই গোয়েনকে নিঃস্ব করে দিতে পারেন। বড় বড় চোখ করে বলত গোয়েন, 'ভালোবাসাই বল আর যাই বল, টাকার কাছে কিছু নয়। টাকা থাকলেই সব হয়। আমার গ্র্যান্ডমাদার এক রকম এখানকার এম্প্রেস, এ-কথা নিশ্চয় মানো? ঐ তো গির্জার অমন বিদ্বান ছোট পাদ্রীর ওপর চটে দিল তো তাকে বিদায় করে। কে কি করতে পারল? লোকাল লোকেরা কেউ ওর সঙ্গে মিশবার যোগ্য নয় বলে কেমন দিব্যি একলা থাকে! একটু ডাকলেই কেমন চল্লিশ মাইল দূর থেকে সব নেমন্তন্ন খেতে ছুটে আসে। দুঃখের বিষয় ঐ ছেলেটার টাকাকড়ি কিছু নেই। নাকি মা বাপ মরা দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করা ছেলে। কে জানে! কিন্তু মুখটা কি মিষ্টি বল দিকিনি। চেটে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।'

হাঁ করে মায়া ওর কথা শুনত। ভাবত সত্যি ঐ ছেলেটা বড় ভালো, সর্বদা ফার্স্ট হয়। গোয়েন তাকে গোলাপি খামে করে ছোট ছোট সুগন্ধী চিঠি পাঠাত। সে কোনো উত্তর দিত না। এ-সব তো মাত্র উনিশ বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে গোয়েন কোথা থেকে কোথায় ছিটকে পড়েছে, রেখে গেছে ঐ দুঃখী ছেলেটাকে আর মায়াও দুঃখের দুস্তর পারাবার পার হয়ে সেই ছেলেটার কাছে এসে পড়েছে।

ফাদার চাওড্রির কাছ থেকে ফিরে আসতেই গরম খাবার দিয়েছিল ডি-সুজা। ম্যাডাম নাকি শুধু স্যুপ আর পরে একটু পুরানো ব্র্যান্ডি চেয়ে খেয়েছিলেন। এ-সব ব্র্যান্ডি বাড়ির নিচেকার সেলারে ম্যাডামের বিয়ের সময় থেকে জমা আছে। কত বড় বড় লোকে তার সুখ্যাতি করে গেছে। চেখে দেখবেন মিস একটু? মায়া চেখে দেখেছিল; আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন কত বছরের কত পুরোনো সুখ গালিয়ে রুবির মতো গাঢ় লাল পানীয় তৈরী হয়েছে। আস্তে আস্তে মায়া মাথা নাড়ল। সুখের সঙ্গে তার কি?

মনে হল এই সুন্দর ছোট্ট শহরটা দুঃখীদের জায়গা। ঐ বড় বড় স্কুল দুটি দুঃখীদের জন্য তৈরি হয়েছিল। যাদের মা বাবা নেই, কিংবা থেকেও নেই তারাই ওখানে আসত। বাকিরা ছিল মুষ্টিমেয়। এখন বোধহয় সেটা পাল্টে গেছে। এখন স্কুল চালায় সরকার, তার কাছে সুখী-দুঃখী বলে কিছু নেই। এখানে একটাও সুখী পরিবার ছিল না। মা-বাবা ছেলেমেয়ে আর মাথার ওপর একটা ছাদ, দু-বেলা দুটি করে গরম খাবার, রাতে গা গরম করার লেপ—সুখী হতে আর কি চাই? তাও ছিল না এদের। খাওয়া-শোয়ার কষ্ট ছিল না, কিন্তু মাথার ওপর নিজেদের বলতে একটা ছাদ ছিল না। তাই খালি বলত ওরা কবে বড় হবে, কবে রোজগার করার ক্ষমতা হবে, কবে এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাব!

কিন্তু মায়ার সুখ ছিল। মা ছিল আর মিসেস অ্যাবট এক রকম বলতে গেলে মায়ার বাপের-ই মতো ছিলেন। মিসেস অ্যাবটের গাউন-পরা গোলগাল চেহারাটা মনে পড়তেই মায়ার হাসি পেল। যাকে মিস ফিলোমিনার বাড়িতে দেখে এল, সে কিন্তু অন্য মানুষ। ফাদার চাওড্রি মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসে বলতেন, 'সব এক। কাপড়-চোপড় ছাল-চামড়া দিয়ে শুধু তফাৎ। ভিতরে সব এক, এক রক্ত-মাংস হাড়, মন্ত্র-তন্ত্র তার আবার প্রায় সবটাই জল দিয়ে তৈরি, পোড়ালে এক মুঠো ছাই!'

স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস বুড়ি মিস্ মাইলস বলতেন, 'একজন খৃশ্চান পাদ্রীর ও আবার কেমন কথা!' ফাদার চাওড্রি কারও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে হাসতেন! 'খৃশ্চান-ই বা মন্দ কি, পোড়ালে সব এক। কে হিন্দু কে খৃশ্চান বোঝবার জো থাকে না। যুদ্ধের সময় দেখে এসেছি।'

নাকি ডাক্তারিতে খুব নাম-ডাক হচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সব ছেড়েছুড়ে এই সেবার কাজে লাগলেন, অথচ কিছু নাম লেখানো পাদ্রীও নন। কি করে চলে কে জানে। স্কুল দুটো থেকে নিশ্চয় একটা মাসোহারা দেওয়া হয়, খায়-দায়, শীতে গায়ে কম্বল দেয় তো মানুষটা। তিন-চার মাস

অন্তর দুটো কুলির মাথায় ওষুধের গাঁটরি আর দুঃস্থ গ্রামবাসীদের জন্য কিছু গরম জামা-টামা নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান। দিন পনেরো বাদে ফিরে এসে আবার কাজে লেগে যান। ওষুধ কেনার টাকা কে দেয়? চাঁদা তোলেন কি? হয়তো মিসেস গঞ্জালেজের মতো লোকেরা নিজেদের আত্মার সদগতির জন্য ঘৃণিত গরিব গ্রামবাসীদের ওষুধ আর গরম জামা কেনার টাকা দেন। কিন্তু আগে না হয় তারা দিত, এখন তো তারা সব অন্য দেশে চলে গেছে। এ-দেশের লোকেরা ও-সবে বিশ্বাস করে না। মায়া হঠাৎ সটাং হয়ে উঠে বসল, তবে কি— মিঃ সলোমনের কথাই ঠিক। বলেছিলেন 'এখানে এমন কেউ আছে যাকে সবাই বিশ্বাস করে, সম্ভবতঃ বহু বছরের বাসিন্দা, সে-ই এই চোরা চালানের পান্ডা। এছাড়া হতেই পারে না। স্রোতের মতো কোনো গোপনে সুড়ঙ্গ দিয়ে চোরাচালানি চলেছে। সেটা বন্ধ করতেই হবে। ওখানে আমার সব চেনা-জানা। অথচ এত বছর পরে দরকার হলে নিজের পরিচয় গোপনও করতে পারবে, যেমন এই যেখানে তোমার চাকরি ঠিক করা হয়েছে এই মিসেস গঞ্জালেজ ওল্ড পর্তুগীজ ফ্যামিলির মেয়ে, নেটিভদের ওপর হাড়ে চটা, চোখে ভালো দেখেন না, সাদা-কালো সব সমান, একটু চটপট ইংরিজি বললেই ভাবেন বুঝি পর্তুগীজদের বংশধর। এই যেমন আমি। উনিই যদি মক্ষিরানি হন আমরা একটুও আশ্চর্য হব না। ওঁর বাড়িতে বসে তদন্ত করবে।' এই বলে মিঃ সলোমনের কুচ্‌কুচে কালো মুখ হাসিতে ভরে গেছিল।

'দেখ, কতটা কি পার। এ-কেসটা বাগাতে পারলে তোমার খুব ভালো একটা উন্নতি হবে, মিসেস পাল। তোমার মতো বুদ্ধিমতী কর্মী মেয়ে-পুলিশে কেন পুরুষদের মধ্যেও একটাও আছে কিনা সন্দেহ।'

সব অলীক স্বপ্ন! বুদ্ধি? শুধু বুদ্ধি দিয়ে কি হয়? মায়ার বুদ্ধি এখন বলছে—এই তো পেয়েছে। এতে আর সন্দেহ কি! আরেকটু তদন্ত কর, বুড়ো এখনো তো এখানে আছে, ট্রেক-এ বেরুলে পেছনে গুপ্তচর লাগাও 'কোডে' একটা টেলিগ্রামের ওয়াস্তা!

এই তো চেয়েছিল মায়া। কাজ। কাজে উন্নতি। মন-টনের ধার ধারে না মায়া, তাই তো কাজে এত মনোযোগ, তাই তো মায়া বলে, কাজের মতো আছে কি, কাজের ওপরেই জীবনের প্রতিষ্ঠা।

জনি কখন এসে মায়ার খাটে শুয়েছে। মায়া তাকে জড়িয়ে ধরেছে, কিন্তু চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে। মায়ার বুকের মধ্যে কাজের তালে চাপা পড়া একটা অচেনা সত্তা বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছিল।

কি করে ঘুমোয় রাতে মায়া? মনে পড়ল, মা যখন বেঁচে ছিল ফাদার চাওড্রির একশো রকম ছোট ছোট দয়ার কথা স্নেহের কথা বলত মা। ওঁকে খুব একটা পছন্দ করত না, বলত নাকি, নিজে খৃশ্চান হয়ে সবাইকে খৃশ্চান করতে চায়। কিন্তু খৃশ্চান হবার কথা কোনো দিনও মুখে বলেন নি ফাদার চাওড্রি। যদি দুঃখীর দুঃখ দূর করা, বঞ্চিতের অভাব মেটানো, রুগ্নের সেবা করা খৃশ্চানি হয়ে থাকে তাহলে তার চাইতে ভালো আর কিছু নেই। তবু মায়া এ-সবে বিশ্বাস করত না। কিবা হিন্দু, কিবা খৃশ্চান, সব সমান। নিচের মানুষটার নাগাল পাওয়া বড় শক্ত।

মা মারা গেলে মিসেস অ্যাবট কাঁদতে বসেছিলেন। তখন ফাদার চাওড্রি মায়াকে নিয়ে মিসই মাইলসের জিম্মা করে দিয়েছিলেন। তখনো এটা একটা মিশনারি প্রতিষ্ঠান ছিল, অবিশ্যি বিলেত থেকে সামান্য টাকাই আসত। ফাদার চাওড্রিরা আপ্রাণ কষ্ট করে চাঁদা তুলতেন। সরকার নিয়ে নিলে সকলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কত স্কুল কত হাসপাতাল মিশনারিরা করেছিলেন, কত ভালো কাজ হয়েছিল সেখানে। এখন আস্তে আস্তে তার মেজাজ বদলে যাচ্ছে। তবু ভালো কাজ হল ভালো কাজ। ফাদার চাওড্রি দুঃখীদের বাপ।

কিন্তু—কিন্তু কি করে উনি মিঃ সলোমনের কথা জানলেন? অফিসে নিশ্চয় তবে ওঁর চর আছে। কে হতে পারে?—হাই তুলে হঠাৎ মায়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে আবার এত দ্বিধার কি আছে?

পরদিন সকালে এতটুকু সময় পেল না মায়া। জনিদের স্কুলে খেলা-ধুলোর পুরস্কার বিতরণ। জনি 'মঙ্কি ট্রিকস'-এ প্রথম পুরস্কার পাবে। তার মামি না গেলে কেমন করে হয়।

চলে গেছিল মায়া মিসেস্ গঞ্জালেজের অনুমতি ছাড়াই। তাঁকে পেল কোথায় যে অনুমতি নেবে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেম সেজেই গেছিল, কেউ অবাক হয় নি। দেখল গত সতেরো বছরে স্কুলটার কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেই 'বয়েজ হোম' 'গার্লস হোম' সাইনবোর্ড দুটি নেই। তার জায়গায় লেখা 'হিল স্কুল বয়েজ' 'হিল স্কুল গার্লস' আর আজকের বিশেষ দিনটিতে ছাদের ওপর উঁচু দণ্ডে ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে ভারতের তে-রঙা পতাকা উড়ছে। বাইরের খোলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান। বড় শীত।

দর্শক বলতে বাইরের কেউ নয়—ছোট জায়গায় বাইরের কেই বা আসবে—শুধু দুই স্কুলের ছেলেমেয়েরা, কিছু অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা আর ফাদার চাওড্রির দল। তাতেই আসর জমে উঠেছে। চেয়ে দেখলে মায়া একটিও চেনা মুখ দেখতে পায় কিনা। কাউকে পেল না। মেয়েদের স্কুলের কয়েকজন

শাড়ি-পরা মহিলা দেখে বুঝতে পারল কাল কত পালটে গেছে। ফরসা মুখ খুঁজতে হয়।

একটা গান কিছু ব্যায়াম খেলাধূলা কিছু বক্তৃতা—যিনি সভাপতি তিনি নিশ্চয় রাজনৈতিক কোনো নেতা, অতিরিক্ত সাজগোজ করা যিনি পুরস্কার বিতরণ করবেন তিনি ওঁর স্ত্রীই হবেন। একধারে হাসিমুখে ফাদার চৌধুরী তাঁর সঙ্গে ছয়-সাতজন বিশিষ্ট অতিথি। সকলেরই রঙ কালো। ফলবাগানে পরীক্ষাগার খোলার ব্যাপারে এসেছেন, পন্ডিত, বিশেষজ্ঞ সব। তাদের মধ্যে একজনকে কেমন একটু চেনা-চেনা মনে হল। নইলে সব নিয়ে এই শ'তিনেক মানুষের ভিড়ে ফাদার চাওড্রি, মিস ফিলোমিনা আর জনি ছাড়া কাকেও মায়া চিনতে পারল না।

জনি আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। মেগ কোথা থেকে গাঢ় নীল কোট, পুলোভার আর লম্বা পেন্টেলুন বের করে দিয়েছে। লাল-নীল ডোরা-কাটা টাই বেঁধেছে জন, জুতোয় পালিশ পড়েছে। শেষের দিকে ছোট মানুষটি যখন বাও করে, এই এত বড় দো-রঙা ফুটবল পুরস্কার গ্রহণ করল, মায়ার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মনে হল ফাদার চাওড্রির দলও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জনিকে দেখছে। আর সে কি হাততালি। ভোরের ফিকে রোদের মতো ক্ষীণ একটু হাসি জনির ঠোঁটে ফুটে উঠে, ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত মুখখানিকে উদ্‌ভাসিত করে তুলল। আনন্দের চোটে বলটাকে বুকে চেপে, লাইন ভেঙে 'মামি! মামি!' বলে ডেকে মায়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বহু অচেনা মুখ ঘাড় ফিরিয়ে মায়াকে দেখবার চেষ্টা করল।

সভা ভেঙে গেলে ফাদার চাওড্রি এগিয়ে এসে জনিকে অভিনন্দন জানালেন। এ যেন এক নতুন জনি। কারো পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল না।

সুন্দর দিন করেছিল; পাহাড়ের মাথায় লাল ছাদের বাড়িটি রোদে ঝলমল করছিল। গঞ্জালেজ উঠে সামনের লনে আরাম-কেদারায় বসেছেন দেখে মায়া কত নিশ্চিন্ত হল; ফাদার চাওড্রি যে জনির একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন সে-বিষয়ে মায়ার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহলেও ম্যাডামের সেরে ওঠা চাই।

এই প্রথম ম্যাডাম জনিকে ডেকে তার বলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলেন। মায়া ভাবল, ম্যাডাম সাফল্য ভালোবাসেন। ম্যাডাম জনিকে বললেন, 'আরো কাছে এসো।' বলে ওর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে যেন চেহারাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। মায়াকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার চেয়ে ফরসা নাকি?' মায়া হেসে বলল, 'ঢের ফরসা।' 'আমার চেয়ে?' মায়া চাটুকারের মতো

বলল, 'ইংল্যান্ডের রানিও আপনার চাইতে ফরসা নয়।' কথাটা কিন্তু সত্যি। ম্যাডামের হাত কাঁপতে লাগল। আনাড়ির মতো গলা থেকে মুক্তোর মালা খুলে জনির হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রীর জন্য রেখে দিও।'

জনি বলে বসল, 'আমার মামিকে দেব।' বলে মায়ার হাতে গুঁজে দিল। মায়া ভয়ে কাঠ। মিসেস গঞ্জালেজ বললেন, 'আবার মা পেয়েছ বুঝি? তোমার কপাল ভালো। আমার মাকে হারাবার পর, আমাকে ভালোবাসার আর লোক পাইনি।—মায়া আজ তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। দোতলা ছেড়ে দিয়ে নিচের পূবের বড় গেস্টরুমে থাকতে পারবে তো? জনি সঙ্গে থাকলে আশা করি কষ্ট হবে না? ব্যাঙ্ক থেকে মিঃ গডফ্রে কি ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন মেগের কাছে শুনো। আমি বড় ক্লান্ত, সব কথা বলতে পারছি না, তবে আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই।'

কুশনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন বড়-মেম। মায়া উঠে পড়ল, 'আমিও ভিতরে যাই, লাঞ্চের আগে যতটা পারি কাজ এগিয়ে রাখি।'

জনি মহাখুশী। মামির সঙ্গে বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ঘরে থাকতে পাবে শুনে সে আহলাদে আটখানা। কতবার যে ওপর-নিচ করল তার ঠিক নেই। গোলাপি দেয়াল, ঘি-রঙের ব্রোকেডের পরদা, বড় সুন্দর পূবমুখী ঘরখানি। বন্ধ ঘরের স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব দূর করবার জন্য চিমনিতে আপেল কাঠের আগুন জ্বালা হয়েছে। ডি-সুজা বলল, এর জন্য আপেল কাঠই সবচেয়ে ভালো মিস, ভারি সুগন্ধী। গদী-তোষক সব রোদে দিয়েছি। এ-ঘরে ছোট লাটসাহেবকে আর তাঁর স্ত্রীকে আমি থাকতে দেখেছি। এই বিছানার চাদর. বালিশের ওয়াড় বের করে দিয়েছিলাম। এগুলো ইংল্যান্ডে তৈরি, হরক্সের জিনিস। সেখানেও আর এমন হয় না। গলার আওয়াজটা বড় করুণ শোনায়।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মায়া বলল, 'সবই বদলে যায় ডি-সুজা, নইলে প্রোগ্রেস হবে কি করে?' জনি ঘরে ঢুকে বলল, 'সর, সর! মামি এই নতুন বই দুটোর জায়গা হবে তো?' মায়া হাসল, 'সব জিনিসের জায়গা হবে, জনি, কত বড় ঘর দেখেছ?' মেগও হাত লাগাবার জন্য ঘরে এল। 'মুক্তোগুলো খুব মূল্যবান, তুলে রাখলেই ভালো হয়, মিস।' জনি বলল, 'না, আমার মামি পরবে। আমি দিয়েছি।'

পরে মেগ বলল, 'ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ গডফ্রে এসেছিলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন। পয়সা-কড়ির কথা বলছিলেন। সরকার থেকে দোতলাটা ভাড়া নেবে, অর্চাডের নতুন ডিরেকটর মিঃ রয় থাকবেন। সব যেমন আছে তেমন থাকবে, খালি খুচরা জিনিস সব সরাতে বলে গেছেন। ভারি ভারি আসবাব

ছাড়া নেই-ও তো কোনো খুচরা জিনিস। আমরা নিচের তলাতেই বেশ আরামে থাকতে পারব। ম্যাডামের অর্থচিন্তা ঘুচবে।'

মায়া ভাবল, এ-ও নিশ্চয় ফাদার চাওড্রির কাজ। মনে হল খুঁজে দেখলে দেখা যাবে এখানকার অধিকাংশ ভালো কাজের মূলেই বুড়ো ফাদার চাওড্রি। মা বলত চাওড্রি আবার একটা পদবী হল নাকি? নিশ্চয় চৌধুরী। বাঙ্গালীর ছেলে খৃশ্চান পাদ্রী হয়ে ফাদার চাওড্রি বনে গেছে। হাসব, না কাঁদব!

দুপুরে মিঃ সলোমনকে একটা লম্বা এবং সম্ভবতঃ অপ্রত্যাশিত চিঠি লিখেছিল মায়া। বিকেলে জনিকে নিয়ে মিসেস অ্যাবটকে দেখতে গেছিল। সব কথা তাঁকে বলেছিল। জনি তার নতুন বল নিয়ে পাশের বাড়ির সহপাঠীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। ফিরে এসে বলল, 'মামি, সব বাঁশগাছে ফুল ফুটেছে দেখে এলাম।'

মিস ফিলোমিনা একটা ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে জনির হাত মুছিয়ে একটুকরো ঘরে তৈরি কেক গুঁজে দিয়ে বলল, 'তার মানে সবগুলো মরে যাবে। বাঁচা যাবে। বাঁশঝাড়ে সাপের বাসা হয়, পাশ দিয়ে যেতে ভয় করে। মায়া, তুমি জানতে বাঁশগাছে পঁচিশ-ত্রিশ বছর, কি তারো বেশি দিন বাদে ফুল হয়, আর ফুল হলেই গাছ মরে যায়?' মায়া কথাটা শুনেছিল বটে, মনে ছিল না।

নতুন ভাড়াটেকে মিসেস গঞ্জালেজ সমারোহ করে অভ্যর্থনা করেছিলেন। নিচের বড় বসবার ঘরের ঐশ্বর্যের মাঝখানে বসিয়ে ডি-সুজার হাতে তৈরি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী খাইয়েছিলেন।

লোকটি মায়ার অচেনা নয়। মায়ার মনে পড়ে গেল এ-ই গোয়েনের সেই পুরনো বয় ফ্রেন্ড। নাম নাকি ডঃ রয়। ভারতসরকার থেকে পাঠিয়েছে গবেষণাগারটাকে চালু করে দেবার জন্য। তাহলে অন্ততঃ বছর পাঁচেক থাকতে হবে। এক-একটা ছোট আপেল গাছ বড় করে না তুলে যাবেনই বা কি করে?

রাতে জনি মায়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ড্যাডি কি একলা উপরে শোবে?' শুনে মায়ার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল। এই তবে উত্তর। এই জন্য অত নামকরা বিশেষজ্ঞ এখানে এসেছেন। ধাঁধার টুকরোগুলো পর পর ঠিক জায়গায় পড়ে কেমন সুন্দর এক ছবি হয়ে গেল। এঁরই সঙ্গে বিলেতে গোয়েনের দেখা হয়েছিল, এঁকেই গোয়েন বিয়ে করেছিল, এঁকেই ত্যাগ করেছিল---গোয়েনের মতো মেয়েরা বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কেমন করে সুখী হতে পারে? জনির জন্যেই নিশ্চয় এখানে আসা। ব্যস, তাহলেই তো মায়ার যা কাম্য তাই হয়ে গেল।

সকালে জনিকে নিয়ে মায়া ওপরে গিয়েছিল। সে দৃশ্যের কথা ভাবা যায় না। বিকৃত স্বরে 'ড্যাডি' বলে চেঁচিয়ে জনি ডঃ রয়ের গা বেয়ে উঠে

পড়েছিল। তাঁর ঘন কালো চোখ জলে ভরে এসেছিল। মায়াকে বলেছিলেন, তুমি জানতে মায়া? তুমি মায়া না; তোমাকে চিনতে পারছি, গোয়েনের সঙ্গে তোমার ভাব ছিল। এখন একে নিয়ে কি করি বল তো?, জনি, তোমার ড্যাডিকে এখনো মনে আছে?'

অনাথ ছেলেমেয়েদের গল্প এটা, এর শেষটাতে সুখ থাকতেই হবে। সুখ সুখ করে যারা দুনিয়া হাতড়ে মরে, তারা সুখ কোথায় পাবে? আর যারা ছোটবেলা থেকে বঞ্চিত হয়, সুখের এতটুকু স্ফুলিঙ্গ পেলে বুকে করে রক্ষা করতে চায়, তাঁরা জানে সুখ বলে কিছু নেই, নিজের মনের ভিতর থেকে সুখ এনে হৃদয়হীন পৃথিবীতে ঢালতে হয়।

পরদিন ডঃ রয় মিসেস গঞ্জালেজের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'জনি আমার ছেলে, আমার কাছে কাগজপত্র আছে। আমি ওর ভার নিতে চাই। আপনি যা করেছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার গায়ের রং কালো, আমি অনাথ, এই হিল-স্কুলে লেখা-পড়া শিখেছিলাম।'

মিসেস গঞ্জালেজ বলেছিলেন, 'আমি সব জানি। ফাদার চাওড্রিকে আমি বলেছিলাম তোমাকে খুঁজে এনে দিতে। এখানে থাকো। আমার সময় হয়ে এসেছে। একা মরতে চাই না। ভাবতাম আমার অসীম শক্তি। দেখছি আমি দুর্বল! মরবার সময় নিজের লোকের কাছে মরতে ইচ্ছা করে।'

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েও ছিল। এই ঘটনার এক মাস পরে, বাগানে বসে সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মিসেস গঞ্জালেজ স্বর্গে গেছিলেন। যদি স্বর্গ বলে আলাদা কোনো জায়গা থাকে।

তারও পরে একটা সুখের দিনে মায়ার সঙ্গে ডঃ রায়ের বিয়ে হয়েছিল। এমনি করে জনি তার মা-বাবা ফিরে পেয়েছিল। মিসেস অ্যাবটের শেষ জীবনটা মায়ার কাছে কেটেছিল। গল্পের শেষে সবাই সুখী হয়েছিল, খালি মিঃ সলোমন চটে কাঁই। তাঁর সবচাইতে ভালো 'পুলিশ উওম্যান' কিনা তদন্ত করতে গিয়ে চাকরি ছেড়ে বিয়ে করে বসল! যদিও তাকে মিছিমিছি পাঠানো হয়েছিল, ওখানে কোনো সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আর ফাদার চাওড্রি? তিনি এ-সবের কথা জেনেছিলেন অনেক দিন পরে, সব চুকেবুকে গেলে পর। ততদিনে গবেষণার কাজ পুরোদমে চলেছিল।

মেগ মোটা পারিশ্রমিক নিয়ে গোয়া চলে গেছিল। ডি-সুজার আসল বাড়ি নাকি এই পাহাড়ে, সে আরো দশ বছর কাজ করবার শক্তি ধরে। সাঁইলাকে বই বাঁধাই কাজ শিখতে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল। বড়-মেম উইল করে জনিকে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী করে গেছিলেন। বাঁশ গাছ সব সত্যি মরে গেছিল।

সত্যাসত্য

প্রতিভা বসু

কোন এক ছুটিতে ছোট বোনের কাছে বেড়াতে এসেছিল নন্দিতা, আজ ফিরে যাচ্ছে। অবশ্য একেবারে নির্জলা ছুটি কাটাতেই যে এসেছিল তা নয়, কোথাও বেড়ানো-টেড়ানোর অভ্যেস তার বরাবরই কম ছিল, বছর কয়েক যাবৎ তো একেবারেই নেই। বরং কিছুকাল নিজেকে এত বেশি ঘরকুনো করে রেখেছিল যে মা বাবা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এ অভ্যেস দূর করাতে। নিজেরাই শেষে বেরিয়ে পড়তেন মেয়েকে নিয়ে।

বন্দনা লিখেছিল তার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, টুকুনের কষ্ট হচ্ছে খুব। দিদি যদি এই ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য আসতে পারে অত্যন্ত উপকার হয়। বোনের সেই চিঠি পেয়ে এই বেড়ানো। বোন ভগ্নীপতির চেয়ে তাদের পাঁচবছরের পুত্র টুকুনই নন্দিতার আসল আকর্ষণ। সেই টুকুনের যেখানে মায়ের অসুস্থতার জন্য অসুবিধে হচ্ছে সেখানে আর নন্দিতা বসে থাকে কেমন করে?

আজ চলে যাচ্ছে। ভগ্নীপতি তুলে দিতে এসেছে স্টেশনে। টুকুনও এসেছে। টুকুনের মা আসেনি, তার কোলের বাচ্চাটির বয়েস আট মাস। প্রায়ই দাঁত ওঠার কারণে পেটের অসুখে ভুগছে আজকাল, খুশিমত যখন তখন যেখানে সেখানে তাই যেতে পারে না বন্দনা। বলাই বাহুল্য, আজও সেই কারণেই সে আটকে পড়ে গিয়েছে।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেল, রঞ্জন বলল, 'উঠে পড় এবার।' নন্দিতা শেষবারের মত টুকুনকে চুমু খেয়ে চলে এল। খুব মন খারাপ লাগছিল, এই বাচ্চাটার প্রতি তার বিষম টান, বন্দনার চেয়েও বোধহয় বেশি। বলেও ছিল,'তুই তো আজকাল ফুটকুনকে নিয়েই ব্যস্ত থাকিস সারাক্ষণ, দে, আমি ওকে কলকাতা নিয়ে যাই।' বেশ ইচ্ছের সঙ্গেই চেয়েছিল। বন্দনা হেসে

হেসে বলেছিল,'নাও না, নিলে তো বেঁচে যাই। দিনকে দিন যা পাজী হচ্ছে না, অসম্ভব।' বন্দনারটা কথার কথা।

স্টেশনে তুলে দিতে আরো একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন রঞ্জনের সঙ্গে, তিনি ওখানকার ডাক্তার। ডক্টর এম. কে. মজুমদার, এফ. আর. সি. এস। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, মাথায় সামান্য টাক, চেহারা সম্ভ্রান্ত, হালচালে কেতাদুরস্ত।

নন্দিতা ট্রেনে উঠলে তিনি এসে খুব হাত ঝাঁকালেন, 'আশা করি আবার শিগগিরই দেখা হবে।'

নন্দিতা সহাস্যে বলল, 'কলকাতা এলে আসবেন আমাদের বাড়ি।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই— ' পা-দানি থেকে লাফিয়ে নামলেন তিনি, হুইসিল বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

রঞ্জন খুব রুমাল নাড়ছিল, ভদ্রলোকও নাড়ছিলেন, হঠাৎ টুকুন 'মাসি' বলে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। গাড়ি চলে গেল প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে।

আসলে বন্দনা এই ডাক্তার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যই পরামর্শ করে অসুখের ছুতো দিয়ে ডেকে এনেছিল নন্দিতাকে। বিবাহে অনিচ্ছুক দিদিকে বিবাহিত করার জন্য বন্দনা সবসময়েই ব্যস্ত। বিশেষত নিজের বিয়ের পরে আরও। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি, এবং ইনিও অবিবাহিত শুনেই সে চনমনিয়ে উঠেছে, তক্ষুনি রঞ্জনকে বলেছে, 'দ্যাখ, এঁর সঙ্গে দিদিকে কিন্তু বেশ মানায়।'

রঞ্জন বলেছে, 'মন্দ কী।'

'মন্দ কী মানে?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুর ফুটিয়ে জোর গলায় বন্দনা বলেছে, 'বল খুব ভাল।'

'কিন্তু তোমার দিদি কি রাজি হবে?'

'হওয়া উচিত।'

'উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তো উঠছে না, যে ঘটনাটা ঘটে গেছে জীবনে—'

'বাজে—' তৎক্ষণাৎ উড়িয়ে দিয়েছে বন্দনা—'মনে রাখবে বলেই মনে রেখেছে। কিন্তু প্রতিশোধটা কার উপরে নিচ্ছে শুনি? নিজেকে ছাড়া আর কাকে শাস্তি দিচ্ছে?'

'সেটা অবশ্য সত্য কথা, কিন্তু—'

'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।'

'তবে তোমার দিদির মনোবলের কিন্তু প্রশংসা করতেই হয়। এই জেদ আমার খুব ভাল লাগে, ওর কথা আমি বুঝি।'

'স্ত্রীর কথা ছাড়া আর সকলের কথাই তো তুমি খুব ভাল করে বোঝ।' মুখ ভার করেছে বন্দনা। তারপর গিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে।

কলকাতা থেকে দুর্গাপুর, দূর তো কিছু নয়। চলে এসেছে নন্দিতা। এবং আসার সঙ্গে সঙ্গেই; মানে ট্রেন থেকে নেমেই সুস্থ সবল ভগ্নীকে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে দেখেই বুঝতে পেরেছে অসুখের সংবাদটা ছলনা। তখুনি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে ফিরে যাবার ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে বসে থাকতে চেয়েছিল, বন্দনা এসে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছে।

এসে পৌঁছেছিল বিকেল বিকেল, সন্ধ্যা হতেই টের পেল শুধু শুধুই বন্দনা তার দিদিকে নিয়ে আসেনি এখানে. উদ্দেশ্য আরও গভীর। সেই রাত্তিরে ডাক্তার সাহেবটিকে ওরা ডিনারে আহ্বান জানিয়েছিল এবং তিনি সাতটা বাজতেই এসে হাজির হয়েছিলেন। এবং বন্দনা যে তার দিদির বিষয়ে অনেক আগে থেকেই এঁকে অবহিত করে রেখেছে, মিনিট মাত্র আলাপেই তা বুঝে নিতে তিলমাত্র অসুবিধে হয়নি।

তবে ভদ্রলোকটি সত্যিই পছন্দের যোগ্য। কথাবার্তা সুন্দর, চালচলন চমৎকার, অতিশয় শান্ত এবং ভদ্র। দ্বিতীয় দিনেই তিনি জানিয়ে দিলেন নন্দিতাকে যে তাঁর পছন্দ হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে, এটাও বললেন, 'আমার বয়েস আটতিরিশ, আমি মনে মনে কিছুদিন যাবৎ এই বিবাহ করা বিষয়ে সিরিয়াসলিই ভাবছিলাম, কাজেই আমার আপত্তি নেই, তবে বয়সের তফাত বোধহয় কিছু বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

তা হয়তো একটু যাচ্ছিল, নন্দিতা এই সবে তিরিশ পূর্ণ করল। আট বছরের ছোট কম ছোট নয় আজকালকার দিনে। তবে ভদ্রলোকটির স্বাস্থ্য এত সুন্দর যে সেটা কোন প্রশ্ন বলেই ভাবল না কেউ।

এই কেউর মধ্যে অবিশ্যি নন্দিতা পড়ে না, কেননা সে বরাবরই এত নির্লিপ্ত ছিল যে তার মনের কথা ধরা সম্ভবই ছিল না। রঞ্জন বন্দনাই সারাদিন বলাবলি করত, সে ধৈর্য ধরে শুনত।

নন্দিতাকে পছন্দ করা ভদ্রলোকের পক্ষে কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা গুণ যোগ্যতা চেহারা কোন দিক থেকেই কোন বিষয়ে, খাটো ছিল না সে। একটা স্পনসর্ড কলেজে পড়ায়, ভাল পড়ায় বলে তার সুনাম আছে সেখানে। ছাত্রীরা ভালবাসে, স্বভাবের দিক থেকে অত্যন্ত শান্ত, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, একটু লেখার হাতও আছে। দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও, উল্লেখযোগ্য রকমের লাবণ্যের অধিকারী নিশ্চয়ই।

দুই বোনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ঠিক তিন বছরের। বিবাহের আগে পর্যন্ত বন্দনা দিদির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, একনিষ্ঠা চ্যালা ছিল, এখন দিদির আগেই বিবাহ করে, ভার-ভারিক্কি হয়ে সমান তো বটেই, অনেক বিষয়ে সেই দিদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, অনেক ভালমন্দ পরামর্শ দেয়, অবশ্য সবই বিবাহের উপযোগিতা বিষয়ে। নন্দিতা হাসে। বোনের পাকা কথা শুনতে ভারি মজা লাগে তার।

অবশ্য বন্দনার নিজের বিয়েটা খুবই সফল হয়েছে। রঞ্জনের মত যোগ্য এবং ভাল ছেলে কমই দেখা যায়। পত্নী-প্রেমিকও বটে। ইঞ্জিনিয়র, খুব উঁচু পোস্টে আছে এখানে, গাড়ি বাড়ি বয় বেয়ারা সব নিয়ে বন্দনা পরিপূর্ণভাবে সুখী। বাবা তাকে দেখেশুনে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছেন। এই বিয়েতে তখন খুব আপত্তি করেছিল বন্দনা, নন্দিতাই তাকে বুঝিয়ে পটিয়ে রাজি করিয়েছে। নিজের নির্বাচনই যে অব্যর্থ হয় না তার প্রমাণ দূরে ছিল না, কাজেই সেটাও বোঝাতে পেরেছে।

বিয়ের পরে চলে যাবার সময় দিদিকে জড়িয়ে ধরে বন্দনা খুব কেঁদেছিল, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বলেছিল, 'দিদি, তুই আমাকে যত ভালবাসিস আমিও তোকে ততই ভালবাসি, কিন্তু আমি তোর মত ভাল না, আমার ভালবাসার মধ্যে কোন ত্যাগ নেই, তোকে আমি ভেঙে দিয়েছি, তুই আমাকে জুড়ে দিলি।

ভুরু কুঁচকে নন্দিতা বলেছিল, 'বোকামি করিস না তো।'

সম্বন্ধটা অবশ্য বাবা প্রথম নন্দিতার জন্যেই এনেছিলেন, অনুরোধ, উপরোধ, অনশন কিছুই বাকি রাখেননি মেয়েকে রাজি করাবার জন্যে। মা বাবা দুজনেই যৌথভাবে এটা করেছেন।

নন্দিতা অসহায়ভাবে মাথা নেড়েছে আর বলেছে, 'আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমার উপর রাগ করো না, নির্দয় হয়ো না, আমার মন এখনও প্রস্তুত নয়, আরো কিছুদিন সময় দাও।'

মা বলেছেন, 'এমন পাত্র কি সহজে পাব?'

'বন্দনা আছে।'

'তোর বিয়ে না দিয়ে বন্দনাকে কেমন করে বিয়ে দেব? তুই বড় বোন।'

'আমি যদি সারাজীবন বিয়ে না করি, তাহলে বন্দনাও কি সারাজীবন অবিবাহিত থাকবে?'

তারপর নিজেই উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ঘটনাটা ঘটিয়ে দিয়েছে। ঘটিয়ে বোনকেও সুখী করেছে, নিজেও সুখী হয়েছে। মা-বাবাও মাঝখানকার ব্যাপারটা ভুলতে পেরেছে অনেকখানি।

নন্দিতার বাবা নেহাতই একজন সাদাসিধে ভালমানুষ, এ. জি. বেঙ্গলে ভাল কাজ করেন, স্ত্রীও সুশিক্ষিত। এই দুটি মেয়েকে নিয়ে জীবনটা বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিল। নন্দিতা বন্দনা দুজনেই দেখতে ভাল। ছাত্রী ভাল, অসাধারণ না হলেও সাধারণও ঠিক বলা যায় না। নন্দিতার যেমন লেখার হাত আছে, বন্দনাও তেমনি ছবি আঁকে।

মেয়েদের নিয়ে মা বাবা মিলে চারটি মানুষের সংসার এত মসৃণভাবে চলছিল যে মাঝে মাঝে নিজেদের সুখে নিজেরাই অবাক হয়ে যেতেন।

যেহেতু এই বিশ্বসংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয় তাই একদিন এই সুখও মাটির বাসনের মত ভেঙে গেল। ঝড়টা সকলের উপরেই প্রথমে সমানভাবে বর্ষিত হয়েছিল, ধীরে-ধীরে যখন প্রলেপ পড়ল দেখা গেল নন্দিতাকে বড় বেশি জখম করে দিয়ে গেছে। একটা হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকোর মত নিস্তেজ নিরুত্তাপ হয়ে গেছে তার জীবন। যে ঠোঁটের বাঁকে স্বভাবতই একটি মিষ্টি হাসি অবিরত ফুটে থাকত, সেটি সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে যেত মা বাবার, বন্দনা বিব্রত অপ্রস্তুতভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত। দিদির জন্যে তার দুঃখও মা-বাবার চাইতে তিলমাত্র কম ছিল না।

এবং সেই কারণেই নিজের বিয়েতে অত আপত্তি ছিল প্রথম দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেটাই অনেকখানি শান্তি ফিরিয়ে এনেছে পরিবারে, আর টুকুন জন্মাবার পরে তো নিশ্চয়ই। দিন বসে থাকে না, দেখতে দেখতে সেই টুকুনের পাঁচ বছর বয়েস হয়ে গেল, ফুটকুন জন্মে গেল, বিয়ের সাত পূর্ণ হয়ে গেল, তবু সে এতদিনে নন্দিতাকে বিবাহিত করতে পারল না, এটা ভেবে বন্দনার প্রায়ই অত্যন্ত খারাপ লাগে। তবে কি দিদি চিরকালই এভাবে থাকবে নাকি? এই একটা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজে পড়িয়েই জীবন যাবে? আগে তবু একটু লেখার অভ্যেস ছিল, খুশি রাখার জন্য বাবা নিজে খরচ পর্যন্ত করে একটা বইও ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর আর কই?

অবশ্য দুর্গাপুরে বসে বন্দনা ভাবনা ছাড়া আর কী করতে পারে? বাবা-মারই উচিত এখন জোর করে, দেখে-শুনে পাত্রস্থ করা। তবে এমনিতে শান্ত হলে কী হবে, দিদির জেদও বড় প্রচণ্ড। না তো না, হ্যাঁ তো হ্যাঁ, সুতরাং মা বাবাকেও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না।

এদিকে পছন্দসই মানুষ পাওয়া দুষ্কর। নইলে বন্দনা তো আর কম চেষ্টা করে না, কম ভাবে না, কম সচেতন নয়? বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, পরিচিত, কতজন তো কতদিকে ছড়িয়ে আছে, একটা মানুষের কথাও মনে করা যায়

না দিদির সঙ্গে যাকে মানায়। এই ডাক্তার ভদ্রলোকটিই প্রথম মানুষ, যাকে একেবারে ঠিক খাপে-খাপে ভাবা গেল। এবার দয়া করে দিদি সম্মতিটুকু জানালেই সুন্দরভাবে সব হয়ে যেতে পারে।

ফিরে যাবার মুখে দিদিকে সে বলল, 'এসব কথা।' তারপর দিদির নিঃশব্দ মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হতাশ লাগল। তবু জোর দিল গলায়, 'তাহলে তাই ঠিক, কেমন?'

মৃদুস্বরে নন্দিতা বলল, 'চিঠি লিখে জানাব।' বলেই উঠে পড়ল গাড়িতে।

কী শক্ত মেয়ে! বাপরে বাপ! মাঝে-মাঝে রাগই হয় বন্দনার। না ভেবে পারে না, দিদিকে সুখী করার জন্য তার কী এত দায় পড়েছে? তার কিসের মাথা-ব্যথা। বিয়ে না করে দিদি যদি থাকতেই পারে, তাহলে তাই থাকুক না, বিয়ে দেবার দরকারই বা কী?

কিন্তু কী যে দরকার সে-কথা তো জীবনেও কাউকে বলতে পারবে না? আর দিদিকে যে সত্যি ভালবাসে সে বিষয়েই কী কোন সন্দেহ আছে?

ছোট্ট ফার্স্ট ক্লাস কামরা। ট্রেনের দরজা থেকে গলি বেয়ে সেখানে এসে নন্দিতা নিজের আসনে বসল। মনটা ভার লাগছিল, ওদের জন্য বেশ কষ্ট হচ্ছিল, টুকুনের শেষ মুহূর্তের কান্নাটা লেগে ছিল কানে।

আর ছুটে এসে হাতে চাপ দিয়ে ভদ্রলোকের হাত ঝাঁকানিটাও মন্দ রেখাপাত করেনি। বোঝাই যাচ্ছিল তাঁর মনের কথাটা। নন্দিতার প্রতি সত্যিই তিনি আকৃষ্ট। যদিও ভেবে-চিন্তেই বিয়ে করছেন, তবু তার মধ্যে রং লেগেছে খানিকটা। সেটা নিশ্চয়ই উপরি পাওনা।

কিন্তু নন্দিতা কেন কিছুই পায় না কারও মধ্যে? স্বামী শব্দটা ভাবলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মানুষকে বিশ্বাস করবার শক্তিটাই হারিয়ে গেছে হৃদয় থেকে।

কিন্তু তিরিশ বছর বয়েস হয়েছে, বিয়ের কথা ভেবে দেখতে গেলে (যেমন ডাক্তার ভদ্রলোকটি আটতিরিশ বছর বয়সে দেখছে) এখনই একটা সমাধানে পৌঁছনো দরকার। আর সত্যি বলতে বিয়ে না করে সমস্ত জীবন নিঃসঙ্গ ভাবে কাটানো সম্ভব কি না সেটাও মন্দ ভাববার বিষয় নয়।

মা-বাবা চিরকাল বেঁচে থাকবেন না, মা বাবার মৃত্যুর পর তার আয়ু তাকে আরও অনেকদূর নিয়ে যাবে, তারপর? তারপর কী? বন্দনা যে-সব যুক্তি দেয়, খুব অবহেলার যোগ্য নয়, সে-সব কথা। এগুলো বন্দনারই যুক্তি। বন্দনা আরো বলেছে, 'দিদি, আর কিছুর জন্য না হোক তুই না হয় একজন মা হবার জন্যই বিয়ে কর। টুকুনকে নিয়ে এমন পাগল-পাগল করিস, তবু

তো সে পরের ছেলে। নিজের হলে ভেবে দ্যাখ তো কী রকম লাগবে?'

নন্দিতা খুব হেসেছে এরপরে, বোনের চুল টেনে বলেছে, 'উঃ, তোর গিন্নিগিরি আর তো আমি সইতে পারি না।'

'গিন্নি-গিরি কী?' বন্দনা নিজেও হেসেছে, 'যা ঠিক তাই বলছি।'

'থাম তো। তার চেয়ে চল, তোদের নতুন বাজারটায় ঘুরে আসি একবার।'

'দিদি, আমারও তো বিয়েতে কম অমত ছিল না?'

'তোর আর আমার!' নন্দিতার গলা আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে, সে দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারে না।

মুখ নিচু করে বন্দনা বলে, 'জানি তুলনা হয় না। কিন্তু দিদি, তোকে বলা হয়নি, রঞ্জনই প্রথম পুরুষ নয় আমার জীবনে, আমি আরও একজনকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু এখন তো রঞ্জনকে আমি চোখে হারাই।'

'সে কী রে! কবে?' নন্দিতা আবহাওয়াটা লঘু করে দিয়ে কৃত্রিম কৌতূহলে ফেটে পড়ে,'কখনও তো বলিসনি! দিব্যি তো চেপে গিয়েছিস! কম মেয়ে নও তো তুমি!' তারপর মাথা নেড়ে বলে, 'জানি, জানি, কার কথা বলছিস।'

'কে?' হঠাৎ যেন চমকে ওঠে বন্দনা; তারপরই স্বাভাবিক হয়ে বলে, 'বল তো কে?'

'মলয় তালুকদার।'

'মলয়!' হাসতে হাসতে মরে যায়, 'শেষে তুমি আমাকে মলয়টার প্রেমে ফেললে?'

'কেন মলয় খারাপ কিসে? তোদের গ্রুপে সবচেয়ে ভাল ছেলে। কী রকম ফরমাশ খাটত তোর।'

'থাক, আমার প্রেমের গল্প শুনে তোমার কাজ নেই। যা বলছি তা শোন। এই ডাক্তারটিকে তুমি বিয়ে কর। আমি বলছি তুমি সুখী হবে, সব ভুলে যাবে।'

'সব ভুলে যাব?'

'নন্দিতা!'

নিজের আসনে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বোনের সঙ্গে এইসব কথোপকথনেব টুকরো-টুকরো অংশ ভাবতে ভাবতে নন্দিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। উল্টোদিকের ভদ্রলোকটিকে আর খেয়াল করতে পারেনি। তাছাড়া ভদ্রলোকটি এতক্ষণ একখানা ইংরেজি খবরের কাগজে মুখ ঢেকে কি যে পাঠ করছিলেন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কে জানে।

ডাক শুনে নন্দিতা চমকে ফিরে তাকাল, তারপরেই যেন জমে গেল বরফের মত।

'চিনতে পারছ?'

নন্দিতা নড়ে-চড়ে বসে একবার হিম চোখে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'কী কাণ্ড, না? শেষে এভাবে দেখা হয়ে গেল?'

নন্দিতা পাথর।

'কিন্তু আমি জানতাম দেখা হবে।'

ঈশ্‌শ্‌! কী নির্লজ্জ! গাল গলা ঘামে জবজবে হয়ে যাচ্ছিল নন্দিতার।

'আমি সাত বছর ধরে এই সুযোগটিই খুঁজছিলাম। যদি সারাজীবন এই অপেক্ষায় বসে থাকতে হত তাই থাকতাম।'

স্কাউড্রেল! সত্যি স্কাউড্রেল। নন্দিতার নিশ্বাস ঘন হয়।

'খুব আশ্চর্য যে সাত বছর আগে ঠিক এই মাসের এই তারিখটিতেই তোমার আমার শেষ দেখা হয়েছিল, মনে আছে?'

এবার মুখ খুলল নন্দিতা। লাল হয়ে বলল, 'দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না, আপনি আর কারও সঙ্গে ভুল করে যদি ক্রমাগত আজে-বাজে কথা বলতে চেষ্টা করেন, বাধ্য হয়েই আমাকে অন্যের সাহায্য নিতে হবে।'

'অন্যকে তুমি পাচ্ছ কোথায়? কামরায় তো আমরা মাত্রই দুজন। আর যে দুজন ছিলেন, আমারই ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে এই স্টেশনে নেমে গেলেন তাঁরা।'

'আমি-আমিও পরের স্টেশনে নেমে যাব।'

'তারও তো ঢের দেরি আছে। আর চলন্ত ট্রেন থেকে যদি লাফিয়ে পড়তে চাও আমি তা হতে দেব কেন? অন্য কিছুতে না পারি, শরীরের শক্তিতে আমি নিশ্চয়ই জয়ী হব।'

'হ্যাঁ, শুধু ঐ শরীরেরই শক্তি আছে, আর কিছু নেই।'

'কে বলেছে নেই? তাহলে এতদিন বাদে ঐ হৃদয়হীন বালিকাটিকে আমি মনে রাখলাম কেমন করে?'

'হৃদয়হীন!'

'স্টেশনে তোমাকে কে তুলে দিতে এসেছিল?'

'কথা বলবার মত আমার প্রবৃত্তি নেই।'

'বল না। স্বামী? পুত্রটি কার? তোমার?'

নন্দিতা মুখ ফিরিয়ে বসল।

'আমার যদ্দুর ইনটুইশন,' হাসল সে, 'বন্দনার স্বামী এবং পুত্রটিও তার। ঠিক?'

নন্দিতা জবাব দিল না।

'আর যে ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে [illegible]
সেটি তোমার প্রেমিক। ঠিক?'

নন্দিতা জবাব দিল না।

'বল না, ঠিক বলেছি?'

'দেখুন--'

কি দেখুন দেখুন করছ তখন থেকে? তোমার চরিত্রে তো কখনও কোন ভান ছিল না, কে তোমাকে এমন বদলে দিল?'

নন্দিতার দাঁতে দাঁত আটকে গেল।

'আমি অভিজিৎ রায়, তুমি নন্দিতা দত্ত, নাকি নও, পদবী বদলেছ? যদি বদলেও থাক তাতেও কিছু হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই, কেননা পরিচয়টা তো আমাদের ঐ একই থাকছে, বল, সতি৷ কি না?'

নন্দিতা নিঃশব্দ।

'তোমার একটা গল্প পড়েছিলুম কয়েক বছর আগে, গল্পের নাম ছিল অনন্য' এবং সেই 'অনন্য' যে তুমি আমাকে ভেবেই লিখেছ. সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, যদিও তার আগের ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষীই দিয়েছিল।'

নন্দিতা নিঃশব্দ।

'কিন্তু আমার অনন্যা এখনও আমার কাছে অনন্যাই আছে।'

'অনন্যা!' গলা চিরে শব্দ বাব করল নন্দিতা।

'নিশ্চয়ই। একশোবার, হাজারবার, লক্ষ কোটিবার। কেন, বিশ্বাস কর না?'

'না।'

'এই অবিশ্বাসের জন্য কে দায়ী নন্দিতা?'

'কেউ না, কেউ না, আমি নিজেই আর কাউকে বিশ্বাস করিব না।'

'কেন?'

'কোন কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।'

'কৈফিয়ত তোমাকে দিতেই হবে। এই কৈফিয়তের জন্যই আমাব এতদিনেব অপেক্ষা।'

'আমি সব ভুলে গেছি।'

'ভোলোনি। একতিলও ভোলোনি। আজ তোমাকে দেখে তোমার মুখ দেখে আমার এই উপলব্ধি হল তোমাবও একটা অপেক্ষা ছিল আমার জন্য।'

'না না।'

'নিশ্চয়ই।'

'না না। কক্ষনো না।'

'নিশ্চয়ই।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে শক্ত করে হাত ধরল, 'শোন, আমি দিনের পর দিন টেলিফোন করেছি, পাইনি, দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থেকেছি তোমাদের গলিটাতে, দেখা হয়নি। আমি রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি, পথে পথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি, চাকরি ছেড়েছি, কলকাতা ছেড়েছি—'

'আমি শুনতে চাই না, শুনতে চাই না—'

'বল কেন? কী হয়েছিল?'

'সে-কথা কি আমার চেয়ে প্রশ্নকর্তারই বেশি ভাল করে জানার কথা নয়?'

'না। অপমানিত হওয়া, অসম্মানিত হওয়া আর ঠকে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই জানি নে আমি।'

নন্দিতা ঢোঁক গিলল। বুঝতে পারল না, কোন খুঁটিতে পা রেখে এতকাল পরে এমন ভাবে কথা বলছে এই লোকটি। ভয়-ডর ওর কোন কালেই ছিল না সে কথা সত্য, তা বলে মিথ্যেবাদীও তো ছিল না।

উত্তেজিত ভাবে বলল, 'গলায় জোর থাকলেই কি সব ক্ষেত্রে সব দোষের খণ্ডন হয়ে যায়?'

'দোষ? দোষ তুমি কোথায় দেখতে পেয়েছ? কী দোষ?'

'আমি আর কথা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু পারতেই হবে, আমার প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে তোমাকে।'

হঠাৎ দুই চোখ ছাপিয়ে জল এল নন্দিতার, ঝাপসা দৃষ্টির ভিতর দিয়ে একটি উজ্জ্বল আনন্দময় বিয়েবাড়ির দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল চোখে।

লোকজন, হৈ-হল্লা, গানবাজনা, আমোদ-প্রমোদ---কী সুখ সকলের মনে। কত ঘটা-পটা করেই না বিয়ে হচ্ছে বাড়ির বড় মেয়েটির। নিঃসন্তান পিসি এসেছেন, চিরকুমার জ্যাঠামশায় এসেছেন, তিন পুত্রের জনক জননী মাসি মেসো এসেছেন, দুই পুত্রের জনক-জননী দুই মামা দুই মামী এসেছেন, দলে-দলে ভাগ হয়ে পরচর্চা থেকে শুরু করে হেন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবার তর্ক হচ্ছে খুব, কেউ তর্ক করছে রাজনীতি নিয়ে, কেউ বা ফুটবল ক্রিকেট, মেয়েরা একজোটে বসে সিনেমা।

মস্ত এক বাড়ি আলাদা করে ভাড়া নেওয়া হয়েছে একমাসের জন্যে, বাড়িটাতে ঘরের অন্ত নেই, জায়গার অন্ত নেই।

পিতৃকুলে মাতৃকুলে এই প্রথম মেয়ের বিয়ে, ধুম-ধাড়াক্কা যে হবেই সে তো জানা কথা। শুধু তো প্রথম মেয়ের বিয়ে বলেই কথা নয়, মামা মাসীর মেয়ে নেই, এদিকে পিসি বন্ধ্যা। জ্যাঠামশায় অবিবাহিত। মাঝখান থেকে তারা দুটি বোন

জন্মিয়ে দুই কুল একেবারে উচ্ছ্বসিত করে ফেলেছে। ভবতোষবাবু খরচপাতি করছেন খুব, মনোমত জামাই পেয়ে উৎসাহ তাঁর আরও বেড়ে গেছে।

শুধু মা বাবাই নেই, তাছাড়া আর কী নেই অভিজিতের। বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জন, চেহারা চরিত্র এতটুকু খুঁতও কি কেউ বার করতে পারবে? শুধু মামা একবার বলেছিলেন, 'বারো চোদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়েছে, ওখানে আবার কিছু বাধিয়ে এসেছে কি না ভাল করে খবর নিয়েছ তো?'

মা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছেন, 'তুই বলছিস কি ভানু, দুদিন মেলামেশা করে দ্যাখ না, কী রত্ন। ওর দিদি জামাইবাবু লন্ডনে থাকেন, আমি সুধীনবাবুকে লিখে দিয়েছিলাম একটু টিপে দেখতে, তাছাড়া পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কি সেখানে আমাদের কম? সব খবর নিয়েছি।'

মামা বললেন, 'দিদি, জামাইবাবু লন্ডনে থাকেন বুঝি?'

'তাঁরা সেখানকারই প্রবাসী, বাড়ি-টাড়ি কিনে একেবারে কায়েমী হয়ে বসেছেন। মাতৃপিতৃহীন ভাইকে তার দিদিই নিয়ে যায় প্রথমে। অক্সফোর্ড থেকে বি. এ. পাশ করবার পরে চাকরিও নিয়েছিল সেখানে, তারপর কী খেয়ালে চলে এসেছে দেশে। আর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট চাকরি পেয়েছে ইন্ডিয়া টোবাকোতে। বয়েসটা কী বল? নন্দুর তেইশ, অভিজিতের আটাশ। সবদিক থেকে এ রকম যোগাযোগ সত্যি দেখা যায় না। কী শুভক্ষণেই যে ওদের দেখা হয়েছিল।'

শুভক্ষণের দিনটির কথাও ভাবল নন্দিতা। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন, এবং শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশে এই বৃষ্টির আগমন হঠাৎই হয়েছিল। দুই বোনে মিলে নিউ মার্কেটে গিয়েছিল ফিরতি পথে এই কাণ্ড।

ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দৌড়ে গাছের তলায় এল, তারপর ট্যাক্সি ধরার জন্য ছুটে এল বড় রাস্তার উপর। ট্যাক্সি পাওয়া গেল না কিন্তু গাড়ি থামল একটি, চালকটি মুখ বার করে জানালো, সে লিফট দিতে প্রস্তুত। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দু'বোনে, অভিজিৎ সামনের দরজাটা খুলে ধরে বলল, 'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, একেবারে ভিজে যাচ্ছেন যে।' উঠে পড়ল ওরা, সামনের আসনেই এঁটে গেল দুই বোন।

নন্দিতা লজ্জিত মুখে বলল, 'আপনার সিটটা আমরা ভিজিয়ে দিলুম।'

অভিজিৎ বলল, 'আগে বলুন কোনদিকে।'

এই হল আলাপের সূত্রপাত। অভিজিৎ সেদিন তাদের রাসবিহারী এভিনিউর বাড়ির দরজাতেই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। তারা ছাড়েনি, ভদ্রতা করে ডেকে এনেছিল ঘরে, বাবা ছিলেন না, মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, চা খেতে বলেছিল, খুব সহজেই একটা বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। নন্দিতা

তখন সদ্য এম. এ. পাস করে বেরিয়েছে, আর বন্দনা তখন বি. এ. দেবে।

বিদায় দেবার সময় বন্দনা বলেছিল, 'আজ চা খেলেন না, আর একদিন কিন্তু আসতে হবে।'

নন্দিতার অত মুখ ফোটে না, সে শুধু তাকিয়ে সেই প্রস্তাবে সায় জানিয়েছিল। দেখা গেল, সত্যি আর একদিন চা খেতে এল অভিজিৎ, তারপরে আর একদিন, আর একদিন। আর তারপর কী থেকে যে কী হয়ে গেল, কখন যে নিঃশব্দে দুজনে গভীর প্রেমে মগ্ন হয়ে গেল কে জানে।

কথাবার্তা বন্দনাই বলত বেশি, আদর যত্নও বন্দনাই করত তারপর চলে গেলে ক্ষ্যাপাতো। এই করতে করতে একদিন অভিজিৎ বিয়ের প্রস্তাব করে ফেলল মা বাবার কাছে। এবং মা বাবার সম্মতি পেতে এক মুহূর্তও দেরি হল না।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে কয়েকটা দিন যে অভিজিৎ কী উদ্দাম হয়ে উঠেছিল তা বলা যায় না। আর বিয়ে হবে বলে মা-বাবাও ওদের দুজনকেই যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

আপিস-টাপিস সব তার মাথায় উঠে গেল, কেবল যখন তখন ফোন আর যখন তখন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। নন্দিতাও তখন বেকার, অসুবিধে ছিল না কিছু। বন্দনা আটকে থাকত। হয় তার কলেজ নয় তার আসন্ন পরীক্ষার পড়া। তাছাড়া একটু একটু করে সে যেন কেমন বদলেও যাচ্ছিল। তার সেই চালাক চতুর কথাবার্তা ব্যবহার সব যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। নন্দিতা রাত্তিরে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে বলত, 'তোর কী হয়েছে রে বন্দনা, কী রকম চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে থাকিস?'

বন্দনা বলত, 'কই, না তো।'

'নিশ্চয়ই।'

বন্দনা তখন মৃদু হেসে বলত, 'তোর বিয়ে আর আমার পরীক্ষা, দুটোয় মিল আছে নাকি কিছু বল?'

'তাহলে বিয়েটা পেছিয়ে দিতে বল না মা-বাবাকে।'

'পাগল!'

'না সত্যি, পরীক্ষার সময় এ ধরনের গোলমাল খুব খারাপ।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তা নিয়ে আর তোকে অত ভাবতে হবে না। আজ কোথায় গিয়েছিলি বল।'

'দ্যাখ না, পাগলের মত সব কী যা-তা কিনছে। আমার এত লজ্জা করে—'

'কী কিনছে রে?'

'যা-তা। শাড়ি গয়না ফার্নিচার, কী যে করছে না—'

'ভাল তো—' এই বলে বেডল্যাম্প নিবিয়ে বন্দনা পাশ ফিরত।

এমনি করেই ঘনিয়ে এল দিন, সাতদিন আগে থেকেই বাড়ি ভরে গেল আত্মীয় স্বজনে। মা অভিজিৎকে বলে দিলেন: 'তুমি কিন্তু কটা দিন আর এস না। একেবারে বিয়ের পরে দেখা হবে আবার।'

অভিজিৎ হেসে বলল, 'নন্দিতাও যাবে না?'

'তোমার দিদি আসবেন, ওরও না যাওয়া ভাল। আর চিরকালের জন্যই তো যাচ্ছে তোমার কাছে, আমার কাছে আর ক'দিন? বলতে বলতে সজল হয়ে ওঠেন মা।

কিন্তু মাকে আর সেই কারণে সজল থাকতে হল না বেশি দিন, বিয়ের দু'দিন আগে সব বন্ধ হয়ে গেল, বাবা তাদের দুই বোন আর মাকে টিকিট কিনে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন।

উঃ! সে দিনটার কথা ভাবা যায় না। ভাবা যায় না। সেই লজ্জা, সেই দুঃখ, সেই মর্মান্তিক বেদনা—তার কি কোন তুলনা আছে? আর যার জন্য এই কাণ্ড সেই কিনা মুখোমুখি বসে চোখে চোখে তাকিয়ে আজ কৈফিয়ত তলব করছে?

অনেক কথা অভিজিতের বুকের মধ্যেও তোলপাড় করছিল। প্রথমে মনে পড়ল, নন্দিতার বাবার সেই গম্ভীর গলার নির্দেশ, 'এ বিয়ে হবে না!'

ফোনের ভিতর দিয়ে যেন বজ্রপতন হল।

'কেন?' আকাশ থেকে পড়েছিল অভিজিৎ।

ওপিঠ থেকে কোন জবাব এল না, ফোন কেটে গেল। নিশ্চয়ই আপিস থেকে করেছেন। আর এটা আপিসেরই সময়। নম্বর দেখে সে দ্রুত হাতে সেখানেই ফোন করল, পাওয়া গেল না, শোনা গেল সেদিন তিনি আপিসেই যাননি। তখন মরিয়া হয়ে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিল ওদের বাড়িতে, নতুন বাড়ি পুরনো বাড়ি কোন বাড়িই বাদ দেয়নি, কিন্তু কোনখানেই কোন হদিস মিলল না।

কি হল, কেন হল, কোথায় গেল কিছুই বুঝতে না পেরে নিজেকে তার বুদ্ধিভ্রষ্ট মনে হচ্ছিল। সে যে তারপর এই মেয়েটিকে পাবার জন্য কি করেছিল আর না করেছিল তার কি কোন হিসেব আছে?

সেই সঙ্গে একটা গভীর সন্দেহও আক্রমণ করেছিল তাকে, মনে পড়ল যে কদিন নন্দিতার মা তাকে নন্দিতার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছিলেন না,

নিয়মিত ভাবে বন্দনা আসছিল খোঁজ-খবর নিতে। যতটুকু পাওয়া যায় তাই লাভ, নন্দিতার বদলে বন্দনাকে দেখেও তার বিরহ অনেক প্রশমিত হয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে নিয়ে ঘুরত ফিরত খাওয়াতো, তারপর সময়মত পৌঁছে দিয়ে আসত বাড়ির কাছাকাছি। কেননা বন্দনা বলত, 'না মশাই, দরজা পর্যন্ত যাবেন না, মা বকবেন।'

সেদিন সন্ধ্যায় খুব সেজে-গুজে এল বন্দনা। আপিস থেকে ফিরে চান-টান করে বলা যায়, বন্দনার অপেক্ষাতেই বসেছিল অভিজিৎ। বন্দনা সবসময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই আসত। দুপুরে সে টেলিফোন করত আপিসে, তারপর স্থান কাল নির্দিষ্ট হত। বন্দনাকে খুব অন্যমনস্ক আর ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। অভিজিতের মনে সেই সময়ে এমন একটা অপার্থিব সুখের নদী অনবরতই বয়ে চলত যে অন্যের দিকে তেমন লক্ষ্য করার মত মন থাকত না। ফুর্তির সুরে বলল, 'চল, একটু মার্কেটটা ঘুরে আসি।'

বন্দনা বলল, 'মার্কেটে কী?'

'আর বল কেন,' সিগারেট ধরাল অভিজিৎ, 'দিদি টাকা পাঠিয়েছেন, অনেক হুকুম তাঁর ভ্রাতৃবধুর জন্যে, শাড়ি, গয়না—হিন্দু বিয়েতে নাকি কী একটা অধিবাস-টধিবাস আছে?'

বন্দনা বলল, 'ওসব আমি জানি না। তবে আপনার দিদি যখন নিজেই আসছেন তখন আর আপনাকে দিয়ে কেন?'

'দিদি আসবেন একেবারে বিয়ের দিন দুপুরে, তখন আর কেনা-কাটার সময় কই?'

'কেন, অত দেরিতে কেন?'

'সে-সব কথা আমি বিশদভাবে কিছু বুঝতে পারলাম না চিঠি থেকে, তার যদ্দুর মনে হচ্ছে, ঐ তারিখে বোধ হয় প্লেনে কোন মোটা কনসেসন পাচ্ছে। সপরিবারে আসছে তো? কনসেসন পেলে অনেক টাকা বাঁচবে।'

'ও।'

'তা হলে যাবে নাকি? তোমার দিদির পছন্দ আর তোমার পছন্দ এক রকম হবে।'

'আজ আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাব, আমার মাথা ধরেছে, কথা দিয়েছিলাম বলেই আসতে হল। আমি বরং এখনই উঠি—' সত্যিই উঠেছিল বন্দনা। অভিজিৎ হাত ধরে বসিয়ে দিল 'এই এলে, এই উঠবে কী? পাগল না [illegible]—'

তখন সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল, ঐটুকু টানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল অভিজিতের গায়ের উপরে, তারপরেই তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের

মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল, 'অভিজিৎ, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে এমনভাবে পরিত্যাগ কোরো না। আমি মরে যাবো, আমি বিষ খাবো।'

অভিজিৎ একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এই অপ্রত্যাশিত আচম্বিত ব্যবহারে। একটু পরেই ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, বন্দনাকে বসিয়ে দিল সোজা করে, আস্তে বলল, 'চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ তুমি সত্যিই সুস্থ নেই।'

এটা বোধহয় বিয়ের চারদিন আগের ঘটনা। পরের দিনটা একটা অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কেটে গেল, আর তারপর দিন দুপুরেই নন্দিতার বাবার বজ্রনির্ঘোষ—এ বিয়ে হবে না।

সুতরাং এ-দুটোর মধ্যে যে কোথাও একটা গভীর মিল আছে, সেই সন্দেহ হওয়াটা অভিজিতের পক্ষে কিছু আশ্চর্য ছিল না, কিন্তু তা বলে—

'আরে, এর মধ্যেই বর্ধমান স্টেশন এসে গেল নাকি। এই বেয়ারা—বেয়ারা—' চিন্তা ভাবনা ছেড়ে জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে অভিজিৎ চ্যাচামেচি শুরু করে দিল।

ফার্স্টক্লাসের যাত্রী, ছুটে এল তকমা আঁটা বেয়ারা, চা এসে গেল মুহূর্তে।

অভিজিৎ খুশি হয়ে বলল, 'আঃ, এই সময়ে চা না হলে চলে? ঢালো, শিগগির ঢালো, তোমারটা পাতলা আমারটা ঘন। না কি অভ্যেস বদলেছ কিছু?'

নন্দিতা ওর ভাবভঙ্গি দেখতে দেখতে মাঝখানকার সময়টা হারিয়ে ফেলেছিল, তার মনে হচ্ছিল, এই দেখা যেন সাতবছর উত্তীর্ণ করে নয়, অনেক আগুন মাড়িয়ে নয়, যন্ত্রণার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে নয়, যেন কালকের পরে আজ। কোন আড়ষ্টতা নেই, লজ্জা নেই, অন্যায়ের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই ব্যবহারে।

'তোমাকে দেখে আমার কী যে ভাল লাগছে—' দুই চোখ ভরা আলো নিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, কী করব, কেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাব ঈশ্বরকে। তুমি ঠিক সে রকম আছো, ঠিক সে রকম। আমি জানতাম তুমি তাই থাকবে, তুমি কখনও অন্য রকম হতে পারো?'

'এই লোকের সঙ্গে আর কী করে কঠিন ব্যবহার করা যায়?' কম্পিত হাতে চা ঢালল নন্দিতা।

'তুমি তো জানতে, তুমি ছাড়া আমার জগতে আর কিছু ছিল না, তবে কেন অমন করে সব বন্ধ করে দিলে? কে তোমাকে উধাও করে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে? বল, কী হয়েছিল, বল, বল—'

সন্ধে ঘন হয়ে আসছিল, নন্দিতা ভেবে পাচ্ছিল না, এখন তার কী করা

উচিত। শুধু ইচ্ছে করছিল অনন্তকালের মধ্যে এই ক্ষণকালটিকে চিরন্তন করে ধরে রাখতে। হোক মিথ্যে, তবু এর মাধুর্যে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, তার একান্তে লালিত ভালবাসা আর অভিমানের দুঃখ তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

অনেক পরে এক সময় অধীর হয়ে সে বলে উঠল, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি কিছু বলতে পারবো না, আমার ভাগ্যই আমাকে বঞ্চনা করেছে, আমি কাউকেই এজন্য দায়ী করছি না।'

অভিজিৎ গলায় জোর দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার ভাগ্য নিয়ে থাক, আমিও আমার পুরুষকার প্রয়োগ করি, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি আর আছে কি না দেখ তুমি, যা আমার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে!'

নন্দিতা মুখ ঢাকল দু'হাতে।

আর সেই সময়ে দুর্গাপুরে বসে বন্দনা ভাবল, দিদির সুমতি হোক, দিদি যেন আর অমত না করে এই বিয়েতে। তারপর অনেকদিন পরে তার অভিজিৎকে মনে পড়ল, মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা, যখন দিদিকে নিয়ে সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে এসেছিল বলেছিল, 'একটা কথা আছে, দিদি।'

নন্দিতা তার অস্বাভাবিক চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কী রে?'

সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'অভিজিৎ---'

'অভিজিৎ কী'?

'আজ আমার সঙ্গে কলেজে দেখা করেছিল।'

'কিছু বলল?'

'সন্ধেবেলা যেতে বলেছিল ওর ফ্ল্যাটে।'

'গিয়েছিলি?'

'গিয়েছিলাম।'

'ও ভাল আছে তো?'

বন্দনা চুপ করে থেকে বলল, 'দিদি, তুমি এ-বিয়ে কোরো না।' এ-কথা বলতে বুকটা ধক ধক করছিল।

নন্দিতা অধীর ভাবে বলল, 'কেন?'

'ও ভাল না!'

'কী বলছিস তুই?'

'তোমাকে ও ভালবাসে না, মিথ্যে কথা বলে।'

'বন্দনা---'

'আজ আমাকে ও অপমান করেছে।'

'তোকে? অপমান করেছে?'

'আমাকে— আমাকে— ওর ফ্ল্যাটের মধ্যে একা পেয়ে—'

'কী—কী—'

'জোর করে খারাপ কাজ করেছে, আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে, আমার নারীত্ব কেড়ে নিয়েছে—'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল. মা উঠে এসেছেন, হাতে ভেজা শাড়ি. কাজ সেরে স্নান করে এলেন বোধহয়, ছাদে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। নন্দিতা ঠিক মরা মানুষের মত দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল চোখ বুজে, বন্দনা নিজের মিথ্যাপটুতায় নিজেই স্তম্ভিত হয়ে শব্দ করে কাঁদছিল।

'কী রে?' মা ঝুকে পড়লেন তাদের দিকে, 'কী হয়েছে? কী করছিস তোরা?'

তারপর' তারপর আর কী? বন্দনা যা চেয়েছিল তাই হল। মা তখুনি তাদের নিয়ে আত্মীয় কুটুম্বের ভিড় থেকে চলে এলেন পুরনো বাড়িতে। চুপচাপ অন্ধকারে শুয়ে পড়ল নন্দিতা, একটা শব্দও আর কেউ শুনতে পেল না তার মুখে, তাকে খাওয়ানো গেল না, ওঠানো গেল না, আর মধ্যরাত্তিরে দেখা গেল বিছানা থেকে নেমে সে শিশিভরা অ্যাসপিরিন, বিলিতি অ্যাসপিরিন মা'র সর্বদা মাথা ধরে বলে অভিজিৎই যেটা দিয়েছিল একদিন, মুঠো করে নিয়ে, জল মুখে দিয়ে হাঁ করেছে খাবার জন্য। লাফিয়ে নেমে এল বন্দনা, ভাগ্যিস চোখে তার ঘুম আসেনি সেদিন. এক ধাক্কায় সব ফেলে দিল। মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নন্দিতা, আর তার সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না।

পরের দিনই অসুস্থ দিদিকে আর তাকে নিয়ে মা জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের কর্মস্থান দিল্লীতে চলে এলেন।

সামলে উঠতে নন্দিতা অনেকটা সময় নিয়েছিল, অনেকদিন, থাকতে হল দিল্লীতে। বাবা মা জ্যাঠামশায় সর্বদিক বিবেচনা করেই কলকাতা আসতে দেননি, যখন এল, দেখা গেল, বাবা বাড়ি বদলেছেন।

কিন্তু কেন এই ভীষণ কাজ করেছিল সে? কোন শয়তান চালিত করেছিল তাকে? অথচ অভিজিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্বয় আগে তো কোন মালিন্য ছিল না। বিলেত প্রবাসী ছেলে, ধরণ-ধারণ অভ্যেস সবকিছুর মধ্যেই এ-দেশের চেয়ে সে-দেশের ছাপই বেশি স্পষ্ট, আবার আচরণ এত সহজ সরল সুন্দর ছিল যে কখনই মনে হয়নি এই বন্ধুত্বর মধ্যে কোন স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান আছে। বন্দনা সে ভাবেই গ্রহণ করেছিল তাকে, আর বন্ধুত্বটা তার সঙ্গেই গাঢ় ছিল বেশি। দিদি স্বভাবতই একটু লাজুক প্রকৃতির। কারও সঙ্গে নিবিড়

হয়ে উঠতে সময় লাগে ওর, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে ওরা যে কখন বন্ধুত্বর গণ্ডি ছাপিয়ে স্ত্রী-পুরুষের গণ্ডির মধ্যে আবন্ধ হয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারেনি বন্দনা। যদি অভিজিৎ দুম করে একটা বিয়ের প্রস্তাব করে না বসত, বন্দনা সারাজীবনেও জানত না যে অভিজিৎ শুধু বন্ধু নয় একজন পুরুষ বন্ধু, যার সঙ্গে প্রেমে পড়া যায়, বিয়ে করা যায়। সেই প্রস্তাবটাই তার কুড়ি বছরের সতেজ সবল হৃৎপিণ্ডে একটা ঘা দিল বিষম জোরে, তক্ষুনি মনে হল, এই প্রস্তাবের নায়িকা তো আমিও হতে পারতাম। ভাব তো আমার সঙ্গেই বেশি। কতদিন তো এমনও হয় সারাক্ষণই ও আর আমি গল্প করি, দিদি আসে যায় বসে চা আনে, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে সঙ্গ দেয় না। তবে কখন ও এই জয়ের মুকুট কেড়ে নিল? একটা হেরে যাওয়ার গ্লানি কষ্ট দিয়েছিল তাকে, আর সেই কষ্ট থেকেই কখন যেন একটি ছোট্ট প্রেমের অঙ্কুর মাথা তুলল উপর দিকে। কিন্তু কে জানত সেই অঙ্কুর এমন সাপ হয়ে ছোবল দেবে।

শেষের দিকে বন্দনা সত্যিই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। নইলে অমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা সে ঘটাতে পারল কেমন করে? অভিজিতের বিয়ে বন্ধ করার জন্য তখন তার এমন কোন কর্মই ছিল না যা সে না করতে পারে! শেষ পর্যন্ত করলও তো! অভিজিতের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার প্রতিশোধ তো নিল!

অথচ এখন তো ভুলেও একবার মনে পড়ে না ওকে। দিদি চোখের সামনে একটা জ্বলন্ত চিহ্ন হয়ে বসে না থাকলে এই মুহূর্তেই বা তার মনে করবার দরকার ছিল কী? একটা অপরাধবোধ। এই অপরাধবোধই মাঝে মাঝে কুরে কুরে খায় তাকে। অনুতাপ দগ্ধ করে হৃদয়কে। হে ভগবান, দিদি যেন এবার সত্যি বিবাহিত হয়ে আমাকে মুক্তি দেয়। এই যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারি না।

ট্রেন ততক্ষণে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। ব্যাকুল হয়ে অভিজিৎ বলল, 'তুমি এখনও মুখ ভার করে থাকবে? এখনও আমাকে বলবে না কী হয়েছিল? কেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল সব?'

একই প্রশ্ন বারবার। নন্দিতা অসহায় বোধ করল।

'তোমার ব্যবহারে মনে হচ্ছে তুমি আমাকেই দায়ী করতে চাইছ, আমার উপরই তোমার সমস্ত অভিযোগ, অভিমান—'

নন্দিতা হাত মুঠো করল।

'বল তো, এর মধ্যে বন্দনা কোনভাবে জড়িত ছিল কি না?'

এবার সে আপাদমস্তক চমকে উঠে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

চোখে চোখ রেখে অভিজিৎ ঝুঁকে বসল একটু, 'তাহলে আমার সন্দেহ অমূলক নয়? ভগ্নীর জন্য আত্মত্যাগের মহিমাই তবে এর মূল কারণ?'

'আত্মত্যাগ!' নন্দিতা ভুরু কুঁচকাল।

'কী করেছিল বন্দনা? বিষ-টিষ খেয়েছিল নাকি?' অভিজিতের কণ্ঠস্বরে বিদ্রুপ।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নন্দিতা বলল, 'অমানুষিকতার একটা সীমা থাকা উচিত।'

'ত্যাগের একটা সীমা থাকা উচিত, ভান করে তো আর কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না?' অভিজিৎকেও সমান ক্রুদ্ধ মনে হল।

'ভালবাসার প্রশ্ন উঠছে কোথায়?'

'আমি তার একটা চিঠিও পেয়েছিলাম।'

'চিঠি!'

'যার নাম প্রেমপত্র। তাতে কোন ঠিকানা ছিল না, তলায় নাম ছিল না, কিন্তু দিল্লির ছাপ ছিল।'

'চিঠি লিখেছিল সে? বন্দনা?'

'যদিও আমি ওর হাতের লেখা চিনতাম না, তবু আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এটা ওরই চিঠি। ক্ষমা কর, তোমার ভগ্নীর প্রেম নিবেদনের ভঙ্গি-টা আমার একটুও রুচিসঙ্গত মনে হয়নি।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'কি আবার! যখন বোঝা যাচ্ছে বিয়েটা ওর জন্যেই ভেঙে গিয়েছিল, আমার কোন সহানুভূতি নেই ওর ওপরে। সে তুমি রাগ কর আর যা-ই কর। আমি ভেবেছিলাম, কথাটা বিয়ের পরেও তোমাকে বলব না, ছেলেমানুষি ঝোঁকে সে যা করেছে তা নিয়ে কখনও লজ্জা দেব না তাকে—'

'কি করেছিল সে?' আর্তের মত বলে উঠল নন্দিতা।

ছোট কামরার মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল অভিজিৎ, 'আমি যখন তাকে শান্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, তখন সত্যি তার জন্য কষ্ট হচ্ছিল আমার, তোমার সঙ্গে দেখাশুনো বন্ধ হয়ে যাবার পরে রোজই সে আসত, আমার কত ভাল লাগত, আমি তাকে কত ভালবাসতাম—'

'অভিজিৎ—'

'আমি চিঠিটা তোমাকে দেখাবো?'

'তবে কি ও সব কথাই বানিয়ে বলেছিল?' যেন ঠোঁট থেকে স্খলিত হল কথাগুলো, ফিসফিস করে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল নন্দিতা।

আগেকার দিনের নাইটদের ভঙ্গিতে তার পায়ের কাছে এক হাঁটু ভেঙে

বসে অভিজিৎ মাথা ঝেঁকে বলল, 'আমি তোমাকে ছাড়া জানি ।, জানি না। তখনও জানতাম না, এখনও জানি না। কথা দাও আর তুমি হারিয়ে যাবে না আমার জীবন থেকে।'

মোহাচ্ছন্নের মত নন্দিতা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যাব তোমার কাছে, আমি চিঠিটা দেখব।'

হাতটা মুঠোয় ভরে নিল অভিজিৎ, 'আমি গ্রেট ইস্টার্নে উঠব, সাতদিন থাকব, এখন যদিও আসানসোল থেকে আসছি, আসলে বম্বে আমার কর্মস্থল, সেই যে তোমাকে না পেয়ে কলকাতা ছেড়েছিলাম, সাত বছর বাদে এই আবার ফিরছি। আর পথেই তুমি। কি আশ্চর্য!' সে উঠে দাঁড়াল। 'বন্দনা তোমাকে কি বলেছিল আমি জানি না, চিঠি পড়লে সবই তুমি বুঝতে পারবে। এটাও দৈব যে চিঠিটা আমার সঙ্গে আছে। মনেই ছিল না, আসার আগে স্যুটকেশটা গুছোতে গিয়ে দেখি তার পকেটে কখন থেকে গেছে ওটা। ভাবলাম আছে থাক, এও তো তোমারই চিহ্ন। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবার জন্য কি তোমার সাক্ষীসাবুদের দরকার?'

'না।'

'তবে?'

'বিয়েটা তো সাক্ষীসাবুদ ডেকেই হবে, হয়তো তখন কাজে লাগবে ওটা।'

প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে নন্দিতা দেখল, তার বাবা উৎসুক চোখে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন। গাড়ি নিয়ে এসেছেন বোধহয়। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে শান্তভাবে বলল, 'যাই, আমি কাল সকাল আটটায় পৌঁছে যাব তোমার কাছে। বেশি বেলায় উঠ না। ঘরের নম্বরটা দাও।'

'নম্বরটা এখনও জানি না---' দ্রুত গলায় বলল অভিজিৎ, 'পথে এসে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি কিন্তু ঠিক এসো।'

তা এল। আসবার আগে ঐ সকালেই একখানা চিঠি লিখল সে।

বন্দনা, তোর ওখানে সাতদিন কাটিয়ে অত্যন্ত আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরেছি। টুকুন ফুটকুনের জন্যে মন কেমন করছিল। আশা করি ফুটকুন সেরে উঠেছে, টুকুনও আর মাসির বিরহে তেমন কাতর নেই।

তোর ডাক্তার সাহেবটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু বিয়ে আমি অভিজিৎকেই করব। ট্রেনে তার সঙ্গেই কলকাতা এলাম। এখন নিশ্চয়ই তোর কোন আপত্তি হবে না। একটা চিঠির কথা বোধহয় তুই ভুলে গিয়েছিস। বোকা মেয়ে! খুনের আগে কখনও কি এ-রকম কোন প্রমাণ রাখতে হয়? ভাল থাকিস।

বান

মহাশ্বেতা দেবী

দ্রমাসে রান্নাপূজার দিন এসেছে। এ সময়ে গৃহস্থমাত্রেই মনসাগাছ খোঁজে। রূপসী বাগদিনীর ছেলে চিনিবাস মনসাগাছ খুঁজতে গেল। মনসাগাছ নিয়ে পূর্বস্থলীর গৃহস্থরা উঠোনে পোতে। মনসা বাস্তু। মনসা খেতে ধান, গাইয়ের পালানে দুধ, পুকুরে মাছ, গৃহস্থ বউয়ের কোলে ছেলে দেন। কিন্তু ঘরে ঘরে মনসাগাছ থাকে না। রান্নাপূজার পরদিন অরন্ধন।

'মা, রান্নাপূজা করবি না?' চিনিবাস জিজ্ঞেস করেছিল।

'না বাপ, এবার আমাদের রান্নাপূজা নেই।'

'কেন মা?'

'ই সনে তোর কাটোয়ার জেঠা মরেছে না?'

'তোকে বললে কে?'

'আমি জানি।'

চিনিবাস অবাক হয়ে ভাবল, এ কেমন কথা হল? গতবছর তো রান্নাপূজার দিন মা পিদিম জ্বেলে বসে কত কী রেঁধেছিল। শোল মাছের টক, নারকেল দিয়ে কচুশাকের ঘন্ট, তিতোপুটি ভাজা, সরলপুটির ঝাল,ময়ামাছ আর বেগুনের ঝোল, চালবাটা দিয়ে ঢেঁকিশাক, পিটুলি দিয়ে পাট পাতার বড়া আর তালবড়া। পরদিন দুবেলা ধরে চিনিবাস তাই খেয়েছিল।

এ বছর বড় কষ্ট, এদিকে গঙ্গায় বান ওদিকে খোড়ে নদী টুবুটুবু। চিনিবাস শুনেছে অঞ্জনা নদীতে তিনখানা বাঁশ ওপর ওপর রাখলে ডুবে যায় এমনই ভাসাভাসি। সবাই বলাবলি করছে বান আসবে। বান কেমন জিনিশ তা চিনিবাস দেখেনি। চিনিবাসের মা যখন ছোট ছিল তখন নাকি কাটোয়ার গঙ্গাতে বান এসেছিল।

চিনিবাসের মা নারকেলপাতা চেঁছে কাঠি বের করছিল। অন্তত দশটি

নতুন ঝাঁটা বেঁধে দিতে হবে, নইলে আচার্যবাড়ির কাজ চলবে না।

'মা বান কেমন করে আসে গো?' চিনিবাসের কথা শুনে রূপসী বড় বিরক্ত হল। বলল, 'দেখিস এখন।'

রূপসীর মা গাবগাছের আঠা দিয়ে বাঁশের মাছধরা পলো পালিশ করছিল, সে বলল, 'দেখবি রে দেখবি, বান হবে, মড়ি হবে, মানুষ নিয়ে শেয়াল-শকুন-ছিঁড়ে খাবে।'

'উ কি কথা মা?' রূপসী মৃদু ধমক দিল।

নেয্য কথা লো নেয্য কথা! পিঁপড়ে পতঙ্গ ভেসে যাবে, হাতি-ঘোড়া জিয়ে থাকবে, এ হল শাস্তরের কথা।'

'তবে যে সবাই বলতেছে ই বানে কেউ মরবে না?' চিনিবাস আবার জিগ্যেস করল।

'ও গোরাপ্রেমের বানের কথা? উ আমি জানি না বাবু। আমি তো শুনলাম শান্তিপুর-কাটোয়ার জনমনিষ্যের আর আনকথা মুখে নাই। শুনে আমি হেসে বাঁচি না। হাটে যেতে দেখি সবাই এক কথা বলে। আমি যাকে শুধাই কথাটি কী গো? সেই বলে, আ লো বাগদিবউ, কী যে কথা সে তো আমরা বুঝি না। শুধু শুনি গৌরাঙ সন্ন্যাসী নাকি উঁচুকে নিচু আর নিচুকে উঁচু করবে বলে লেচে বেড়াচ্চে। শুনে তো আমি শুধাই, হাঁ গো, তবে কি আমরা ঠাকুরদের পুকুরে জল সরব, উনাদের মতো পালঙে শোব, খইমুড়ি যা মন হয় তাই খাব? তা যদি না হয় তবে আমি গোরাপ্রেমের বানে ভাসব কেন? আমায় সবে খুব মুখ নাড়লে, আমি বকনা বাছুরটা খুঁজে নিয়ে চলে এলাম। ই আবার কোন বান বাবা?'

'মা!' রূপসী গলা তুলল।

'আ লো দেখিস! অঙ্গ যে রসে গেল।'

'তুই তো মা গৌরাঙ্গ দেখিসনি?'

'দেখতে যাব কেন লো? গৌরাঙ কি আমায় রাজা করবে?'

'তবে যা মাছ ধরগা যা!'

'আ লো, রূপের গোমর করিস না। মাছ ধরা আজ মন্দ কাজ হল। এই মাছ ধরে তোকে এত বড়টা করেছিলাম।'

চিনিবাস দেখল বাতাস বেগতিক। সে মনসাগাছ নেবে কিনা জানবার জন্যে বাতাসের আগে আচার্যবাড়ি গেল।

পূর্বস্থলীর আচার্য পরিবার বড় ধার্মিক সচ্ছল গৃহস্থ। এই ১৪৩৫ শকাব্দে কম গৃহস্থেরই ক্ষমতা আছে যে, নিত্য কাঙালি ভোজন করায়। কিন্তু বড়

আচার্যের উঠোনে বেলা দুপুর পর্যন্ত এখনো একশতটি পাতা পড়ে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর সংবাদ এখন বাতাসের আগে ধায়। এখন তিনি গৌড় থেকে শান্তিপুর গিয়ে মাতৃদর্শন করে আবার নীলাচলে চলেছেন। বড় আচার্যের ইচ্ছা যে এ পথ দিয়ে নিমাই গেলে তাঁর বাড়িতে দুটি দিন রাখবেন।

'আ গো কেন?' তাঁর আচার্যানী জানতে চেয়েছিলেন। বড় আচার্য তো সিরস্তদার, পোতদার, ধনীমানী মানুষ দেখলে তবে সম্মান করেন। যুবক সন্ন্যাসীকে এ সম্মান কেন?

'কেন! কেন কি গো? আমি দশজনকে ভাত দিই কেন?'

'পুণ্য করো।'

'পুণ্য করো! একে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। দশজনকে ভাত দেও, কাপড় দেও মানুষ তোমায় মাথায় করে রাখবে।'

'গৌরাঙকে সম্মান করো কেন?'

'ও গো, গৌরাঙ এখন নতুন নতুন গো! মানুষ এখন গৌরাঙের নামে সত্বর মজে। যে জন গৌরাঙ ভজে তার এখন সমাজে সম্মান। শান্তিপুরের তাঁতি বেটারা অব্দি গৌরাঙ যখন নগরে গেল, তখন কাঙালিরে কাপড় বিলিয়ে নাম করল। আমি যদি করি আমার ভালো হবে।'

'আ গো আপনি তো অধিক ব্যয় করতে ডরাও। তা গৌরাঙ সন্ন্যাসী আসবে, তার চেলাচামুণ্ডা এতগুলি! ব্যয় হবে কত আমি সে কথাটি ভেবে মবি!'

'আরে স্ত্রী-বুদ্ধি! গৌরাঙ এখন কৃষ্ণনামে মেতে রয়েছে। সে মানুষ একবার আসবে, একবার নয় ব্যয় করব। তুমি বোঝো না। এতে আমার নামডাক দশদিকে যাবে।'

'তিনি নাকি মানুষ ডেকে ডেকে আচণ্ডালে কোল দেয়? এ কথাটি জেনে আমি অবাক যাই গো!'

'কোল দিলে কি? কোল তো উনির সঙ্গে যাবে। উনি গেলে তবে চাঁড়াল বাগদি আবার যেমন ছিল তেমন রইবে। তোমার এত কথায় কাজ কি? যাও না, রান্নাপূজার কাজে যাও না।'

বড় আচার্যানী নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন। আচার্য তো বলেই খালাস। বসে বসে শত শত লোকের রান্না করেন, এখন কি তাঁর সেদিন আছে? সকলের রান্না সেরে ভাত খেতে খেতে সন্ধে হয়। উনোনে রাতের ভাত-ডাল বসিয়ে দিয়ে তবে তিনি খেতে বসেন।

'কে রে?'

উঠোনের এক কোণে চিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমি চিনিবাস গো!'

'কে?'

'উপোসি বাগদিনীর বেটা। আপনাদের কি মনসাগাছ এনে দেব? ম. শুধোলে।'

বড় আচার্যানীর সর্ব-অঙ্গ জ্বলে গেল। কী অলক্ষণ কী অপয়া তাই দেখো! এখন ঠাকুরের ভোগ দিতে যাবেন, এখন বাগদিদের ছেলেটা মুখ দেখাল?

'এই এত বড় গাছ গো!'

চিনিবাস হাত দুটি তুলে দেখাল। রান্নাঘরের দোর দিয়ে গরম ভাতের গন্ধ আসছে। বামুন মা ডালের হাঁড়িতে কতখানি করেই না ঘি ঢালে। দুধ দিয়ে শাদা ধপধপে লাউয়ের শুক্তো রাঁধে আর মূলো বড়ি-নারকেলের ঘন্ট। সব ঘি-চপচপে. সম্বরার সুবাসে ম-ম। কতদিন চিনিবাস গরম ভাত খায়নি। কতদিন বামুনবাড়িতেও খায়নি।

'সে পরে বলবখন, এখন বাড়ি যা।'

'বামুন-মা, রান্নাপূজা কবে গো?'

'সোমবার।'

'কচুশাক এনে দেব?'

'না বাপ তুই যা।'

এই ছেলে বামুন-মা বললে আচার্যনীর অঙ্গ জ্বলে। রূপসী বাগদিনীর মতো গরিব এ পূর্বস্থলীতে কেউ নেই। খেতে পায় না, মাথার চুল জট বাঁধা, তবু রূপ মরে না ওর। ছেলেটাও চাঁদপানা। আচার্যানী ছেলে-ছেলে করে তে বার ব্রত পুজো করে কালোজিরের মতো কয়েকটি মেয়ে পেলেন বলেই না ছোট আচার্যানীকে আনলেন কর্তা!

'যেন চোখ দিয়ে গিলে খায়।'

আচার্যানী চোখ সরু করে দেখলেন চিনিবাস কোথায় দাঁড়িয়ে। উঠোনের কোণে ওই আতাগাছটি হল লক্ষ্মণের গণ্ডি। বাগদি বলো, জেলে বলো, গেরস্ত সংসারে সকলেরই দরকার, তা, সবাই ওই আতাগাছের ওপারে এসে কথা কয়ে চলে যায়। চিনিবাস বুড়ো-আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

ছোট আচার্যানী ছেলে কোলে করে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে আবার টুপ করে ঘরে ঢুকে গেলেন। ছেলেটি বড় ভোগে। চিনিবাসের নজর লাগলে হয়তো আবার ভুগবে।

'ওরে এক পাই মুড়ি দেন গো!' ছোট আচার্যানী ঘর থেকে ডেকে বললেন। মুড়ি নিয়ে খুশি হয়ে চলে যা বাবা. আমার ছেলেটার দিকে তাকাস না।

চিনিবাসের চোখদুটো যেন সর্বদা খাই খাই। এত খিদে ওর কোত্থেকে আসে কে জানে!

'নে মুড়ি নিয়ে চলে যা।'

চিনিবাসের যে কী ভূত চাপল মাথায় কে জানে! ও হঠাৎ বড় আচার্যানীকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'হ্যাঁ গো বামুন-মা, সোনার গৌরাঙ্গ এলে আমরা নাকি সকলের সঙ্গে এক দাওয়ায় বসে পেসাদ পাব?'

'কী বললি?'

বড় আচার্যানী এখন গলা তুলে চেঁচাতে শুরু করলেন। চেঁচামেচির মধ্যে অনেকখানি হল স্বামীর বিরুদ্ধে আক্ষেপ।

'আ গো, তিনি চাঁড়াল-বাগদি নিয়ে নাচতেছে, নাচুক গা! মনিষ্যি না দেবতা না তিনি কী বস্তু তা কি আমরা জানি? তিনি বান আনতেছে, বানের সঙ্গে ভেসে চলে যাবে গো! আমাদের এই গাঁয়ে জন্ম কাটাতে হবে। আমরা কেন নাচতে যাই?'

রূপসী বাগদির বিরুদ্ধেও অনেক বিষোদ্গার ছিল। মেয়েটা মন্দ। ওর ছেলেটা মন্দ, গ্রামের কলঙ্ক একটা।

ছোট আচার্যানী তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আর একখণ্ড মিছরি এনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণে অকারণে বড় আচার্যানী এইভাবেই চেঁচান। চেঁচাতে চেঁচাতে ওঁর মুখে থুথু উঠে যায়। তখন একখণ্ড মিছরি আর এক ঘটি জল খেলে উনি শান্ত হন।

চিনিবাস তো কোঁচড়ে মুড়ি কটা নিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে শেষ অব্দি খালের ধারে পৌঁছে গেল। খালে জল টুবুটুবু। এত জলে মাছ ধরা যায় না। কিন্তু গেঁড়ি গুগলি বিস্তর। চিনিবাসের দিদিমার বুঝি নারকেল পাতা চাঁছা হয়ে গিয়েছে তাই গুগলি তুলতে এসেছে। বুড়ী বসে থাকতে জানে না।

'গুগলি তুলে কী হবে আয়ি?'

চিনিবাস আশায় আশায় জিজ্ঞেস করল। কবিরাজ মশায়ের শ্বশুরের চোখে ছানি পড়ছে। গুগলির ঝোল খেলে চোখ ভালো থাকে বলে কবিরাজ-গিন্নি মাঝে মাঝে বাবার জন্যে গুগলি রাখেন। কখনো চারটি ডাল দেন, অথবা একটা কুমড়ো। দিদিমা নাতির কথা শুনে বললে, এমনি রে এমনি! কেউ নিলে তো নিলে। নইলে গুগলির শাঁস আর কচুশাক দিয়ে ঘন্ট রাঁধব। তোকে মুড়ি কে দিলে? আচাজ্জি বউ?'

'হ্যাঁ।' চিনিবাস তাড়াতাড়ি মুড়ি গালে ফেলতে ব্যস্ত।

রূপসীর মা, চিনিবাসের দিদিমা এখন কার উদ্দেশ্যে যেন মুখ বাঁকা করে

গাল দিল। বলল, 'তখন তো কত কথা, হ্যানো দেব, ত্যানো দেব, কাপড় দেব, সব্বস্ব ভার নেব। এখন কি সব ভুলে গেল?'

'কে আয়ি?'

'তোর শত্তুর, তোর মায়ের শত্তুর!'

চিনিবাস দিদিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুগলি তুলল, যতক্ষণ না হাত-পা জলে ভিজে ভিজে অসাড় হয়। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে চিনিবাস বলল, 'এ বন্যে নয়, সেই বানের কথা বল আয়ি!'

'পেলয় বান!' বুড়ী তখনি মাথা নাড়লে।

'কি রকম?'

'তোর মা তখন সোমত্ত মেয়ে। রূপে রঙ্গ ভেসে যায়। সকালবেলা থেকেই গুঁড়ো-গুঁড়ো বিষ্টি, যেন বাতাসে তুঁষ উড়তেছে। আর বাতাসের কী ডাক মা!'

'তা বাদে?'

'বান আসতে আমরা সব যেয়ে বড় আচাজ্জির দালানে উঠলাম। কতজন গাছে চেপে রইল, কতজনা ভেসে গেল। মানুষ পোকামাকড়ের মতো মরে দেখে বামুনরা সকলকে দালানে-উঠোনে ঠাঁই দিলে।'

'তা বাদে?'

গল্পের এই জায়গাটি চিনিবাসের বড় প্রিয়। বারবার ও এই গল্পটা শুনতে পারে শুধু এই কথাগুলো শুনবে বলে। রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য সব কথা। বানের সময়ে মানুষরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, নইলে এমন কাণ্ড করবে কেন?

'অন্ন বিনা প্রাণী মরে যায় দেখে, বামুনরা ধামা ধামা চিড়ে মুড়ি-বাতাসা দিয়ে সব প্রাণ বাঁচালে মা! যারা রাঁধতে জায়গা পেলে তাদের চাল-ডাল দিলে।'

'আমার মা-কে?'

'আঙাকাপড় দিলে বামুনরা। পরনের কাপড় ত্যানা হয়ে যেয়েছিল।'

'তা বাদে?'

'নতুন গোলঘরে (গোয়ালঘরে) মোদের ঠাঁই দিলে।'

'তা বাদে?'

মাচা থেকে শুকনো কাঠ, চাল-ডাল-তেল-নুনের সিধে, আনাজপাতি, মাছ। জল নেমে গেলে, যে-যার ঘরে গেল কিন্তু রূপসী আর তার মা-র জন্যে বড় আচার্যের কী ভাবনা, কী ভাবনা! ওদের মতো দুঃখী কে আছে? কে এমন গাঁয়ের একটেরেয় থাকে? কতদিন ধরে ওদের আগলে রাখলেন, তারপর নিজের মাহিন্দারের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দিলেন, বিয়ের পর বছর না

পরতে চিনিবাস হল। কিন্তু রূপসীর বরটা জ্বরে ভুগে মরে গেল।

'ও আয়ি, তা বাদে?'

'তুই হতেও দয়া ছিল, মন ছিল। এখন য্যামন মুড়ি দিয়ে বিদেয় করে দেয় ত্যামন নিমায়া ছিল না।'

চিনিবাসের দিদিমা মাথা নেড়ে আরো কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। আর তখনি ওরা ঢাকের বোল শুনতে পেল। ঢোলমোহর দিয়ে বড় আচার্য সকলকে যেতে বলছেন ওঁর বাড়িতে। কীর্তন, ঠাকুর সেবা, প্রসাদ বিতরণ, আর গৌরাঙ্গ দর্শন হবে। সবাই যাবে। দিবাকর চক্রবর্তীর মতো বামুন, চিনিবাসের মতো বাগদি, সবাই।

বাবা গো! সত্যিই বামুনরা সবাইকে ডাকছে, সবাইকে খেতে দেবে? চিনিবাসের দিদিমা কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। এ বান-ও যে সেই গঙ্গার বানেব মতো মনে হচ্ছে? সবাই এক জায়গায় দাঁড়াবে, বসবে, একসঙ্গে চিড়েমুড়ি ভাগ করে খাবে?

'চিড়েমুড়ি না রে আয়ি! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল, আর নারকেল ছাঁচিকুমড়োর বেন্নন! গয়লাবউ খাসা দই পেতেছে, জানলি?'

'যা মা কে যেয়ে বল গা, কাপড়-চোপড় যেন ক্ষারে সেদ্ধ করে। এটটু তেল আনতে পারিস? মাথাটা যেন সন্ন্যাসীর জট মা! এমন মাথা নিয়ে যাব কেমন করে?'

চিনিবাস যেন হাওয়ার আগে উড়ে মা কে খবর দিতে চলে গেল। রূপসী বারবার হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে। একি একটা সোজা কথা? ওঃ, তিনি যদি তার চিনিবাসকে মাথায় হাত দেন, আশীর্বাদ করেন! তা হলে তো সবাই জানবে চিনিবাসও মানুষ; রূপসীও মানুষ। আরেকজন আছেন এ গাঁয়ে, অহংকারে মাথা উঁচু করে বেড়ান। রূপসীর খুব ইচ্ছে করে গৌরাঙ্গাকে জিজ্ঞেস করে, কাউকে দিয়ে জিজ্ঞেস করায়, একটি অহংকারী পুরুষের এক সন্তান বাগদি বলে চিরদিন গরিব হয়ে থাকবে, ঘরের ছেলেটির শত ভাগের এক ভাগও পাবে না, এ কেমন বিচার?

রূপসীর মনে হতে লাগল যেন গৌরাঙ্গ এসে গেছেন, যেন চিনিবাসকে বুকে টেনে নিয়েছেন। যেন যত দুঃখ, যত কষ্ট, সব ঘুচে গেছে রূপসীর।

কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না।

শান্তিপুর-কাটোয়া হয়েই কুমারহট্টের পথ ধরতে হল। সন্ন্যাস নেবার ক-বছরের মধ্যে মানুষ যেন তাঁকে ঘিরে মৌমাছির মতো জমতে থাকে। মানুষের মাথায়-মাথায় থই-থই; সবাই দেখতে চায়, সবাই একবার পা ছুঁতে চায়।

কানা বলে আমায় ছুঁয়ে দাও, দিষ্টি হোক। খোঁড়া বলে পা-খানা ফিরে দাও ঠাকুর। কোলমরুনি ছেলে নিয়ে এসে পায়ে রাখতে চায়, ছেলে হয়ে বাঁচে না কেন তাই বলে দাও।

এমনি হাজার মানুষের হাজার বায়না। মানুষ শুধু আসতেই থাকল, আসতেই থাকল। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ যাত্রায় উনি চিনিবাসের গ্রামের কাছাকাছিও আসতে পারলেন না।

মানুষরা আচার্যবাড়ির সামনে কতক্ষণ বসে রইল। শুধু তো গৌরাঙ্গদর্শন নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেট ভরে যাবে বলে মা-ছেলে, বুড়োবুড়ী, কানা-খোঁড়া, অনাথ-আতুর সবাই এসে বসে রইল। আর তেমনি কি গুঁড়ি-গুঁড়ি বিষ্টি! আকাশকে কে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, 'জল ঢাল বাপু, তুমি মোটেই থেমো না।'

ওই বিষ্টিতেই বান হয়, একটানা প্রহরের পর প্রহর ভিজতে ভিজতে কে যেন কাকে বললে। সবাই আশায় আশায় বসে রইল কোনো-না-কোনো সময়ে পেসাদ দিতে ডাক আসবে।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে মুড়ি-বাতাসার ধামা নিয়ে মাহিন্দাররা মানুষের ভিড়ে নেমে এল। চিনিবাসরা কেউ উঠোনে ওঠেনি বটে, কিন্তু মাহিন্দাররা মিষ্টি গলায় বললে, 'তিনি যদি আসতেন, তবে তোমরা উঠোনে উঠতে বাপ সকল, আমরা ডেকে এনে বসাতাম। তা, তিনি তো আসেনি, এখন আর উঠোনে উঠে জলকাদা করে কী হবে বলো?'

'তা... মুড়ি বাতাসা দিচ্ছ কেন গো? পেসাদ পাব বলেছিলে না?'

'তিনি যদি আসত, তবে পেসাদ নিশ্চয় রান্না হত। ইদিকে কীত্তন হত, হতে হতে পেসাদ রান্না হত। তোমরা সবাই পেসাদ পেতে। জোগাড় ছিল, সরঞ্জাম ছিল, সবই ছিল গো! তা তিনি যখন এল না, তখন আর পেসাদ কেমন করে হয় বলো?'

'কিন্তুক, আমরা খাব বলে আশা করে এসিছি গো!'

'এই দেখো! এয়েছিলে তো সন্ন্যেসী দেখতে, খেতে এয়েছিলে?'

'হ্যাঁ গো।'

'নাও, তোমাদের সঙ্গে আমি বকতে পারিনি বাবু। ঠাকুর দর্শনের চেয়ে খাওয়াটা বড় হল? ওই জন্যে তোমাদের দুক্কু ঘোচে না জানলে বাছা? নাও, মুড়ি-বাতাসা নাও দিকি।'

'কী রাঙা রাঙা মুড়ি, বড় বড় বাতাসা, কিন্তু চিনিবাসের চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। ও তো জানে, সকাল থেকে থোড়, মোচা, লাউ, শাক, দুধ,

দই কত কী ভারে ভারে এসেছে। ভগবান জানেন কার জন্যে। এখন হঠাৎ চিনিবাসের ওর মা রূপসীর উপর রাগ হল।

'কেন এবার রান্নাপূজা করলি না রাক্কুসি? কেন, আমার পেট ভরে ভাত খেয়ে সাধ যায় না?

মা-কে মেরে ধরে শেষ করে মুড়ি-বাতাসা ফেলে দিয়ে চিনিবাস পালিয়ে গেল।

অনেক, অনেকক্ষণ সময় গেল। সন্ধের সময় চারিদিকে জোনাকি ফুটছে, ঘন অন্ধকার নেমে আসছে, চিনিবাসের দিদিমা চিনিবাসকে খুঁজে পেল মাঠের ধারে। জলে-ডোবা তালগাছটার ডগায় ও চুপ করে বসেছিল। কেঁদেকেটে অবসন্ন, ঘুম পাচ্ছে, ভূতেরও ভয় করছে।

'আয়ি আমার হাত ধরো।'

দুজনে জল ছপছপ করতে করতে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে চিনিবাস বলল, 'গৌরাঙের বানের চে' সে বান ভালো রে আয়ি! তেমন বান আর আসে না? সেই যে, যেমন বানে চিড়ে-মুড়ি-চাল দেয় এত? দুক্কু ঘুচে যায়?'

পুণ্যি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

—পুণ্যি, পুণ্যি-ই।

অভ্যস্ত চাপা গলায় সিঁড়ির বাঁক থেকে ডাক ভেসে এল।

—আসচি, আসচি। কী? এই কটা মাত্র রুটি। তুই যা, আমি এলাম বলে।

রান্নাঘরের জানলার পাশ দিয়ে সিঁড়ি। তিনতলা আর চারতলায় যাবার জন্যে। এবং অবশ্যই একতলায়। সেদিকে আর একবার তাকিয়ে দ্রুত কাজ সারতে লাগল পুণ্যি। টেবিলে রাখল রুটির কাসারোল। আঙুলে ঢোকাল সদর দরজার চাবির রিং। তারপর হাওয়াই চপ্পলে পা গলিয়ে, দরজা টেনে সোজা দৌড়ে একতলায়। সে জানে লতি কোথায় বসে।

এই সরকারি আবাসনের বাড়িগুলি চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যেন পাহারা দিচ্ছে মাঝখানের ওই ছোট পার্কটাকে। পার্ক না বলে বাগান বললেও চলে। অযত্নের বুনো বাগান। ওখানেই একটা কোণের বেঞ্চিতে লতি আজকাল দু'জনের আসন সংরক্ষণ করে। লতির কাজ কম। বুড়িমার জন্য দু'জন মাসি পালা করে আসে। নাইট মাসি আসার আগেই লতির সামান্য স্যাপ-টুপ করা হয়ে যায়। তুলনায় পুণ্যির কাজ ভারি। এ বাড়িতে কর্তার আর গিন্নির খাবার আলাদা। জলখাবারের টাইমও ভিন্ন। দু'জনেরই আপিস। একটাই ছেলে, বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে। বড় ছুটিতে সে বাড়ি এলে, পুণ্যির কাজ বেড়ে যায়। তবুও এখানে কত আরাম! বাড়ির ড্রয়িং কাম ডাইনিং স্পেসটা সারাদিন এখন পুণ্যির দখলে। বাথরুমের দরজায় তালা না পড়লে লুকিয়ে চানটাও সারা যায়। সেখানে গন্ধ-সাবান, ফোয়ারা জল, আরো কত কী! দুপুরে টেবিল চেয়ারে বসে কলাই করা থালায় ভাত খেতে খেতে খুব জোরে টিভি চালিয়ে *হিন্দি 'বই' দেখা— এত সুখ আগে কখনো ভাবতে পেরেছিল সে? ভাগ্যিস* দিদিটা নিজের বিয়ে ঠিক করেই তাকে এনে এ বাড়িতে লাগিয়ে দিল! না

হলে পুণ্যির সাধ্য কী— এখানে আসে। লেখাপড়া জানে না, রাস্তা চিনতে পারে না, গাঁ থেকে শহরে এসে চোখ যেন ঝলসে যায়।

লীনা একদিন কথাটা পাড়ল অর্কর কাছে,—শুনছ, পুণ্যি যেরকম সিড়িঙ্গে লম্বা হয়ে উঠছে দিনকে দিন, এবার চৈত্র সেলে ওকে শাড়ি কিনে দিলে হয়। কী বলো?

—হয়। সোফায় হেলান দিয়ে ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছিল অর্ক। টিভি খোলা। বিবিসি নিউজ একটু পরেই শুরু হবে।

—আচ্ছা, আজকাল ও বাড়ি যাবার নাম করে না কেন বলো তো? ওই যে তিনতলার মাসিমার কাছে নতুন মেয়েটা কাজ করছে—ফরসা, মোটাসোটা— মালতী না লতি, কী যেন নাম— ওই মেয়েটার সঙ্গে পুণ্যি সবসময় মেশে আজকাল। দু'জনে ফিসফিস করে কথা বলে। ওই মোটা মেয়েটা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। বয়েসও ঢের, আর খুব ঘোড়েল। ওর সঙ্গেই পুণ্যির অত মেশামেশি কীসের?

—মিশতে দিও না, মানা করে দিও। আলগোছে বলে অর্ক।

—মানা করে দিলেই শুনবে? আমি তো আপিস যাই তুমি বেরোবার আধঘন্টা বাদেই। তারপর সারাদিন ও কার সঙ্গে মিশছে, কী কথা বলছে— কে দেখতে আসবে? সিকিউরিটিকে অবশ্য বলা আছে— ফ্ল্যাটে বাইরের লোক যেন না ঢোকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। ওদের দু'জনকে আমার টিপ্‌স দেয়া থাকে মাসের প্রথমেই। কিন্তু কাজের মেয়েগুলির মধ্যে তো আর তফাৎ করতে বলা যায় না।

সমাধান সূত্র বেরোনোর আগেই অবশ্য লীনাকে নিরস্ত হতে হয়। বিবিসি'র খবর শুরু— অর্কর চোখ সেখানে সেঁটে গেছে। বাথরুমে ঢুকে পড়ে লীনা।

পুণ্যির আসল নাম পূর্ণিমা। পদবি হালদার। কালো, রোগা, লম্বা, হাড়জিরজিরে মেয়েটা অসম্ভব মুখরা। রেগে গেলে খট্ খট্ করে, চেঁচিয়ে কথা বলে। গাঁয়ে থাকতে তো হাতে কলমে ঝগড়া করা শিখেছে, তাই। মা ওকে খুব মারে। এত কালো আর এত লম্বা যে বিয়ে দেওয়া গরিব বিধবা মায়ের পক্ষে অসম্ভব। তার ওপরে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে স্বভাবটা হয়েছে জংলি। শহরে এসে ও এই প্রথম পেনি আর প্যান্টি পরল। প্যান্টি পরে ওর প্রথমদিন মনে হয়েছিল যেন কিছুই পরেনি; ওটা এত মসৃণ যেন চামড়া। কুচি দেওয়া কাপড়ের ইজের অল্পসময়ে কোথায় আর খুঁজবে লীনা। মাইনের টাকা প্রতিমাসে এসে নিয়ে যায় পুণ্যির মা। ওর দিদিরটাও নিত প্রথম প্রথম, পরে আর পারত না অবশ্য। দিদির শেষপর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেছে নিজের চেষ্টায়। কিন্তু

পুণ্যির তো কাউকে জোটাবার যোগ্যতাও নেই। বাবুদের বাড়িতে থেকে ভালো খাবার-দাবার পাচ্ছে, পরবার জামা কাপড়, তেল সাবান পাচ্ছে। একটু চা চিনিও এদিক ওদিক করতে পারে। যে ক'দিন এভাবে রস শুষে নেওয়া যায়, সে ক'দিনই লাভ।

একদিন সন্ধেবেলা বেরোবার আগে পুণ্যিকে আটকাল লীনা — পুণ্যি শুনে যা এদিকে। অনিচ্ছার সঙ্গে এসে দাঁড়াল পূর্ণিমা।

—শোন, তোকে এবার প্রিন্টেড শাড়ি কিনে দেব। আর পেটিকোট, ব্লাউজ। এখন থেকে শাড়ি পরবি। লম্বা লম্বা ঠ্যাং, ফ্রক পরলে আর মানায় না। আচ্ছা বল তো, কী রঙ তোর পছন্দ—

—আমি শাড়ি পরব না! চেঁচিয়ে ওঠে পুণ্যি, শাড়ি পায়ে আটকে গেলে দৌড়নো যায় নাকি?

—তাহলে সালোয়ার কামিজ পর, সে তো আর আটকাবে না?

—তুমি ভাবছ, বাড়িতে ওই শালোয়ার-সেট ছিল না? দিদিরগুলো তো পড়েই আছে। আমি জামা ছাড়া আর কিছু পরতে পারি না, গরম লাগে।

—তাহলে পুজোয় দেব, শীতে পরবি?

এবারে হেসে ফেলে পুর্ণিমা,— জামা টেনে পা দুটো ঢাকা দিয়ে বসি। আর একটা চাদর হলেই গায়ে আর শীত নেই, 'অন্য' কিছু লাগে না। এখন আমি নিচে যাচ্ছি।

আবার এক রবিবারে পুণ্যিকে নিয়ে পড়ে লীনা। ধমকায়। ঠান্ডা-গরম ডোজ।

—আচ্ছা, আগে এত টিভি দেখতিস, এখন কী হল হঠাৎ? খালি নিচে থেকে ডেকে পাঠাতে হয় কেন? কী করিস, কার সঙ্গে নিচে এত আড্ডা? ওই মালতীটা তোর চেয়ে ঢের বড়, ওর সঙ্গে কী এত জরুরি কথা, শুনি?

জবাব দেয় না পুর্ণিমা। কিচেনে ঢুকে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিজের ড্রয়ার খুলে বসে। তার নিচের তাকে বিছানাপত্র, ওপরের তাকে দু-একটা জামার পাশে সাজার জিনিস, সংখ্যায় বাড়ছে ক্রমশ। আয়না বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখ দেখে। তারপর নীচু হয়ে পায়ের আঙুলের চুটকি সরিয়ে নড়িয়ে নেলপালিশ লাগায় দশ আঙুলের নখে। খানিক পরে লীনার উদ্দেশে বলে— বউদি, এবার পুজোয় আমার 'সিলকেটিক' শাড়ি চাই। বেলাউজ আর শায়া মেচ্ করে দেবে।

লীনাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আটা

হাসতে থাকে পুণ্যি। রুটি করে, টেবিল সাজায়। তারপর টুক করে দরজা খুলে 'আসচি' বলেই দরজা টেনে পালায়।

রাতে খাবার পর ড্রয়িংরুমে পুণ্যি নিজের বিছানা ছড়িয়ে নীল মশারি খাটিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লে লীনা নিজের ঘরে ঢোকে। ঢুকে দেখে অর্ক ফোনে কথা বলছে। ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করে সে। তারপর পুণ্যির শাড়ি-প্রস্তাব সবিস্তার বলে বরকে। অর্ক এই প্রথম মন দিয়ে ঝি-সংবাদ শুনল। শুনে মন্তব্য করল— তুমি ওকে সঙ্গে নিয়েই দোকানে যাও না; স্টেশনের দিকের দোকান থেকে শাড়ি-টাড়ি কিনলে তোমার বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবে। সিনথেটিক শাড়ি তো নানারকম আছে।

–বাজেটের কথা নয়। ও কী ভেবে শাড়ি পরার সিদ্ধান্ত নিল, সেটাই কথা। আর কে ওকে পেছন থেকে চালাচ্ছে, সেটা ভেবে দেখেছ?

— ওসব ভাবা-টাবার সময় আমার নেই। কালকে আধঘন্টা আগে আমাকে বেরোতে হবে। আর হ্যাঁ, টিফিন যেন না করে, বাইরে লাঞ্চ আছে।

পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে অর্ক। লীনা চুল বেঁধে, দাঁত মেজে, নাইটি পরে, মুখে ক্রিম ঘষে একঘন্টা কাটিয়ে দিল। তারপর মেজেয় টান হয়ে বসে মেডিটেশনের চেষ্টা করল। বরের কল্যাণ, ছেলের মঙ্গল প্রার্থনা করল দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে। তারপর শুয়েও ভালো ঘুম হল না রাতে।

পুজোর কদিন আবাসনে হইচই। পুজো, অঞ্জলি, কমিউনিটি-ভোজ। প্রথমদিনে খিচুড়ি অষ্টমীতে লুচি আর নবমীর দিনে? সে-দারুণ মেনু। গরম ভাতে গাওয়া ঘি, আলুভাজা, পোস্তবড়ি দিয়ে শুক্তো, ধোঁকার ডালনা, চাটনি, পায়েস আর পানতুয়া। কিন্তু পুণ্যিকে কোথাও দেখতে পেল না লীনা। দুপুর গড়িয়ে গেলে ফ্ল্যাটে ঢুকল সে। লীনাকে বলল, রাতে ঠাকুর দেখতে বেরোবে, বন্ধুদের সঙ্গে। লীনা ইতস্তত করে বলল, তুই তো কলকাতার রাস্তাঘাট কিছু চিনিস না। রাত্রি করে এই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবি না তো? আর ফিরবি কখন?

প্লাস্টিক থলেয় কিছু ঢোকাতে ঢোকাতে পূর্ণিমা জবাব দিল, তার বেশি রাত হবে না।

---এগারোটার আগে নিশ্চয় করে ফিরিস। গেট বন্ধ হয়ে গেলে খোলাতে মুশকিল হয়। তোর চাবিটা রেখে যাবি। বেল বাজাস, আমি দরজা খুলে দেব। কালকে আবার দশমী, নারকেল নাড়ু আর কুচো নিমকি বানিয়ে রাখতে হবে।

প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে পুণ্যি বেরিয়ে গেল।

সন্ধেবেলা চাবি হাতে সামনে এসে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে যায় লীনা। এ কোন্ মেয়ে? তারই দেওয়া লাল শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে সে, কিন্তু ভেতরে যে দেখা যাচ্ছে প্যাডেড গোলাপি ব্রেসিয়ার! চুল উল্টে বাঁধা বিশাল খোঁপা, মুখে পাউডার, ঠোঁট লাল, পায়ে হিলতোলা চটি, কানে গলায় ইমিটেশন গয়না।

কোথায় পেলি এসব, কার থেকে নিয়েছিস, বল্? মুখ লাল করে জিজ্ঞেস করে লীনা।

—সবিতা সাজিয়ে দিয়েছে।

—কে সবিতা? কোথায় থাকে?

—অইধারে। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে পুণ্যি। তারপর ঠক্ করে চাবিটা টেবিলে রেখে দরজার দিকে এগোয়, হাতের মুঠোয় লাল রুমাল।

—শোন্, এগারোটার থেকে যদি এক মিনিট দেরি হয়—

আবার ঠক্ করে দরজার লকের আওয়াজ, পুণ্যি বেরিয়ে যায়।

লীনা সন্ধেবেলা নিচের ফাংশানে গেল না। ম্যাজিক, গান, বাজনা আর ছোট ছোট দলে তুমুল আড্ডা— সঙ্গে কোক্, পেপ্সি বা ভাঁড়ের চা। বারান্দার ধার থেকে দেখতে লাগল পার্কের ছোট গাছগুলিতে টুনি বাল্ব জ্বলছে— সবুজ লাল, সবুজ— কী অর্থ এই ডিজাইনের?

সাড়ে দশটায় অর্ক ওপরে এলে চুপচাপ রুটি তরকারি খেল দু'জনে। লীনাকে গম্ভীর দেখে দু'চারটে প্রশ্নও করল অর্ক, খোঁজ নিল অনুষ্ঠানে সে যায়নি কেন। উত্তর না পেয়ে এক সময়ে অর্ক শুতে চলে গেল। সোফায় বসে লীনা দেখতে থাকল একবার টুনি বাল্ব আর একবার দেয়ালঘড়ি— সাড়ে এগারো বারো, এক, দুই, আড়াই— পৌনে তিনটের সময় আলো নিবিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল লীনা।

পরেরদিন বেলা দশটা নাগাদ বেল বাজল। পুণ্যি। কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। বিধ্বস্ত, কিছুটা যেন ত্রস্তও।

—কোথায় ছিলি সারারাত, হতচ্ছাড়ি?

—সবিতার বাড়ি।

—সেটা কোথায়?

ঠিকানা বলতে পারে না সে, কিন্তু বাড়ি চেনে। কেমন বন্ধু? এমনি বন্ধু। কত বয়েস, কী করে? পুণ্যির বয়েস, কাজ করে। কী কাজ? অতশত জানে না সে।

লীনার ইচ্ছে হল সেই মুহূর্তে পূর্ণিমাকে বিদেয় করে দেয়। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ভেতরে। অথচ সাহস পায় না। তিনদিন পরে আপিস খুলে যাবে। দু'মাস পরে শীতের সময় ছেলে ফিরবে ছুটিতে। এমন বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য পরিচারিকা কোথায় পাবে সে? চাকরি ছেড়ে বাড়ির কাজ? মাসান্তে এতগুলি টাকা, রোজ ঘরে ফিরে শরীরের বিশ্রাম, মনের আরাম। অথচ মেয়েটা—চোখে অন্ধকার দেখে লীনা। মাথা ঘুরে ওঠে। সামনে ভাসতে থাকে অসংখ্য টুনি বাল্‌ব, লাল সবুজ, সবুজ লাল, শুধুই লাল।

পূর্ণিমা একটু অপেক্ষা করে তারপর আস্তে আস্তে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। দরজা আড়াল করে শাড়ি খুলে রেখে ফ্রক পরে। উবু হয়ে বসে নিচু কলটায় মুখ হাত পা ধোয় নিঃশব্দে। তারপর কড়াইয়ে তেল চাপিয়ে বেগুন কেটে ছেড়ে দেয়। কাঁচা তেলে আওয়াজ হতে থাকে চড়্‌চড়্‌ করে। লীনার প্রায় অসাড় শরীরে শুরু হয় রক্ত চলাচল। দ্রুতপায়ে সে সরে যায় নিজের ঘরের দিকে।

এখন থেকে বেশ কিছুক্ষণ লীনা একা ঘরে থাকবে। ইচ্ছে হলে কাঁদতেও পারে, অনেকক্ষণ, ফুঁপিয়ে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। কেউ জানবে না।

নাট্যারম্ভ

নবনীতা দেব সেন

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

"মা, এই যে, পুপ্‌সিকে দেখতে চেয়েছিলে? পুপ্‌সি, এই যে, আমার মা।" একহাতে কালো হেলমেট, অন্য হাতে ডেনিম জ্যাকেট, কাঁধে ভারী ক্যামেরার ব্যাগ---সব সামলে পুপ্‌সি নিচু হয় ববির মাকে প্রণাম করতে। বন্দনা দু'পা পিছিয়ে যায়। "থাক থাক। হয়েছে।" পিছোবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এটা তো ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। বন্দনা নিরুপায়। কোনোটাই স্বেচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নয়। এই যে পুপ্‌সিকে দেখতে চাওয়া সেটাই কি আর স্বেচ্ছাকৃত? নেহাৎ না দেখলেই আর চলছিল না, তাই চাওয়া। বিশ্বসুদ্ধু প্রত্যেক দেখেছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, রবির অফিসের কলিগরা, কেউ বাকি নেই। পথেঘাটে, রেস্তোরাঁয়, নন্দনে, অ্যাকাডেমিতে, মিটিঙে মিছিলে সর্বত্র দু'জনে জোড় বেঁধে পরিদৃশ্যমান হবি তো হ, সমস্ত বন্দনাদেরই চেনা লোকেদের সামনে। একমাত্র বন্দনাই দেখেনি। রবিও না। তাই আজ নেমন্তন্ন করেছে। ববি বন্দনাকে জানিয়েছে এই মেয়েকেই সে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়। আর তো না দেখে উপায় নেই। তাই ডাকা।

পুপ্‌সি নামটাও যেমন বিতিকিচ্ছিরি, অনেকটা পেপসি কোলার মতন, ওর ভাবভঙ্গিও ঠিক তেমনি। ছোট করে ছাঁটা প্রায় ছেলেদের মতন চুল, কালো টী শার্ট আর ব্লু জিন্‌স পরনে, পায়ে সুতি মোজার সঙ্গে কাদামাটে ময়লামতন গোব্দা একজোড়া বিশ্রী ন্যাকড়ার জুতো। ববিরও আছে ঠিক ঐ জিনিস। দাম নাকি চারশো-পাঁচশো টাকা---কী যে দরকার অমন যাচ্ছেতাই চেহারার বস্তু অত দামে কেনবার তা বন্দনা বোঝে না। ঐ দামে চমৎকার চামড়ার জুতো হয়ে যায়। দু'খানা মোটরবাইকে চড়ে ভট্‌ভট্ শব্দে পাড়া কাঁপিয়ে ববি আর পুপ্‌সি প্রেম করে বেড়াচ্ছে। বন্দনা আর রবিরও তো বাপু প্রেম করেই বিয়ে? কই

এমন হতচ্ছাড়া বেহায়াপনা তো ছিল না? চুপিচুপি, কেউ যাতে না দেখতে পায়, কাকপক্ষীতেও না টেরটি পায়, এমনভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করতো। তবেই না প্রেমের মজা? আর এরা? এদের প্রেমের দাপটে দেশসুদ্ধু লোক অস্থির। কেবল ববি কেন জানি না পুপ্‌সিকে এই তিন বছরে একবারও বাড়িতে আনেনি। এবার ডেকে পাঠিয়েছেন বন্দনা।

বন্দনা পিছিয়ে গেল, পুপ্‌সিও আর তেড়ে এল না, প্রণামের ভঙ্গি করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একগাল হাসল, যেন কী অপরূপ কীর্তিটাই না করেছে সে বন্দনার ছেলেটিকে হাত করে।

—"হয়েছে, হয়েছে। বোসো।" বলে বন্দনা সোফা দেখায়। ইতিমধ্যেই পুপ্‌সি ব্যাগ রেখে বন্দনাদের পেটমোটা মিনিবেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়েছে এবং অদ্ভুত সব ভাষাতে তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করেছে। মিনিও নেহাৎ বিশ্বাসঘাতিনীর মতো, আরামে গুরগুর শব্দ করছে।

—"কি রে? বোস। মা বসতে বলছে না?" আরেকবার ধাক্কা লাগে বন্দনার। ববি পুপ্‌সিকে 'তুই' বলল। তাদের সময়ে 'তুই' বলা মানেই 'বন্ধুত্ব' ছিল আর 'তুমি' মানেই 'সংশয়জনক' অবস্থা। তবে হ্যাঁ, পাড়ার দাদারা অনেক সময়ে তুই-তোকারি করলেও প্রণয়দৃষ্টিতে তাকাতো বটে। কিন্তু ববি তো দাদা নয়, সমবয়সী। বরং ক'দিনের ছোটই হবে। পুপ্‌সি ধুপ করে বসে পড়ল। সুন্দর কাচের টেবিলে লেসের শোভাটা না দেখেই তার ওপরে ধ্যাবড়া বড় হেলমেটটা চাপিয়ে দিল। তারপর পাশের আসনটা থাবড়ে ববিকে বলল, 'তুইও বোস?" বন্দনার আর অবাক হবার কিছু নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে অবিশ্যি মেয়েটাকে খুব একটা খারাপ দেখতে লাগে না। একটা আলগা চটক আছে। বয়েসের একটা লাবণ্য তো থাকবেই। মোটা চশমার আড়ালে হলেও, চোখদুটি বেশ। ঝকঝকে, হাসিভরা। না, হাসিটা সত্যিই মিষ্টি। দাঁতও বেশ সাজানো। রংটা যদিও চাপার দিকেই বলতে হবে (বন্দনা টকটকে ফরসা), নাকও খুব একটা টিকোলো নয়, তবে হাতের আঙুলগুলো লম্বা লম্বা আছে, নোখগুলো পরিষ্কার করে কাটা, রঙ মাখানো নয়। চশমার ওপরে কোঁকড়াচুল ঝামরে পড়ছে, অর্থাৎ বতটুকুনি চুল আছে। ছেলেদের মতো করে ছাঁটা চুল বন্দনা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এইই ছিল তাদের কপালে? এই নাকি মুখুজ্যেবংশের বড় বউ? পরনে কালো গেঞ্জি, আর রং ওঠা ব্লু জিনসের পেন্টুলুন? অন্তত আজ একটা শাড়ি পরতে পারতো না? হাত শূন্য। কানে ফুটো নেই। মুখে রংটং নেই। ঠিক ববিও যেমন, এই মেয়েও তেমনি। ঘেমো, ক্লান্ত চেহারা। সারাদিন আপিস করে এসেছে। রাত ন'টার সময়ে।

রবি স্নান করে ঘরে এল।

—"বাবা, পুপ্‌সি।" পুপ্‌সি আবার প্রণাম করতে উঠে দাঁড়ায়। নীচু হয়। রবি সরে যায় না। মাথায় হাত দেয়। "থাক থাক" বলে মুখে। রবির ঠোঁটে পাইপ, পরনে পাজামার ওপর কমল মিত্র টাইপের ড্রেসিং গাউন। পুপ্‌সি স্পষ্ট চোখে চেয়ে দ্যাখে। লম্বা, সুপুরুষ, পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ। এই ববির বাবা? ববি তো রোগা, বাতাসে ফিনফিন করছে। একমুখ দাড়িগোঁফ চুলটুল মিলিয়ে একশা। বড় বড় চোখ দু'খানাই শুধু দেখা যায়। রবি একটা সোফায় বসে পড়ে বলে, "বোসো। সো? হাউ ডিড ইওর ডে গো?" বলেই খুদে কীসব যন্তরপাতি বের করে পাইপটা খোঁচাখুঁচি শুরু করে রবি! ওটা ওর খুব সুবিধে। বন্দনা কী করবে? একটা বোনাও নেই ছাই হাতে, যা গরম। "আমি যাই বরং তোমাদের খাবার গরম করি, রাত হয়ে গেছে, ফিরতে দেরি হয়ে যাবে তোমার—" বলে বন্দনা উঠে পড়ে।

—"এখুনি খাওয়া কী? এই তো এলাম?" চটপট বন্দনার ছেলের প্রেমিকার উত্তর।

—"কোয়াইট রাইট! এখুনি খাওয়া কী? তোমার ভালো নাম কী পুপ্‌সি?" রবি বলে।

—"কারুবাকী। কারুবাকী দাশগুপ্ত।"

—"বা। বা। বা। হুম।" আর কথা নেই। ঘর স্তব্ধ। পাখা ঘুরছে। আপনমনে নুয়ে পড়ে কোলের মিনির সঙ্গে বাক্যালাপ চালিয়ে যায় কারুবাকী দাশগুপ্ত। অবশেষে রবি বলে :

—"তোমার বাবা—"

"বেল টেলিফোনে। ন্যু জার্সিতে। আমার মা এখানে। পড়ান।"

—"বেশ। বেশ। বাঃ। তোমরা ক' ভাইবোন?"

—"আমি একা।"

—"একা? ওনলি চাইল্ড? আই সী!" রবিকে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তিত দেখায়। পাইপটা মুখে গুঁজতে চেষ্টা করে সে।

—"ববির চেয়ে বেশি স্পয়েল্ট নই।" ধরে অ্যাটম বোমা ফেলার মতো বলে দেয় পুপ্‌সি, এক মনে বেড়াল আদর করতে করতে। "এ্যাই যে, পুসিমনি, তুই অবশ্য সবচেয়ে বেশি স্পয়েল্ট।" এবার বন্দনা এগোয়। "তা বটে! ববি খুব অলস।"

—"তোমরা তো পাম এভিনিউতে থাকো?"

বাজে প্রশ্ন। পুপ্‌সি উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করে না।

—"রাত বাড়ছে, ওকে তো একা একা ফিরতে হবে অতটা রাস্তা? আমি খাবার দিয়ে দিচ্ছি। এ্যাতো দেরি করে এলি।" সঙ্গে সঙ্গে ববির চটপট উত্তর এল—

—"আগে এলেই বা কী হতো? বাবা তো এই এলেন।"

—"তুমি রান্নাবান্না জানো পুপ্‌সি?" টেবিল সাজাতে সাজাতে বন্দনা জিজ্ঞেস করে।

—"ঐ একটু আধটু—কাজ চালানোর মতো। আমি হেল্‌প করবো?" তিড়িং করে উঠে পড়ে পুপ্‌সি। "আমি টেবিলটা সেট করে দিচ্ছি। তুমি খাবারটা গরম করো। ববি, এদিকে আয় তো?" তুমি! এই তো প্রথম দেখা। এখনি তুমি? কী গায়ে পড়া মেয়ে রে বাবা. ভাগ্যিস তিন বছর ধরে এ-বাড়িতে তেড়ে আসেনি।

টেবিল বেশ পাকা হাতেই সাজিয়ে ফেলল। দিবি গল্প করে আড্ডা মেরে হাসি ঠাট্টা করে খেল. যেন কত জন্মের চেনা! এসব মেয়েরা আশ্চর্য বেহায়া! জানে তো "এরাই আমার শ্বশুর শাশুড়ি হবে?" একটা লজ্জা সংকোচ ভয় নেই!

খাওয়াটা খুবই কম। ঐ আচারটাই যা চেয়ে নিয়ে খেলে, আর আলুভাজাটা। মাছটা খেয়ে জিজ্ঞেস করলো— "মাছটা বুঝি সর্ষে. নারকোলের দুধ দিয়ে করেছো?"

রবির সঙ্গে খুব জমে গেছে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। রবির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে গলে গেছে। অথচ প্যান্ট পরা, গেঞ্জী গায়ে. হেলমেট হাতে. নোংরা ন্যাকড়ার জুতো পায়ে. ছেলেদের মতো মুড়িয়ে চুলকাটা মেয়েকে মুখুজ্যেবাড়ির বড় বউ করতে রবিরই ঘোর অমত ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক। কি জানি, এই ব্যবহারটা ও মন থেকে করছে, না ভদ্রতা করছে। বন্দনা অতশত বোঝে না। কোম্পানির অফিসারদের নানারকম কৃত্রিম ভব্যতার অভ্যেস থাকে। বন্দনার ওসব ধাতে নেই। ওর মন যা চায় না ও তা কিছুতেই করতে পারে না। হঠাৎ খাবার টেবিলে যেন যুদ্ধ বেধে গেল। প্রচণ্ড তর্ক লেগে গেছে বুশ আর সাদ্দামকে নিয়ে। রবি একদিকে। পুপ্‌সি আরেক দিকে। ববি বাবার মুখের ওপর কথা বলে না। ববি চুপ। পুপ্‌সি মুখে মুখে তর্ক করছে—রবি একদম তর্ক সহ্য করতে পারে না। বন্দনা থামাতে চেষ্টা করবে কি? বন্দনার ভয় করছে। ফের হঠাৎ তর্কটা শেষ হয়ে গেল। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল। আবার হাসিঠাট্টা। গল্প। যাক। বাঁচা গেছে। এখন মেয়েটা বাড়ি গেলেই তো হয়। রাত এগারোটা বাজে। ববি নিশ্চয়ই বলবে —

"পৌঁছে দিয়ে আসি।" অর্থাৎ ফিরতে সেই রাত বারোটা। কিন্তু না, মেয়েটা রাজী হলো না ববিকে সঙ্গে নিতে। বলল, —"কিস্যু ভাবনা করিস না। হুশ করে চলে যাবো। পৌঁছে ফোন করে দেবো।" তা হুশ করেই গেছেন তিনি। পনেরো মিনিট যেতে না যেতে ফোন এসে গেল। রাত্রে শুয়ে রবি বলল, "না, মেয়েটা বেশ ব্রাইট আছে।" বন্দনা বলল "একটু-আধটু রান্নাও জানে, মাছটা খেয়ে বলতে পারলে, কী মশলায় রাঁধা।"

প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা বেল বাজালো। বন্দনা খুলল।

—"নমস্কার। আমি কারুবাকীর মা— শমিতা দাশগুপ্ত।"

—"আমি বন্দনা মুখার্জী। আসুন, ভিতরে আসুন।" আঙুলে গাড়ির চাবি, চটি ঘষতে ঘষতে শমিতা ঢুকল। বন্দনা নিজের বাড়িতে ওর চেয়ে ঢের বেশি পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে একটা সিল্কের শাড়ি পরে আছে। শমিতার পরনে একটা চটকানো ডুরে শাড়ি। খোঁপাটা একপাশে খানিকটা খুলে ঝুলছে। চোখে চশমা। ঘেমোকপালে একটা বড় কুমকুমের টিপ। গয়নাগাঁটির বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, হাতে কানে গলায় যেখানে যা থাকা। কাঁধে দুটো প্রকাণ্ড থলি। একটা বোধহয় এককালে বেশ দামি ভ্যানিটি ব্যাগই ছিল, এখন চামড়ার বস্তার মতন দেখাচ্ছে। অন্যটা বস্তাই। চটের ঝোলাভর্তি কাগজপত্র। ঢুকেই একগাল হাসল শমিতা। মেয়ের মতো, মায়েরও দেখি বেশ বিনা কারণে হাসার অভ্যেস। রবিকে ডাকে বন্দনা। পাঞ্জাবি পাজামা পরা, ভদ্র, স্নান করা রবি বেরিয়ে আসে। "নমস্কার, নমস্কার। বসুন?" বোঝা গেল, মাকে দেখে রবিও আশ্বস্ত। তবু ভালো। মেয়ের মতন চুলছাটা প্যান্টপরা নয়। বলা যায় না। ডিভোর্সির বউ বলে কথা। অনেককাল নাকি বিলেতে ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাস্টারি করে, আবার কবিতা লেখে। প্রেমে পড়বি তো পড় ববি এমনই মেয়েকে পাকড়ালো, যার সবরকমের 'দোষ' আছে। একে তো অসবর্ণ বিয়ে, বদ্যির সঙ্গে বিয়ে এ-বংশে আগে হয়নি। মেয়ের ইঞ্জিনিয়ার বাপের আবার দুটো বিয়ে। ছাত্রাবস্থায় প্রথম বউ নাকি জার্মান মেয়ে ছিল। ডিভোর্সের পর এই বিয়ে। মেয়ের দিদিমারও নাকি দুটো বিয়ে। তারা আবার ব্রাহ্ম। বালবিধবার বউয়ের শ্বশুরই নাকি বিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয়বার। সে বালবিধবাই হোক, আর যাই হোক, বিয়েটা তো হয়েছে দু'বারই। আত্মীয়স্বজন তো ছেড়ে কথা কইবে না। মেয়ের মা কেমন হবে, মনে মনে বেশ উদ্বেগই ছিল। তা, ভয়ের কিছু আছে বলে দেখে তো মনে হচ্ছে না। দেখতে শুনতে

স্বাভাবিকই, কেবল একটু খ্যাপাটে আছে বোধহয়। জীবনে প্রথমবার আলাপ করতে আসছে হবু বেয়াইবাড়িতে। কবি বলেই কি এমন আলুথালু হয়ে আসতে হয়। বেয়াইবাড়িতে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে তো?

—"এই নিন। • .ছের কচুরি। আপনারা মাছের কচুরি খান তো?" বস্তা থেকে একটা টিফিন বাক্স বের করল শমিতা। ন্দনাকে দিল। রবি বলল, "হুইস্কি, রাম, কিছু চলবে? বীয়ার?"

—"নাঃ। ওসব ভালো লাগে না। থ্যাংক ইউ। শরবৎ হবে এক গেলাস? বাপ রে যা গরম!" —"নিশ্চয়ই!" বন্দনা উঠে গেল শরবৎ করতে।

—"তা, বলুন এবারে—আপনারা কিছু ভাবলেন?" শমিতার সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে রবি ভুরু কুঁচকোলো।

—"আমরা? আমরা আবার ভাববো কী? আপনিই তো মেয়ের মা। আমরা তো আশা করছিলুম আপনিই যোগাযোগ করবেন। তাই তো করবার কথা।"

—"কথা আবার কী?" শমিতা চোখ পাকায়। —"এটা কি সম্বন্ধ করে বিয়ে হচ্ছে, যে 'ছেলের বাড়ি—মেয়ের বাড়ি' এসব থাকবে? দেখুন ভাই, সম্বন্ধ করলে আমি কিন্তু কখনোই আপনার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ করতুম না। অতটুকুনি ছেলে। যতই সে ব্রিলিয়ান্ট হোক, সবেমাত্র কাঁচা চাকরিতে ঢুকেছে, শরীরস্বাস্থ্য তো তালপাতার সেপাই—মেয়ের চেয়ে পুরো সতেরো দিনের ছোটো! সম্বন্ধ করে এমন কচি পাত্র কেউ যোগাড় করে? আরে. বয়স্ক, আরেকটু পাকা চাকরিতে এস্টাব্লিশড্ পাত্র খোঁজে লোকে। শক্তপোক্ত, পরিণত তাই না? যদিও রবি ছেলেটাকে আমরা ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি, ওর গুণের শেষ নেই, তবু ওকে ঠিক 'পাত্র' 'পাত্র' মনে হয় না। আর সম্বন্ধ করলে আপনিও নিশ্চয়ই ঘটক লাগিয়ে আমার মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেন না ঘরের বউ করবার জন্যে? একে তো আপনার ছেলের সমানবয়সী, তায় ছেলেদের মতন হাবভাব। চুলছাঁটা, প্যান্ট পরা, দিন নেই রাত নেই মোটর সাইকেলে গাঁক গাঁক করে শহর চষে ফেলছে! চাকরিটাও এমনই, যে রিপোর্টিং করতে আজ এখানে কাল ওখানে যত্রতত্র ছুটতে হয়। তায় আমরা বদ্যি, আপনারা ব্রাহ্মণ। আমার মায়ের আবার বিধবা-বিয়ে হয়েছিল। ওর বাবারও একটা ডিভোর্স হয়েছিল— বাঙালীসমাজে এমনটি তো খুব লোভনীয় সম্বন্ধ নয়? বলুন? সম্বন্ধ করলে আপনিও আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেন না, আমিও আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতুম না। এতে সন্দেহ নেই। তবে সম্বন্ধটা তো পাত্রপাত্রীই

করেছে। সো লেট আস মেক দ্য বেস্ট অফ আ ব্যাড সিচুয়েশন—কী বলো ভাই বন্দনা? তুমিই বলছি, আমি বয়েসে বড়ই হবো।" বন্দনা আবার বলবে কী? দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে ফেলেছে সেও।

—"অ্যাবসলিউটলি!" রবি হাসতে হাসতে, "উই হ্যাভ নো চয়েস! আফটার অল, উই আর ইন দ্য সেম বোট, সিসটার! আমাদের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ যখন এক, আমাদের স্বার্থও তখন অভিন্ন।"

—"আসুন, তবে দিনটা ঠিক করে ফেলি। কবে, কোথায়, কীভাবে আশীর্বাদ হবে। আশীর্বাদ-কাম-এনগেজমেন্ট। ওদের প্লাস আমাদের বাগদান।"

রবির মুখ গম্ভীর হয়। সে ধীরে ধীরে বলে:

—"দেখুন, আমি কিন্তু আমার ঠাকুরদাকে ডাকতে চাই। সোজা কথা।"

—"তা ডাকুন না! ডাকবেন বইকি? এ আর"—

—"ঠাকুরদাকে?" শমিতাকে থামিয়ে দেয় বন্দনা। "তোমার ঠাকুরদাকে? রবির আশীর্বাদে? তিনি তো কবেই—রবির জন্মের আগেই" —কথা শেষ না করে রবির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে বন্দনা। শমিতা হঠাৎ হেসে ওঠে।

—"ওহো, বুঝেছি বুঝেছি, নান্দীমুখ, বৃদ্ধি, এইসব রিচুয়ালসের কথা বলছেন তো? পূর্বপুরুষদের আহ্বান, হেন তেন? দূর! ওসব আবার আশীর্বাদে কী? ও তো বিয়ের সময়ে হয়। স্বর্গত গুরুজনদের জন্য এখানো কোনো স্লট নেই! ডাকলেও তিনি আসবেন না।"

সামান্য ঘাবড়ালেও রবি মচকায় না।

—"আমাদের কিন্তু হিন্দুবিবাহ চাই। আপনারা নাকি ব্রাহ্ম?"

—"আমার মা বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন—আমরা ব্রাহ্ম নই। কিন্তু হিন্দু রিলিজিয়াস রিচুয়ালসে বিশ্বাসীও নই। রেজিস্ট্রি বিয়ের পক্ষপাতী আমরা—"

"রেজিস্ট্রি তো করতে হবেই। কিন্তু হিন্দুবিবাহ না হলে বিয়ে হবে না। এই বলে দিলাম।" শমিতা ওতে দমে না।

—"আমাকে বলে কী হবে? আমার তো বিয়ে হচ্ছে না, যাদের বিয়ে, তাদের বলবেন। আপনারা ছেলেকে বলুন, বউকে বলুন। আপনি দয়া করে শুধু অত হিন্দু-হিন্দু করে চেঁচাবেন না! এক্ষুনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লোকজন চলে আসবে-- এখন দিনকাল ভালো নয়—সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়।"

—"তা আশীর্বাদের দিন ঠিক করার কী হলো?" বন্দনা খেই ধরিয়ে দেয়।

– "দিন ঠিক হয়ে যাবে। আগে নীতিটা ঠিক করে নিচ্ছি।" রবি উত্তর দেয়।

—"নীতি?" শমিতা হেসে ওঠে ঝরঝরিয়ে।

—"এসব বিষয়ে আমার কোনোই নির্ধারিত নীতি নেই। এসব হচ্ছে ব্যক্তিগত নীতির ব্যাপার। যারা বিয়ে করবে তারা বুঝবে। বিয়ে না করলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।" শমিতা মহানন্দে জানায়। "দিল্লী-বম্বেতে আজকাল ছেলেমেয়েরা আকছার বিয়ে না করে লিভ টুগেদার করছে। বিয়ে-থা হয়ত পরে করে। কলকাতাতে ওসব চলে না অবশ্য, লোকে ছ্যা ছ্যা করবে। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাই না—ইটস্ দেয়ার লাইফ, দে শুড ডিসাইড হাউ টু লিভ ইট।"

বন্দনা শিউরে ওঠে। ও বাবা, মেয়ের কবি মা কী ভীষণ ভীষণ সব কথাবার্তা বলছে। দেখলে মনে হয় নিরীহ। বন্দনার আর রবির খুবই আপত্তি আছে এইসব দুর্নীতিতে। লিভ টুগেদার আবার কী? ছিঃ। যতসব অসভ্যতা। বিলেত থেকে আমদানি করা বেহায়াপনা। আর শমিতারও বলিহারি যাই। তুই মা হোস, কোথায় সুবুদ্ধি দিবি, তা না—লজ্জা করল না এসব কথা বলতে? বন্দনা বিষয়টা পালটাতে তাড়াতাড়ি বলে, "আমরা কি তাহলে নতুন বছরের পাঁজি নিয়ে শনিবার সন্ধেবেলা আপনাদের বাড়ি যাবো? আশীর্বাদের দিনটা স্থির করে ফেলতে? কালই ঠাকুরমশাইকে খবর দিচ্ছি।"

—"ঠাকুরমশাই? আশীর্বাদেও আবার পুরুত লাগে নাকি? আমাদের তো লাগেনি? শুধু গুরুজনেরা ছিলেন।"

—"আমাদের লেগেছিল। তাছাড়া কাদের বাড়িতে আগে হবে? ছেলের না মেয়ের?"

—"দু'বাড়িতে দুবার করে কী হবে? একসঙ্গে সেরে দিলেই হয়। ছেলেমেয়ের দু'বাড়ি থেকে একই লোকেরা তো আশীর্বাদ করবেন পাত্রপাত্রীকে। দু'বার ধরে নেমন্তন্ন খাইয়ে কী হবে? দু'বার ঝামেলা। দু'বার ধরে সময় নষ্ট।"

—"বাঃ! এটা দারুণ সাজেস্ট করেছেন তো মিসেস দাশগুপ্ত? বেশ একটা নিউট্রাল জায়গা ঠিক করে ফেলা যাক—কতো তো বিয়েবাড়ি ভাড়া দেয়—"

—"ঠিক আছে, সেটা আমি ব্যবস্থা করবো" শমিতা বলে— "লোক তো কম করেও শ' দেড়েক হবেই, দু'বাড়ির যখন?"

—"কেটারার আমি পাঠিয়ে দেবো"— হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে রবি বলে। "সেদিন আমার শালার বাড়িতে দারুণ রেঁধেছিল—" হঠাৎ উৎসবের হলুদ আলোটা ঝলসে ওঠে ঘরের বাতাসে।

—"আশীর্বাদে ছেলে পাজামা পরলে হবে না, ধুতি পাঞ্জাবি পরা চাই।

আজকাল দেখছি খুব পাজামার চল হয়েছে বিয়েবাড়িতে।''

—''পাজামা-পরা বের করে দেবো না?'' রবি বলে। ''বলে দেখুক না? ধুতি আমি নিজে হাতে পরিয়ে দেবো, বেল্ট লাগিয়ে দিলেই হবে। হুঃ, পাজামা পরবে!''

বন্দনা শমিতার দিকে চেয়ে হাসে, ইঙ্গিতে রবিকে দেখিয়ে বলে,—

—''রাগী আছে! ছেলে বাবাকে খুব ভয় পায়—যা বলবার সব আমাকে বলে। আপনার মেয়ের কথাও বাবাকে বলেনি, আমাকে।'' শমিতা কলকল করে ওঠে।

—''আমার মেয়েও রাগী আছে। আমি খুব ভয় পাই। তুমিও কিন্তু সামলে চোলো বাপু! আজকাল তো বউদেরই দিন। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল। শাশুড়িকেও ভয় পেয়েছি, আবার বউকেও ভয় পেতে হবে। আমরা মাঝের জেনারেশন তো চেপ্টে গেছি।''

—''ঈঈঈকা!'' বন্দনা বলে। ''বউকে আমি ভয় পাই নাকি? দেখবেন ওকে ঠিক বারণ করে দেবো, আশীর্বাদের দিন জিন্‌স পরলে চলবে না। হুঁ! ঐটুকু তো মেয়ে।''

—''ঐটুকু মানে? ধানী লংকা। আজকালকার সবগুলো বাচ্চা ধানী লংকা।''

—''এরা তো বড়ো হয়ে গেছে। বাচ্চা নেই, ধানী লংকাও নেই, পাহাড়ী লংকা হয়ে গেছে। সিমলাই মির্চ। ঝাল নেই, কেবল গন্ধ আছে।'' রবি হা হা হাসে।

—''সে হলুম আমরা। ওরা অন্য বস্তু। বন্দনা, ভালো চাও তো সামলে থেকো। যা বুঝছি, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ।''

—''আশীর্বাদের দিন ওদের কিন্তু অফিস গেলে চলবে না। ছুটি নিতে বলে দিতে হবে।'' বন্দনা আবার বলে। শমিতা মীমাংসা করে দেয়

—''রবিবার, গোধূলি লগ্নে আশীর্বাদ করলেই তো হয়। সামনে ইলেকশন। ওরা দু'জনেই খবরের কাগজে কাজ করে, ছুটি কি পাবে? রবিবার খুব ভালো দিন—শনিবার বিকেল আরো ভালো দিন— আর সমস্ত গোধূলি লগ্নই সুলগ্ন। তখন ঐ কনে-দেখা আলোটা ফুটে ওঠে—ঐ সময়টা আশীর্বাদের পক্ষে আইডিয়াল লগ্ন—''

—'' না না ওভাবে হয় না। পাঁজি চাই পাঁজি।'' রবি শমিতার উচ্ছ্বাসে ছিপি এঁটে দেয়। ''শনিবার সন্ধ্যায় আসছি পাঁজি নিয়ে। দু'দিন সবুর করুন। এভরিথিং উইল বি সেটলড। নতুন বছর তো পড়েনি, পাঁজি কেনা হয়নি এখনও।''

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

মেয়ের বিয়ে বলে কথা। দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে শমিতা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিবুকে পাঠিয়ে একটা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত হাফ পঞ্জিকাও কিনিয়ে ফেলেছে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে। কিন্তু কিনে এনে দেখেছে সেটি বিশুদ্ধ গ্রীক। সিদ্ধান্ত নেবে কী আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝতে পারছে না। সবই সাংকেতিক, ব্রাডশ বা প্লেনের এবিসি গাইডের মতো। পড়তে জানা চাই। পি এইচ ডি করার সময়ে শমিতাকে পাঁজি পড়তে শেখানো হয়নি। শনিবার সন্ধেবেলায় বন্দনা এসে শমিতাকে তার টিফিনবাক্স ফেরৎ দিল।

—"এটা ফেলে এসেছিলেন। এতে কিছু প্যাটিস আছে।" গুছিয়ে বসে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, রবি বলল :

—"আ স্মল প্রবলেম। পাঁজিতে দেয়ার্স নো স্পেশাল মেনশন অফ আশীর্বাদ এনিহোয়্যার। গৃহপ্রবেশ, সীমন্তোন্নয়ন, কুষ্মাণ্ডভক্ষণ, গর্ভাধান, অলাবুভক্ষণ নিষিদ্ধ, সমস্তই ডিটেল আছে। আশীর্বাদ নেই। না থাক, আপনাকে দুটো চয়েস দিতে পারি—নাট্যারম্ভ? না বীজবপন?"

—"মানে?" দু'হাতে প্যাটিসের বাক্স, শমিতা বোকার মতো চেয়ে থাকে।

—"মানে আশীর্বাদই বলুন এনগেজমেন্টই বলুন এটা তো জীবননাটকের শুরু? এই অকেশনের সবচেয়ে কাছাকাছি যায় যেসব অকেশন তার মধ্যে 'নাট্যারম্ভ' একটা 'বীজবপন' একটা। কোনটা নেবেন? সিম্বলিকালি দুটোই চলবে।"

—"বীজবপনটা একটু আর্লি হয়ে যাবে না?" শমিতা একটু চিন্তা করে বলে। "তার চেয়ে নাট্যারম্ভই—" বন্দনা গম্ভীরমুখে শুনছে। রবি পাঁজি উলটোচ্ছে। এবার প্রশ্ন করে :

—"বেশ নাট্যারম্ভ। নেক্সট, অমৃতযোগ, না সোনায় সোহাগা?"

—"সোনায় সোহাগা আবার কী?"

—"ঐ যে ঐরকম শুনতে একটা ডাবলব্যারেলড শুভযোগ—অমৃতযোগ, আর, আর, আ, এই যে—মণিকাঞ্চন যোগ? কোনটা চান? নাকি দুটোই নেবেন?"

—"দুটো একসঙ্গেও আছে?" বন্দনা সোৎসাহে প্রশ্ন করে। শমিতাও স্বাদ পেয়ে গেছে মজাটার।

—"দুটো যদি পাওয়া যায় তো দুটোই থাকুক না?" লোভীর মতো বলে শমিতা। "ক্ষতি কী?" —দিনটা স্থির হয়ে গেল। সুন্দর একটি রবিবার। 'নাট্যারম্ভ' আছে, বিকেলবেলায় 'অমৃতযোগ'ও আছে, আবার মণিকাঞ্চন আছে। শমিতা আর বন্দনা এবারে নিমন্ত্রণের তালিকা প্রস্তুত করবে। আর

কেটারারের খাদ্যতালিকা। রবি দেখবে ঘরভাড়া ডেকরেটর আলো ইত্যাদি খরচ সব আধাআধি। চমৎকার।

পরদিন সকালেই ফোন। রবি। উদ্বিগ্ন।

—"মিসেস দাশগুপ্ত? স্যরি। হবে না।"

—"হবে না মানে?"

—"ঐদিন আশীর্বাদ হবে না।"

—"হবে না। কেন হবে না?"

—"এই ধরুন, বন্দনা বলবে?"

—"শমিতাদি? ঠাকুরমশাই বললেন ঐদিন আশীর্বাদের লগ্ন নেই।"

—"তবে যে তোমরা বললে আশীর্বাদের লগ্ন বলে কিছু হয় না?"

—"ভুল বলেছি। হয়, অন্যভাবে লেখা থাকে। আমরা পড়তে পারিনি। ঠাকুরমশাই চার-পাঁচটা দিন দিয়েছেন। বেছে নিন।"

—"নাট্যারম্ভ চলবে না?"

—"নাঃ।"

—"অমৃতযোগ? মণিকাঞ্চন যোগ?"

—"ঐ সমস্ত আছে। আটাশ, উনত্রিশ, দোসরা, পাঁচুই—"

—"ফোনে এসব হয় না। তোমরা কাল চলে এসো।"

—"বেশ। কাল হবে না। ও ট্যুরে যাচ্ছে। পরের বেস্পতিবার।"

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

শমিতা এবার নিউ জার্সিতে ফোন করল। পুপ্সির বাবার মতটাও জানা দরকার। তাঁকে তো আসতে হবে আশীর্বাদ করতে।

পুপ্সির বাবা এসব ঠাকুরমশাই-টশাই শুনলে ক্ষেপে ভূত হয়ে যাবেন। হাফ সাহেব মানুষ। বৈজ্ঞানিক। প্রায় চল্লিশ বছর পশ্চিমে আছেন। পুপ্সির প্রণয়ীর সঙ্গে তাঁর অবশ্য আলাপ পরিচয় হয়েছে।

শমিতা ব্যাখ্যা করল যথাসাধ্য রেখেঢেকে, কেন আশীর্বাদের লগ্নটা ঠিক হয়নি। ওইটেই বাকী। ওদিক থেকে পুপ্সির বাবার গলায় উদ্দীপনা :

—"লগ্ন? নো প্রবলেম। আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

—"তুমি? তুমি লগ্ন ঠিক করবে? তোমার কাছে পাঁজি থাকে? যা তা কথা বোলো না।"

—"আমার ডায়েরিতে phases of the moon আছে—বুঝলে? তাতে পূর্ণিমা থাকে— পূর্ণিমা মানেই শুভলগ্ন," কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, তারপর—

সোৎসাহে—"এই তো আটাশে, মঙ্গলবার full moon —ঐদিন লাগিয়ে দাও—অবশ্য ওটা ব্লু মুন নয়—বেশ তো বৈশাখী পূর্ণিমা—কী এটা তো বৈশাখ মাসই? মে মাসে পঁচিশে বৈশাখ হয় না?" —শমিতাও নেচে ওঠে।

—"বৈশাখী পূর্ণিমা? গ্র্যাণ্ড! তার মানে ওটা বুদ্ধপূর্ণিমা। ছুটির দিন। রবিবারের মতই হলো। দ্যাখো ওদের ঠাকুরমশাই মানেন কি না?"

—"মানবে না মানে? খুব মানবে? আমি ফ্লাইট বুক করছি। ওদের বলে দাও। আটাশে, আগামী বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমার শুভলগ্নেই আশীর্বাদ। ন অন্যথা।"

বন্দনা শুনে বলল, "আটাশে? হ্যাঁ, আটাশেও আছে। ঠাকুরমশাইও তো আটাশে বলেছিলেন।" রবি বললে— "ওয়াণ্ডারফুল! লাইফ ইজ সো সিম্পল।"

শমিতা বললে, "দ্যাখো তো বন্দনা, ঐদিন 'নাট্যারম্ভ' আছে কিনা? ওটা আমার বড্ড পছন্দ হয়েছিল—" পাঁজিতে দেখা গেল সত্যি সত্যিই সেদিন নাট্যারম্ভও রয়েছে। আর কি? বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বুকে বল নিয়ে বন্দনা বলে ফেলল, "পুপ্‌সি, তোমাকে কিন্তু কান ফুটো করতে হবে। আমি তোমাকে যে-সব গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করব, তাতে আমার শাশুড়ির একটা ঝুমকো আছে—ফুটো না হলে পরবে কী করে?" "কেন?" পুপ্‌সি বলল, "ওতে ক্লাসপ্ এঁটে নেব!" বন্দনা অটল—"সোনার জিনিস ওভাবে পরা চলবে না। কোথায় টুক করে খসে পড়ে যাবে। ওটা আমার শাশুড়ির গয়না। কানে ফুটো করতে হবে। বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ।"

কানে ফুটো? যত পৈশাচিক, বর্বর কাণ্ডকারখানা। গয়না কে পরতে চায়? না। করবে না পুপ্‌সি কানে ফুটো। তাতে আশীর্বাদ না হয়, না হবে। —"ওমা সে কি? এত ভয় পেলে হয়?" শমিতা বলে ফ্যালে। "একটুও লাগবে না, দেখিস। আমার ছাত্রী অনুরাধার একটা gun আছে, কানে যন্ত্র দিয়ে ফুটো করে গয়না সেঁটে দেয়, staple করার method, কানে লাগেও না, কান পাকেও না। ভয়ের কিছু নেই।"

—"ভয় পাচ্ছি কে বললে? নৈতিকভাবে আপত্তি আছে। বিশ্রী বার্বারিক প্র্যাকটিস্।"

—"নীতিটা বড়বড় ব্যাপারের জন্য তুলে রাখ বরং। কানের ফুটো নিয়ে নীতির লড়াই করতে হবে না। শ্বশুরবাড়ি বলে কথা। ছোট ছোট ব্যাপারগুলো মেনে নিতে হয়। বড় ব্যাপারে নীতির প্রশ্ন উঠলে, তখন আপত্তি কোরো। এটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এটা মেনে নাও।"

—"তারপর, কানে পাঁচড়া হবে। দগদগে ঘা হয়ে রস গড়াবে, আশীর্বাদের দিনে নকল টেপা-দুলও পরাতে পারবে না, তখন বুঝবে মজা!" মেয়ে বলে।

—"সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ঘা হবে না। হলেও সারিয়ে দেব। চল, এক্ষুনি চল। ছ'হপ্তা লাগে কান সারতে। টায়টোয় ছ'হপ্তা পেয়ে যাবে। প্লীজ এটা নিয়ে ঝামেলা কোরো না।" কানের কানপাশা stapled হয়ে গেল মুহূর্তেই। আশীর্বাদের জন্য প্রথম প্রস্তুতি। বন্দনাকে ফোনে জানাল শমিতা। "হয়েছে। কানে ফুটো।"

—"বাঃ। তবে কেন বলছিলেন মেয়ে রাগী? ভয় পেতে হবে? মেয়ে তো লক্ষ্মী।"

—"হ্যাঁ, লক্ষ্মী বটে। বেরুবে, গুণপনা সবই বেরুবে। লোক ভালোই, কিন্তু লক্ষ্মী নয়।"

বন্দনা এসে পড়ল, মেয়েকে নিয়ে শাড়ি কিনতে যাবে। দিব্যি লক্ষ্মী মেয়ের মতোই একবেলা একটু তাড়াতাড়ি ফিরল পুপ্‌সি। শমিতা অবাক।

—"বাঃ। শাশুড়ির জন্যে তো দিব্যি তাড়াতাড়ি ফেরা হয়। মা বললে রাত বারোটার আগে ছুটি মেলে না। পুজোর কাপড় জীবনে কিনতে যাও না।"

—"কী? হিংসে হচ্ছে? ছি মা! হিংসে করে না। তুমিই তো বললে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে নীতির লড়াই করতে হয় না। শাড়ি কেনা অতি তুচ্ছ ব্যাপার।"

বেশ গোটাকতক শাড়ি কিনল বন্দনা। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজপিসও আছে, জামা করতে দেওয়া হল। পুপ্‌সিও দিব্যি বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের দর্জিকে গিয়ে হাতাওয়ালা ব্লাউজের মাপ দিয়ে এল। এবার জুতো। জমকালো একখানা বেনারসী শাড়ি হয়েছে। তার জন্যে জরির চটি চাই। ম্যাচিং হতে হবে তো? কিন্তু মেয়ে যাবেই বাটা-তে। নর্থস্টার কিনবে। যা কাজে লাগবে, তাই কেনা ওর মত।

—"না। আমি কিছুতেই তোমাকে ওই বিশ্রী নোংরা ন্যাকড়ার নর্থস্টার কিনতে দেবো না।" বন্দনা অনড়। "চটিই কিনতে হবে। লাল, জরির চটি। তত্ত্বে সাজানো হবে।"

বাটার দোকান থেকে শেষ পর্যন্ত কেনা হলো কী? লিপস্টিক, পাউডার, কাজল, ব্লাশার, ক্রীম, শ্যাম্পু দোকানে এসমস্তই আছে। কিন্তু জরির চটি নেই। সেটার জন্য ফুটপাতে কিনতে যেতে চাইছিল পুপ্‌সি। বন্দনা শুনল না, "অন্য দোকানে চলো।"

"শুধু শুধুই কিনছ। ও আমি জীবনে পরব না। জরি-ফরি।"

পরতে তো বলিনি? তত্ত্বেও সাজিয়ে দিতে হবে তো?" বন্দনার সাফ জবাব। "লোকে দেখলে বলবে কী?"

"ওই বেনারসী শাড়িটা যে তুমি কিনলে, ওটা আশীর্বাদে পরবো না?"

"ওমা সেকি? ওটা পরবে কেন? ওটা তো তত্ত্বে সাজিয়ে দেবো? আশীর্বাদের দিন তোমাদের বাড়ির শাড়ি পরতে হয়।"

—"অঃ। বাড়ির শাড়ি? তার মানে মার শাড়ি।"

—"মার শাড়ি কেন পরবে? মাকে বলবে, তোমাকে নতুন শাড়ি কিনে দেবেন।"

—"তার মানে আরেকদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা? ইম্‌পসিবল। আজকেই দু'জনের একসঙ্গে বেরুনো উচিত ছিল। দোকানে তো কত শাড়ি ছিল। আরেকখানা নিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু শাড়ি কি না পরলেই নয়?"

—"মানে?"

—"প্যান্ট নয়, বেশ গর্জাস একটা সালওয়ার কুর্তা পরলে হয় না? মুভমেন্ট অনেক ইজি"--

—"মুভমেন্টের দরকারটা কী? চুপটি করে আসনে বসে থাকবে। নড়বে না। সালওয়ার পরে বিয়ে হয়েছে কখনও বাঙালী মেয়ের? বেনারসী চাই।"

—"বিয়ে তো হচ্ছে না? হচ্ছে এনগেজমেন্ট।"

– "সে যাই হোক। সামাজিক অনুষ্ঠানে ওসব কুর্তাফুর্তা চলবে না। শাড়ি পরতে হবে। বেশ জমকালো শাড়ি।

পুপ্‌সি শেষ চেষ্টা করে।

"শাড়ি খুলে গেলে জানি না কিন্তু!"

—"খুলবে না। মাকে বলবো, পিন করে দেবে।"

"পিন করলে ছিঁড়ে যাবে।"

—"গেলে যাবে। আবার হবে।" বন্দনাও মরিয়া। যতই জেদী বউ হোক, সে ছাড়বে না, ভয় পাবে? ঈশ্! সে না শাশুড়ি?

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

—"মাটিতে শুয়ে পড়। মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। হাতটা গলিয়ে দে, যদ্দুর যায়—" বড়মাসি ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন ভূলুণ্ঠিত শমিতাকে। ভুঁড়ির জন্যে নিজে যেহেতু পারছেন না। শমিতা হাত গলিয়ে গলিয়ে নানারকম বাক্স বের করছে। মার গয়না। ঠাকুমার গয়না। নিজের বিয়ের গয়না। বাবার ঘড়ি-আংটি, কর্তার ঘড়ি-আংটি-বোতাম। "ঐ তো, ঐ তো, তোর কর্তার বোতাম। ঈশ্, পালিশ করার আর টাইম নেই। দেখি, যদি একটা চটকা লাগিয়ে দিতে পারি।"

গর্তটা থেকে বাক্সর পর বাক্স বেরুচ্ছে। বাক্সর পর বাক্স খোলা হচ্ছে। কনেকে কী পরিয়ে সাজানো হবে স্থির হচ্ছে। শমিতা নিজের গয়নাও যদি কিছু না পরে, ভালো দেখাবে কেন? বড়মাসি সব বেছে-টেছে ঠিকঠাক করে দেবেন। শমিতার কাজ শুধু মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে টেনে টেনে বাক্স বের করা।

—"অত্যন্ত বিশ্রী এই ভোল্টটা নিয়েছিস।"

—"সেবার ওখানে জল ঢুকে যাবার পরে এইখানে সব সরিয়ে নিতে হলো।" এই সময় ঐ ঘরে আরেকজন উট্‌কো লোকের আবির্ভাব হলো। লোকটা ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো শমিতাদের। ওখানেই ওর ভোল্টটা। শমিতা শুয়ে শুয়েই মুখটা তুলে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো। খুবই অস্বস্তিকর শারীরিক পজিশন এটা। মন্দিরে মানায়। কিন্তু এটা ব্যাংক।

ঐ লোকটার অবস্থাও বিপরীত রকমে সঙ্গীন। খুব একটা লম্বা লোক নয়। তার ভোল্টবাক্সটা আবার অনেকটা উঁচুতে। ডিঙি মেরে মেরে অতিকষ্টে বাক্স বের করছে। পাশেই একটা ট্রলি টেবিলে রাখছে। আবার ডিঙি মেরে উঁকি মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আরেকটা বাক্স। "ইচ্ছে করলেই বড়দি ওই টেবিল থেকে লোকটার অন্য বাক্সটা নিয়ে নিতে পারে"—শমিতা বলল।

—"কোনো প্রিভেসি নেই। কোনো সিকিওরিটি নেই। যাচ্ছেতাই।" হঠাৎ বলেও ফেলল কথাটা সে বেশ জোরেই।

—"যা বলেছিস শমি"—বড়মাসি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকান। যেন ওরই দোষ। ও কেন ঢুকেছে! শমিতা বোঝে ভদ্রলোকের দোষ নেই। তারও তো কাজেই ঢোকা। তবু রাগ হয়। লোকটা দেখতে বেশ ভদ্র, নিরীহ, সভ্যভব্য। ভয়ের কিছু নিশ্চয়ই নেই। তবু, যদি দুষ্টু লোক হয়? এই মাটির নিচের ঘরে—নিভৃতে শমিতাদের খুন করে রেখে গেলে? অতগুলো গয়নার বাক্স! লোকটার সামনেই খোলা ছাড়া উপায়ও নেই। তিনটের সময় বন্ধ হয়ে যাবে। ভেতরে কেন যে পুলিশ থাকে না? যাক, লোকটার কাজ শেষ হয়ে যায় বেশ তাড়াতাড়িই। সে বাক্স বন্ধ করে হঠাৎ একগাল হাসে। তারপর হাত জোড় করে বলে—"আপনিই তো শমিতা দাশগুপ্ত? আমি হচ্ছি ববির ছোটমামা! বন্দনার ছোড়দা। এখানে আপনি যে-উদ্দেশ্যে, আমিও সেই উদ্দেশ্যে।" হাসিমুখে নমস্কার করেন ভদ্রলোক।

—"ববির ছোটমামা!" (ছি, ছি, কী ভাবল!)

—"নমস্কার। নমস্কার। আর ইনি পুপ্‌সির বড়মাসি।" আমার বড়দি। শমিতা শয়ান অবস্থাতেই সাধ্যমতো ভদ্রতা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বড়মাসি স্মার্ট লোক।

—"কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে তো চিনি না, তাই ভেবেছিলাম কে না কে। বাইরের লোকের সামনে এতগুলো গয়না—"

—"তা তো বটেই, তা তো বটেই"—

—"তাহলে, মঙ্গলবার সন্ধেবেলা দেখা হবে?" বলে বড়মাসি একটা ফাইনাল হাসি হেসে দেন। শমিতা তো সেই মুহূর্তে এমনিতেই "মাটিতে মিশিয়ে" শুয়ে আছে—লজ্জায় লোকের যা করতে চাইবার কথা। নতুন করে করার কিছু ছিল না।

বাড়ি ফেরার পথে শেষ পর্যন্ত—

—"বড়দি? অত ভারী ঝাড়লণ্ঠন ঝুমকো তো নিচ্ছিস, কিন্তু পুপ্‌সির কানে তো রস গড়াচ্ছে। এখনও নিমকাঠি। কান তো সারেনি!" শমিতা বলেই ফ্যালে।

—"চমৎকার। কানে নিমকাঠি পরে মেয়ে সেজেগুজে আসনে বসবে?"

—"ধরো দু'খানা বেশ কচিকচি নিমপাতাসুদ্ধু কাঠি, বেশ আর্টিস্টিক করে যদি লাগানো যায়?"

—"কনে পাতাসুদ্ধু নিমের ডাল পরবে কানে?"

—"আহা, শান্তিনিকেতনে যেমন ফুলের গয়না পরতেন না সুধীরাদি? তেমন কিছু যদি, নিমপাতা দিয়ে—"

—"সোনা। সোনা পরাতে হবে। সোনা। ওসব ডালপালা চলবে না। এক্ষুনি গিয়েই একটা মাকড়ি পরিয়ে দিচ্ছি। মারকিউরোক্রোম লাগিয়েছিস? যত্তো পাগলের কাণ্ড।"

তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

—"ওরে ব্লাউজগুলো আনিয়েছিস? ওদের বাড়িতে পাঠাতে হবে।" শমিতার হঠাৎ মনে পড়েছে।

—"কিসের ব্লাউজ?"

—"ঐ পুপ্‌সির শ্বশুরবাড়ি থেকে যে শাড়িগুলো দিচ্ছে তার সঙ্গের ব্লাউজপিসগুলো সব দিয়ে গেছে, জামা করিয়ে দিতে।"

—"অনেকগুলো শাড়িও দিচ্ছে নাকি? এই যে শুনলাম জড়োয়ার সেট দিচ্ছে—"

—"সেও দিচ্ছে। তার ওপর দেখলুম তো বেশ কয়েকটা ব্লাউজ করাতে দিলে—"

—"বেশ কয়েকটা ব্লাউজ? ওরা তবে তত্ত্ব করছে? বেশ কয়েকটা ব্লাউজ মানেই বেশ কয়েকটা ট্রে।"

—"তা হবে।" শমিতার নিশ্চিন্ত উত্তরে বড়মাসির গা জ্বলে যায়। গলায় উদ্বেগ নিয়ে বড়মাসি বলেন :

—"আর আমরা?"

—"আমরা মানে?"

—"বাঃ! ওরা তত্ত্ব করবে, আমাদের তত্ত্ব?"

—"আশীর্বাদে আবার তত্ত্ব কী? আমাদের ওসব তত্ত্ব ফত্ত্ব নেই। আমরা বিয়েতে তত্ত্ব করবো।"

—"বা, বা। দু'পক্ষের লোকজন আসবে, একসঙ্গে দু'পক্ষের আশীর্বাদ হবে, বরপক্ষ থেকে থালা থালা তত্ত্ব আসবে, আর কন্যেপক্ষ ভোঁ ভাঁ? তাই কখনও হয়? খুব খারাপ দেখাবে।" শমিতার বড়দি মুখঝামটা দেন। শমিতা তাতে ঘাবড়ানোর পাত্রী নয়।

—"দেখাদেখির কী আছে? ওদের ইচ্ছে হয়েছে ওরা দিচ্ছে।"

—"তোমার ইচ্ছে হয়নি, তুমি দিচ্ছো না। এই তো? সেইটাই বলছি। অন্যলোকেও ঠিক তাই বলবে।"

—"ইচ্ছে হবে না কেন? এই তো এই টাইটা বের করেছিলুম দেবো বলে। বোতামের সঙ্গে, আর ঘড়ির সঙ্গে। তা মেয়েই দিতে দিচ্ছে না। দ্যাখো কী সুন্দর টাই?"

—"টাই? হঠাৎ টাই কেন?"

—"খাস বেনারস থেকে আনা। বেনারসী সিল্ক ব্রোকেডের টাই। পুপ্‌সির বাবাকে আমাদের বিয়ের সময়ে আমার বেনারসের সেই ব্যাচেলর জ্যাঠাশ্বশুর দিয়েছিলেন দু'খানা। তারই একখানা তুলে রেখেছিলাম। চমৎকার দেখতে। এয়ারলুম বলে কথা।"

—"পঁচিশ বছর তুলে রেখেছিলি?"

—"সাতাশ। একদম নতুন আছে। চকচকে।"

—"টাই দিলে সঙ্গে সুটও দিতে হয়। বুঝেছ?"

—"তা কেন? এই যে বোতাম দিচ্ছি, কৈ ধুতিপাঞ্জাবি তো দিচ্ছি না?"

—"কিসের জন্যে দিচ্ছ না? দেওয়াই তো উচিত।"

—"জীবনেও ধুতি পরবে না ও-ছেলে, দিয়ে নষ্ট করে কী লাভ? ধুতি এখন শাড়ির চেয়ে দামী।"

—"তবে বোতাম দিচ্ছিস কেন? বোতাম কিসে পরবে?"

—"ছেলের বাবা তো বারণই করেছিলেন। বলেছিলেন ছেলেকে একটা ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিতে। জার্নালিস্ট মানুষ। কাজে লাগবে। ঘড়ি ওর আছে। বোতাম পরে না।"

—"সে তো বেশ ভালো হতো। বেশ নতুন জিনিস। যেটা কাজে লাগবে।"

—"ধুৎ। দু'হাতে করে ধানদুব্বোর সঙ্গে ছেলের মাথায় টাইপরাইটার তুলে দেবো নাকি? আশীর্বাদী? তাই কখনও হয়? তাছাড়া পুপু বেঁকে বসলো।"

—"বেঁকে বসলো?"

—"বললো, তাহলে ওকেও ইলেকট্রিক টাইপরাইটার দিয়েই আশীর্বাদ করতে হবে। ও-ও পেশাদার জার্নালিস্ট। ও-ও তো শাড়ি গয়না পরে না। ওরও ওইটেই বেশি কাজে লাগবে। দু'জনে একই চাকরি করে, ছেলের বেলায় একরকম, মেয়ের বেলায় অন্যরকম চলবে না।"

—"তারপর?"

—"তখন ওঁরা বললেন, 'আপনার যা খুশি তাই দিয়ে আশীর্বাদ করুন, আমরা তা বলে টাইপরাইটার দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করতে পারবো না।' তাই পুপুর বাবা বিলেত থেকে জামাইয়ের ঘড়িটা আনবেন। আর বোতামটা— পুপু বলেছে, পুপুই কুর্তায় পরবে।"

—"শমি, তোর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব থাক না থাক আমাদের তত্ত্ব সাজাতেই হবে। নইলে বড্ড খারাপ দেখাবে রে।"

—"আজ বাদে কাল কাজ। এখন তত্ত্বের ব্যবস্থা করবো কী করে? দেবোটাই বা কী? ধুতি পাঞ্জাবি তো জঞ্জাল।"

—"জঞ্জাল দিবি কেন? ছেলে যা পরবে তাই দে।"

—"টী শার্ট আর ব্লু জিন্‌স?"

—"তা কেন? তুমি বাছা স্যুট দাও। ওরা বেনারসী দিচ্ছে। আমি আজই মাস্টারকে খবর দিচ্ছি, দু'দিনে বানিয়ে দেবে। তুমি শুধু ছেলেকে ধরো মাপের জন্যে। আর স্যুট-লেংথটা কিনে আনো। যাও, ফোন করো, ছেলেকে পাকড়াও। এক্ষুনি।" বড়মাসির ছাড়ান নেই। শমিতা ছুটল ফোন করতে। তক্ষুনি। সন্ধে আটটার সময় মাস্টারকে এনে ফেলবে বড়দি।

—"হ্যালো। মিস্টার মুখার্জি? আজ সন্ধে আটটায় ববিকে একবার পাঠিয়ে দেবেন? স্যুটের মাপ দিতে হবে।" ওপারে যেন বিজলীর শক্ লাগে। রবি শিউরে উঠেছে, বোঝা গেল।

—"স্যুট? ববিকে স্যুট দেবেন আপনারা? ক্ষেপেছেন? আমার বিয়েতে তিনখানা স্যুট পেয়েছিলুম। তিরিশ বছর ধরে বছর বছর শুধু রোদে দিচ্ছি আর ন্যাপথলিনে জড়াচ্ছি। মাথা খারাপ? খবদ্দার না। কোম্পানির কাজেই স্যুট পরতে লাগে না, তো জার্নালিজমে।"

—"তাহলে? কী দেবো আমরা তত্ত্বে?" শমিতা হাহাকার করে ওঠে।

—"ও, তত্ত্বে? শার্টপ্যান্ট, শার্টপ্যান্ট।"

—"শার্টপ্যান্ট? বেশ দেখি মাস্টারকে বলে যদি করে দেয়। শার্ট কি এত তাড়াতাড়ি—"

—"করাবেন কেন? পিকাডিলি। পিকাডিলি। ওখানে সব রেডিমেড পাওয়া যায়, একঘন্টা সময় দিলেই সব ফিটিং করিয়ে দেবে। ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস। তালপাতার সেপাইদেরও ফিট করিয়ে দেবে।"

—"পিকাডিলিটা আবার কোথায়?"

—"চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি—ববি এখনও বাড়িতে আছে, পিকাডিলি আধঘন্টার মধ্যে খুলে যাবে—"

—"ওখানে কি স্পোর্টসজ্যাকেটও"—

—"স-ব। স-ব। কিন্তু অত দেবেন কেন? কিচ্ছু দরকার নেই। 'তত্ত্ব' বলে কাতরে উঠলেন, তাই ভাবলুম নিয়ে যাই। অত দেবেন না, অত দেবেন না, ডোন্ট স্পয়েল হিম। এ যে জামাই আদর শুরু করে দিলেন।"

—"জামাই তো?" শমিতা এবার হুড়মুড়িয়ে হেসে ফ্যালে। "সত্যি মিস্টার মুখার্জি, আপনি না!—"

তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

বড়মাসির বড় আনন্দ! শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, বাঃ। দিব্যি তত্ত্বের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—"এর সঙ্গে গেঞ্জী, ইজের, জুতো, মোজা, রুমাল, বেল্ট, তোর সেই বেনারসী টাইটা, তেল, সাবান, শেভিং সেট, ওডিকোলন, চিরুনি, বুরুশ—চমৎকার!" বড়মাসির আনন্দ ধরে না।

—"অ্যায়াম সরি টু স্যে দিস, কিন্তু মাগো, তোমার বেনারসী টাইটা কিন্তু চলবে না।" দুঃখিত গলায় পুপ্‌সি বলে। "—আজকাল সরু টাই কেউ পরে না। তাছাড়া বড্ড ঝকমকে! ব্রোকেড টাই কেউ পরে?"

—"পরে না? বেনারসী সিল্ক ব্রোকেড?"

—"বরং ওটা বিয়েতে দিও। ততদিনে হয়তো ওইটেই ফ্যাশন হয়ে যাবে। কে বলতে পারে?" পুপ্‌সি সান্ত্বনা দেয়।

—"এবার তবে ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলো কিনে ফ্যাল? জুতো, মোজা, রুমাল টুমাল পুপ্‌সি আর ববি গিয়ে কিনে আনুক বরং—"

—"সেই ভালো"—নাচতে নাচতে পুপ্‌সি ববিকে ফোন করতে থাকে।

—"ছেলের টয়লেটের জিনিসগুলোও গড়িয়াহাট থেকে আজই কিনে নেবো কি?"

—"প্রথমেই শ্যাম্পু চাই। ববির চুলগুলো বাপু বড্ড কাগের বাসা হয়ে থাকে"—বড়মাসি বলেন, "শিবু লিখে নাও—শ্যাম্পু, ওডিকোলন, ট্যালকম পাউডার, চিরুনি, বুরুশ, তেল, সাবান, শেভিং সেট, শেভিং ফোম, আফটার শেভ—"

—"ও কী? ও কী?" পুপু ফোন ধরেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। "শেভিং সেট দিয়ে কী হবে? আফটার শেভ? ববির তো একমুখ দাড়িগোঁফ!"

—"তা হোক। দিতে হয়।"

—"মোটেই না তার চেয়ে বরং একটা ডিওডোর্যান্ট দিও। ছেলেকে আশীর্বাদ করতে এসে লোকে যাতে পালিয়ে না যায়।"

—"বেশ। শিবু, লেখো, ওডোনিল।"

—"ওডোনিল?" শিবু আপত্তি করে।

—"সে কি বড়দি? সে তো বাথরুমের জন্যে। মানুষের জন্যে আলাদা"—

পুপ্সির হাসি আর থামে না। "বড়মাসি, তোমরা ওটা ছেড়ে দাও দিকি? এবার আমিই বাবাকে ফোন করে দিচ্ছি—বিলেত থেকে টয়লেটের জিনিস নিয়ে আসবেন—ওখানে অনেক কিছু মেলে—"

শিবতোষ এসে পড়লো আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন। সবাই মিলে বসে গেল তার বাক্স ঘাঁটতে। বাঃ! চমৎকার ঘড়িটা তো? কী অপূর্ব টাইগুলো বাবা? প্রসাধনদ্রব্যও প্রচুর—শমিতার লিস্টি ধরে কিনেছে শিবতোষ। কিছুই ভোলেনি। শ্যাম্পু, সাবান, ডিওডোর্যান্ট, ওডিকোলোন, ট্যালকম, এমনকী একটা পুরুষমানুষের পারফিউম পর্যন্ত এনেছে বুদ্ধি করে। কই কই দেখি, কী আনলে?" মহা উৎসাহে ছুটে যায় শমিতা।

—"ও মা! এগুলো সব দিশি গো?"

—"দিশি কী? সমস্ত নিউ ইয়র্কে কেনা।" শিবতোষ আশ্চর্য হয়ে যায় শমিতার নির্বুদ্ধিতায়।

—"কিন্তু এগুলোই তো দিনরাত গড়িয়াহাটে দেখি! অন্য কোনো বিলিতি কোম্পানি কি ছিল না? এ তো এখানে পাওয়া যায়।" শিবতোষ যারপরনাই মর্মাহত। সে নিজে প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়।

—"ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওল্ড স্পাইস খুব নামকরা বিলিতি কোম্পানি, এখন তুমি বলছো দিশি? এগুলো দিশি?"

—"সত্যিই তো খুব নামকরা কোম্পানি, বাবা"—পুপ্সি ছুটে আসে বাবাকে রক্ষা করতে।

---"দেশেরগুলো সব নকল। ভেজাল। মা কিচ্ছু জানেন না। খালি শিশিতে দিশি জিনিস ভরা। তুমি মার কথা শুনো না তো? খুব ভাল কোম্পানি ওল্ড স্পাইস।" শিবতোষের মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিদেশে থাকে বলে কি সে শ্বশুর হতে জানে না?

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

জাহাজ থেকে এসে পড়েছেন ছেলের কাকা, টবি, নেভাল কম্যাণ্ডো, সময়মতন ছুটিটা জুটে গেছে। ব্যাচেলর মানুষ দাড়িগোঁফভর্তি মুখ। গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন একধারে—যখন তত্ত্ব সাজানোর ফাইনাল লিস্ট হচ্ছে।---"সবই এসে গেছে। এখন বাকি শুধু চিরুনী, বুরুশ, মোজা, রুমাল---"

—"আর একটা দাড়ি আঁচড়ানোর চিরুনিও লিখে নিও।" ছেলের কাকা বলে ওঠেন।

—"আর একশিশি দাড়ির আতর, একশিশি লাইসিল। ব্যাস, তবেই টয়লেটের ট্রে পারফেক্ট।"

বড়মাসি লিখে নেন---"দাড়ির চিরুনি, দাড়ির আতর, লাইসিল।"

শিবুমামা ব্যাগ নামিয়ে ফ্যানের নিচে মোড়াটা টেনে নেন।

--"এই নাও। চিরুনি, বুরুশ, মোজা, রুমাল, দাড়ি আঁচড়াবার চিরুনি কেউ দিতে পারল না। একটা দাড়িওলা দোকানদার এইটে দিল। একদিকে সরু, একদিকে চওড়া। বলল এটা দিয়ে দাড়ি, ভুরু, দুটোই আঁচড়ানো যাবে। বড়বাজার থেকে আতর এনেছি। দাড়ির জন্য আলাদা কোন ব্রাণ্ড নেই। গোলাপী, জেসমিন, হাজারটা গন্ধ। মাথা খারাপ হবার জোগাড়। এইটে এনেছি। কিন্তু সাজিয়ে দেবে কিসে? বিশ্রী দেখতে তো শিশিটা। আর এই নাও লাইসিল।"

শিবুমামার বক্তৃতা থামতে না থামতে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পুপ্‌সি।

—"তোমরা সত্যি সত্যি তত্ত্বে লাইসিল সাজিয়ে দিচ্ছো? তোমাদের কি মাথা খারাপ? তোমরা জানো না লাইসিল উকুনের ওযুধ? এতো ববিকে অপমান করা হয়। ওরা তবে তত্ত্বে তোমাদের মেয়েকে দাদের মলম সাজিয়ে দিক? ঠাট্টাও বোঝো না?" শিবুমামা স্তব্ধ। বড়মাসির এতক্ষণে মুখ খোলে।

—"এ আবার কী ধরনের ঠাট্টা? আমি কী করে বুঝবো—"

—"যাগগে যাক, দেখি আতরটা কেমন? আঃ কী সুন্দর গন্ধ। তত্ত্বে ফত্ত্বে দিয়ে কাজ নেই, ও-বাড়িতে চলে যাবে। কবে বিয়ে হবে তার ঠিক নেই, ততদিনে ওই আতর উবে যাবে। চাকরিবাকরির ঠিক নেই, তোমরা বিয়ে বিয়ে করে নেচে উঠলে। দেখি, আতরটা আমাকে দাও—"

—"নেচেছি কি সাধে মাগো?" বড়মাসির পষ্ট কথা। "—তোমরা যা নাচানাচি শুরু করেছিলে তাতে বাপমায়ের আর না নেচে উপায় ছিল না যে?" পুপ্‌সি পালিয়ে যায়। "লাইসিলটা বাথরুমে থাক", বড়মাসি রায় দেন। "চিরুনিটা তত্ত্বে যাক।"

চতুর্থ অঙ্ক : দ্বিতীয় দৃশ্য

বড়মাসি মেজেতে বাবু হয়ে বসেছেন। সামনে নানান সাইজের ট্রে। সেলোফেন কাগজ, রঙিন ফিতে, জরির টুকরো, পুরোনো রাখী, শোলার ফুল, নাইলনের ফুল, পাতা, রাংতা, কাঁচি, আঠা, মার্বেল পেপার, লেসের টুকরো, ভীষণ ব্যস্ততা ঘরময়—ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট ছাড়া সব এসে গেছে। এক ঘন্টায় ফিটিং হবার কথা ছিল। কিন্তু ববি কষ্ট করে তুলতে যেতে পারেনি বলে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। ওই ট্রে দুটো লাস্ট মোমেন্টের জন্যে থাকবে। "লাস্ট মোমেন্ট" ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি এ-বাড়িতে। তত্ত্ব সাজানো চলছে।

একডালা ফল-মেওয়া যাবে—ছোট্ট ছোট্ট রঙিন চুপড়ি এসেছে। ডালাতে সাজানো হবে সুশ্রী পাঁচরকম ফুলের চুপড়ি— আর একথালা মেওয়া। বাদাম পেস্তা কিসমিস আর সঙ্গে ছেলের (মেয়েরও) প্রিয় খাদ্য, চকোলেট। এটাও বাবা এনেছেন বিলেত থেকে।

হঠাৎ বড়মাসি চেঁচিয়ে ওঠেন, "শমি! —ছ'টা ট্রের জন্যে ঝট করে ছ'টা কবিতা লিখে দে তো ভাই? ছেলের বাড়ি থেকে যতো যাই সাজাক, কবিতা তো লিখে দিতে পারবে না? আমরা কবিতা সাজিয়ে দেবো তত্ত্বে" —বলতে বলতে হঠাৎ এই আবিষ্কারে বড়মাসির স্বরেই প্রকাণ্ড রকম গৌরব বৃদ্ধি পায়। নাঃ, এখানে বরপক্ষ জিততে পারবে না। যত যাই দিক! তত্ত্বেও নানারকম কারুকলা হয়। আজকাল তো তত্ত্ব সাজানোর প্রফেশনাল আর্টিস্ট ভাড়া পাওয়া যায়। আগে মা মাসি ঠানদিরা তত্ত্ব সাজাতে এক্সপার্ট ছিলেন। এখন সবই স্পেশালাইজেশনের যুগ। তবে হ্যাঁ, বড়মাসিকে একজন এক্সপার্টই বলা যায়। লোকে তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি তত্ত্ব সাজাতে। কবিতা দিয়ে তত্ত্ব সাজানো কি সোজা মাথায় আসে? সঙ্গে সঙ্গে কাগজকলম নিয়ে ওরই মধ্যে মহোৎসাহে শমিতা বসে যায়—"কবিতা হবে না, তবে ছ'টা ছড়া হতে পারে, বড়দি"—"ওই হলো"—বড়মাসির ওতেই কাজ চলে যাবে।

খুশি মনে শমিতা কলম কামড়ায়, বড়মাসি কাঁচি চালান। কানাই আরেকবার চা দিয়ে চলে যায়—

—"দিদি, কেটারার এসেছে।"

—"ওই তো বললুম—"

—"কোল্ড ড্রিংক কারা সাপ্লাই দেবে? ওরা না আমরা?"

—"আমরা! আমরা! কল্যাণ চাকরি করে তো থাম্‌স আপেই—অনেক সস্তায় পাচ্ছে সে—"

—"ওকে বলে দে, আমরা! আমরা!" লোক মারফৎ নিচে প্রতিধ্বনি চলে গেল কেটারারের কানে,—"আমরা! আমরা!"

—"দিদি, কেটারার জিজ্ঞেস করছে—পানের ব্যবস্থা করেছেন তো? লিস্টে পান লেখা আছে। কিন্তু সেটা ওরা সাপ্লাই দেয় না। মিষ্টিও যেমন দেয় না।"

—"দেয় না বুঝি? সব্বোনাশ। শিগগির ছুটে যা, চিন্তামণির দোকানে বলে আয়।" শমিতা সমাধান দেয়।

—"চিন্তামণি পারবে। ওই যে আমার জন্যে যেমন পান করে, মিঠেপাতা, এলাচ, সুপুরি, চমনবাহার—তাই করুক না? পানে গুচ্ছের জ্যাম-জেলি দিতে হবে না। তিনশ পান বলে দে। ঠোঙা দেয় যেন! আর কিছু দেবে পানে?"

—"ছানা দিতে পারে।"

পাত্রের কাকা সেখানেই দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন।

—"খুব হেল্‌থ ফুড ফ্যাড হয়েছে। আজকাল পানে ছানাটা খুব চলছে দিল্লি বম্বেতে। পান-পনীর।"

—"পান-পনীর? সে আবার কেমন খেতে?"

—"গ্র্যাণ্ড। হেল্‌থ ফুড স্টোরে তো পাওয়া যায়। খাননি?"—এবার পাত্রের কাকার মুখের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন বড়মাসি। "পান-পনীর? না বাবা, সেসব আমরা খাইনি।"

—"সে কি কলকাতায় চলবে? তার চেয়ে আমার মনে হয় ওই মিঠেপানই ভালো। পান-পনীর থাক।" ছড়া লিখতে মগ্ন শমিতার এতক্ষণে টনক নড়ে।

—"পান-পনীর? কে? কে বলেছে কথাটা? কার মগজে জন্মেছে? ওঃ আপনি? তাই বলুন। তত্ত্বে লাইসিল ঢুকিয়েও হয়নি, আপনি এখন পানটা ধ্বংস করতে এসেছেন। সত্যি মিস্টার মুখার্জি, কেন যে আমার দুর্বুদ্ধিটা হলো একসঙ্গে উৎসব করার? শিবু, তোকেও বলিহারি—পানে ছানা কেউ দেয়? তুইই বা শুনছিস কেন ওর বাজে কথা—যতো কুবুদ্ধি দুষ্টুবুদ্ধি নষ্টবুদ্ধি।"

ছেলের কাকা টবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদুমৃদু হাসে। হাসি দেখেই শমিতা রাগে ফেটে পড়ে—"ও, আপনিই? আপনি এখানে কি করছেন? এখানে আপনার কি দরকার? যান বাড়ি যান। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

—"ঐ যে, কেটারার। তারপর আসবে ডেকরেটর। ইলেকট্রিকের লোক। আপনাকেই তো সবাইকে অ্যাটেণ্ড করতে হবে। তাই এলাম। আপনাকে হেল্প করছি।। দাদা পাঠিয়ে দিলেন।"

—"হেল্প করছি? এর নাম হেল্প? এক্ষুনি শিবু পানে ছানা অর্ডার দিয়ে দিচ্ছিল। এটা কি ইয়ার্কি মারার সময়। আচ্ছা মানুষ মশাই আপনি।"

—"মেয়ের বিয়েতে অমন একটু আধটু হয়েই থাকে।"

—"বিয়েটা কি কেবল আমার মেয়ের? অ্যাঁ?"

—"নো, নো, অফ কোর্স নট। বিয়ে আপনার মেয়ের, আর আপনার জামাইয়ের।"

—"আর আপনার তবে কে? আপনাদের কিছু নয়?"

—"নিশ্চয়ই! আমরা তো খেতে আসবো। নইলে খাবেটা কে?"

—"তবে তাই আসবেন। এখন বাড়ি যান দিকিনি? উঃ"—

—"দাদা বলেছেন, যাও, মিসেস দাশগুপ্তকে"—

—"হেল্প করো! উঃ-যেমন দাদা"—

—"ঐ যে দাদা নিজেই এসে গেছেন।"

—"এই যে! এই যে! মিস্টার মুখার্জি কী একখানি ভাইকেই পাঠিয়েছেন—"

—"করেছে? করে ফেলেছে? ওয়াণ্ডারফুল!"

—"কি করবে? করবেটা কী?"

—"ঐ যে ডেকরেটারদের সঙ্গে গিয়ে দেখবে কোথায় কী হচ্ছে—ক'টা টেবিল, ক'টা চেয়ার গুনে নেবে—সি ই এস সি'র মিটারটা"—

—"মুণ্ডু করেছেন। এখানে বসে বসে সব গোলমাল পাকাচ্ছেন—" ছেলের কাকা মিটিমিটি হাসেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয় না তাঁকে।

—"কী রে শমি? কদ্দুর এগোলো?"

যাক শমিতার বড় জা তাহলে এসে পড়েছেন। শরীরটা ভালো ছিল না, উনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারবেন কি না বর্ধমান থেকে, তারই ঠিক ছিল না। শমিতার আনন্দ ধরে না।

—"এসেছো দিদিভাই? এসো এসো—এই যে এঁরাই হলেন আমাদের নতুন কুটুম—এই যে, ইনি আমার ভাসুর, আর ইনি আমার খুড়-ভাসুর"—আহ্লাদে ডগমগ শমিতা উথলে ওঠে। কিন্তু বড় জা স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর বলেন :

—"কী বললি? তোর—ভাসুর?"

—"স্যরি, শ্বশুর।" শমিতা কি একটু ঘাবড়ে যায়।

—"তোর শ্বশুর? শমি?"

—"না, না, মানে, আমাদের জামায়ের।"

—"তোর জামাইয়ের শ্বশুর? ওঃ বুঝেছি। চল্ দিকিনি, ওপরে চল্। তোর বোধহয় ঘুমটুম হচ্ছে না ঠিকমতন।"

অগত্যা রবিই এগোয়।

—"অদূর ভবিষ্যতে পুপ্‌সির শ্বশুর হবো এমন একটা চান্স আছে। আপনি?"

—"নমস্কার, বেয়াইমশাই। আমি পুপুর জ্যাঠাইমা। আর আপনি?"

টবি এতক্ষণ চুপচাপ লক্ষ্মীছেলের মতো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার কথা বলতে পেয়ে বেঁচে যায়। গম্ভীর মুখে টবি বলল--

—"ঐ যে শুনলেন? খুড়-ভাসুর? আমি হচ্ছি একজন খুড়-ভাসুর।"

—"খুড়-ভাসুর আবার কী? জন্মে শুনিনি এসব শব্দ।" ছোকরাকে এক ধমক লাগান জ্যাঠাইমা। "কার খুড়-ভাসুর আপনি?"

—"লজিক্যালি ঠিকই আছে। আমি যদি কারুর ভাসুর হই, তবে আমার ছোটভাই খুড়-ভাসুর হতেই পারে। তাই না?"

রবি আন্তরিকভাবেই সাহায্য করার চেষ্টা করে।

—"ওটা খুড়শ্বশুর হবে—সামলে নিয়ে শমিতা এতক্ষণে প্রুফ কারেক্ট করে দেয়।—

—"পুপ্‌সির হবু খুড়শ্বশুর?" বড় জার মাথা ডিটেলে খুবই পরিষ্কার।—"তাই বল।"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তা, ওঁদের জলটল কিছু দিয়েছিস? বসুন আপনারা। বৈঠকখানা ঘরে—"

—"না না, ওরাও যে হোস্ট—দিদি, জয়েন্ট সেলিব্রেশন হচ্ছে না? এনগেজমেন্ট-কাম-আশীর্বাদ, দুই পক্ষ একসঙ্গে জয়েন্টলি, মনে নেই?" শমিতা ব্যগ্র হয়ে মনে করিয়ে দেয়। "সব খরচে হাফ অ্যান্ড হাফ।"

—"খুব মনে আছে। কিন্তু এই বাড়িটা কার? ওঁদের? না তোমার? না হাফ এ্যাণ্ড হাফ? এখন ওঁরা তোমার বাড়িতে এসেছেন। তুমি ওঁদের বসাও। কুটুম বলে কথা। শরবৎ টরবৎ দাও। চিরদিনের পাগলি রয়ে গেলি? মেয়ের বিয়ে দিতে চললি—তবু বুদ্ধিটা পাকল না।"

—"বসাবেন কী। এতক্ষণ ঝগড়া করছেন"—'খুড়-ভাসুর' কমপ্লেন করেন চটপট।

—"ঝগড়া করবো না? উনি এক্ষুনি ছানা দিয়ে পান সাজাতে অর্ডার

দিচ্ছিলেন দিদিভাই—জ্বালিয়ে মারলেন উনি আমাকে— কেবল খ্যাপাচ্ছে—"

—"ভালই হয়েছে। তোর একটা বেয়াই-কাম-দ্যাওর জুটলো—ওটার তো অভাব ছিল—"

চতুর্থ অঙ্ক : তৃতীয় দৃশ্য

ট্রে সাজানো প্রায় কমপ্লিট। চমৎকার দেখাচ্ছে। শমিতা নিজের ছড়া পড়ে নিজেই মোহিত। বড়দির এই আইডিয়াটা দারুণ কিন্তু! এবার চান করতে পাঠাতে হবে একজন একজন করে। দুটো বাজে।

—"দিদি, নিচে আপনার কাছে লোক এসেছে।"

—"কিসের লোক?" বলতে বলতে শমিতা নিচে নামতে থাকে। জিজ্ঞেস করার চেয়ে গিয়ে দেখতে সময় কম লাগে। ঝোলাঝুলি নিয়ে একটা দাড়িওলা ছোকরা। বাঁচা গেল। এসে গেছে।

—"ওঃ, আপনি? আপনি তো ইলেকট্রিশিয়ান! তা, এত দেরি যে? চলুন, চলুন, আরো দুটো ফ্লাডলাইট লাগবে। ওই মড়ার-মতন-দেখানো-শাদা জোরালো আলোগুলো আমার দু'চক্ষের বিষ। হাজার ওয়াটের ঐ একটার বদলে ঘরে দুটো পাঁচশোর—"

"আজ্ঞে, আমি 'নন্দিনী' পত্রিকা থেকে এসেছিলাম। ঐ যে ইন্টারভিউ নিয়ে গেছে পরশু? আমি ওরই ফোটোগ্রাফার।" শমিতা ঘাবড়ায় না। সময় বড্ড কম।

—"ওঃ ফটোগ্রাফ? নিন। নিয়ে নিন।"

—"আপনি একটু তৈরি হবেন না?"

—"তৈরি? তৈরির কী আছে? দেখছেন তো আমার মরবার সময় নেই।"

—"আপনার চুলটা"—

—"ওতেই হবে।" (শমিতা কি ফিল্মস্টার?)

—"কাপড়টা একটু গুছিয়ে—"

—"হাফ্। হাফ্ ছবি নিন।" (শমিতা প্র্যাকটিক্যাল)।

—"আপনার হাতে কি ওটা থাকবে?"

শমিতা একবার তাকায়। হাতে? ওঃ। তত্ত্বে সাজানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। দু'পাটি মস্ত মস্ত সোয়েডের বুটজুতো খুব যত্ন করে শমিতা দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। তার ভেতরে একটা রাংতার লাঠিতে একটা মিকিমাউসের মুণ্ডু আঁকা কাগজের টুপি। সেই টুপিতে পালকের মতো একটা ছড়া গোঁজা, মিকিমাউসের গোলগাল কান ফ্যানের বাতাসে পত্‌পত্‌ করে

নড়ছে। অত্যন্ত কৃত্রিম বিনয়ের মুখ করে তরুণ ফোটোগ্রাফারটি হাসি চেপে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক্ করছে।

শমিতা হেসে ফ্যালে। জুতোজোড়া টেবিলে নামিয়ে, দু'হাতে খোঁপাটা ভেঙে আবার জড়িয়ে নেয়। শাড়িটাকে গুছিয়ে ভদ্রভাবে টেনে নেয় গায়ে। "ক্লিক্"। "ক্লিক্"। "ক্লিক্"।—"থ্যাংকিউ।—অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে খুবই দুঃখিত।" বলে ছেলেটা ক্যামেরা গুছোতে থাকে।

—"না না তাতে কী"—বলতে বলতে শমিতা দৌড়ে ওপরে উঠে যায়। ট্রেতে জুতোটা নামানো মাত্রই কানাই ডাকতে আসে।

চতুর্থ অঙ্ক : চতুর্থ দৃশ্য

"দিদি, নিচে আবার লোক।"

—"আবার কে এল? এবার ঠিক ইলেকট্রিকের"—

—"না, ইলেকট্রিকের নয়। নাম বলছে না, বলছে চেনালোক নয়। এক মিনিট কথা আছে।"

"উঃ! তাকে বলে দিতে পারলি না, আজ সময় নেই?" শমিতা ফুঁসতে ফুঁসতে নিচে নামে।

—"শমিতা দেবী আমি আপনার লেখার"—

—"থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। মাপ করবেন আজকে আমার একেবারে সময় নেই—"

—"আমি আপনাকে গত বারো বছর ধরে"—

—"অনেক ধন্যবাদ। আমার মেয়ের কালকে আশীর্বাদ, বুঝলেন? একদম সময় নেই"—

—"চিঠিপত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমার নাম সুশান্ত রায়।"

শমিতা চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ। অজস্র চিঠি লেখে। কী উপায়ে পালাবে সে? এত, এতবছর বাদে কিনা আজই? হায় রে।

—"দেখুন, আজ আমি বড়ই বিব্রত, বুঝলেন? আপনি আরেকদিন আসুন— আজ আমার একদমই—"

—"সময় নেই? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার একটা ঘড়ির খুব দরকার। আপনাকে একটা কিছু উপহার দিতে আমার বড় ইচ্ছে, আপনাকে চিঠিতে তো জানিয়েছি আগেই—এখন মনে হচ্ছে একটা ঘড়ি—"

—"না না, আমার কিচ্ছু চাই না। কিচ্ছু উপহার চাই না আমার"— শমিতা অসহায় বোধ করে। এমন সময়ে ক্রুদ্ধ শিবুমামার আর্বিভাব।

—"এই যে, এসে গেছেন দেখছি। এখন ক'টা বাজে জানেন?"

—"কথার দরকার নেই। কাজের কথা বলুন। আপনি তো ফুলের লোক? তবে শুনুন ফুল যা বলেছিলাম, তার চেয়ে মনে হচ্ছে কিছু বেশিই—"

—"আমি যদিও ঠিক ফুলের লোক নই তবে ফুলের লোক হতেই পারি। এখন আমি আপনাদের ঘড়ির লোক। আচ্ছা আপনাদের ঘড়ি কত লাগবে?"

শিবুমামাকে বিভ্রান্ত দেখায়।

—"ফুলের লোক নন? স্যারি। ভেরি স্যারি। কিন্তু ঘড়ির লোক মানে কী?"

—"শিবু, শিবু, তুই ওপরে যা ভাই, ঘড়ির ব্যাপার তুই বুঝবি না।" শমিতা আর্তনাদ করে ওঠে। "একদম সময় নেই।"

—"না বোঝবার কী আছে?" শিবুমামা বলেন।

—"ঘড়ির সেলসম্যান তো? জামাইয়ের জন্যে আমাদের ঘড়ি কেনা হয়ে গেছে ভাই। থ্যাংকিউ, আর লাগবে না।"

—"নাঃ, আমি তাও নই। রং গেস। ট্রাই আগেন"—সুশান্ত রায়ের চোখ মিটিমিটি হাস্য করে। কিন্তু শিবুমামার হাসি পায় না।

—"তবে আপনি কি করেন জীবিকা নির্বাহের জন্য? এখানে ঘড়ি-ঘড়ি কচ্ছেন কেন?"

—"আমি ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি চাকরি করি। আপনি কী করেন জীবিকা নির্বাহের জন্য—ফুলের লোকের পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া?" সুশান্তর অমায়িক প্রশ্নে শিবুমামা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

—"দেখুন ভালো চান তো কেটে পড়ুন, দিদির এখন ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় নেই—"

—"সময় নিয়েই তো কথা হচ্ছিল। ঘড়ির প্রসঙ্গ তাই উঠেছে। কাল আশীর্বাদটা ক'টার সময়?"

—"তাতে আপনার কী মশাই?"

শমিতা তাড়াতাড়ি মধ্যস্থতা করে—

—"আশীর্বাদ সন্ধেবেলাতে—কিন্তু এখানে হচ্ছে না"—

—"তবে আমি আজই কোনো সময়ে এসে দিদির ঘড়িটা দিয়ে যাবো—"

—"ঘড়ির কোনো দরকার নেই ভাই"—

—"আপনার সময়ের প্রচণ্ড অভাব, ঘড়ি দরকার"—

—"ঘড়ি? দিদির ঘড়ির অভাব? ক'টা ঘড়ি চাই? ওঃ ঘড়ি-ঘড়ি করে তখন থেকে..."

—"কে আপনাকে ঘড়ি দিতে বলেছে মশাই?" এমন সময়ে অফিসফেরৎ দীপুমামার আবির্ভাব। হাতে সিগারেট, ঠোঁটে শিস। কাঁধে ঝোলা। চোখে চশমা।

—"ঘড়ি? কার ঘড়ি? কে কাকে ঘড়ি দিচ্ছে শিবুদা? আমার ঘড়িটা যে সেদিন কোথায় হারিয়ে ফেললাম। একটা ঘড়ি আমার খুব দরকার। ও, এই যে! আপনিই বুঝি ঘড়ি দিচ্ছেন? তা বেশ, দিন দিন, আমাকেই দিন।" হাত বাড়িয়ে দেয় দীপু—সঙ্গে সঙ্গেই সুর করে গান ধরে "ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড় কে, কিঁউ ধড় কে, কায় ধড়কে"...গানটা শুনে সুশান্তর মুখের চেহারা পালটে যায়। শমিতা ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। সুশান্ত বলে—"বাঃ, এই তো চাই। সারাজীবন আমি আপনাকেই খুঁজছি।"

এইবার দীপুর মুখে সন্দেহ জাগে।

—"আমাকে? না মশাই না। ভুল অ্যাড্রেসে এসেছেন। সে নহি নহি। গে নহি নহি।"

—"গে হবার কী দরকার মশাই? পাগল তো বটে? পাগলের সঙ্গে পাগলের যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পূর্ণচাঁদের মায়ায়, আর মহুয়ার নেশায় সম্ভব"—

—"মহুয়া? মহুয়া বললেন?" দীপু সচকিত হয়ে বলে।

—"কানাই! ও কানাই, দু'কাপ চা। চলুন মশাই বারান্দায় চলুন। এখানে কথা হবে না।" শিবুমামা গজগজ করতে করতে নিচে যান—।

—"যত পাগল জুটেছে। বলে—'ঘড়ি নেবেন, ঘড়ি?' ওঃ রক্ষে করো"—অন্য ফুলের লোক ধরতে হবে। শিবুমামা ছোটেন। কাণ্ডকারখানা যা হচ্ছে, বলার নয়। তায় ছেলের কাকাটি আর এক বিচ্ছু। দিচ্ছিল সব গড়বড় করে।

—"এই প্যাকেটটা আবার কী? এটা কার প্যাকেট?" বড়মাসি চেঁচাচ্ছেন।

—"ওটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। বলল দিদিকে দিয়ে দিতে।" বিন্দু বলে।

—"কে লোক? কী আছে এতে?"

—"ঘড়ি।" কানাই উত্তর দেয়।

লোকটা বলে গেছে এতে দুটো ঘড়ি আছে। দুটোই দিদির জন্যে। এক এক সময় এক একটা পরবেন। খেয়ালখুশি মতন।"

—"দুটোই পুপ্‌সিকে?" বড়মাসি একটু বিভ্রান্ত।

—"না না, দিদিমণিকে।" বিন্দু কারেক্ট করে দেয়—"পুপ্‌দিদির মাকে দিয়েছে।"

—"কিন্তু আশীর্বাদ তো পুপ্‌সির।"

—"আশীর্বাদের সঙ্গে যোগ নেই। লোকটা বলে গেল, দিদি নাকি অনেক তুকতাক জানেন। ওর অনেক উপকার করেছেন। তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে।"

—"তুকতাক জানে? আমাদের শমি? তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে? হায় কপাল। কই, কী ঘড়ি? দেখি?" নির্দয় হাতে বড়মাসি প্যাকেট খুলে ফ্যালেন। দুটিই টাইটান গ্যারান্টির কাগজপত্তর সমেত। হাজার দেড়েক মতো লেগেছে দুটো মিলিয়ে। তিনটি চিঠি আছে ভিতরে। একটা দীপুমামাকে। ঝাড়গ্রামের কোয়ার্টারের ম্যাপ ট্যাপ সমেত নেমন্তন্ন। যে কোন শুক্লপক্ষে। আরেকটা পুপ্‌সিকে। আশীর্বাদ। আরেকটা শমিতাকে। তুকতাকের জন্যে ধন্যবাদ। দুটো ঘড়িই তার একার জন্যে। বাজেটে যেহেতু দুটোই কুলোলো, তাই। বড়মাসি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

—"যত্তো উন্মাদ পাগলের কাণ্ডকারখানা। এখন শমি এই ঘড়ি নিয়ে কী করবে?"

শমিতা এসে ঘড়ি দেখে প্রায় কেঁদে ফেললে। "ছি ছি! এখন আমি কী যে করি? এ-পাগ্‌লা যে সত্যি সত্যিই ক্ষ্যাপা বড়দি? পরে দীপুর ঐ ম্যাপটা দেখে দেখে ঝাড়গ্রামে গিয়ে ঘড়ি ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। খবর্দার পুপু, ও-ঘড়িতে তোমরা হাত দেবে না। ওগুলো কিন্তু আমাদের নয়।"

দুটো ঘড়ির একটা ছেলেদের, একটা মেয়েদের। শিবুমামা বললেন, "আশীর্বাদে একটা ববিকে, একটা পুপুকে দিয়ে দাও, চুকে যাক ল্যাঠা। ওর বোধহয় সেটাই মনের ইচ্ছে। নইলে দুটো দিল কেন?"

বড়মাসি বললেন, "সেই যদি ইচ্ছে হবে তাহলে সেইটে বললেই পারতো? শমিকে দিলে কেন?" দীপুমামা এসে ঘড়ি দেখে নির্বাক। তারপর বললে—"একটা তুমি রেখে দাও দিদি। দুটোই ফেরৎ দিও না। দুঃখ পাবেন ভদ্দরলোক।"

—"অন্যটা আমাকে দিয়ে দাও—এই তো বলছিস?" বড়মাসি টিপ্পুনি কাটেন।

—"নাঃ। তা বলিনি। অন্যটা ওকে ফিরিয়েই দিতে হবে। সত্যিকারের পাগল। হুঁ, কতরকমই মানুষ আছে পৃথিবীতে!" তারপরেই গেয়ে ওঠে—"হায় দিল—মুশকিল—জীনা য়ঁহা—ওরে কানাই রে, এককাপ চা করবি বাবা?" চটি ফটফট করে দীপু রান্নাঘরে চলে যায়, সম্ভবত দেশলাই চুরির অসৎ উদ্দেশ্যে।

শমিতা যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তারই ভেতর খেয়াল করে ঘড়িদুটোকে আলমারিতে তুলে রাখে। তারপরেই ছোটে—"ওরে? কুলপির জন্যে বরফ আনা হয়েছে? বাবু? বাবু ফিরেছে মিষ্টি নিয়ে? ও যখন তেওয়ারীতে কুলপি আনতে যাবে, তখনই তোরা কেউ বরফটা আনিয়ে রাখবি।"

—"কে আপনাকে ঘড়ি দিতে বলেছে মশাই?" এমন সময়ে অফিসফেরৎ দীপুমামার আবির্ভাব। হাতে সিগারেট, ঠোঁটে শিস। কাঁধে ঝোলা। চোখে চশমা।

—"ঘড়ি? কার ঘড়ি? কে কাকে ঘড়ি দিচ্ছে শিবুদা? আমার ঘড়িটা যে সেদিন কোথায় হারিয়ে ফেললাম। একটা ঘড়ি আমার খুব দরকার। ও, এই যে! আপনিই বুঝি ঘড়ি দিচ্ছেন? তা বেশ, দিন দিন, আমাকেই দিন।" হাত বাড়িয়ে দেয় দীপু—সঙ্গে সঙ্গেই সুর করে গান ধরে "ঘড়ি ঘড়ি মেরা দিল ধড় কে, কিঁউ ধড় কে, কায় ধড়কে"...গানটা শুনে সুশান্তর মুখের চেহারা পালটে যায়। শমিতা ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। সুশান্ত বলে—"বাঃ, এই তো চাই। সারাজীবন আমি আপনাকেই খুঁজছি।"

এইবার দীপুর মুখে সন্দেহ জাগে।

—"আমাকে? না মশাই না। ভুল অ্যাড্রেসে এসেছেন। সে নহি নহি। গে নহি, নহি।"

—"গে হবার কী দরকার মশাই? পাগল তো বটে? পাগলের সঙ্গে পাগলের যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পূর্ণচাঁদের মায়ায়, আর মহুয়ার নেশায় সম্ভব"—

—"মহুয়া? মহুয়া বললেন?" দীপু সচকিত হয়ে বলে।

—"কানাই! ও কানাই, দু'কাপ চা। চলুন মশাই বারান্দায় চলুন। এখানে কথা হবে না।" শিবুমামা গজগজ করতে করতে নিচে যান—।

—"যত পাগল জুটেছে। বলে—'ঘড়ি নেবেন, ঘড়ি?' ওঃ রক্ষে করো"—অন্য ফুলের লোক ধরতে হবে। শিবুমামা ছোটেন। কাণ্ডকারখানা যা হচ্ছে, বলার নয়। তায় ছেলের কাকাটি আর এক বিচ্ছু। দিচ্ছিল সব গড়বড় করে।

—"এই প্যাকেটটা আবার কী? এটা কার প্যাকেট?" বড়মাসি চেঁচাচ্ছেন।

—"ওটা একটা লোক এসে দিয়ে গেল। বলল দিদিকে দিয়ে দিতে।" বিন্দু বলে।

—"কে লোক? কী আছে এতে?"

—"ঘড়ি।" কানাই উত্তর দেয়।

লোকটা বলে গেছে এতে দুটো ঘড়ি আছে। দুটোই দিদির জন্যে। এক এক সময় এক একটা পরবেন! খেয়ালখুশি মতন।"

—"দুটোই পুপ্‌সিকে?" বড়মাসি একটু বিভ্রান্ত।

—"না না, দিদিমণিকে।" বিন্দু কারেক্ট করে দেয়—"পুপ্‌দিদির মাকে দিয়েছে।"

—"কিন্তু আশীর্বাদ তো পুপ্‌সির।"

—"আশীর্বাদের সঙ্গে যোগ নেই। লোকটা বলে গেল, দিদি নাকি অনেক তুকতাক জানেন। ওর অনেক উপকার করেছেন। তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে।"

—"তুকতাক জানে? আমাদের শমি? তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে? হায় কপাল। কই, কী ঘড়ি? দেখি?" নির্দয় হাতে বড়মাসি প্যাকেট খুলে ফ্যালেন। দুটিই টাইটান গ্যারান্টির কাগজপত্তর সমেত। হাজার দেড়েক মতো লেগেছে দুটো মিলিয়ে। তিনটি চিঠি আছে ভিতরে। একটা দীপুমামাকে। ঝাড়গ্রামের কোয়ার্টারের ম্যাপ ট্যাপ সমেত নেমন্তন্ন। যে কোন শুক্লপক্ষে। আরেকটা পুপ্‌সিকে। আশীর্বাদ। আরেকটা শমিতাকে। তুকতাকের জন্যে ধন্যবাদ। দুটো ঘড়িই তার একার জন্যে। বাজেটে যেহেতু দুটোই কুলোলো, তাই। বড়মাসি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

—"যত্তো উন্মাদ পাগলের কাণ্ডকারখানা। এখন শমি এই ঘড়ি নিয়ে কী করবে?"

শমিতা এসে ঘড়ি দেখে প্রায় কেঁদে ফেললে। "ছি ছি! এখন আমি কী যে করি? এ-পাগ্‌লা যে সত্যি সত্যিই ক্ষ্যাপা বড়দি? পরে দীপুর ঐ ম্যাপটা দেখে দেখে ঝাড়গ্রামে গিয়ে ঘড়ি ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। খবর্দার পুপু, ও-ঘড়িতে তোমরা হাত দেবে না। ওগুলো কিন্তু আমাদের নয়।"

দুটো ঘড়ির একটা ছেলেদের, একটা মেয়েদের। শিবুমামা বললেন, "আশীর্বাদে একটা ববিকে, একটা পুপুকে দিয়ে দাও, চুকে যাক ল্যাঠা। ওর বোধহয় সেটাই মনের ইচ্ছে। নইলে দুটো দিল কেন?"

বড়মাসি বললেন, "সেই যদি ইচ্ছে হবে তাহলে সেইটে বললেই পারতো? শমিকে দিলে কেন?" দীপুমামা এসে ঘড়ি দেখে নির্বাক। তারপর বললে— "একটা তুমি রেখে দাও দিদি। দুটোই ফেরৎ দিও না। দুঃখ পাবেন ভদ্দরলোক।"

—"অন্যটা আমাকে দিয়ে দাও—এই তো বলছিস?" বড়মাসি টিপ্পুনি কাটেন।

—"নাঃ। তা বলিনি। অন্যটা ওকে ফিরিয়েই দিতে হবে। সত্যিকারের পাগল। হুঁ, কতরকমই মানুষ আছে পৃথিবীতে!" তারপরেই গেয়ে ওঠে— "হায় দিল—মুশকিল—জীনা য়ঁহা—ওরে কানাই রে, এককাপ চা করবি বাবা?" চটি ফটফট করে দীপু রান্নাঘরে চলে যায়, সম্ভবত দেশলাই চুরির অসৎ উদ্দেশ্যে।

শমিতা যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তারই ভেতর খেয়াল করে ঘড়িদুটোকে আলমারিতে তুলে রাখে। তারপরেই ছোটে— "ওরে? কুলপির জন্যে বরফ আনা হয়েছে? বাবু? বাবু ফিরেছে মিষ্টি নিয়ে? ও যখন তেওয়ারীতে কুলপি আনতে যাবে, তখনই তোরা কেউ বরফটা আনিয়ে রাখবি।"

পঞ্চম অঙ্ক : পঞ্চম দৃশ্য

গাড়ি থেকে পুপ্‌সি নামলো যখন, চেনা যাচ্ছে না। শাড়িতে গয়নায় চন্দনে ঝুমকোয় কমপ্লিট কনে। কোনো দোকানে কনে সাজাতে মেয়েকে নিয়ে যায়নি শমিতা। মায়ে-মাসিতে-জেঠিতে মিলেই যা পেরেছে সাজিয়েছে। দোকানে কনে সাজানো ওর ভালো লাগে না। একবার শমির এক বন্ধুর ভায়ের বিয়ের দিনে, দল বেঁধে 'কবরী'-তে চুল বাঁধতে গিয়ে ভাবী কনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেও চুল বাঁধতে গেছে। ঝুটি-করে-চুল-বাঁধা সেই অপ্রস্তুত কনেকে দেখে অবধি শমি ঠিক করেছিল—নেভার। —পুপ্‌সি নামতেই হুলুধ্বনি, শাঁখ বাজলো। মেয়ে আসতে একটু বিলম্ব হয়েছে। ছেলের বাড়ির পুরুতমশাই ছেলের আশীর্বাদ শুরু করে দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। ধুতিপাঞ্জাবিতে শোভিত ববিকে চেনা যায় না। ছেলের বাবা মা কাকা মামা সবাই উপস্থিত। মেয়ের বাবাও অলরেডি প্রেজেন্ট। কিন্তু মেয়ের বাবা রাজি হননি। রাজি হননি কেননা আশীর্বাদে কনের পিতার 'জেশচার'টাই যে করা হবে না তাঁর। ঘড়ি বোতাম কিছুই তো ওখানে নেই। সব মেয়ের মার সঙ্গে আসবে। পুরুত বললেন মন্ত্রের সঙ্গে ধানদুর্বাই যথেষ্ট। মেয়ের বাবা বললেন, যেহেতু উনি মন্ত্র পড়বেন না, ধানদুর্বা তাই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া মেয়ের মা-ই উপস্থিত নেই। এত খেটেখুটে সব ব্যবস্থা সে করেছে, সে থাকবে না?

—"কিন্তু লগ্ন যে পেরিয়ে যাচ্ছে?"

—"ধুত্তোর লগ্নের নিকুচি করেছে—"

উদ্বিগ্ন ছেলের বাবার কানে মেয়ের বড়মামু বলেন—"একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চুড়ে / ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী / একটি নিমেষে দাঁড়ালো অভ্র জুড়ে / থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি।" এসব লগ্ন কদাচ পার হয়ে যায় না মশাই, ওদের আগে আসতে দিন। একা একা কি এনগেজমেন্ট জমে?"

—"মণিকাঞ্চনযোগ পেরিয়ে যাচ্ছে—অমৃতযোগ অবিশ্যি আছে কিছুক্ষণ"—ব্যস্ত হয়ে পুরুতমশাই জানান।

—"অমৃতই তো আসল মশাই, মৈত্রেয়ীর কথাটা মনে করুন না? মণিতেই বা কী হবে আর কাঞ্চনেই বা কী হবে! যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম? মণি, কাঞ্চন এসব তো বাহ্য"—ভুল সুধীন্দ্রনাথ থেকে অশুদ্ধ উপনিষদে চলে যান বড়মামু, আর কব্জির ঘড়ির দিকে গোপনে ব্যস্ত দৃষ্টিপাত করতে থাকেন। ইতিমধ্যে হুলুধ্বনি। শঙ্খধ্বনি।

ছেলের বাবা-মা-কাকা-মামাদের আশীর্বাদ প্রথমে হলো। নির্বিঘ্নেই হলো।

কাকা কোন গণ্ডগোল করেনি। কেবল রবি মেয়ের হাতে গয়নাটা পরাতে পারেনি, বন্দনার সাহায্য লেগেছে। এবার মেয়ের বাড়ির পালা। মেয়ের বাবা বললেন মন্ত্র তিনি পড়বেন না, তবে বাবা হিসেবে একটা আশীর্বাদী জেশচার করতে চান ঘড়িটা ছেলের হাতে পরিয়ে দিয়ে। শিবতোষ সস্নেহে ববির হাতটি টেনে নিয়ে দেখে, সেখানে আরেকটা ঘড়ি আছে! ওটা পরে আসার কথা ছিল না। ভুল করে পরা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা খুলে ববি পকেটে ভরে ফ্যালে। ফাঁকা কব্জিতে কৃতজ্ঞচিত্তে শিবতোষ ঘড়িটা পরিয়ে দেয়। ববি প্রণাম করে। ধানদুর্বা দিতে দিতে শিবতোষ খেয়াল করে ছেলের হাতে water resistant লেবেলটা সেঁটে গেছে। সময়মতন ওটা খোলা হয়নি। ওটা ওঠানোর কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সব আলো নিবে গেল। লোডশেডিং। "ভয় নেই—জেনারেটর আছে"—শিবুমামার গলা। "পুপ্সি, গয়নার বাক্সগুলো দেখিস"—বড়মাসির গলা।

—"রূপোর জিনিসগুলো সামলে"—শমিতার ভাঙা গলা। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। দেখা যায় কনে দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে আপ্রাণ গয়নার বাক্সগুলো সামলাচ্ছে। বর রূপোর দীপদানটা চেপে ধরে আছে। পুরুতমশাই রূপোর থালাটা আগলে আছেন। একমুহূর্তে সবাই অট্টহাসি হেসে ওঠে। দৃশ্য বটে।

এবার মেয়ের মায়ের পালা। তাঁর কপাল ভালো। water resistant মার্কামারা জামাই ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তিনি বসতেই পুরুতমশাই বললেন, "আপনিও তো মন্ত্র বাদ?" শমিতা বলে—"না। আমি মন্ত্র পড়ব।" ঠাকুরমশাই চন্দনে একটা রজনীগন্ধার বৃন্ত চুবিয়ে ওর হাতে দেন—তিনবার যে মন্ত্র পড়ান, তাতে যে আশীর্বাদের কী আছে তা শমিতা বুঝতে পারে না। "ওঁ সুবাসিত ভব" আবার কেমন ধারা আশীর্বাণী? যাঃ। সেই যে পুপ্সি বলেছিল তত্ত্বের সময়ে ডিওডোর‍্যান্ট কেনার কথা, শমিতার সেইটে মনে পড়ে যায়। শমিতা ধানদুর্বা নিয়ে, প্রাণভরে বাংলায় মনে মনে আশীর্বাদ করতে থাকে— "ভালো থেকো বাছারা, বেঁচে থেকো, শান্তিতে থেকো, আনন্দে থেকো, তোমাদের এই ভালবাসা, এই বিশ্বাস, যেন কোনোদিন ফুরোয় না।" বলতে বলতে ধানদুর্বা বোতামের বাক্স সবই সে ববির মাথায় রেখে দেয়। পুরুতমশাই বাক্সটা নামিয়ে, খুলে, ছেলের হাতে তুলে দেন।

এবার মেয়েকে আশীর্বাদ। কি জন্মদিনে, কি বিজয়ায়, কি পরীক্ষার সময়, মেয়েই আগে মাকে প্রণাম করে, তার উত্তরে মা আশীর্বাদ করেছেন। এবারের প্রণালীটা বিপরীত। মেয়ে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আছে। মাকে আগে আশীর্বাদ করতে হবে। মা পুরুতের দিকে তাকান। মন্ত্রের আশায়। মন্ত্র বলে

আশীর্বাদ করতে হবে। কিন্তু মন্ত্র। ঠাকুরমশাই চুপ করে আছেন। মেয়েকে আশীর্বাদের কোনো মন্ত্রটন্ত্র বলছেন না। শমিতা হাঁটু গেড়ে বসে। চন্দনের বাটিতে কড়ে আঙুলটা ডুবোয়। মনে মনে ভাবতে থাকে— এবার কী করা? আঙুলটা কখন মেয়ের কপালে ঠেকে গেছে। হঠাৎ শোনে মেয়েই মাকে হেল্‌প করছে। পুপ্‌সি গুনগুনিয়ে মন্ত্র বলে দিচ্ছে—"মেয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা / মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা—" যারপরনাই কৃতজ্ঞচিত্তে শমিতাও বলতে থাকে : "মেয়ে যেন হয় লোহার ভাঁটা।" ঠাকুরমশাই হঠাৎ আপত্তি করে ওঠেন—"আরে, আরে ওটা কী বলছেন? ওটা নয়, ওটা নয়, বলুন—"

বাইরে তখন ভরা পূর্ণিমার জোয়ার ডেকেছে। টুনিবাল্বগুলো লতায় পাতায় মিষ্টি হাওয়ায় হেলেদুলে ঝিকিমিকি চোখ টিপে বলছে, "পুপসিসোনা ভালো থেকো, ববিবাবু ভালো থেকো"—চরাচরপ্লাবী জ্যোৎস্নায় আহলাদে ঢলঢল লেকের জলের শামুকগুলো হেসে গলাগলি করে বলছে, "পুপ্‌সি, সুখী হও, ববি সুখী হও", আর বুদ্ধপূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ ওদের ওপরে অজস্র জ্যোছনার ধানদুব্বো ছড়াচ্ছে। তার যেটা চিরকালের 'জেশচার'।

অসৎ ভাই

বানী বসু

সাত-সক্কালে উড়োখুড়ো চুলে সুনন্দকে ঢুকতে দেখে কল্যাণ অবাক হয়ে যায়।

সে ছিল কলঘরে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল। ডানদিকে ছোট্ট জানলা। এই বহুতলে ঢোকবার পথটা সেখান থেকে সোজা দেখতে পাওয়া যায়। গাড়ি-টাড়ি ঢোকবার বেরোবার সময়ে যখন দু দিকের দুটো পাল্লা টেনে খুলে ধরা হয় সেই গড়গড় আওয়াজটাও বেশ শুনতে পাওয়া যায়। লোকজন অবশ্য আসে পাশের একটা একপাল্লা গেট দিয়ে। তার কোনো আওয়াজ নেই। তবু যেন কী অজ্ঞাত কারণে তার চোখ ওদিকে চলে গিয়েছিল। মাথার মধ্যে ছোট্ট একটা ঘন্টি বাজছে। আসছে, তোমার চেনা, তোমার আপন। এই ঘন্টি যদি না থাকত তাহলে যে এই সকালে বারবার ওখান দিয়ে জমাদার, ঝাড়ুদার, সমস্ত ফ্ল্যাটের দুধ নিয়ে আসে কেয়ারটেকারের ছেলে, প্রত্যেকবারই তো তার নজর চলে যেত।

পাল্লাটা খুলে ধরে সুনন্দ ঢুকছে। কাঁধে ওর সব সময়ের সঙ্গী শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা আজ নেই। শার্ট-প্যান্ট। বোঝা যাচ্ছে, কোনো মতে গলিয়ে চলে এসেছে, ঠিক অফিস যাবার মতো দুরস্ত নয়। সুনন্দর মাথায় একমাথা চুল, একের তিন ভাগ সাদা। মুখের যুবক-যুবক চেহারাটার সঙ্গে এই তিন কাঁচ্চা এক পাক্কার অসামঞ্জস্যে একটা অদ্ভুত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ওর। চিত্রা, মানে কল্যাণের স্ত্রী বলে 'ভারী সুইট'। আসলে একইসঙ্গে কেমন একটা মমতা ও সমীহ আদায় করে নেয় ওর চেহারাটা। কল্যাণের ঠিক পিঠোপিঠি ও। ওদের আর সব ভাইবোনেরা দূরত্ব রেখে রেখে জন্মেছে। বড় বড় ড্যাশ মাঝখানে। দাদা ড্যাশ দিদি ড্যাশ কল্যাণ, কল্যাণ আর সুনন্দর মাঝখানেই শুধু আড়াই বছরের হাইফেন। তারপরে আবার একটা মস্ত ড্যাশ। তারপর অবশ্য....।

সুনন্দ আছে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। ওর গলাটা শ্রোতাসাধারণের বেশ চেনাই। এখন বেশ কয়েক বছর কোনো একটা বিভাগের দায়িত্বে আছে ও। অর্থাৎ ঘরের বাইরে নেমপ্লেট, তাতে বড় বড় করে লেখা থাকে সুনন্দ পালচৌধুরী। কিন্তু সুনন্দর আসল পরিচয় হল ও একজন কবি। বেশ নাম করাই। কল্যাণের ধারণা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিটাতে সুনন্দ যত উপার্জন করে, কয়েকটা ভারিভুরি পুরস্কার পাওয়ার পর এখন ওর বইয়ের রয়্যালটি তার থেকে কিছু কম নয়। অবশ্য এটা ধারণাই, ভারতের সব প্রধান ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে ওর বই, ইংরেজিতেও, তার থেকেই, নইলে আয় ব্যয় নিয়ে কেইবা কার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে।

দাড়ি কামানোটা স্থগিত থাকল। মুখটা ধুয়ে তোয়ালে কাঁধে সঙ্গে সঙ্গে কলঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। সামনেই শোবার ঘরের ঘড়িটা বলছে পৌনে সাত। শীত শেষের সকালের চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে। চিত্রাও কাত হয়ে শুয়ে আছে। এখনও। অনেক রাত পর্যন্ত কোনো ইংরেজি ক্ল্যাসিক দেখেছিল বোধহয়। এখনও ঘুম কাটেনি। তাছাড়া কল্যাণ কলঘর থেকে বেরলে তবেই সে যেতে পারে। ওদিকের কমন টয়লেটটা তারা স্বামী-স্ত্রী কেউই পারতপক্ষে ব্যবহার করে না। তার সাড়া অবশ্য পাওয়ার কথা চিত্রার। উঠলেই খাটটার একটা মচমচ শব্দ হচ্ছে আজকাল। বাথরুমের দরজাটা ক্যাচ-ও শুরু হয়েছে আবার। অন্যদিন হলে এতেই ঘুম ভেঙে যেত। এক্ষুনি ঝংকার দিত, কবে থেকে একটু মেশিন ওয়েল আনতে বলেছি। তার মানে বোধহয় তিনটি-টিনটে অবধি টি. সি. এম. দেখেছে। কী মারকাটারি ছবি ছিল কে জানে! 'গন উইথ দা উইন্ড?' হতে পারে। লম্বা ছবি বলতে 'গন উইথ দা উইন্ড'-এর কথাই আগে মনে পড়ে। ঘুমোক। কল্যাণ নিজের ব্রেকফাস্টটুকু নিজেই করে নিতে শিখে গেছে অনেকদিন। চিত্রার অসুখের সময়ে। সবিতা এসে গেলে অবশ্য দরকার হয় না। বাসন মাজে, ঘর মোছে মেয়েটি। কিন্তু কল্যাণ টোস্ট করতে দিয়ে জল চাপিয়েছে দেখলেই টুক করে ফ্রিজ থেকে দুধ ডিম বার করে নিয়ে আসে। বলে—সরো দাদা, আমি করে দিচ্ছি। প্রথম প্রথম সে সরেই যেত, যাকে বলে হাঁফ ছেড়ে। হাঙ্গামা কম? চায়ের জল মাপমতো বসাও রে, ফুটে কমে গেল কিনা খেয়াল রাখ, চা পাতা দাও। ওদিকে টোস্ট হতে থাকছে। এটা আবার সেই পপ-আপ টোস্টার নয়, না দেখলে পুড়ে যেতে পারে। নিজে করলে সে ডিমটা সেদ্ধই করে নেয়। এত খুঁটিনাটি মেয়েরা যে কী করে অনায়াসে সামলায়!

তা চিত্রা বলল—তুমি ওকে রোজ-রোজ এগুলো করতে দিও না, প্লিজ। ভেবে

দেখো, এটা অ্যাডভান্টেজ নেওয়া। কোনদিন হঠাৎ ফোঁস করবে তুমি জানো না। তাছাড়া সব সময়েই কি এরকম বিবেচক লোক পাব! অভ্যেসটা রাখ!

শোবার ঘর থেকে বেরলেই খাবার জায়গা, যাকে বলে ডাইনিং স্পেস। ডানদিকে রান্নাঘর। ডাইনিং স্পেস থেকে বসবার ঘরে যেতে একটা ছোট করিডর আছে। একটানে সেখানটা পার হয়ে, সোফা-কৌচ, ছোট টেবিল, তার ওপরে ফুলদান, নটরাজ এবং ইত্যাদি ইত্যাদির পাশ কাটিয়ে সে সদর দরজাটা খুলে ধরল। সুনন্দ উঠে আসছে। সিঁড়ির বাঁক থেকেই দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

—তুমি? এত সকালে? কল্যাণের ভারী চশমার আড়ালে চোখ দুটো প্রশ্নে বড় বড় হয়ে গিয়েছিল।

—ওভাবে সিঁড়ি উঠো না ছোট, বয়স বাড়ছে।

সুনন্দ হাসল না। ভেতরে ঢুকে দু হাতে চুলগুলো একবার জড়ো করে নিল। তারপর একটা কৌচে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার সামনের দিকে ঝুঁকে বসল। ওর চশমা আরও হাই পাওয়ারের। চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখায়। বলল—কালকে দশটার নিউজটা শুনেছিলে?

—না। কেন?

—এদিকে, মানে যাদবপুরে একটা বিশ্রী ডাকাতি হয়েছে।

—সে তো হচ্ছে, হচ্ছেই। যাদবপুর, কসবা, তিলজলায় আটকেও থাকছে না আর। ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের কোল্যাপসিব্‌ল তো সব সময়ে ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে— অ্যান্টি-বার্গলার চেন। তাছাড়া....

—ছোড়দা, তোমাকে সেফটির পরামর্শ দিতে আমি এতদূরে ছুটে আসিনি....

—সে তো বুঝতেই পারছি, তবে....

—শোনো, ওদের একটা ধরা পড়েছে, গণপ্রহারে আধমরা, সাঙ্ঘাতিক ইনজিওর্ড অবস্থায় ভর্তি আছে পি.জি-তে। অন্যগুলো পালালেও, একজনের খুব অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছে পাড়ার লোকেরা।

কল্যাণ এখনও তাকিয়ে আছে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

সুনন্দ বলল—সে নাকি একটা কলেজের ছাত্রের মতো দেখতে। হাই-পাওয়ার চশমা, যদিও খুব বলিষ্ঠ, আর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল....মুখটা ওদের খুব চেনা-চেনা লেগেছে।

কল্যাণ মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ যেন ওর বুকের ঘড়ি থেমে গেল।

সুনন্দ বলল, কেন চেনা লেগেছে, বুঝতে পারছ?

—ন্‌ না, মানে....

—আমার টিভি অ্যাপিয়ার‍্যান্স....ছবি-টবি তো আজকাল খুব....

—ছোট, যতই হোক, তুমি তো ফিল্মস্টার বা টিভি-স্টার নও....

—তবু, তবু তো পৌঁছেছে দেখা যাচ্ছে। হয়তো এরা কবি-সম্মেলন টনে....

—অর্থাৎ, তুমি ধরেই নিচ্ছ....

—ধরে ঠিক নিচ্ছি না, কিন্তু ছোড়দা সারকামস্ট্যানশ্যাল এভিডেন্স.... ধরো, ধরেই নিচ্ছি। সুনন্দর দু'গালে দুই হাত, কনুই হাঁটুর ওপর।

—আর কাউকে জানিয়েছ?

—বুড়িয়ার বাড়ি ফোন করলাম, রাত সাড়ে দশটা। ফোনটা বেজে গেল সকাল হতে ভাবলাম যাই। ওর কাছে খবর-হদিশ কিছু থাকতে পারে। গ্যারান্টি কিছু নেই। তোমার বাড়ি তো পথেই.... তাই তোমার কাছেই....

—রাত্রে ফোন করোনি কেন?

—কী আশ্চর্য! তুমি কি আগে বুড়িয়াকে করেছি বলে আপসেট হয়ে পড়েছ? তোমার শোবার ঘরে ফোন আমি জানি না? তুমি তাড়াতাড়ি শোও, বউদির ঘুম ভেঙে যাওয়া ঠিক নয়, দাদাকেও করিনি।

—দাদার কথা ছাড়.... কল্যাণ অন্যমনস্কভাবে বলল, কিন্তু আমাকে জানালে পারতে। অ্যাকশন নেবার পক্ষে রাতটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু ভাবনাচিন্তা করবার পক্ষে.... আমার তো মনে হয় রাতটা দরকার ছিল।

—কী ব্যাপার? সুনন্দ এত সকালে? দু'জনে কী গুলতানি করছ? চিত্রা এসে দাঁড়িয়েছে। নাইটির ওপর একটা হাউজকোট চাপানো। মুখে-চোখে জল চিকচিক করছে। বাসি বিনুনি দু'হাত দিয়ে খুলছে।

কল্যাণ লক্ষ করল না চিত্রাকে, সুনন্দর দিকে চেয়ে বলল—দিদিকে একটা এস. টি. ডি. করব?

—মনে হয় না কোনো লাভ হবে—সুনন্দ বলল—তা ছাড়া বলবেটা কী?

—কী বলবে? দিদিকে ফোন? কিছু হয়েছে সুনন্দ!

—অ্যাঁ? সুনন্দ যেন অনেকদূর থেকে কোনো জোরাল শব্দ হঠাৎ শুনতে পেয়েছে। চমকে উঠল।

—শাঁওলি ঠিক আছে তো? চিনু?

—ওরা ঠিক আছে—কল্যাণ উত্তর দিল একটু যেন কাঠ-কাঠ ভাবে, তারপর বলল একটা ডাকাতি হয়েছে যাদবপুরে। একজন ফেরার ডাকাতকে ছোটর মতো দেখতে।

—ছোটর মতো? চিত্রার হাতে বিনুনির গুছি থেমে গেছে, একটু পর সে বলল—

—কে বলল?

—খবরে।

—মানে? খবরে বলল অ্যাবস্‌কন্ডার সুনন্দ পালচৌধুরীর মতো দেখতে?

—না, তা নয়, ডেসক্রিপশনটা শুনে কল্যাণ মুখটাকে ওপরে তুলে ধরল, তারপর হঠাৎ মুখ নামিয়ে বলল—চিত্রা আমাকে আর ছোটকে যা হোক একটু খাইয়ে দাও তো, ন'টা সাড়ে ন'টায় পি. জি-তে ভিজিটিং আওয়ার ধরো, দেখি....

চিত্রা বলল—আশ্চর্য! আমি তোমাদের কথা কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় খবরে বলেছে কোথায় না কোথায় ডাকাতি হয়েছে, উট্‌কো একদম উট্‌কো একটা সন্দেহে দু'জনে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছ?

কেউই নড়ল না। দুশ্চিন্তার আড়ষ্টতা দু'জনেরই ভঙ্গিতে, একটুও আলগা হচ্ছে না। চিত্রা ভেতরে চলে গেল। ফোন করছে।

একটু পরে বেরিয়ে এসে বলল—কেউ ধরছে না। বুড়িয়ারা এত সকালে....

—ফোন খারাপ, আমি কাল করেছি। ফলস্ রিং-সুনন্দ বলল।

—খবরটা যদি শুনে থাকে, ছোড়দা, শুনবেই, তাহলে কিন্তু ওরও স্ট্রাইক করার কথা। সেক্ষেত্রে ওরই উচিত আমাকে বা তোমাকে কনট্যাক্ট করা, সুনন্দ বলল।

—ফোন তো খারাপ, শুনছ?

চিত্রার গলায় ঝাঁঝ—এ-কথা বলো না। রাস্তাঘাটে মোড়ে মোড়ে ফোনবুথ এখন। একটা ফোন করার দরকার হলে বাড়ির ফোন খারাপ আছে বলেই করতে পারবে না এটা কোনো কথা হল? ইচ্ছে করেই করেনি।

—কেন বউদি, ইচ্ছে করে করবে না কেন?

চিত্রা বলল—ভেবে পাচ্ছি না সুনন্দ। কিন্তু নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, একটু ভাবলে বার হবে।

কল্যাণ বলল—তুমি তাহলে ভাব, ভাবতে থাক। আমরা চট করে একটু রুটি ডিম-ফিম খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। এই সবিতা—আ-আ! এসেছিস?

—হ্যাঁ দাদা, এই যে....

—একটু রুটি-ফুটি স্যাঁক তো!

সুনন্দ বলল—ছোড়দা তুমি বরং থাক, তোমার অ্যাটেনডান্স আছে, সরকারি দফতর তো আর নয়! আমি যখন বেরিয়ে পড়েইছি, দেখি কোনো খবর বার করতে পারি কিনা! আকাশবাণী বলেও কিছু সুবিধে পেতে পারি বা প্রেসের কোন বন্ধুকে ধরে-টরে....। তেমন বুঝলে আসব, এখানে বা তোমাদের অফিসে ফোন করব।

—চিনুকে বলে বেরিয়েছ? মানে কারণ-টারণ?

সুনন্দ নিচু হয়ে স্যামসনের স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে বলল—ওসব ঠিক আছে। তুমি ভেব না....আমি খবর দেব। মানে পাই না পাই, যা হোক একটা....

সটান হয়ে একবার গা-ঝাড়া দিল সুনন্দ। তারপর একটা 'আসছি' ছুঁড়ে দিয়ে তরতর করে চলে গেল। চলে যাওয়ায় একটা অন্যমনস্ক তাড়া।

সবিতা চা-টোস্ট নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে।

—এ কী? ছোড়দা চলে গেলেন?

চিত্রা বলল—টেবিলে রাখ চাটা। তুই যা। ডিম দুটো করবি।

কল্যাণ বসতে বসতে ক্ষুব্ধ গলায় বলল—এমন এক-একটা কথা বল! কী ভাবল বল তো ছোট! ছি, ছি!

—কী আবার বললাম আমি! ছি ছি করারই বা কী হল? আশ্চর্য তো! চিত্রা অবাক হয়ে বলে উঠল, তার গলা একটু গরম হতেও শুরু করেছে।

—যে কোনো বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয় এটা আমরা সবাই জানি। মানতে পারি না। পারি না বলেই বিপদ হয়। তোমার প্রেশার হাই, ব্লাড সুগার, হুট বলতে তুমি দৌড়ে গেলে কী সুবিধে হবে বলতে পার? আদৌ যদি কিছু হয়ে থাকে! দৌড়ে যাবে, টেনশন, অফিস কামাই, রুটিন নিয়ম সব তছনছ.... এটাই কি ভাল? তার চেয়ে ছোট রেডি হয়েই বেরিয়েছে, খবর নিক। তারপর যা করার করবে, সত্যিই যদি কিচ্ছু করার থাকে।

—তোমার কথার মানে বুঝলাম না। একবার বললে আদৌ যদি কিছু হয়ে থাকে, আর একবার বললে যদি কিছু করার থাকে। মানে? তুমি বলতে চাও ভাবনার কোনো কারণ ঘটে নি!

—তুমি তা হলে চাইছ কিছু হোক। সাঙ্ঘাতিক কিছু। এবং বেশ কিছু দৌড়ঝাঁপ, থানা পুলিশ, অর্থদণ্ড....এই সব হোক।

—চাইছি মানে?

—কী গ্রাউন্ড কী তোমাদের এত উদ্বেগের?

—তোমার গ্রাউন্ডটাই বা কী এমন নিশ্চিন্ত হবার?

—বিশ্বাস করার কোনো গ্রাউন্ড নেই। এটাই আমার নিশ্চিন্ত হবার গ্রাউন্ড, বলতে বলতে চিত্রা নিজের চায়ের কাপটা তুলে নিল—সুনন্দর অবস্থাই দেখোনা, সারা রাত টেনশন করে এখন সাত-সকালে দৌড়.... এক কাপ চা খেতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

।। দুই ।।

—তুমি তো দুধটা খেলে না বউদি!—সবিতা তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে শোবার ঘরটা মুছে নিল। এখন এ দিকের পাপোশটা ঝাড়ছে।

চিত্রা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়েই ছিল। অনেকক্ষণ। তাদের বারান্দার বরাবর রাধাচূড়া গাছটার মাথাটা। জ্বলজ্বলে হলুদ লণ্ঠনে ভরে গেছে কালচে গাছের মাথা। দেখতে দেখতে সে দাঁড়িয়েই ছিল। আসলে দেখছিল না ঠিক। কল্যাণ পুল কারে অফিসে যায়। চলে গেল। ওপরের বারান্দাটা থেকে ওর মাথাটা দেখতে পায় চিত্রা। রোজ। চুলে ভরা মাথাটা। খুব চুলে মাথা এদের ভাইবোনেদের, দাদা থেকে সুমন পর্যন্ত। তবে কল্যাণের মাথার পেছনে ঘুর্ণিটাতে চুল পাতলা হচ্ছে। ওপর থেকে বোঝা যায়। কখনই বোকার মতো ওপরের দিকে তাকায় না কল্যাণ। মধ্য-চল্লিশে ও কারও মাথায় আসে না, মানায় না। কিন্তু ব্রিফকেস হাতে শার্ট-প্যান্ট-টাই পরিহিত কল্যাণের চেহারার ভেতর থেকে এক ধরনের মনোযোগ বা সচেতনতা বিচ্ছুরিত হয়, মানে কল্যাণ জানে, ওপর থেকে চিত্রা তাকে দেখছে। রোজই দেখে। কিন্তু এ দেখাটা শুধুমাত্র একটা দাম্পত্য রিচুয়্যাল ভাবলে ভুল হবে। সত্যিই চিত্রা দেখে কল্যাণ যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। কল্যাণ বোঝে—চিত্রা পড়ে থাকছে, সে যাচ্ছে, একটা বিচ্ছেদ হল। হতে পারে সাময়িক। কিন্তু এটাও এক ধরনের বিচ্ছেদ, যার মধ্যে একটা বুক হু হু করা ব্যাপার থাকে। সেটা শুরু হয়েছে চিত্রার কঠিন অসুখটার পর থেকে। এই বিচ্ছেদ সচেতনতা। আজকে চিত্রা বুঝতে পারল সেটা নেই। কল্যাণ শুধুই অফিসে গেল। এবং গেল ভীষণ ওলট-পালট হয়ে। চিত্রারও আজ ওই ব্যাপারটা ছিল না, অফিসের অ্যামবাসাডরে আরোহমান কল্যাণের প্রতি। সে অন্যভাবে দেখছিল। যে ভাবে একজন ডাক্তার তার রোগীকে দেখে। নানা রোগ। ডাক্তার নিজে চিন্তিত, কিন্তু রোগীকে সেটা বুঝতে দিলে না। তার পর্যবেক্ষণের বাইরে চলে গেল আপাতত রোগী। কিন্তু সত্যিই সে খুব চিন্তিত। সুনন্দ এবং কল্যাণের সন্দেহ উদ্বেগ এগুলো খুব অমূলক নয়। কেননা, শেষ কথা যা সুমন বলে গিয়েছিল সেটা এই জাতীয়ই।

'শেষ পর্যন্ত চুরি-ডাকাতি করে টিকে থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকছে না।'

বলে গিয়েছিল। লিখে নয়। তাদের যৌথ পরিবারের খাবার-টেবিলে। রাত্তির বেলায়।

সারাদিন ধরে সেদিন দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছিল। যদিও আশ্বিন পড়ে গেছে। একটা হালকা ঝড়ের ভাবও ছিল। মাঝে মাঝেই পাতা খড়-কুটো

উড়িয়ে, জানলা-দরজায় শব্দ তুলে যাচ্ছিল হাওয়াটা। বুড়িয়ার তখনও বিয়ে হয় নি। হবো-হবো। বাড়ির সব্বাইকার ঠোটে-টেপা অমতের ভাবটা আলগা হয়েছে। ছোট মানে সুনন্দর বিয়েটা হয়েছে শ্রাবণের শেষ লগ্নে, বছরখানেক হল শাশুড়ি মারা গেছেন, বোনের বিয়েতে ভাইয়েদের মত করিয়ে। কল্যাণের ফ্ল্যাট শেষ। কয়েক মাসের মধ্যেই চাবি পেয়ে যাচ্ছে। ওদের সবাইকারই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সুনন্দরা তো ছিলই না, কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল? গিরিডি না গালুডি.... ওই সব জায়গায় সুনন্দর যাওয়া বাঁধা, দু-এক দিনের ছুটি থাকলেই। বুড়িয়া, বুড়িয়াই একা বসেছিল সুমনের জন্যে। চিত্রা বাইরের দালানটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত যাচ্ছিল। কলঘর থেকে শোবার ঘরে। খাবার-ঘরে আলো জ্বলছে।

—তুই শুধু শুধু বসে আছিস কেন? —সুমনের গলা। গলাটা ওর গম্ভীর, কিন্তু ভোঁতা নয়।

—তুই না আসা পর্যন্ত, আমার খারাপ লাগে। বুড়িয়া ওর নিজস্ব মিষ্টি গলায় বলল। কথায় আদর, অভিমান মিশে ছিল।

—লাগাস না। আমি কে? কেউ নই।

—ঠিক আছে, তুই কেউ না। আমার খুশি আমি আছি। বুটিগুলো গরম করে দিয়েছি, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। একটু পরেই বুড়িয়া বলে উঠল—এই জানিস, ছোড়দা না লেক-ভিউ রোডে ফ্ল্যাট কিনেছে। মানে, অনেকদিন ধরেই একটু একটু করে কিনছিল। কেনাটা এইবার কমপ্লিট হল।

খানিকক্ষণ চুপ। তারপর বুড়িয়ার গলা—ও কি বুটিগুলো ফেলে দিচ্ছিস কেন?

—খাওয়া যাচ্ছে না।

—কত কষ্ট করে গরম করলাম। জালির ওপর ফুলিয়ে ফুলিয়ে....

—করলি কেন? আমি বলেছি?

—খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এমন করলে টিকবি কী করে? ....এত অনিয়ম!

—তা যদি বলিস, চুরি-ডাকাতি করে টিকে থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকছে না। —সামান্য একটু হাসির সঙ্গে মেশানো দানা দানা কথাগুলো, 'গত্যন্তর থাকছে না।' —চিত্রা একবার ভেবেছিল ঢুকবে, ঢুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে—কেন, এমন অদ্ভুত কথা ও কেন বলল। কিন্তু মুখোমুখির ব্যাপারটাকে চিরটা কাল ভয় পেয়ে এসেছে চিত্রা। তারা যে লোন-টোনের সুবিধে পেয়ে কো-অপারেটিভ-এ ফ্ল্যাট কিনছে, দু-আড়াই বছর আগে থেকে কিনছে, এটা তো সে বা তারা কখনওই শেষ মুহূর্তের আগে ফাঁস করেনি।

যখন করল তখন শাশুড়ি, যাঁকে আসল সংকোচ, তিনি চলেই গেছেন. সুনন্দ, যে ভাই কল্যাণের একেবারে একান্ত সে নতুন বিয়ে নিয়ে মায়া-ফানুসে মায়া-বাতাসে ভাসমান। কাউকে সেভাবে কৈফিয়ৎ দেবার নেই। অন্য দু'জন অকিঞ্চিৎকর, তাদের আবার বলাবলি কী? কৈফিয়ৎ কী? তবু, কেন যে পারল না! কেন যে সেই মুহূর্তে চোরা পাপবোধ ট্যাংরা মাছের কাঁটার মতো বিঁধে গেল গলায়।

তার সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ছিল। বউদি বলে তাকেই তো ডাকতো। বড় জা বিশাল ব্যাপার, থাকেন বাইরে, মাঝে মাঝে আসেন যান। বাঙালিনী হলে হবে কি, আচার-আচরণে মেমসাহেব। তাঁকে বউদি ডাকার খুব একটা সুযোগ পাওয়ার কথা না। চিত্রা মনে করতে পারছে না সুমন এমন কি সুনন্দরও এই ডাক বড় বউদিকে লক্ষ করে। কল্যাণ বলত। কল্যাণের তো আর কোনো আটপৌরে বউদি ছিল না। ও ডাকত বউদি, আপনি। ওরা সকলেই বড়দা ও বউদিকে 'আপনি' বলতো।

নতুন বিয়ের পর একদিন শাশুড়ি ছোট ছেলেকে এক গ্লাস সয়াবিনের দুধ দিচ্ছিলেন। দেখে চিত্রা অবাক হয়ে বলেছিল, কেন, হরিণঘাটার দুধ তুমি খাও না।

—নাঃ, সুমন খুব হেসেছিল, হরিণের দুধ আমার চলে না বউদি, আমাকে বাঘের দুধ খেতে হয়, গেলাসখানা কী রকম বোম্বাই দেখছ তো!

সয়াবিনে কত বেশি প্রোটিন আছে, কত তার গুণ, তখনই প্রথম জানতে পারে চিত্রা।

—খেতেও ভাল, খাবে এক ঢোঁক? —নিজের একটা কাপ নিয়ে খানিকটা ঢেলে দিয়েছিল। —খেয়ে চিত্রা বলে ওঠে ম্যাগো! ডাল-ডাল গন্ধ!

ডাল-ডাল গন্ধে ঘেন্না করলে আর ব্যাটম্যান হতে হচ্ছে না বউদি। বউদি ডাকটা সুমনের মতো সুইট অথচ, কনিষ্ঠ কিশোরের গলায় শুনতে খুব উত্তেজনা ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম ও পরিমাণ তখন একেবারে বাঁধা ছিল সুমনের। অসীম যত্নে নিজের শরীরটা গড়ত।

এটা দাদারা পছন্দ করত না। এটা তো তাদের ঐতিহ্যে নেই!

—খোদার খাসি হয়ে হবেটা কী? —কল্যাণই বোধহয় একদিন বলল।

—যার যে রকম—সংক্ষেপে উত্তর এল।

—খেলাধুলো, শরীর-চর্চা করলে চাকরি-ফাকরি পাওয়া যায় বলে তো শুনেছি।

—তা যায়। কিন্তু যাবেই যে তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

—তুমি ওই ভারোত্তোলন—ফোলন....

—ও সবের জন্য অনেক আগে থেকে, আলাদা ভাবে তৈরি হতে হয়। টেকনিক্যালিটিজ আছে।

—তুমি কিসের জন্য তৈরি হচ্ছো তা হলে?

—আমার জাস্ট ভালো লাগত বলেই.... এ জিনিসটা আমি পারি.... এই।

—জাস্ট ভালো লাগে? কোনো লক্ষ্য নেই!

—এটা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করি না। লক্ষ্য আছে, মানে সম্পূর্ণ ফিট, সুষম একটা বডি পাওয়া। ভালো লাগাটা কি কিছুই না? —সুমন তর্ক করত না। অল্প কথার মানুষ। সেদিন এইটুকু বলেছিল।

—তাহলে চাকরি-ফাকরি!

—আমি চেষ্টা করছি।

—তুমি বরং সিনেমায় ভিলেন-ফিলেনের রোলে নেমে যাও।

পরে আড়ালে চিত্রা বলেছিল—কী দরকার?

—কীসের?

—ব্যঙ্গের কী হল?

ব্যঙ্গ-ট্যাঙ্গ নয়, ক্রোধ, বুঝেছো ক্রোধ! দাদা ছিলেন গোড়ার থেকেই ট্যালেন্টেড। আজ কোথায় উঠেছেন! কিন্তু আমি? আমি তিল তিল করে এগিয়েছি। সুচ্যগ্র জমি কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না আজকের দিনে। সারভাইভ্যাল অব দা ফিটেস্ট। নিজেকে ফিটনেসের সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। এই সব বডি-বিল্ডিং-ফিল্ডিং-এর বিলাস আমাদের জন্যে নয়। ওর ভালোর জন্যেই বলি।

সত্যিই, এদের একটা ভদ্রাসন পর্যন্ত ছিল না। রামধন মিত্তির লেনের কোণে গোঁজা সেই ভাড়াটে বাড়ি, তিন পুরুষের ভাড়া, তাই রক্ষে। একটা পুরো দোতলা বাড়ি। উঠোন-দালান-ছাদঅলা, দু'শ সাঁইত্রিশ টাকা ভাড়া। পুরনো বাড়িঅলার নাতিপুতিদের ভাড়াটে তুলে দেবার গরজটুকু পর্যন্ত নেই। জানে এই গলির মধ্যে কোনো বহুতল উঠবে না। কিছুই করে না ওরা, আদ্যিকাল থেকে না-সারানো না-রং পড়ে রয়েছে, ভাড়াটা সামান্য বেড়েছে, গোড়ায় বোধহয় সত্তর আশি টাকা ছিল। এরা নিজেরাই দরকার মতো পাম্প, রিজার্ভার, ডি.সি ছেড়ে এ.সি লাইন করে নিয়েছে। চিত্রার বিয়ের আগেই এ বাড়িতে প্রথম ব্যাপক ভাবে মিস্ত্রির হাত পড়ে। কল্যাণ বলে, হাজার পনেরো কুড়ি ওখানেই গলে গিয়েছিল। শুধু কলি ফেরাতে গিয়েই

কী অবস্থা, চর্তুদিক ফেঁপে গেছে, এখান থেকে চাঙড় ভেঙে পড়ছে। ওখান থেকে বরগা খুলে যাচ্ছে। খরচ কল্যাণেরই, তারই গরজ। বাবার কিচ্ছু নেই, ফ্যামিলিটি ছাড়া। দাদার, চিত্রা বরাবর শুনেছে, সাংসারিক, বৈষয়িক ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব বোধই নেই। করতে যে হয় সেটুকু জানেন না। অদ্ভুত! যেটুকু করেন, ওই বউদিই করেন। মনে করে ড্রাফট পাঠানো-টাঠানো। চিত্রার বিয়ের সময়ে অবশ্য এসেছিলেন। যা দিয়েছিলেন তাতে প্রীতিভোজটুকু নাকি হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস! নিজের বিয়ে-বাবদ কল্যাণের যে ধার-কর্জ হয়েছিল, তা মিটতে তো বেশ কয়েক বছর লেগে গেল। কী ধরনের গৃহস্থ ছিলেন শ্বশুর-শাশুড়ি চিত্রা জানে না। অদ্ভুত! একের পর এক সন্তানের জন্ম দিয়ে খালাস! তার বাবা যেটা জীবনে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন সেটা হচ্ছে বাড়ি, নিজস্ব একটা আশ্রয়। সেই বাবারই মেয়ে সে। এদের ভদ্রাসনহীনতায় সে প্রচণ্ড আশ্চর্য হয়েছিল এবং গোড়ার থেকেই কল্যাণকে এই বিষয়ে উৎসাহী করছিল। কল্যাণ প্রথম-প্রথম একেবারেই সাড়া দিত না। বলত---এই বাড়িটা পুরনো হতে পারে, কিন্তু কত বড় বল তো। আমাদের তিনটে ভাই পরিষ্কার ধরে যাবে। তুমি যদি নতুন বাড়িও করো, তার ট্যাক্স, তার মেন্টেনান্সই এ বাড়ির ভাড়ার চেয়ে বেশি পড়বে। আর পজিশন কী! এদিকে গলির নির্জনতা। ....একটু বেরোলেই, বড় রাস্তা, দোকান-বাজার, যে দিকে যেতে চাও বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি....। চারদিকে এত লোক থাকারও কতকগুলো পজিটিভ দিক আছে। আজকালকার দিনে একটু চাক বেঁধে থাকা ভালো।

সবিতা অনেকক্ষণ চলে গেছে দরজাটা টেনে দিয়ে। চিত্রা দুধের কাপটা ফ্রিজের ভেতর তুলে চায়ের জোগাড় করতে লাগল। মনটা একেবারেই ভালো লাগছে না। ভেতরে কেমন একটা শিরশিরোনি। ভয়। কী হবে? যদি সত্যিই....

।। তিন ।।

জ্যামটা আজকাল ডেফিনিটলি কিছুটা কমেছে। কিন্তু যানজটের বদলে এখন ওয়ান-ওয়ের গোলকধাঁধা। নাকের বদলে নরুন। একই যানজট, একই লাল আলো আর ওয়ান-ওয়ে, একই গাড়ি-বাস-ট্রাম। অথচ মন-মেজাজের তফাতে এগুলো সব কেমন পালটে পালটে যেতে থাকে! এমনিতে তাকে সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে অফিসে পৌঁছতেই হয়। সন্ধের দিকেও একটু দেরি হয়। অফিস যাবার সময়ে সতর্ক থাকে মনটা। নিজেকে ভিড়ের ভেতরে এবং বাইরে দু জায়গাতেই থাকতে হয়। ফেরার সময়ে একেবারে আরাম

কেদারায় এলানো থাকে মন। অলসভাবে চোখে পড়ে দু'জন মিনি ড্রাইভার একজন আরেকজনকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিফল হয়ে খুব খানিকটা মুখ খিস্তি করে নিল। রাস্তায় একটা উটমুখো লোক ভুল জায়গা থেকে রাস্তা পেরোতে গিয়ে টাল খেলো। এরই মধ্যে ঝালমুড়ির ঠোঙা-হাতে প্রেমিক-প্রেমিকা ঠিক মাঠের দিকে হাঁটছে।

চ্যাটার্জি বললেন—কী হল চৌধুরী?

—কী হবে?

—কেমন অন্যমনস্ক দেখছি যেন।

কল্যাণ খুব চেষ্টা করে একটু হাসল। সত্যিই কি মনের ছায়া এই ভাবে পড়ে মুখের ওপর? সে যে এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে, নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম এসে গেছে— সে বুঝতেই পারে নি। একটা যান্ত্রিক হাসি বাদে চ্যাটার্জি বা মুস্তাফির সঙ্গে একটাও কথা বলে নি এতক্ষণ।

মুস্তাফি সামনে বসে ছিল, বলল— মিসেস ঠিক আছেন তো?

—হ্যাঁ অ্যা।

—আর ছাওয়াল? আপনার লাডলা?

—ঠিক আছে।

—ব্যস তবে আবার কী! পুত্রকলত্র ভালো থাকাটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আবার কী দুশ্চিন্তা করছেন? আসুন।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে মুস্তাফি সামনের সিট থেকে ঝুঁকে পড়েছে।

—নো, থ্যাংকস।

—অ্যাজ ইউ প্লিজ....।

চ্যাটার্জি একবার আড়চোখে তাকাল। আর কিছু বলল না। কল্যাণ পাশ ফিরে হাসল আবার, বলল—না, এই....।

এর চেয়ে বেশি খবরাখবর করা অভদ্রতা হয়ে যাবে। একটা মানুষের মন খারাপের সমস্যা একলা তারই। সে যদি পাঁচজনের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নিতে চায় তো ঠিক আছে। নইলে জোর করা যায় না। কল্যাণ পালচৌধুরীর স্ত্রী কিছুকাল আগে মারাত্মক অ্যানিমিয়ায় পড়েছিল। তখন সহকর্মীরা যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। চৌধুরী সেটা চেয়েছে। কিন্তু ছেলে যখন কিছুতেই জয়েন্ট এনট্রান্সটা পার হতে পারল না, এইচ.এস.-এর রেজাল্টটাও আশানুরূপ হল না, তখন সব জেনে শুনেও এই চ্যাটার্জি এই মুস্তাফি জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। খুব স্পর্শকাতর বিষয়। আজ কি কল্যাণের তেমন বলবার মতো কিছু আছে?

একটা খবর, খবরের অন্তর্গত একটা সন্দেহ, ভাইয়ের সঙ্গে তার ছুটে যাওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছেতে স্ত্রীর প্র্যাকটিকাল বাধা দান, ছোট ভাইয়ের হেঁট হয়ে স্যামসনের স্ট্র্যাপ বাঁধার দৃশ্যটা।

সুনন্দর সরকারি চাকরি ঠিকই; কবি হিসেবেও সে একটু বিশেষ খাতির পায়। খাতিরের পেছু পেছু আসে বিবেচনা, ছাড়। কিন্তু এটাও তো ঠিক, এই বিপজ্জনক ব্যাপারটার খোঁজখবর করতে সুনন্দ একা যথেষ্ট নয়, তার যাওয়া দরকার ছিল, খুবই দরকার। গাড়িতে আসলে মনে মনে চিত্রার সঙ্গে ঝগড়াও করছিল সে।

—এটা আমাদের দুজনের দায়, এ কথা বোঝা উচিত ছিল তোমার....

—কেন বুঝবো না, শুধু শুধু সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাও কেন বলো তো? সুনন্দ ইন এনি কেস যেত। একজন গেলেই যে খবর পাওয়া যায়, তার জন্যে দুজনের কাজ নষ্ট করবার কোনো যুক্তি আছে?

—হয়তো যুক্তি নেই। কিন্তু চিত্রা তুমি যদি শুনতে তোমার সাত বছর নিরুদ্দিষ্ট ভাই হঠাৎ কোনো ডাকাতির অকুস্থলে ভেসে উঠেছে। সে ফেরার। তুমি কী করতে? যুক্তি-বুদ্ধি হারাতে। না হারাতে না?

কয়েকটা রুটিন কাজ অফিসে পৌঁছে এ ভাবেই সেরে ফেলল কল্যাণ। মনে মনে চিত্রার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে। ঝগড়া অথবা তর্ক।

যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলাটা প্র্যাকটিকাল না হতে পারে. কিন্তু স্বাভাবিক এবং এবং ....মানবিক। মানবিক, চিত্রা। তুমি আমাকে হিসেবি, বিষয়ী, সতর্ক আর প্র্যাকটিকাল হতে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছো। আমিও সফল হিসেবি, বিষয়সম্পত্তি করেছি, সাবধানতার সঙ্গে বেশ প্রশংসনীয়ভাবে অনেকগুলো গণ্ডগোলে বাঁক পেরিয়েছি, এমন একটা আত্মপ্রসাদ আছে আমার, সেটা তৈরি হতেও তুমি সাহায্য করেছ আমায়। কিন্তু, কিন্তু চিত্রা আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটা ডাকাত হয়ে গেল, যার বড়দাদা মেডিক্যাল রিসার্চে খ্যাতিমান, ছোড়দাদা একজন কবি, সেজদাদা কিছু না হোক একজন এগজিকিউটিভ, সে একটা ডাকাত? কী করে হল, কেন হল— এ বষয়ে কোনো ভাবনা-চিন্তায় তুমি আমাকে সাহায্য করনি, করছ না। সাবধানে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছ আমাকে, আমার গায়ে যেন আঁচটি না লাগে। কিম্বা হয়তো প্রথম দায়টা সুনন্দর কাঁধে চাপিয়ে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলার মনোগত ইচ্ছাটাকে সে-ই জয়ী হতে দিয়েছে চিত্রার স্পষ্ট কথার মধ্যে দিয়ে।

হয়তো নিজের দুর্বলতার দায়টা এইভাবে চিত্রার ওপর চাপিয়ে পুরোপুরি ভারমুক্ত হতে চাইছে সে-ই। নিজেকে এরকম বিচক্ষণ. ভেতরে-ভেতরে কাপুরুষ

ভাবতে এমন একটা গ্লানিবোধ হতে থাকে তার যে মনে হয় এই মুহূর্তে একখানা দগদগে করে পদত্যাগপত্র লিখে ফেলে সাদা বাংলায়—এই যে মশাই শুনুন, আমার এই পদে চাকরিবাকরি করার যোগ্যতা নেই। কেননা আমি দায়িত্ব নিতে বেসিক্যালি অক্ষম। সব অন্যের ঘাড়ে চালান করে দিই। স্ত্রী, ছোট ভাই, এর পরে ছেলে হ্যাঁ ছেলেও এভাবেই আমার কাপুরুষতার শিকার হবে। এই বেলা, আমাকে বিদায় দিন। মানে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিন। আমি আমার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করিনি। হ্যাঁ, ভাইকেও আপনারা পরিবারের মধ্যে ধরেন তো! ভাইটা কী ভেবে বেরিয়ে চলে গেল, আর বাড়ি ফিরল না। ঠিক কী ভেবে—আমি আজও জানি না।

হঠাৎ কল্যাণ সিনেমার ছবির মতো স্পষ্ট বুড়িয়ার কান্না ভেজা মুখটা দেখতে পেল। কনের সাজ। মুখের চন্দন কাজল সব ধুয়ে গেছে, বলছে—ছোড়দা, আমি সুমনকে না দেখে যেতে পারছি না। ওকে ফিরিয়ে আনো! তখনও ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল! পাড়ায় বেপাড়ায় যত বাউন্ডুলে মূর্খ, বখাটেদের সঙ্গে ও মিশত, তারা ওর খবর রাখত। গোড়ার গোড়ায় ওদের কাছেই সুনন্দ কল্যাণ ওর খোঁজ করেছে।

—অ্যাই নিতাই!

—কিছু বলছেন কল্যাণদা?

—বলব আবার কী! তোমাদের বন্ধুটি কী মনে করেছে কী? পত্রপাঠ বাড়ি আসতে বলবে।

দাঁত বার করে বোকা বদমাশটা বলেছিল—ও বলে ওর বাড়ি নেই। একটু এগিয়ে সম্ভবত কল্যাণের নাগালের বাইরে গিয়ে আরও বলেছিল—ও বলে ওর বাড়ি নেই, মা-বাবা নেই, দাদা-দিদি কেউ নেই, ওরা তো সৎ, সৎ ভাই।

মাথার ভেতরে আগুন। ইডিয়ট, ইমপসিব্‌ল্ একটা, ইডিয়ট!

ঢাকনি খুলে এক গ্লাস জল খায় কল্যাণ।

সৎ ভাই এ কথাটা, এ পরিচয়টা সুমনের জানবার কথা নয়। মা কি মৃত্যুর আগে ওকে বলে গিয়েছিলেন? নাকি বুড়িয়া? বুড়িয়ার নিজেরও তো জানবার কথা নয়। ওকেও কি মানা-ই? মায়েদের সঙ্গে মেয়েদের একটা ঘনিষ্ঠতা থাকে, যেটা ছেলেদের থাকে না। সেইভাবেই কি বুড়িয়াও জেনেছিল? স্বীকার করছে, সে অকপটে স্বীকার করছে বড় ছেলে তেইশ/চব্বিশ, বড় মেয়ে আঠার/উনিশ, মেজ ছেলে দশ/এগারো, ছোট ছেলে আট/নয়, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এমত অকথায় যখন একজন সাতচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় দীর্ঘ

পঁচিশ বছরের বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে একটি বছর তিরিশের মহিলাকে, ইনি তোমাদের নতুন মা' বলে এনে তোলেন, তখন তীব্র বিদ্বেষে, জীবন ভরে যায়। দাদা পরের বছরেই রকফেলারের স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা চলে গেল, দিদি দিল্লিতে বিবাহিত, এতগুলো বছরে কতবার এসেছে হাতে গোনা যায়। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্বেষ সে আর সুনন্দ তো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ পুরোপুরিই, এবং নিজেদের অজান্তে। কেননা, জীবনটা আবার ছন্দে বইছিল। অত বড় বাড়ি, কোনো ছিরিছাঁদ ছিল না এক বছর। ডাঁই করা ময়লা কাপড়ের স্তূপ, রান্নাঘরে কয়লা ভাঙছে সুনন্দ, বাবা বাজার গেছেন, ফ্যান গালতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে দাদা। সে নিজে ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে এধারকার ময়লা ওধারে আর ওধারকার ময়লা এধারে করছে, টপটপ করে ঘাম পড়ে আক্ষরিকভাবে পা ভিজে গেল। ভাবছে আজও স্কুল যাওয়া হল না।

নতুন কাজের লোক এসেছে। বাবা কথা বলছেন---ইয়ে মানে বাড়িতে থাকবে, থাকতে হবে, যা যা করতে হবে, এই রান্না, সব সাফসুফ রাখা.... ইতর কণ্ঠে ঝঙ্কার—কী যে বলেন বাবু, এই এত বড় বাড়ি, সাফসুফ রাখবো আবার রান্নাবাড়া---অত গোপালের মা পারবে না। থাকতে পারি, শুদ্দু রান্না করবো, কুটবো বাটবো বাড়বো, একশো টাকা দেবেন, বছরে চারখানা কাপড়, সায়া, বেলাউজ, থান কাপড় ছাড়া আমি পরি না।

—ইয়ে মানে অত, আবার বলছেন এদিকের লোক—

---হ্যাঁ আমার ননদ আছে, খুব গতর, সে ও সব করবে এখন, পঞ্চাশ টাকা দিও।

---চুরি হয়ে যাচ্ছে সব। মাসে সাত কিলো তেল কী করে খরচ হল গোপালের মা? আরও আনতে হবে বলছো?

—কী করে হল, তুমিই না হয় রেঁধে দেখো বাবু। নর্মদা দিয়ে ফেলে তো আর দিইনি। বাসায়ও যাই না যে নে যাবো।

স্কুলে শিবনাথ সার ডেকে বললেন---কল্যাণ, ক্লাসে কথাগুলো বলিনি, শোনো, এত ময়লা আর দুমড়োনো জামাকাপড় পরে স্কুলে এসো না। হ্যাঁ, খুব দুর্ভাগ্যের কথা, মা চলে গেলেন। আমি জানি। তবু সব ঠিকঠিক চালিয়ে যেতে হয়। কাজের লোক নেই তোমাদের, না থাকলে নিজে করে নেবে, শিখে নেবে....

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে কল্যাণের। কী করে কাচতে হয়, সাফ করতে হয় সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। ইস্ত্রিটা তেতে যেত। কিন্তু

ময়লা কাপড়ের ওপর কয়লার ইস্ত্রি করলেই তো আর ময়লা যায় না!

সুনন্দ হাফ-ইয়ার্লিতে ডাহা ফেল করে গেল। ওয়ার্নিং দিলেন হেড সার। ছোড়দা—গরুচোরের মতো মুখ করে রিপোর্ট কার্ডটা নিয়ে এসেছে সুনন্দ। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছছে।

দু-তিনবার লোক বদল হল। প্রত্যেকবারই মাইনে বাড়াবার বায়না। সম্ভব না কি? বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, এ দৃশ্যটা এখনও ইচ্ছে করলেই দেখতে পায় সে। কষা মাংস আর রুটি এনেছেন দোকান থেকে। খেয়ে তাদের ফুড-পয়জন।

ইনি তোমাদের নতুন মা—বলে বাবা ঘরে চলে গেলেন। তখন রাত নটা। ঠিক যেন বাবা অফিস-ফেরত ভিড় বাসে উঠতে পারেননি, এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে হঠাৎ মনে হয়েছে, দোকানে-টোকানে ঢুকে পড়েছিলেন।

—একজন নতুন মা' পাওয়া যাবে? হ্যাঁ বেশ গৃহকর্মনিপুণা, সৎ ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে, বেশি লম্বা না, বেশি খাটো না, বেশি মোটা না, বেশি রোগা না, শান্ত-শিষ্ট, স্বাস্থ্য ভাল একজন 'নতুন মা? —ও, না, ও একটু বেশি ফর্সা হয়ে যাচ্ছে, ওহ, এটি বড্ড কালো, মাঝামাঝি, ওই ভাবে বেশ দরদস্তুর করে মা-টি কিনে একেবারে বাড়ি ফিরছেন। 'এই নাও তোমাদের জামাকাপড়' কি 'নতুন বই-পত্তর' যেভাবে কেনা-কাটা করে আনেন সেইভাবেই বললেন, অন্য সওদার চেয়ে এটি একটু জটিল বুঝে, ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইলেন, বড় বড় গরুর মতো চোখ, লম্বাটে হাত-পায়ের গড়ন, ঘরোয়া করে একটা ডুরে শাড়ি পরা। মাথায় সিঁদুর, সিঁদুরের টিপ। হাতে গলায় হয়তো অল্প সল্প কিছু গয়নাও ছিল। যেন অনেকদিনের বিবাহিত। পরে, আর একটু বড় হয়ে কল্যাণের মনে হয়েছিল, ইনি কি সত্যিই নতুন? না বেশ পুরনো, অন্য কোথাও অপেক্ষা করছিলেন? সে মুহূর্তে মনে হয়নি, মনে হবার বয়স হয়নি। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সে যায়নি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সুনন্দ এক পা এক পা করে এগোল।

—কোথায় তোমাদের কী মানে আমি তো কিছুই জানি না, দেখিয়ে দেবে না?

একটু থেমে থেমে বললেন। ঠিক যেমন নতুন রাঁধুনি-টাঁধুনি বলে। তবে তাদের চেয়ে অনেক ভদ্র, সভ্য কথার ধরন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভদ্র চেহারা. একটু কি গ্রাম্য? যেন গ্রামের মেয়ে? তবে নতুন শহরে আসার জড়তাটা ছিল না।

সেই রাত্তিরে অল্প-স্বল্প কিছু রান্না করলেন। বোধহয় খিচুড়ি আর ওমলেট। খেতে দিলেন, দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা সার দিয়ে এসে বসেছিল। উনি দাঁড়িয়েছিলেন। বাবা বললেন—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।

—আমি পরে।

—সে ঠিক আছে। কিন্তু বসো।

খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল দাদা। তারাও। কিন্তু তাদের জিভের ভেতরটা লালায় টইটম্বুর হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে যখন চামচ করে খিচুড়িটার ওপর ঘি ছড়িয়ে দিলেন। একটা শাম্‌লা, পুষ্ট, শাঁখা বুলি আর বালা-পরা হাত। আঙুলগুলো ভরন্ত। ডগায় হলুদের দাগ।

বাবা বললেন—বরেণ্যকে আর একটা চামচ দাও স্মৃতি। তারপর উনি চামচ আনতে রান্নাঘরে গেলে বললেন—খাচ্ছো না কেন? খেয়ে নাও বড় খোকা। আর একটু মাথা নিচু করেই বললেন—না খাবাব মতো কিছু হয়নি।

সেই প্রথম দিনের খিচুড়ি আর ওমলেট. জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে স্বাদে-গন্ধে এখনও ঠিক তেমনি আছে। খুব নিচু গলায় কথা বলতেন, কাজের লোক থাকত, কিন্তু বেচাল সইতেন না। কোনো কাজকেই কাজ মনে করতেন না। বাড়িটা ঝকঝকে, বিছানা জামাকাপড় ধবধবে। আর এক অদ্ভুত স্বর্গীয় রান্নার গন্ধে ম ম করত বাড়ির বাতাস। যদিও এগুলোর সঙ্গে যে নতুন মায়ের যোগাযোগ অব্যর্থ সেই বয়সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি সে, দাদা হয়তো বুঝেছিল, কিন্তু তাতে তার বিরূপতা কমেনি। কথা বলত না, নীরবে খেয়ে উঠে যেত, নীরবে নিত সব সেবা, সব যত্ন। কিন্তু চুপ, একেবারে চুপ।

তাদের আসল ধাক্কাটা লেগেছিল যখন অনেক রাত্তিরে, তারা ঘুমিয়ে পড়লে, নতুন মা যে বাবার ঘরে শুতে যেতেন সেটা তারা আবিষ্কার করে। দু-তিনদিনের আগে তারা বুঝতেই পারেনি. নতুন মা কোথায় শোন। চতুর্থ দিন রাতে বাথরুমে যেতে গিয়ে বাবার ঘরে ওঁর গলা পেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

—বললে না তো কেমন লাগছে? —বাবা।

—কী আর? ভালই। —নতুন মা।

—আহা, অত সরে থাকার কী আছে, একটু এদিকে —খুব স্পষ্ট নয়, নিচু সুরেই বলা, বাবার গলা তো বেশ জড়ানো ছিল। রাত বলেই শোনা যাচ্ছিল। কল্যাণ আর দাঁড়ায়নি, ভূতগ্রস্তের মতো বাথরুম থেকে সটান ঘরে ফিরে এসেছিল। সুনন্দ পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছিল, ক্রোধ ঘৃণার গরম চোখের জল

তার চোখ ফুঁড়ে বেরোচ্ছে, ছোট বাইরে চাপতে পারছে না, শেষে দালানের কোণে নর্দমার ধারে গিয়ে ছেড়ে দিল।

বাবা বা নতুন-মা কী বুঝেছিলেন কে জানে। কিন্তু পরের দিন দালানের দিকের বড় জানলাটা সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। ওঁরা বোঝেননি, বন্ধ করলেই সব বন্ধ করা যায় না। কেননা ঠিক এগারো মাসের মাথায় বুড়িয়া হল, পরের বছর সুমন। এবং এত দিনের মধ্যে কোনো নতুন মামারবাড়ির কথা তারা কখনওই শোনেনি।

কোনোদিন মা বলতে ওদের জোর করেননি উনি। ওরা কিছু না বলেই চালিয়ে দিচ্ছিল এতগুলো দিন। বুড়িয়া-বুড়িয়াই ওদের মা ডাকটা শিখিয়েছিল। প্রথমটা বাঁদরের বাচ্চার মতো একটা বাচ্চা, নতুন-মারই জঠর থেকে বেরিয়েছে এবং তাতে তার বাবার একটা কোনো গর্বিত ভূমিকা আছে টের পেয়ে সে ভীষণ ঘৃণা অনুভব করে। কিন্তু তারপর সে-ই কিন্তু যখন ফুটফুটেটি হয়ে খেলা করতে লাগল, নানারকম মোহন ভাবভঙ্গি করে দা-দা মা-মা এ ভাবে কপচাতে থাকল, তখন আর এই শিশুর প্রজনন রহস্য মনে থাকছিল না। নতুন মা কড়ায় কী একটা বসিয়েছেন, এদিকে শিশু ককিয়ে যাচ্ছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে কল্যাণ ছুটতে ছুটতে বলতে বলতে এল মা, মা, বুড়িয়ার কেমন দম আটকে যাচ্ছে, শিগগির। উনি হাত ধুতে ধুতে পেছন ফিরে তাকিয়েছেন। চোখদুটো, চোখদুটো কী অদ্ভুত ভাষাময়। এক লহমা, তারপরই উঠে এসে বুড়িয়াকে কোলে নিলেন। পিঠে কীভাবে যেন থাবড়া দিলেন, বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। সারাক্ষণ একটা চোখ, যেন মনেরও অর্ধেকটা দিয়ে দেখছিলেন কল্যাণকে, তার পাশে সুনন্দকেও। সুমন হতে আরও একেবারে সুনন্দর চেহারা পেতে থাকল। অবিকল। এক চোখ, এক নাক, এক রকম ঠোঁটের ভঙ্গি। অথচ সুনন্দ যে বাবার মতো দেখতে ছিল তা নয়, হয়তো তাদের কোনো পূর্বপুরুষের চেহারা পেয়ে থাকবে। সুনন্দ এবং পরে সুমন।

সৎ ভাই, সৎ-বোন কনসেপ্টগুলো মুছে যেতে যেতে একেবারে মুছে গেল। দিদি দূরে দূরেই রইলো; দাদাও। কিন্তু, যেহেতু দূর, তাই বোঝা যেত না। তাছাড়া দাদা-দিদি যখন আসতো কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করতো না। বড় বউদি তো নয়ই। তবে ওঁরা এমনিতেই একটু দূরের মানুষ। দাদা সব সময়ে যেন কী ভাবছেন। বউদি এলেই প্রতিদিন কারও না কারও সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাদের জীবনে এগুলো খুব একটা ছায়া ফেলেনি। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স থেকে যে দাদা বিদেশবাসী, আঠারো বছর বয়স থেকে যে দিদি প্রবাসী তাদের প্রত্যক্ষ ছায়া কী-ইবা পড়তে পারে!

কিন্তু, সুমন, সেই সুমন কেন, কেন ও কথা নিতাইকে বা নিতাই জাতীয়দের বলবে! তারা কি সুমনকে অবহেলা করেছিল? শাসন? শাসনই যদি হয়, শাসনের মধ্যে স্নেহ কি একেবারেই ছিল না। চিন্তা?

এ কথা তো একেবারে ঠিক যে শেষ বয়সের শেষ সন্তান বলে বাবা সুমনকে ভয়ঙ্কর আশকারা দিতেন। মা-ও। মায়ের পক্ষে জিনিসটা অস্বাভাবিক: বুড়িয়াকে দেননি। কিন্তু সুমনকে দিতেন। রিটায়ারমেন্টের পাওয়া পি. এফ-এর টাকা থেকে সুমনের দামি বাইসাইকেল চলে এলো। সুমন দামি ব্রান্ডের জিন্‌স পরবে। সুমনের ওয়ার্ডরোব আধুনিক পোশাক-আশাকে ঠাসা। কেড্‌স, স্পোর্টস্‌ শু দু-তিন রকম, ট্র্যাক সুট এবং সুমন ক্রমাগত লেখাপড়া অবহেলা করে যাচ্ছিল। টায়ে টায়ে পাস, হাতে-পায়ে ধরে পাস করিয়ে প্রোমোশন মঞ্জুর করিয়ে আনলেন বাবা। তারা দু-ভাই পছন্দ করছিল না, চিত্রা পছন্দ করছিল না, কেউ না—এভাবে কি একটা দূরত্ব তৈরি হয় না? ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের? বড় ভাইদের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের! নিজের ভাইয়ের! সৎ-ভাই, এ প্রসঙ্গ উঠছে কোথা থেকে? কেনই বা!

এখন যদি সুমন ধরা পড়ে, তার জীবনেতিহাস সাংবাদিক, আদালত, আদালত-নিযুক্ত মনস্তত্ত্ববিদ সবাই খুঁড়বেন। এমনিতে তো একজন কমন ডাকাত, জেল আসামী তার ভাই, এ লজ্জা এ বিষয়ে পাবলিসিটির বিষ সে কী ভাবে হজম করবে তাই ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তার ওপর যদি বার হয় সুমনের সাইকিতে সৎ দাদাদের দীর্ঘমেয়াদি ঠাণ্ডা মাথার অবহেলা, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, এসবের স্থায়ী দাগ পড়েছে, মানে সুমনের বকলমে সুমনকে যে সৃষ্টি করেছে সেই সমাজ, আর সমাজ মানে তার পরিবার! সৎ ভাইয়ের ও তাদের পরিবারই আসল অপরাধী!

সাড়ে বারোটা নাগাদ ফোনটা এলো। কল্যাণ নিশ্চিত ভেবেছিল সুনন্দ। উৎকণ্ঠা এবং আশা দুটো একসঙ্গে নিয়ে ফোনটা ধরলো। কিন্তু ওপাশ থেকে চিত্রার গলা শোনা যাচ্ছিল।

—শোনো। তুমি টেবিলে আছো তাহলে? ভাবছিলাম হয়তো লাঞ্চে গেছো....

—বাজে না বকে আসল কথাটা বল না। —অধৈর্য, বিরক্তি ফেটে বেরোলো কল্যাণের গলা থেকে। হয়তো আক্রোশও। একেক সময়ে নিজের স্ত্রীকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য জীব বলে মনে হয়।

—কী আশ্চর্য। আমি কোনো খারাপ খবর দিচ্ছি না। চিনু ফোন করেছিল। সুনন্দ এখনও ফেরেনি। আমি ওকে ওসব কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, তোমার দাদার সঙ্গে বেরিয়েছে দুজনে। কী দরকার আছে। বললাম যেন নিশ্চিন্তে

খাওয়া-দাওয়া করে নেয়। শাঁওলিকে স্কুল থেকে আনতে বেরোবে, চাবি-টাবির প্রবলেম। বলেছি—বোধহয় সুনন্দ তার মধ্যে ফিরবে না....

—নির্জলা মিথ্যে কথাটা বললে?

—কী আশ্চর্য! না হলে তো ভেবে মাথা খারাপ করে বলবে, যা মেয়ে.... তা ছাড়া খবরটার কথা সুনন্দ যখন বলেনি আমারও বলা উচিত নয়। এটা....

কথা শেষ হল না। শব্দ করে ফোনটা রেখে দিল কল্যাণ। মাথার মধ্যেটা জ্বলছে। সুনন্দর সঙ্গে তার যাওয়া উচিত ছিল, সে যায়নি, চিত্রার গাঁইগুঁইতেই যায়নি। আর জ্বলজ্যান্ত বলে দিলে কি না তার সঙ্গেই গেছে! এসব সাউখুড়ির মানে কী? কী বুঝবে ওই মহিলা তার অন্তর্দাহের?

।। চার ।।

খবরটা এইরকম : গতকাল রাত্রে যাদবপুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেছে। খবরে প্রকাশ রাত সাড়ে নটা নাগাদ বেল শুনে বাড়ির গৃহিণী কর্তা ধীরাজ ভদ্র এসেছেন মনে করে রাস্তার দিকের জানলা দিয়ে চাবি ঝুলিয়ে দেন। চাবি দিয়ে সদর খুলে তিন-চার জনের একটি সশস্ত্র দল ওপরে উঠে আসে। গৃহিণী জয়া ও তাঁর মেয়ে রূপালি ছাড়া কেউ ছিল না। হঠাৎ কালো কাপড় বাঁধা মুখ ডাকাতদের দেখে জয়াদেবী অতর্কিতে চিৎকার করে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাক-মুখ ক্লোরোর্ফম দেওয়া রুমালে চেপে ধরা হয়। তিনি লুটিয়ে পড়লে তাঁকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়। ওদিকে মায়ের চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে রূপালি ছুটে আসে; ছুরি দেখিয়ে তার কাছ থেকে চাবি বার করে ডাকাতরা নগদ তিন লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা এবং আনুমানিক দু'লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গহনা নিয়ে গেছে। স্বস্তির কথা পালাবার সময়ে, রূপালিদেবী কোনোভাবে মুখের বাঁধন খুলে জানলার ধার অবধি পৌঁছে চিৎকার করেন। সামনের বাড়িতে দুটি প্রতিবেশী যুবক তাই শুনে ছুটে বেরিয়ে এসে সামনেই একজনকে স্রেফ ল্যাং মেরে ফেলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে ছুটে এসে তাকে বেদম প্রহার করতে শুরু করে। অন্যেরা পালিয়ে যায় বটে কিন্তু একটি ডাকাতের মুখে পালাবার সময়ে আলো পড়েছিল, কালো কাপড় সম্ভবত তাড়াহুড়োয় খুলে গিয়েছিল। প্রতিবেশী যুবকরা জানিয়েছেন, পলাতক ছেলেটি, একেবারেই ভদ্র, ছাত্রসুলভ চেহারা, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, খুবই বলিষ্ঠ কিন্তু মাথায় বেশ পাকা চুল মুখটি তাদের চেনা-চেনা লাগে। প্রহৃত ডাকাত যুবক এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। পি. জি. হাসপাতালে সর্বক্ষণ পুলিশ প্রহরায়

রাখা হয়েছে তাকে। যুবকটি কথা বলবার অবস্থায় এলেই তাকে প্রশ্ন করা হবে। বিবরণ মাফিক পলাতক ডাকাত যুবকের ছবি আঁকা হচ্ছে। উল্লেখ্য ধীরাজবাবুর হার্ডওয়্যারের ব্যবসা আছে।

লিখিত এক রকম। কিন্তু রাতের খবরে যখন একেবারে ভদ্র, ছাত্রসুলভ, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা, খুবই বলিষ্ঠ কিন্তু মাথায় বেশ পাকা চুল এই বর্ণনাগুলো পড়া হচ্ছিল, সুনন্দ প্রথমে উৎকর্ণ, তার পরে উন্মুখ, তার পরে একেবারে ব্যোমকেশ হয়ে যায়। তার কানে হল্‌কা, অথচ মেরুদণ্ড দিয়ে হিমবাহ নামছে। এ কার কথা বলছে খবর-পড়ুয়া? বলিষ্ঠটুকু বাদ দিলে এ যেন তার নিজের আয়নায় দেখা মুখ। আর বলিষ্ঠটুকু যোগ করলে মুখটা আর একজনের হয়ে যায়। খুব অল্প বয়স থেকেই সুনন্দর চুল পাকছিল। ডাক্তার-টাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা মনে হয়নি। কলেজে-টলেজে বন্ধু-বান্ধবরা বলতো অবশ্য, কী রে সুনন্দ, কবি-কবি গ্ল্যামারের জন্যে চুলগুলোতে সাদা রং-ফং লাগাচ্ছিস না কী বল তো! পাড়াতেও অনেকেই বলতেন—সুনন্দ তোমার চুলগুলো যে এই বয়সেই পেকে গেল হে!

আঠারো-উনিশ বছরেই সুমনেরও মাথায় পাকা চুল ভেসে উঠতে শুরু করেছিল।

একটা হাওয়া উঠলো হঠাৎ। দক্ষিণ থেকে। অদূরে একটা বেঞ্চে একজোড়া ছেলেমেয়ে হেসে উঠলো। কতকগুলো শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে। পি.জি. থেকে ভিক্টোরিয়া যতদূর তার চেয়েও দূর যেন মনে হয় রোদে পথ চলার এই সব পথ। দুপুরের গা ফেটে একরকম পাকা বেলের মতো আঠালো গন্ধ বার হয়। দুপুরের আঠা যেন তার আঙুলে জড়িয়ে যাচ্ছে। চক্রাকারে দুটো চিল ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে মাথার ওপরে। তার কেমন মনে হল পাখিগুলোর লক্ষ্য সে-ই। থাবার ভেতরে বাঁকানো নখ এখন গুটোনো, ওরা লক্ষ রাখছে। কিন্তু আদৌ কোনো ভয় থেকে এ সব মনে হচ্ছিল না তার। কে না জানে প্রাণিকূল আজন্ম বা জন্মান্তরের অভ্যাসে খাদ্য খোঁজে! জীবন একটা কংক্রিট, সপ্রাণ, সচেতন ব্যাপার বলে মনে হয় তার। আমরা জীবনে আকণ্ঠ ডুবে থাকি, কিন্তু জীবন তারও বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখে। তার নিজস্ব কতকগুলো খিদে আছে। নাটকীয় কোনো ঘটনার খিদে, দুঃখ-বিষাদ, দুর্ঘটনা, সর্বনাশের একটা প্রচণ্ড খিদে। এখন সেই রকম হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞানহীন খিদের সময় জীবনের। সুনন্দকে দিয়ে, সুনন্দর সর্বনাশ দিয়ে পেট ভরাবে ও। সে একেবারে শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত হয়ে গেছে ফেরার ছেলেটি সুমন। এটা কেন সে

বলতে পারবে না। যে কোনো দৃঢ় ধারণার পেছনে অনেক ঘটনার একটা ছায়া-ছায়া ভূমি থাকে। ধারণাটাকে বিশ্লেষণ করলে সেইসব ঘটনাগুলো মনে পড়লেও পড়তে পারে। কেন না, এক্ষুনি তার মনে পড়ে যাচ্ছে সে হনিমুন সেরে ফিরে এসে সুমনকে আর দেখতে পায়নি। অথচ বউভাতে কোমর বেঁধে পরিবেশন করার দৃশ্যটা ওর স্পষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছে। লেডিকেনি, আর দুটো লেডিকেনি। আরও মনে পড়ছে একটি খুব কর্কশ চেহারার ছেলের সঙ্গে সুমন বেরিয়ে যাচ্ছে। আঠারো-উনিশে অবশ্য অনেক ছেলেরই চেহারা কর্কশ হয়ে যায়। কিন্তু এই ছেলেটির মধ্যে আরও কিছু অতিরিক্ত পারুষ্য ছিল। যেন নীচের কোনও তমঃস্তর থেকে ও ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে ওপরে উঠে এসেছে। অন্য ক্ষেত্রে হলে এ রকম মনে হওয়ার জন্য ও লজ্জিত হত। কিন্তু এটা যে তার ভাই। তারই ভাই।

—কে রে ছেলেটা? প্রশ্নটা সে খুব হালকা পালকের বলের মতো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রশ্নটার ভার যেন বোঝা না যায়।

—কোন ছেলে? —সুমন জিজ্ঞেস করলো, —আমি তো কত ছেলের সঙ্গেই মিশি....

—ওই যে কাল সন্ধেবেলায় তোর সঙ্গে বেরোচ্ছিল!

—কাল সন্ধেবেলায়? ও, দাঁড়াও ও তো বিটুমেন। মানে। বিটু।

—বিটুমেন? কী অদ্ভুত নাম!

—যা বলেছো, তবে আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেক অদ্ভুত নাম আছে সোন্‌দা, জুয়াড়ি কারও নাম হয়, শুনেছো? বাবা-মাই রেখেছে। কিম্বা টেম্পো?

সুনন্দ শুকনো হাসিটা একটু রসালো করার চেষ্টা করে বললো—সবাই তোর বন্ধু?

—হ্যাঁ, বন্ধুই তো! তুমি কি সেই প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত 'সঙ্গী সাথী' এগুলোর-তফাৎ করছো?

—ধর তাই।

—আমি তফাৎ করি না। মানে তফাৎ বুঝতে পারি না সোন্‌দা। জাস্ট 'পরিচিত' যে কখন সো কলড্ রাজদ্বারে, শ্মশানে পাশে এসে দাঁড়াবে কে বলতে পারে, প্রাণের বন্ধু যাকে বলছো হয়তো দেখা গেল সে আমার 'আ' ও বোঝে না। এরকম খুব হয়।

সুমন কিন্তু সত্যিই খুব দুর্বোধ্য ছিল। বুড়িয়া ওর পিঠোপিঠি দিদি, হয়তো সুমনের দু-একটা পিঠ বেশি দেখতে পেতো। সুনন্দ হয়তো অন্য দু-একটা। যেমন, সুমন খুব অভিমানী, চট করে ওর লেগে যায়। কিসে লেগে গেল

বোঝা দায়। তা ছাড়া ওর মধ্যে একটা কমপ্লেক্স সব সময়ে কাজ করতো। দাদারা অত কৃতী, আমি একটা 'কিছু না' আমার জন্যে আছে নিচের তলা —এই রকম। কমপ্লেক্সটা ওকে কুঁকড়ে দিত না, বরং যেন আরও একরোখা করে দিত। যদিও তার প্রকাশের মধ্যে তেমন কোনো অভদ্রতা ছিল না। এ যেন যতই নিকটে যাই সমুদ্রতল সরেই যায়, সরেই যায়, তল করুণা না করলে অক্সিজেনহীন সেই জলস্তরে ডুবে থাকা যায় না, স্তরে স্তরে ভেঙে ভেঙে ভাঙা দুটো একটা কথার কুচি, বাস। এর চেয়ে বেশি যোগাযোগ নেই। অথচ সুমনের জন্ম-ইস্তক সে তার এই ভাইটির প্রতি এক রহস্যময় টান অনুভব করেছে। এমনিতে ছোড়দার সঙ্গেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। আড়াই-তিন বছরের তফাৎ হলে কী হবে, ছোড়দা-ই যেন আজন্ম তার গার্জিয়ান। মা-বাবার সঙ্গে তাদের সত্যি কথা বলতে কি তেমন যোগাযোগ ছিল না। মা ছিলেন খুব চুপচাপ, সরল ধরনের মহিলা—যাঁর জীবনের ষোল বছর বয়সের প্রথম উৎপাদন বড় ছেলে বরেণ্য, তাঁদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির তুলনায় এক বিস্ময় বালক! দাদার বুদ্ধিবৃত্তির উৎস তার বাবা-মার মধ্যে খুঁজলে যে কেউ নিরাশ হবে। দ্বিতীয় উৎপাদন দিদি আবার দারুণ সুন্দর। এত, যে ভয়ের চোটে বাবা ধারকর্জ করে সতের বছর বয়সেই দিদির বিয়ে দিয়ে দিলেন। দাদা কোনো দিনই কী করবে না করবে বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করতে যায়নি। কিন্তু গেলেও ওঁরা বলতেন— যা ভালো বোঝো। বড় দুই ছেলে-মেয়ের ব্যক্তিত্বর কাছে নিতান্ত ছাপোষা বাবা-মা বেশ নত হয়ে থাকতেন। কল্যাণ-সুনন্দ তেমন দারুণ কিছু না হলেও বাবা-মার ধরনটা পাল্টায়নি। মায়ের যে কবে হার্টের গণ্ডগোল হয়েছিল, তারা কেউ বুঝতেই পারেনি। তারা আর কী বুঝবে, বড়োরা, হয়তো মা নিজেও পারেনি। তাই দিদির বিয়ের পরিশ্রমের পরেই মা দুম্ করে মারা গেলেন। মনে-মনে সে স্বভাবতই নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল, চুপচাপ ভালোভানুষ স্বভাবের মা তাকে বেলুন-ঘুড়ি-লাটাই কেনবার পয়সা দিতেন। 'দেখিস, দাদা যেন জানতে না পারে। আর শোন কুলফি খেয়ে মুখ মুছে ঢুকবি।' —একমাত্র সুনন্দকেই মা 'তুই' বলতেন। তখন তার দিবারাত্র গুমরে গুমরে থাকা, রাত্তিরে বালিশের মধ্যে কাঁদা এসব সামলেছে তার ছোড়দা। অদ্ভুতভাবে আগলে আগলে চলতো তাকে।

—এই ছোট, দুধটা খেলে না? খেয়ে নাও। লক্ষ্মী ছেলে। কে কাকে বলছে?

না বারো-তেরো বছরের এক বালক ন-দশ বছরের আরেক বালককে। দিদি এসে কিছুদিন রইল। কিন্তু কতদিন থাকবে?

হঠাৎ ভিক্টোরিয়ার বাগানে শুয়ে তার প্রবল দিদি-তেষ্টা পেল। বেগনি

রংয়ের একটা তাঁতের শাড়ি পরে দিদি এসে দাঁড়িয়েছে। খোলা চুল, পায়ের তলায় বাড়ির একমাত্র দামি গাল্‌চে। দিদিকে দেখতে এসেছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে দিদিকে! দিদিকে যদি এক্ষুনি হাতের কাছে পাওয়া যেত! দিদি, দিদি সুমনটা এমন কেন হল? এ কী ভয়ঙ্কর কথা। কীসের এত রাগ ওর? এ কী গর্হিত রাগ? দিদি তুমি নতুন-মাকে ভালভাবে নিতে পারনি। কিন্তু বুড়িয়ার ওপর বিশেষ করে, এবং সুমনের ওপরও তোমার একটা আন্তরিক টান আছে আমি জানি। দিদির সঙ্গে কোনও শিল্পমেলায় গিয়ে ইলেকট্রিক নাগরদোলায় চেপেছে সে, যখন উঠে যাচ্ছে, দিদি তাকে চেপে ধরছে, আর যখন নামছে তখন সে দিদিকে চেপে ধরছে, পেটের মধ্যেটা এমন কুলকুল করছে! দিদিকে তাদের এ-ব্যাপারটা জানানো উচিত।

স্পেশ্যাল অর্ডার করিয়ে নিয়ে সে পি.জি-তে সেই বিশেষ কেবিনের কাছাকাছি গিয়েছিল ঠিকই। চতুর্দিকে পুলিশ। ছেলেটার নাকি এখনও জ্ঞান ফেরেনি। জ্ঞান ফিরলে, কথা বলতে পারলে ও আর সবার নামধাম বলে দেবে। তখনই সুনন্দ ও কল্যাণের কাজ শুরু। এ নিয়ে ছোড়দার সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। ডাকাতির কেস। জেল-টেল হবেই। কল্যাণ ও সুনন্দর কর্মক্ষেত্র এবং সুনামের কী ক্ষতি হবে, কতটা—এখন মাপতে পারছে না সে। সুমন তাদের সৎ-ভাই এই তথ্যটা যখন সাংবাদিকরা আলোয় আনবে, তক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে সমাজের বিচার, তার মতামত, তারা দুই ভাই সুমনের সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে, তাদের দুর্ব্যবহার, হয়তো বাবারও দুর্ব্যবহার কল্পিত হবে, দাদা-দিদির ঘাড়ে উদাসীনতার দায় পড়বে, তখন মুখ দেখানো ভার হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত চিন্তার মধ্যে থেকে সুমনের মন, সুমনের অধঃপতন কেন, বর্তমানে সে কোথায় আছে, কেমন আছে—এই নিয়েই সুনন্দর মন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে রইল। সাত বছর আগে, সাত-সাতটা বছর। প্রথম যখন গিয়েছিল, খোঁজখবর ছিল, ওর সেই অদ্ভুত বন্ধুদের মাধ্যমে, কিন্তু তারপর ও একেবারে যেন উবে গেল। তখন ওরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কিন্তু—

—'সুমন, তোমার মা শয্যাশায়ী, শিগগির ফিরে এসো', কিংবা 'সুমন, তুমি যা চাইবে তাই হবে, কেউ কিছু বলব না'—এ জাতীয় বিজ্ঞাপন তো দেওয়া গেল না। কে শয্যাশায়ী হবেন? বাবা-মা দু'জনেই তখন গত। 'সুমন, তোমার ছোড়দা সোন্‌দা শয্যাশায়ী'টা একেবারেই ইডিয়টিক। আর সে যা চাইবে তাই হবে—এটারও কোনো মানে নেই। প্রকৃত কী চাইত সুমন? কোন কাজে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। শরীরচর্চার সময়টা কমিয়ে লেখাপড়ায় মনটা লাগাতে

বলা হয়েছে মাঝে-মধ্যেই। ছোড়দাই বলেছে। সুনন্দ বলেনি। কেননা, সুমনের সঙ্গে একটু বেশি একাত্মতার কারণে সে মানত সুমন লেখাপড়ায় মন দিলেও কিছু হত না। যেমন তার হয়নি। গতানুগতিকভাবে পাস-টাশ করতে পারত সুমন, যদিও তার বাংলাজ্ঞান চমৎকার ছিল, বুদ্ধিসুদ্ধিও গড়পড়তা তো বটেই। সে কোনো ইন্টারেস্ট পেত না, কিছুতে না। ইকনমিক্স ছিল তার দু'চক্ষের বিষ, ফিলসফিও তাই, অঙ্কে বিজ্ঞানে তো কোনো মতে পাস করে কলেজে ঢুকেছিল।

—আচ্ছা সোন্‌দা—বিম্বিসার প্রথম সভারেন কিং না অশোক জেনে আমার কী হবে বলো তো? আকবরের দীন্‌-ইলাহি, ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া নিয়ে আমায় কেন মাথা ঘামাতে হবে?

সুনন্দরও ধরাবাঁধা পাঠ্যসূচী ভাল লাগত না। কিন্তু এতটা না। পরীক্ষার জন্যে পড়তে গায়ে জ্বর আসত। কিন্তু নিজের তাগিদে অনেক কিছু পড়ে ফেলেছে সে। সেই বয়সেই। হঠাৎ উঠে বসল সুনন্দ। ইয়েস, সুমন ছিল যাকে বলে এ ম্যান অব অ্যাকশন! মেডিটেটিভ, কনটেমপ্লেটিভ নয় একদম, অথচ সত্যিকারের অ্যাকশন-প্রেমীদের জন্যে আমাদের সীমাবদ্ধ সমাজে কী-ই বা আছে? এক, মিলিটারিতে বা পুলিশে যেতে পারত, কিন্তু সেখানেও পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল তার মাইনাস-ফাইভ চোখের পাওয়ার। ভাইটা কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না বুঝেও, ছোড়দা তাকে গাইড্যান্স দিতে পারেনি। শুধু চেনা গলিপথটা দিয়ে হেঁটে যেতে বলেছে, আর সে? সে তখন তার কবিতার শব্দবন্ধের ঘোরে এমনই বিভোর যে অন্যকিছু নজরেই পড়ত না। বুঝতে কী আর পারত না? পারত ঠিকই। কিন্তু স্বার্থপরের মতো নিজের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী থাকতে ভালবাসত। ফাঁক, সুমনের আর তার মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি করে দিয়েছিল, তার কবিতা। অথচ কবিতাকে আরও বেশি কাছে পাওয়া, আরও বেশি মরমি হবার জন্যই তো ব্যবহার করেছিল সে। এভাবেই তো ব্যবহার হয় কবিতার, যাবতীয় শিল্পকলা। কে আর আজ গজদন্ত মিনারে বসে থাকতে চায়?

সে আর সুমন। এক। চেহারায়, স্বভাবে। খালি তার কবিতা লেখবার ক্ষমতা ছিল, সে-জন্য সে আজ একজন প্রতিষ্ঠিত, এমনকি বিখ্যাতই মানুষ। তার অন্য ভাইবোন সবার থেকে, এমনকি দারুণ ট্যালেন্টেড দাদার থেকেও। সুমনের এই জাতীয় কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। ও কষ্ট পেয়েছে খুব। ইস্‌স্‌! আক্ষেপটা সুনন্দ এমন শব্দ করে করল যে পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি জোড়া পেছন ফিরে তাকাল, পাশের গাছটা থেকে একটা ছোট্ট নীলচে পাখি উড়ে গেল। তাদের উচিত ছিল ওকে আশ্বস্ত করা। দাদার কাছে কখনও তারা কিছু চায়নি। কিন্তু যদি কিছু অর্থসাহায্য চেয়ে তারা তিন ভাই

সুমনের জন্য একটা সাইবার কাফে-টাফে করে দিত! দূর কী ভাবছে সে? সাত বছর আগে কোথায় সাইবার-কাফে। সে যে কাফেই হোক, একটা সৎ-উপার্জনের ব্যবস্থা! এসব কথা কেন তারা সুমনের সঙ্গে আলোচনা করেনি? কেন? লোকে তো বলবেই, সৎ-ভাই, সৎ-ভাই বলেই। অথচ পরিবারে সৎ না হলেও ছোটদের ওপর কি বড়রা সব সময়ে সুবিচার করেন? যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত দেওয়া হয়? আপন ভাইয়েরাই কি নিজেদের পরিবার-টার হয়ে গেলে অন্যদের প্রতি একটু উদাসীন হয়ে যায় না? ছোড়দা! ছোড়দাও কি হয়ে যায়নি? ছোড়দা, যে নাকি সামান্য বড় করে তুলেছে সে পর্যন্ত ফ্ল্যাট কেনার কথা তাকে জানায়নি। নতুন বিয়ের পর, সামান্য ক'মাস পরেই বুড়িয়ার বিয়ে হয়ে যাবে, সে আর চিনু বিয়ে করছে, নতুন সংসার পাতছে—ছোড়দা বউদি আর পিকলুকে নিয়ে আলাদা সংসার করার কথা ভাবল? ভাবতে পারল? তাদের বাড়িতে জায়গার কোনো অভাব ছিল না, তখন মা-বাবাও মারা গেছেন, ছোড়দা একবার ভাবল না ছোট ভাইয়ের দায়িত্বটা সুনন্দর ঘাড়েই চালান হয়ে গেল। অতর্কিতে! টাকাপয়সার কথা সে বলছে না, ওই বয়সের ছেলের দায়িত্ব! চিনু, সে আর সুমন? সদ্য বুড়িয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। মা মারা গেছেন, বছর দু'ইও হয়নি। বাবাও খুব বেশিদিন নয়। হঠাৎ যেন গোটা বাড়িটা ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল। একটা লক্ষ্য খুঁজে না পাওয়া সদ্য তরুণের মনে কোনো শক লাগবে না? জসিডি থেকে ক'দিন বেড়িয়ে এসে বজ্রপাতের মতো সে শুনল খবরটা।

ছোড়দা-বউদিই বলল অবশ্য।

বউদি—ছোটকে বলো। কী হল? বলো!

ছোড়দা—বলব তো বটেই, তবে ছোট আবার না রাগ-অভিমান করে।

সুনন্দ—কেন? কী হয়েছে? কী হয়েছে ছোড়দা?

ছোড়দা—আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম, পেয়ে যাচ্ছি, বুঝলে!

সুনন্দ কথা বলতে পারেনি। কোনো কথাই না।

বউদি—তার মানেই যে আমরা এক্ষুনি রামধন মিত্তির লেন ছেড়ে চলে যাব, তা নয়। পিকলুকে বালিগঞ্জ গভর্মেন্টে এখান থেকে যতদিন পাঠাতে পারি.... দেখা যাক....

সুনন্দ একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখল বুড়িয়াকে।

—বুড়িয়া জানে, কমপ্লিশন হবার খবর পেতেই ওকে বলেছি। সুনন্দও জানে, তুমি বেড়াতে গিয়েছিলে তাই জানতে না।

সুনন্দ ভেতরে-ভেতরে চেষ্টা করে নিজেকে স্বাভাবিক করেছিল, বলেছিল

—বাঃ, ভাল খবর। খুবই ভাল। পিকলু তাহলে বালিগঞ্জ গভর্মেন্টে.... বাঃ।

নীরবতাটা বিশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। চিনু আর বুড়িয়া মিলে সেটাকে স্বাভাবিক করে। বুড়িয়া বলে উঠল—কী মজা না সোনাদা? আমার নতুন বাড়ির কাছাকাছি হবে, যখন ইচ্ছে চলে গিয়ে উৎপাত করব।

চিনু বলল—হ্যাঁ, তোমার সুবিধে হবে। আর আমি? আমি যে একলা পড়ে যাচ্ছি? বেশ ছোড়দিভাই, আমাকে পছন্দ হল না বলেই, না! আমি একে কিছু পারি না। সত্যিই চিনুটা তো সুমনের থেকে মাত্র মাস দশেকের বড়, কী-ই জানত ও সংসারের?

বউদি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে, চিনুর মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল—ইস্‌স্‌ চিনু! আমি তোকে সব শিখিয়ে না দিয়ে মোটেই যাব না! এরকম ভাবিসনি! আসলে আমাদের কারওরই নিজের বাড়ি নেই। লোন-টোনগুলো পাওয়া গেল বলে আমি ওকে বললাম এরকম সুযোগ হাতছাড়া করো না। আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি তো হল! আর বলিনি কেন জানিস! শেষ পর্যন্ত ইনস্টলমেন্টগুলো দিয়ে যেতে পারব কিনা, লোনের দরুন টাকাটা তো কাটবে—এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই.... দু'জনে ভাবলাম, শিওর হয়ে জানাব। অনেক দিন বুক করেছি। তখন বাবাও বেঁচে।

পুরনো কথা ভাবতে ভাল লাগে না। বিশেষত এইসব সাংসারিক কুটকচালে। কিন্তু এইসবের পরেই সুমন বাড়ি ছাড়ে। বুড়িয়ার বিয়ের জন্য অপেক্ষা পর্যন্ত করে না। ওদের কিন্তু ভাবাতে চায়নি সুমন। প্রথমটাই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি। লাট্টু, ওদের গ্রুপের একজন এসে জানিয়ে গেল—সুমন আমাদের বাড়ি রয়েছে। ক'দিন থাকবে। তারপরই বুড়িয়ার বিয়ের ঝামেলা। সুমন কোথায়? সুমন কোথায়? খোঁজ লাট্টুকে। লাট্টু বলল—সুমন তো চেতনদের সঙ্গে মজঃফরপুর চলে গেছে।

—তার মানে? ওর দিদির বিয়ে, ও জানে না!

—কী জানি! তা তো বলতে পারি না।

আজ এ বন্ধুর বাড়ি, কাল ও বন্ধুর বাড়ি—এভাবেই কাটিয়ে দিল বছরখানেক। বুড়িয়ার বাড়ি নাকি একবার গিয়েছিল। বুড়িয়া অনেক বুঝিয়েছে। কিছু বলেনি। কিছু বলে না। শুধু তা না না না না করতে করতেই বছর তিন কাটিয়ে দিল। তারপর একেবারে ডুব।

হ্যাল্‌লো—

—মিঃ পালচৌধুরী আছেন? হরিশ মুখার্জির এস. টি. ডি বুথ থেকে ফোনটা করল সুনন্দ।

একটু ধরুন, খোঁজ করছি.... নাঃ উনি বেরিয়ে গেছেন। আজ খুব সম্ভব অফিসে ফিরছেন না। যা বাব্বা, গেল কোথায় ছোড়দাটা?

।। পাঁচ ।।

রাস্তার নতুন পিচ, তার সঙ্গে গাড়ির ধোঁয়া, বায়ুস্তরের ধুলো এসবের রসায়নে মানুষ এবং পশুর মাঝ-দুপুরের শরীর-গলা ঘামেরও কিছু অবদান থেকে যায়। কেমন একটা উগ্রতা সেই গন্ধে, রাস্তাঘাট-মানুষ গাড়ির ঝমঝম শব্দে। বাড়ির মধ্যে এই দুপুরবেলাগুলোতে একটা গুহাসন্নিভ আরামের অন্ধকার, একটা অলস ফাঁক তৈরি হয়; তবু সেই আরাম সেই অন্ধকার ছেড়ে এই উগ্রতায় বেরিয়ে আসতেই হয়। তোমার প্রতিক্রিয়া, তোমার প্রতি আমার দায়, আমার মানসিক নির্ভরতাই আমাকে টেনে বার করল কল্যাণ। শোনো, প্রথমত মানুষ শুধু শুধু প্র্যাকটিক্যাল হয় না। অনেক ঠেকে তবে হয়। এবং 'প্র্যাকটিক্যাল' কথাটার চারপাশে তোমরা যে স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ, অনুভবহীনতার ঘেরাটোপ তৈরি করেছ সেটা শব্দটার মূল উৎসে মোটেই ছিল না। কোনো পূর্বসংস্কারবদ্ধ, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মানুষেরা তাদের অদ্ভুত এক পাপবোধ থেকে এই অধম অন্ত্যজ অর্থ তৈরি করেছে শব্দটার। 'প্র্যাক্‌টিক্যাল'-এর উল্টো তাদের কাছে 'ইমপ্র্যাক্‌টিক্যাল' নয়। বরং 'আইডিয়্যাল' 'নোব্‌ল' 'সেল্‌ফলেস' এইসব। যে মানুষ বিপদের গন্ধ পেলে সাবধান হয়, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয়, কীভাবে বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব বা উচিত এ নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে। সে তাদের কাছে অচ্ছুৎ, তিরস্কারযোগ্য বিশেষত মেয়ে হলে। মেয়ে মানেই যেন বিপদে পড়লে বিহ্বল, আলুথালু, দেওয়ালে মাথা-ঠোকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় এক উন্মাদ। উন্মাদিনী হতে পারলে, সে মেয়ে ঠিকঠাক মেয়ে, ভাল মেয়ে। ছেলের দুর্ঘটনা ঘটলে বাবাকে মাথা-ঠাণ্ডা করে তাকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে, এমার্জেন্সি থেকে ও. টি. মাঝে ওষুধ, রক্ত এসবের জন্যে ছোটাছুটি, তার চোখে জল থাকবে না, হাত কাঁপবে না, সে মাঝে মাঝে সিগারেট ধরাবে, তা খাবে বারবার। খুব খিদে পেয়েছে বুঝলে দোকানে-টোকানে খেয়েও নেবে। কিন্তু মা? সেই যে শকে অজ্ঞান হয়ে গেল, প্রতিবেশিনী আত্মীয়রা তাকে ঘিরে মাথায় জল থাবড়াতে লাগলেন, ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন্ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেলেন— এই দৃশ্যের ব্যত্যয় ঘটলে চলবে না। অন্তত সেটাই প্রত্যাশিত।

সে-ও হয়তো এই রকমই ছিল, এই রকমই দাঁড়াত, কেননা তার মা ঠিক এই রকমই ছিলেন। আর তাই-ই চিত্রাকে শক্ত হতে হয়েছিল। শক্ত, অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল, অর্থাৎ মাথা-ঠাণ্ডা। বাবার যখন করোনারি অ্যাটাক হল, ম্যাসিভ

মানে প্রকাণ্ড অ্যাটাক একটা, তখন বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া, এদিকে সংসার সামলানো, এসবের দুই-তৃতীয়াংশ তাকেই করতে হয়েছে। কারণ ভাই ছোট, দু'বোনের মধ্যে সে-ই বড়। মা থেকে থেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, তাঁকে কিচ্ছু খাওয়ানো যাচ্ছে না, দেখেশুনে ভাইটা ভ্যাব্‌লা মেরে গেছে। বোন ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল, তখনই চিত্রা মাকে ধমকটা দেয়—'আচ্ছা মা, এখন তোমাকে দেখব, না বাবাকে দেখব, ঠিক করে বলো তো!' বোনকে ভাতে-ভাত বসাতে বলে ভাইকে নিয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে হাসপাতালে ছুটত। বোনকে বলে যেত—হাত পোড়াসনি কিন্তু, ফ্যান্‌ গালতে না পারলে, ফ্যান্‌-ভাতই খেয়ে নেওয়া যাবে। বাবা যখন আই. সি. সিউয়ের বাইরে এলো, মাকে সে বলে—তুমি শক্ত ধীর-স্থির না হলে তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না মা, অথচ তোমার যাওয়া খুব দরকার।

—আমি ভেতরের কাঁপুনিটা কেন থামাতে পারছি না রে।

—তা বললে হবে না মা। বাবার এখন কথা বলা বারণ। গোমসা, ভারী মুখ করে বাবার কাছে গিয়ে বসলে ক্ষতি হবে। নিশ্চিন্তভাবে যেতে হবে। শোনো, গিয়ে পাশে বসবে, হাতটা ধরবে, বলবে—ঘাবড়িও না। ডাক্তার বলেছেন ভাল হয়ে যাবে। আমরা সব ঠিকঠাক চালিয়ে নিচ্ছি। এটা বাবাকে তোমারই বলা দরকার মা।

সেই থেকেই চিত্রার শক্ত ধাতের ওপর বাড়ির ভরসা। মা পরে বলত বাবা যে ওইরকম সাঙ্ঘাতিক জখম হবার পরেও বিশ বছর বেঁচে রইল, সংসারটা ভেসে গেল না, কুণাল দাঁড়াল, পুতুর বিয়ে হল—এসব বাইরে থেকে তাঁরা করলেও, ভেতরে ভেতরে আসলে সাহস জুগিয়ে ছিল মেয়ে। অথচ কাল কল্যাণ দুম করে ফোনটা নামিয়ে রাখল তো বটেই। সেই থেকেই আনমনা হয়ে রয়েছে। আজকে অফিস যাবার সময়ে এমন তাড়াহুড়ো করে গেল! হুঁ হাঁ ছাড়া কথার উত্তর দিচ্ছে না। কোনো আলোচনা পর্যন্ত না। যেন সে আর ওদের পরিবারের কেউ না।

শ্বশুরবাড়ির দেওর-ননদদের জন্যে তার দরদ, ভাবনা-চিন্তা কি সত্যিই কম? বিশ বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে। এখন কি আর শ্বশুরবাড়ি শ্বশুরবাড়িই থাকে? এ কথা একশোবার ঠিক, যে নিজের বাবা-মা-ভাই বোনের মতো আর কেউই নয়। বুড়িয়ার উল্টো-পাল্টা বিয়েতে যেমন তার কিছুই মনে হয়নি। বুড়িয়াকে একটা প্রাণবন্ত তরুণী হিসেবে তার খুব ভাল লাগত। কিন্তু মনোজিৎকে বিয়ে করবে শুনে দাদারা যখন রেগে লম্ফ-ঝম্ফ করছে, শাশুড়ির মুখ শুকনো, তখন তার ওরকম দুশ্চিন্তা বা রাগ হয়নি। একটা বিরক্তি এসেছিল অবশ্য।

—একটু ভেবে দেখলে পার বুড়িয়া। সে বলেছিল, সবাইকার অমত, কেউ ভাল বলছে না।

বুড়িয়া সজলচোখে বলেছিল— জানি ও দাদাদের উপযুক্ত নয়। তবু ওকেই.... বউদি দাদাদের বল না গো একটু মেনে নিতে। তাহলে আমাদের জীবনটা একটু ভাল করে শুরু হত, একটু সাহস পেতাম!

এ কথা কল্যাণকে বলতে কল্যাণ বলে—তুমি কী করে বুঝবে চিত্রা, বোনটা যে আমার!

আজও বেশি চাপাচাপি করলে হয়তো বলবে---তুমি কী করে বুঝবে চিত্রা। ভাইটা যে আমার!

লেক-ভিউ রোডে চ'লে আসার ব্যাপারে কল্যাণের মনে খুব সম্ভব সব সময়ে একটা চোরা অপরাধবোধ কাজ করে যাচ্ছে। সুমনের চলে যাওয়ায় ও খুব ভেঙে পড়েছিল, সুনন্দর চেয়েও। চিত্রা বলেছিল— দেখ, সুমন যথেষ্ট বড় হয়েছে, এত বড় ছেলেকে জোর করে কিছু করা যায় না, ছেড়ে দাও না। ও তো তোমাদের ওপর ডিপেন্ড করতে চাইছে না, যা চায় করতে দাও না। দুই ভাই-ই তখন তার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়েছিল। তার মানেটা ওই দাঁড়ায়—তুমি কী করে বুঝবে চিত্রা। ভাইটা যে আমাদের।

—বউদি-ই। কে যেন ডেকে উঠল। চিত্রা এদিকে-ওদিকে তাকায়, তারপর ভুল বুঝতে পারে। এ তার ভেতরে জমানো ডাক। সুমন। সুমনই এই ভাবে খুশি-খুশি, খানিকটা গদগদ গলায় ডাকত বউদি...ই। খুনসুটি করত। ঠিক যেমন বুড়িয়ার সঙ্গে করত। পিকলুর সঙ্গেও ওর আর বুড়িয়ার সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে বেশি। কাকা-পিসি-বউদি-ভাইপোর একটা জমজমাট সংসার। কিন্তু সে তো সংসারটা ভাঙতে চায়নি। শুধু নিজস্ব বাড়ি তৈরির সুযোগটা নিয়েছে। তা নয়তো চিনুর প্রথম বাচ্চাটা যখন হল, মাস তিনেকের হয়ে মারা গেল সে কি যায়নি? থাকেনি? শাঁওলি যখন হল। তখনও সে গিয়ে থেকেছে, চিনুর খাওয়া-দাওয়া, বাচ্চার দেখাশোনা সব-সেই করছে। বাচ্চার কাঁথা-টাঁথাই কম কেচেছে না কি? চিনুকে যে সে ভাইয়েদের দুশ্চিন্তার খবর জানায়নি সেটা মিথ্যে? মিথ্যে যদি মেয়েটাকে উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলেও কি সে মিথ্যে শুধু মিথ্যেই? চিনু যদি জানতে পারে তার এক নম্বর বন্ধু সুমন যার সঙ্গে চুল দুলিয়ে দুলিয়ে সে কবি সুনন্দ পালকে দেখতে এসেছিল এবং সেই কবিকে শেষ পর্যন্ত অটোগ্রাফ থেকে টোপর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিল সেই সুমনকে ফেরার ডাকাত সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে, তবে চিনুর মতো ছেলেমানুষ নরম মনের মেয়ে, প্রথম সন্তান মারা যাবার

পর যে আরও ভঙ্গুর হয়ে গেছে, সেই চিনুর কী মনে হবে? বড়দের অ্যাতো সেন্টিমেন্টাল হলে চলে?

কল্যাণের রকম-সকম দেখে প্রথমটা মাথাগরম হয়ে গিয়েছিল তার। তারপর, যখন আজও কল্যাণ ভাল করে না খেয়ে অর্ধেক পরোটা চিবিয়ে ফেলে, ডিমটা খাব্‌লে খেয়ে বেরিয়ে গেল, তাকে একবারও 'আসছি' পর্যন্ত না বলে, তখন হঠাৎ চোখ-মুখ লাল করে কান্না এল তার।

—হ্যাঁ। বাঁধবেন। 'চর্মশিল্প'র সামনে।

বুড়িয়াকে ধরা দরকার। ও যদি কিছু গোপন করে থাকে! আফটার অল বুড়িয়া ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ। শুধু সহোদরা বোন বলে নয়। বয়েস মাত্র এক বছরের বড়। অন্য দাদা-দিদিরা সবাই কত বড়! তা নয়তো এই সৎ-ভাই-বোনের ব্যাপারটা ওদের বাড়িতে একটি সম্পূর্ণ ভুলে-যাওয়া জিনিস। কল্যাণ সুনন্দ কেউ মনে রাখেনি এই মা তাদের নিজের মা নয়। এত সম্ভ্রম, এত বিবেচনা। চিত্রা তো জানতই না। একদিন পুরনো একটা ফটো অ্যালবাম হাতে পেয়ে সে ওদের মায়ের ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ির বিয়ের ফটো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা-বাবা, সুনন্দকে কোলে নিয়ে একজন অপরিচিত মা। কল্যাণকে জিজ্ঞেস করতে সে বলেছিল— তুমি ও অ্যালবাম কোথায় পেলে?

—মায়ের ঘরের আলমারিটা গুছোচ্ছিলাম।

—দেখি। কল্যাণ অ্যালবামটা টেনে নিস, তারপর বলল— চিত্রা এ ছবিগুলো ভুলে যাও। আমরাই ভুলে গেছি। একটা কি নিশ্বাস পড়ল কল্যাণের? একটু থেমে সে বলল— আমার দশ-এগারো বছর বয়সে মা চলে গেছেন। পরের বছরই আবার মা এসেছেন। আমাদের কোনো অভাব, কষ্ট রাখেননি। বরং আমরা ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছিলাম। সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ ভাল করেই বুঝি, মা মায়ের জন্যেই আমরা বেঁচে গেছি। দ্যাখো, বুড়িয়া আর সুমনের জন্যে আমরা এ সব ছবি লুকিয়ে রাখি। নেই-ও আর, খুব একটা ছবি-টবির রেওয়াজ আমাদের বাড়িতে ছিল না। শোনো, এ কথাটা মাথা থেকে মুছে ফেলো।

চিত্রা মুছেই ফেলেছিল। তার আচরণে কোনো তফাতই হয়নি। মনের মধ্যে একটা বিশ্লেষণ শুধু কাজ করত। ও তাই দিদি অত ফর্সা, টিকালো মুখ-চোখ, বুড়িয়া শাম্‌লা, অন্যরকম দেখতে, এরা ভাইবোনেরা সকলেই বেশ সফল, বুদ্ধিমান, ছোট দুটো ওই জন্যেই একটু অন্যরকম। যদিও সুমন ঠিক যেন ছোট সুনন্দ। চেহারায়।

সে একটা রিকশা নিল। —'গুল ফ্যাক্টারি।' ব্যস্ রিকশাঅলা, শন্‌শন্ করে ছুটল।

মনোজিৎ নতুন বাড়ি করেছে। ফ্ল্যাট নয়, বাড়ি। সেই গৃহপ্রবেশের পর আর যায়নি কেউ। বুড়িয়া ছোট, সে-ই ঘুরে ঘুরে আসে, তাছাড়া দরকারে তো ফোন আছেই।

—এই যে, এইখানে, গোলাপি বাড়িটা, ব্যস।

গেটের ওপরের বেড়িটা খুলে সাবধানে ঢুকলো চিত্রা। দুপুরবেলা কারও বাড়ি আসতে সঙ্কোচ হয়। বুড়িয়ার ছেলেটা বছর চারেকের, বেশির ভাগ সময়েই ঠাকুমার কাছে থাকে অবশ্য। কিন্তু বুড়িয়া সকাল আটটা থেকে বারোটা একটা কিন্ডারগার্টেনে কাজ করে। ছেলেকেও বোধহয় ওখানেই দিয়েছে, নার্সারিতে। তার হাতঘড়িতে এখন বেলা দুটো, হয়তো এসে চান-টান করে খেয়ে একটু ঘুমোচ্ছে। দরজায় উদ্বিগ্নমুখে বুড়িয়াকে দেখে চিত্রা হেসে বলল.

—কী আশ্চর্য! সব ভাল। চল ভেতরে চল। বুবাই আবার উঠে না পড়ে। নিচেই বসি।

—হ্যাঁ রে, সুমনের খবর কিছু জানিস?

বসতে বসতে চিত্রা বলল।

—সুমন? তোমরা কিছু খবর পেয়েছ? সুমনের কিছু হয়েছে, না বউদি?—গলার স্বর কাঁপছে বুড়িয়ার। চোখ উপছোবে-উপছোবে করছে।

—কী হচ্ছে বুড়িয়া, কিছু হয়নি সুমনের। চোখ মোছ। কিন্তু তুই সত্যিই ওর কোনো খবর জানিস না? প্লিজ লুকোস না।

—না, লুকোবার কী আছে। মাঝে মাঝে ওর ফোন পাই। তবে সে কালেভদ্রে, লাস্ট করেছিল এক বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল।

—তুই পাস। আমরা পাই না কেন রে? আমাদের কেন করে না? আমরা কি ওর কেউ নয়?

—তা নয়। ও তোমাদের খোঁজ নেয়। পিকলুর, সবাইকার। তোমাদের কেন করে না.... সত্যি জানি না। তবে আমার জন্যে ওর বোধহয় একটু দুর্ভাবনা হয়, সেইজন্যে খোঁজ করে।

—তুই কখনও বলিসনি আমরা কত উদ্বেগে থাকি!

—বলেছি বউদি, অনেকবার। ও বলে ভাল আছে তো সবাই। আবার কী!

—তুইও তো ভালই আছিস। বাড়ি করেছিস, চাকরি পেয়েছিস....

—আমার সঙ্গে ওর। মানে কাছাকাছি তো.... বলতে বলতে চিত্রার স্থির দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিতে থেমে গেল বুড়িয়া। তারপর খুব কুণ্ঠিত গলায়

বলল—মানে তুমি যা ভাবছ তা নয়. সত্যিই, পিঠোপিঠি তো!

—আমি কী ভাবছি তুই জানিস?

বুড়িয়া কথা না বলে মাথা নাড়ল।

— তুই জানলি কী করে?

—ও-ই বলেছে।

—ও কোথা থেকে জানল?

— পাড়াতে শুনে থাকবে। পুরনো লোকদের থেকে। ওর বন্ধুরা হয়তো তাদের বাবাদের মাদের কাছ থেকে শুনে বলেছে।

চিত্রা বলল—বুড়িয়া, তোর দাদারা কিন্তু এই ব্যাপারটা ভুলেই গেছে। ওরা তোদের একটুও . .

—আমি জানি বউদি, আমাকে বলতে হবে না, তার জন্যেও সুমন. .

—তবে, কী জন্যে?

—আমি জানি না। অনেক বার জিজ্ঞেস করেছি। কোনো জবাব দেয় না।

কিন্তু ব্যাপারটা তুমি কী করে জানলে?

— আমি অ্যাক্সিডেন্টালি তোদের একটু পুরনো অ্যালবাম পেয়ে যাই। তাতে প্রথম মায়ের ছবি ছিল. . . ওকে জিজ্ঞেস করতে ও বললো—দাদারা জানত কোনোদিন তোদের আলাদা ভাবেনি. .

—কী আশ্চর্য, বউদি এ প্রশ্ন উঠছে কেন, এতদিন পরে?

—উঠছে। সুমন কেন গেল, সে নিয়ে ভেবে ভেবে....

—সে তো গত সাত বছর ধরেই ভাবা হচ্ছে। হঠাৎ আজ এ সব কেন? বুড়িয়া যেন তার বউদির ব্যক্তিত্বের তলায় আর চাপা থাকতে চাইছে না। মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

চিত্রা বলল— বুড়িয়া, আজ যদি শুনিস সুমন কোনো গ্যাং-এর সঙ্গে ডাকাতির দায়ে ধরা পড়েছে, তুই কি আশ্চর্য হবি?

বুড়িয়া এত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো যে চিত্রার ভয় করল।

—বউদি, সত্যি? এটা সত্যি? —কেমন আল্‌গা-আল্‌গা গলায় বলল বুড়িয়া, সমস্ত শরীরটাই যেন ওর এলিয়ে পড়ছে।

—ও রকম করিসনি। এখনও এ রকম ঘটেনি। কিন্তু তুই যাদবপুরের ডাকাতির খবরটা শুনিসনি?

—যাদবপুর? ....ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই মেয়েটা কোনরকমে জানলায় গিয়ে চিৎকার করে?

—হ্যাঁ। একজন ডাকাতের যে বর্ণনা দিয়েছে, হুবহু সুমনের সঙ্গে মিলে যায়।

—কিন্তু সুমন.... এ রকম....

—আরে আমরা কি বলছি—সুমনই। কিন্তু বর্ণনা শুনে তোর দাদার ভীষণ ভয় হয়েছে। তুই বলতে পারিস— এতদিন ধরে যে ও বাড়ি ছাড়া ওর মিন্‌স্‌টা কী? কীভাবে ও চালাচ্ছে? জিজ্ঞেস করেছিস কখনও?

—জিজ্ঞেস তো করেছি-ই। আমি আমার রোজগারের টাকা থেকে ওকে দিতেও চেয়েছি। ও হাসলো, বলল— আমি তো একটা একলা মানুষ, আমার চলে যায়, তুই ভাবিস না। বউদি আমি ভাবতে পারছি না। কিন্তু.... একটা কাজ করলে হয়.... বুড়িয়া ভাবছে।

—কী? কী কাজ?

—চিনুকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? মানে চিনু তো ওকে, মানে বাইরেও কাদের সঙ্গে মিশতো, কী ভাবত ফ্যামিলির গন্ডির বাইরে এগুলো আমাদের চেয়ে ভাল জানতে পারে।

—জানলে আগে বলতো না।

—আগেও কিছু কিছু বলেছে, তুমি ভুলে গেছ বউদি, সেই যে দর্জিপাড়ার একটা বাড়িতে দাদারা খোঁজ করতে গেল, সে তো চিনুর কথা শুনেই। ওখানেই তো ও লাস্ট ছিল। সাবির আলি বলে খিদিরপুরের সেই দর্জির কথাও চিনুই বলেছিল। তুমি ভুলে গেছ।

—তাহলে যেটুকু ও জানে, অলরেডি বলেছে। আর নতুন কী....

—তা নয়, এই যে নতুন একটা ডেভেলপমেন্ট, একটা সন্দেহ এ নিয়ে চিনুর মতটা নেওয়া যেতে পারে। দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। চলো দুজনে যাই.... যদি ওর কাছ থেকে কিছু....

—যদি তোর দাদারা রাগ করে, চিনুও তো একটু ডিপ্রেশ্‌ড, বুঝিস তো!

—রাগ করলে করবে। বুড়িয়া কঠিন গলায় জবাব দিল, —এত বড় বিপদ সুমনের, চিনুকেও মন শক্ত করতে হবে। ওকে বাঁচাবার যদি কোনো উপায় থাকে,.... আতুপুতু করবার সময় না কি এখন?

।। ছয় ।।

করুণাময়ীর বাংলোর ওপর মধ্য-ফাল্গুনের দিন শেষের রোদ পড়েছে। উইপিং অশোক গাছে পশ্চিম দিকটা ঢাকা, ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রোদটা। গেট খুলে ঢুকতে ঢুকতে ওরা দেখলো এখনও বাগানটা গোলাপে গোলাপে, ক্যাকটাসের লাল ফুলে ফুলে ফুলময়। উপরন্তু একটিমাত্র পলাশ গাছ, লনটাকে আরও ভালো করে রেখেছে। দাদা-বউদি কিছুকাল হল ইউ. এস. এ. থেকে

পাকাপাকি চলে এসেছেন। ওঁরা যে কখনও এভাবে চলে আসবেন ওরা কেউ ভাবেনি। ছেলে-মেয়েরা রয়ে গেছে। মেয়ে তো এখন বিবাহিত, ইতালীয় আমেরিকান বিয়ে করেছে। ছেলে নিজের পেশা নিয়ে ব্যস্ত। ওঁদের নাকি ঠান্ডা একেবারে সহ্য হচ্ছে না। ট্রপিক্যাল আবহাওয়াতে থাকতেই পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার। দাদা আই. এম. বি-র ডিরেক্টর পদে রয়েছেন এখন। বউদির বিষয়ও একই। কিন্তু উনি সেরকম পছন্দসই কোনো কাজ পাননি। তবে দাদা নামেই এখানে। সারা বছর কোনো না কোনো কনফারেন্স কোথাও না কোথাও যাচ্ছেনই। এইডস রিসার্চে দাদা এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। বিদেশে থাকতে ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ছিল, এদেশে এসেও তার থেকে বাড়েনি কিছু। ওখানে যখন ছিলেন বছরে বার চারেক নিয়ম করে ফোন আসতো।

—কী, কল্যাণ নাকি? ভালো আছো? হ্যাঁ দাদা বলছি। সুজন এবার হাই স্কুল পাস করে গেল। ল পড়বে। নাও বউদির সঙ্গে কথা বলো।

কিম্বা—

—হাই সুনন্দ, হাউ আর য়ু? ইয়াপ্, সুজাতা ইজ ফাইন। ও মাইক্রো চিপস নিয়ে কাজ করছে। কল্যাণের কী খবর? চিত্রা এখন ভালো আছে তো? পিকলুকে কি ব্যাঙ্গালোরেই পড়াবে ঠিক করলে? বুড়িয়া না কি চাকরি করছে? খুব ভালো খবর। আচ্ছা সুমনের কোনো খবর পেলে? এক মিনিট, নাও দাদার সঙ্গে কথা বলো।

এই রকম। দাদার কিছু কর্তব্যাকর্তব্য খেয়াল থাকে বলে মনে হয় না। কিন্তু বড় বউদি এসব বিষয়ে খুবই বিচক্ষণ। বাবার জন্য, মা যতদিন বেঁচেছিলেন মায়ের নাম করেও নিয়মিত ডলার পাঠিয়ে গেছেন। কল্যাণ আর বুড়িয়ার বিয়েতে ওঁরা এসেছিলেন। সুনন্দরটাতেই আসতে পারেননি। বুড়িয়ার যাবতীয় গয়না তো দাদা-বউদি দিলেন, মনোজিৎ ফার্নিচার কিছুতেই নিতে চাইল না তাই, নইলে তা-ও দিতেন। আজ যে মায়ের বেশ কিছু টাকা জমে আছে, সেটা সম্ভবত দাদা-বউদির পাঠানো সেই ডলারেরেই সঞ্চয়। সেটা ওরা আজও সুমনের কথা ভেবে রেখে দিয়েছে।

সুনন্দ সল্টলেকের এই বাড়িতে এসেছে দু-একবার। কিন্তু কল্যাণরা এখনও পর্যন্ত আসেইনি। খবরাখবর নিতে চিত্রা ফোন করে, বউদিও করেন। কিন্তু উনি কখনও ওদের সে ভাবে আসতে তো বলেননি! এই বাংলো ওঁরা গত তিন-চার বছর ধরেই কেয়ারটেকারের হাতে ছেড়ে রেখেছিলেন। সে খবরও ভাইদের জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। একটা গৃহপ্রবেশ, কি হাউজ-ওয়ার্মিং যাই নাম দাও, তা-ও না। কথার কথা বলেন অনেক সময়েই—কী চিত্রা এক দিন

দুজন চলে এসো না! জাস্ট একটা ফোন করে দেবে! —সুনন্দ, চিনু আর শাঁওলিকে নিয়ে আসলে পারতে! কী রে বুড়িয়া, একদিনও তো দাদা-বউদির কাছে এলি না? এমনি বলা কথা সব, তাতে তেমন কোনো আগ্রহ যেন নেই। কল্যাণের কি এ নিয়ে একটু অভিমান নেই! আছে, সুনন্দরও আছে। তাই সুনন্দ যখন বললো— ছোড়দা, দাদা এখানে রয়েছেন। অথচ এই ভয়ঙ্কর খবর এখনও আমরা ওঁকে জানাচ্ছি না, এটা ঠিক নয়। আমাদের দিক থেকে জানানো দরকার। ওঁরা কী করতেন কীভাবে নেবেন সেটা ওঁদের ব্যাপার। তা ছাড়া ছোড়দা, আমি যেন হালে পানি পাচ্ছি না।' তখন কল্যাণ কী করবে ভেবে উঠতে পারেনি। সিদ্ধান্ত নিতে ওদের একটু দেরিই হয়ে গেল।

কেন না, ছেলেটি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। গণপিটুনিতে মরো-মরো ছেলেটি শেষ। অনেক কষ্টে না কি মুখ দিয়ে একটিমাত্র নাম বার করতে পেরেছে পুলিশ। জিতুদা। সেই নামের সূত্র ধরেই ধরা হয়েছে ছেলেটিকে। খবরে দেখালোও। মুখ মাথা আচ্ছা করে তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। সেই ব্লু জিন্‌স, ডেনিমের জ্যাকেট। সেই কাঁধ, হাতে কালো ব্যান্ডের ঘড়ি।

দেখতে দেখতে বুড়িয়া ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, চিনু নিঃশব্দে। বাকি দুই দাদা ও বউদি টেলিভিশনের সামনে থ।

ধরা গলায় কল্যাণ বলে— এক হিসেবে বাঁচোয়া ছোট, বলছি বটে ঠিক আছে সামলে নেবো, কিন্তু ভাইকে ডাকাতির দায়ে জেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এ খবরের পাবলিসিটি হলে, পরিচিত মহলের রি-অ্যাকশন সহ্য করা সোজা হত না।

সুনন্দ বলল— তা ছাড়া সাংবাদিক এক মড়াখেকোর জাত। মানুষের দুর্ভাগ্যের ওপর ঠিক শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য ওরা না বললে সমাজ জানবেই বা কী করে? অ্যালার্টই বা হবে কী ভাবে?

—তাই বলে সীমা কোথায় জানবে না? কোথায় থামতে হবে? ডায়নাকে কী করলো? এই কদিন আগে বসন্ত চৌধুরীকে নিয়ে টি ভি কভারেজটা দেখেছিলে, ক্যানসারের কষ্টে কাতরাচ্ছেন মানুষটা, আর পারছেন না- -সেইটা ছবি তুলেছে? অর্ধেক সময়ে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা খুলে দেখো, অ্যাক্সিডেন্ট বা খুনের ভিকটিমদের বীভৎস ছবি। অল্প বয়স্কদের মনের ওপর কী চাপ পড়ে বলো তো! চিত্রা উত্তেজিত হয়ে বললো।

চিনু ছোট গলায় বললো, ছোড়দা, যে ছেলেটা মারা গেল, তার ছবিও তো দিয়েছে। বলছে না কি ওর ঘনিষ্ঠ ছিল। ওকে কিন্তু চেনা লাগল না।

—সাত বছরে কি আর নতুন বন্ধু হতে বাধা আছে। তা ছাড়া, চিনু, তুমি চিনতে ওর কলেজে-টলেজে যায় আসতো তাদের। বিটুমেন নামে চিজটিকে কি চিনতে?

বুড়িয়া চোখ মুছে বললো— কিছু মনে কর না সোনদা— তোমরা কি পাবলিসিটির কলঙ্কের ভয়েই ওর সঙ্গে দেখা করছো না? তোমরা না-ই গেলে, আমি যাই। আমার কারওকে লাগবে না। মনোজিৎকেও নেবো না, একা যাবো।

সুনন্দ বললো— বুড়িয়া হ্যাভ্ পেশেন্স। কলঙ্কের ভয় পাবলিসিটির ভয় নেই তা বলবো না। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমরা ওর পক্ষে যেটা বেস্ট সেটাই করতে চাইছি।

এর পরেই ওরা দাদা-বউদিকে জানানোর সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে।

বেলটা টিপতে, ভেতরে বুলডগটার ঘাঁউ ঘাঁউ শোনা গেল। বউদির গলা। কাউকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন। তার পরেই দরজা খুলে দিলেন।

—আরে? একেবারে দুজনে? কী ব্যাপার? বলতে বলতে বউদির মুখ সতর্ক হয়ে যাচ্ছিল। কল্যাণ আর সুনন্দ দুজনের কারও মুখেই তো হাসি-ঠাট্টা ছিল না, কোনো রকম উপক্রমণিকা করার অবস্থাতেও ওরা ছিল না।

বউদি একটু মোটা হয়ে গেছেন। কিন্তু পরনে সেই প্যান্ট আর ঢোলা টপ। খুব ফরসা রং, বয়সের শৈথিল্য আরম্ভ হয়েছে মুখ, ঘাড়, গলা জুড়ে, মেমসাহেবরা অনেক বুড়ো হলেও তো এমনই পরে, খারাপ দেখায় না। বউদিরও তেমন। সিমলেশ চশমা, কাঁচা-পাকা ছোট চুল, ডাক্তার-ডাক্তার চেহারাটা।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও একনাথ, লন পে টেবিল লগা দো তো। কফি আউর কাজু। কল্যাণ তুমি আজ প্রথম এলে, সব ভালো তো? কল্যাণ যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়লো।

লনে ফোল্ডিং টেবিল আর চেয়ার। ওরা কজন এখানেই এসেছে এখন। বুলডগটা থ্যাবড়া মুখে চোখ কুতকুত করে দেখছে সবাইকে। কতকগুলো কফি রং-এর কফির কাপ, কোনোটা আধ খাওয়া, কোনোটা সিকি খাওয়া, পড়ে পড়ে ময়লাটে রং ধরছে। একমাত্র সুনন্দই দ্বিতীয় কাপ কফি ঢেলে নিল। তার অজস্র কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস। আর সিগারেট। সব কাপ অবশ্য শেষ হয় না, সব সিগারেটও না। কিন্তু চুমুক তাকে দিতেই হবে, সিগারেটটাও ধরা থাকতে হবে হাতে।

পুরো খবরটার মাঝখানে ডক্টর বরেণ্য চৌধুরী শুধু একটাই কথা বলেছেন,— সুনন্দ য়ু স্মোক্ টু মাচ।

বউ বউদি শিবানী বললেন— এখন দুটো পথ খোলা আছে। এক, উনি বাঁহাতের তর্জনির ওপর ডানহাতের তর্জনী দিয়ে টোকা মারলেন, —আলিপুর সেন্ট্রাল-এ গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করা।

—কিন্তু ও তো আসল পরিচয় দেয়নি, আমরা কীভাবে....

—এক মিনিট কল্যাণ, আমাকে শেষ করতে দাও। জেলে দেখা করা? দ্যাট ক্যান বি অ্যারেঞ্জড্। ওটা প্রবলেম নয়।

—কীভাবে বউদি। তখন তো সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের কথা ছাড়ুন। দাদার পক্ষে ব্যাপারটা....

—দাদা কি তোমাদের ফ্যামিলি ছাড়া? উই টু হ্যাভ সাম রেসপনসিবিলিটিজ। দ্যাখো, আমরা এমন কতকগুলো ব্যাপার নিয়ে কাজ করি, বিশেষত ডক্টর চৌধুরী, যে সত্যিই আমরা ফ্যামিলি নিয়ে সেভাবে ঘামাতে পারিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দরকারের সময়ে আমরা ইন্‌ডিফারেন্ট থাকবো। কিছু কানেকশনস্ তো আমাদের আছেই। আর দ্যাখো, উই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্ডার্ড সুমন বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, অথচ তোমরা কোনোদিন আমাদের খোলাখুলি সেটা বললে না।

গলা খাঁকারি দিলেন ডক্টর চৌধুরী, বললেন— আহ্ ও সব কথা থাক। কল্যাণ তাড়াতাড়ি বলল— সুমন যে নিরুদ্দেশ এটা বুঝতেই তো আমাদের বছর তিনেক কেটে গেল।

—দ্যাখো প্রবলেমটা যদি সেভাবে জানতে পারতাম তাহলে ওকে ওখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম। অনেক উপায় আছে ওখানে। অন্তত নিরাশ হবার বয়সটা ওখানে নেই....

—কী হলে কী হতে পারতো সে সব কথা থাক শিবানী, তুমি দ্বিতীয় একটা কি উপায়ের কথা বলছিলে না? —বরেণ্য বললেন।

—হ্যাঁ, আমরা ওর জন্যে একজন ভালো লয়ার, কি ব্যারিস্টার ঠিক করে দিতে পারি। ওর জানবার দরকার নেই পেছনে আমরা আছি। তোমরা যে রকম বলছো, আমরা দেখা করতে গেলে হয়তো বিগড়ে যেতে পারে।

—এটাই ঠিক বউদি, সুনন্দ বললো, সব দিক ভেবে এটাই সবচেয়ে ভালো মনে হচ্ছে।

কল্যাণ বললো, মনে রেখো পুলিশ ওকে জেরা করছে, পরিচয়টা ফাঁস হয়ে যেতেই পারে।

—তাতে কী ক্ষতিবৃদ্ধি ছোড়দা! আমরা তো ওকে স্বীকার করে নিতে রাজিই আছি। ও-ই বরং....

দাদার বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে কল্যাণ বললো, আশ্চর্য কোথায় আমরা ওঁদের ওপর অভিমান করবো, এ তো দেখা যাচ্ছে ওঁরাই আমাদের ওপর....

—হ্যাঁ, আজ বলে নয়, মনে হল অনেকদিন ধরে। বিশেষত, বউদি — সুনন্দ বললো।

—দাদাকে আমি কোনোদিনেই বুঝতে পারলাম না।

—এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পাচ্ছে ছোড়দা, এই কথা ভেবে যে দুর্বোধ্যতার ব্যাপারে বাবার জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে অদ্ভুত মিল। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না।

।। সাত ।।

চারজনে মিলে ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত সান্যালকেই পছন্দ করলো ওরা। বয়স্ক মানুষ, বহু অভিজ্ঞতা। গ্রিন বেঞ্চের হয়ে ভালো কিছু কাজ করেছেন। অর্থাৎ সামাজিক দায়গুলোকেও দায় বলেই মনে করেন। অর্থপিশাচ হবেন না। দুলাখ দিতে হবে ওঁকে মোট। শিবানী বললেন— ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দা মানি। ওটা পুরোটাই আমরা দেবো।

—তা কেন, উই ক্যান পুল আওয়ার রিসোর্সেজ, কল্যাণ বললো....

শিবানী বললেন— কল্যাণ প্লিজ, তারপর খুব মৃদু, ধীর গলায় বললেন, বড্ড গাফিলতি হয়ে গেছে, আই ফিল টেরিবলি গিল্টি।

।। আট ।।

জয়ন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ভবেশ সান্যালের দিকে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো সতর্ক, ভঙ্গিতে একটা আত্মরক্ষার ভাব। যেন বনবেড়াল এক্ষুনি ফ্যাচ্ করে উঠবে।

—আমার উকিল? কে দিয়েছে? আমার তো কেউ নেই! শুনুন আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। আর কোনো ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি না।

—কী ফাঁদ আশঙ্কা করছো তুমি?

—জানবো কী করে? পুলিশের হতে পারে, যার হোক বলবো কেন?

—এই দ্যাখো আমার পেপার্স, আমি অ্যাডভোকেট ভবেশ সান্যাল। বহু অভিযুক্তকে আমি শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছি। কোর্ট পাড়ায় আমায় এক ডাকে চেনে ইয়াং ম্যান।

—ফিজ কত আপনার।

—লাখ-টাখ হবে। সে ছাড়ো....

—এতো টাকা দিয়ে আমার কেস লড়বার কেউ নেই। আর এনিওয়ে কেস লড়বার আছেটাই বা কী! ওরা আইডেন্টিফাই করে দিয়েছে, আমিও তো স্বীকার করেছি। আমার তো জেল হবেই। যা বলবার কোর্টে বলবো।....

—স্বীকৃতি দেবার পরও কিছু অতিরিক্ত কোর্টে বলবার মতো আছে তা হলে তোমার?

—কে আপনি? ছেলেটি বাঘের মতো তাকালো, তারপর বলল, চলে যান।

—অর্থাৎ বলবার কিছু আছে বুঝলেন ডক্টর চৌধুরী—ভবেশ সান্যাল তাঁর পাকা চুলে আঙুল চালালেন, অ্যান্ড ফর সাম রিজন অর আদার ও জেলে থাকাটাই প্রেফার করছে। বেল নেবে না। আই হ্যাভ আ হাঞ্চ ধরাটাও ও ইচ্ছে করে দিয়েছে।

—কেন? শিবানী চশমাটা ঠিক করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—আউট অফ ফিয়ার, যে দুটোকে ধরা যায়নি, তারা ওকে যে কোনো মুহূর্তে বাগে পেলেই শেষ করে দেবে—এটাই বোধহয় ভাবছে ও। পুলিশ বলছে ও ধরা না দিলে ওদের বাবার সাধ্যি ছিল না ওকে ধরে। যে ছেলেটা মারা গেল, সে কোনোক্রমে বলেছিল জিতুদা, কলাবাগানের জিতুদা। এখন কলাবাগান কলকাতার দুটো। টালিগঞ্জের বস্তিতে যখন জিতু কে? জিতু কে? বলে পুলিশ তোলপাড় করছে, তখন নাকি ও ফিলমি হিরোর মতো স্টাইলে একেবারে সামনে এসে বলে—কী জিতু জিতু করছেন? আমার নাম জয়তু বর্মন। আমাকেই খুঁজছেন বোধহয়!—বিনা বাক্যে, বিনা বাধায় পুলিশ ভ্যানে উঠে বসে।

—সঙ্গীসাথীদের নাম বার করার জন্য ওর ওপর টর্চার-ফর্চার? বলতে বলতে শিঁটিয়ে গেল সুনন্দ।

সেদিকে তাকিয়ে ভবেশ সান্যাল বললেন—একেবারে কিচ্ছু হয়নি বা হচ্ছে না সে গ্যারান্টি তো দিতে পারছি না, কিন্তু ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি স্বীকার করায় দু-চারটে গুঁতো, চড়-থাপ্পড় ছাড়া—এ সব তো পুলিশের হাতের সুখ, বুঝলেন না? কেস সাজাতে পুলিশের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। চারজন ছিল মোট। একটা তো মার খেয়ে মরেই গেল, বাকি দুজনকে নাকি ও ভালো করে চেনে না। দেখলে, আইডেন্টিফাই করতে পারবে বলছে। ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য আছে। এনি ওয়ে আমি দেখছি আপনাদের ভাইয়ের কেস যাতে তাড়াতাড়ি কোর্টে ওঠে।

।। নয় ।।

শিগগিরই কেস উঠবে এবার। কল্যাণের প্রায় নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের মতো অবস্থা। তার দিকে চেয়ে চিত্রা গুমরোয়—সুমন, কী করলি দেখ তো! এইভাবে দাদাদের শাস্তি দিতে হয়, সুনন্দ অফিস যাচ্ছে, কিন্তু সংখ্যাতীত সিগারেট আর চা চলছে তার। বুড়িয়া মেয়েকে শাশুড়ির জিম্মায় রেখে রামধন মিত্র লেনে সুনন্দ-চিনুর কাছে এসে রয়েছে। শুনে চিত্রা বলল, তুমি যদি এত আপসেট হয়ে পড়ো, তো চলো আমরাও ওখানেই চলে যাই। একসঙ্গে

থাকলে সাহস পাবে। কল্যাণ চোখ লাল করে বলল—বাজে কথা বকো না তো! ইতিমধ্যে দাদা ভিয়েনায় গেছেন। বড় বউদি অবশ্য দাদার সঙ্গে যাননি। উনিই কল্যাণকে ডাকলেন—চিত্রা? কল্যাণকে একটু দাও তো।

—হ্যালো বউদি। সিরিয়াস কিছু....

—না কল্যাণ। পরশু দিন ডেট পড়েছে। ভবেশ সান্যাল তোমাদের ভাইয়েদের ডেকে পাঠিয়েছেন। একবার মিট করে নিতে চাইছেন। কিছু জরুরি কথাও আছে....

—কিন্তু বউদি, দাদা যে নেই? —কল্যাণের গা শির্‌শির্ করছে, এ রকম তার আগে কখনও হয়নি। যেন জ্বর আসছে।

—আমি তো আছি—শিবানীর হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল, সুনন্দকে জানিয়ে দাও। আমি বেরোচ্ছি।

চিত্রা কল্যাণের দিকে তাকিয়ে ফোনটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলো—দিদিভাই আমিও যাবো।

—এসো না। পেছনে ওরা দুজন, সামনে আমরা দুজন, অসুবিধে নেই। কল্যাণ কি খুব আপসেট?

—হুঁ।

কল্যাণের ফোনটা যখন এলো তখন চিনু খবরের কাগজটা খুলে বসেছিল। খালি বন্যা, বন্যা, গ্রামের পর গ্রাম, ত্রাণ নিয়ে যারা যাচ্ছে তারাও অনেকে ভেসে যাচ্ছে। প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন অবধি এই-ই। খুঁটিয়ে পড়লেই কোথাও আর যাদবপুরের ডাকাতি নিয়ে কোনো ফলো-আপ নিউজ নেই।

সুনন্দ বলল—চিনু আমার গ্রে পাঞ্জাবিটা দেবে? বউদি এখুনি এসে যাবেন।

বুড়িয়া বলল—কেন রে? কোথায় যাবি সোনদা?

—ওই যে ভবেশবাবু, ডেকে পাঠিয়েছেন কেস ওঠবার আগে লাস্ট মিনিট কিছু শলাপরামর্শ আছে। ছোট বউদি যাচ্ছে, চিনু তুমি যাবে নাকি?

—না।

তা হলে বুড়িয়া? আর একজনের জায়গা হবে।

চিনু বলল—বুড়িয়া আমার কাছে থাক। এই নাও তোমার গ্রে পাঞ্জাবি, এই গুরু কলারটা তো?

বড় বউদি সকাল সাড়ে নটায় নিজের ছোট্ট মারুতিটা চালিয়ে সুনন্দকে তুলতে এলেন। লেকভিউ থেকে কল্যাণ-চিত্রাকে তুলে অতঃপর হিন্দুস্থান পার্ক। ভবেশ সান্যালের বাড়ি এবং চেম্বার। ভেতর থেকে তখন গম্ভীর সুরে সাড়ে দশটার ঢং টা বাজলো।

মিনিট পনেরো পরে ওদের ডাক পড়লো। পনের মিনিটটাকে অন্তত ঘন্টাখানেক মনে হচ্ছিল। কেউ কাউকে বলছিল না অবশ্য।

—ওহ্, আপনারা সকলেই এসেছেন? বসুন বসুন।

ভবেশ সান্যাল কিছু কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

—আচ্ছা একটা কথা বলুন তো সুনন্দবাবু, ভাই সম্পর্কে আপনাদের ধারণাটা গোড়া থেকেই ভালো ছিল না, ঠিক কি না!

—ঠিক তা নয়, ইদানিং ও খুব বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছিল।

চিত্রা বলল—চুরি-ডাকাতি করে খাবে—এই জাতীয় কথা ওকে আমি বলতে শুনেছি।

ভবেশ বললেন—বেশ। দেখুন, অনেক সময়ে রেগে গিয়ে আমরা তো বলি ওকে খুন করে ফেলবো। কিন্তু করি কী? মুখে বলি—এমন মারবো বুঝবে মজাটা—কিন্তু সত্যি-সত্যি মারি না। ঠিক কি না।

শিবানী বললেন—আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন একটু পরিষ্কার করে বলুন মিঃ সান্যাল।

—ডাকাতি করা চাট্টিখানি কথা নয়, এটা তো মানবেন মিসেস চৌধুরী?

—একশোবার—এইবার কল্যাণ বলল কোনো ক্রমে তার ভেতরকার কাঁপুনি থামিয়ে। —আর তাই-ই ধরা পড়ে গেল....

—হ্যাঁ ধরাও পড়ে গেল। একটা স্যাঙাৎ ওর নাম মুকু, মুকুন্দ। মাত্র উনিশ বছর বয়স, একেবারে বেঘোরে মারা গেল। বীভৎস মৃত্যু। প্র্যাক্টিক্যালি, সেই দুঃখেই ছেলেটা ধরা দিল। এই মৃত্যুটা ওদের হিসেবের মধ্যে ছিল না।

একজন ডাকাত গণপিটুনিতে মারা গেছে, এটা একটা নৈর্ব্যক্তিক খবর। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ উনিশ বছরের তরুণ, উন্মত্ত জনতার আক্রোশের মার খেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় বেঁচে থেকেছে কিছুদিন। তারপর মারা গেছে, এটা হৃদয়ঙ্গম করে হঠাৎ সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। এই অপমৃত্যু ঘটাবার দুঃখে তার বন্ধু, যে প্রধান আসামী, সে যেচে ধরা দিয়েছে। সুমন ঠিক এইরকমই বরাবর। স্কুলে অনেক সময়েই মারপিটের পুরো দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিত অম্লানবদনে। হেড মাস্টারমশাই সুনন্দকে ডেকে বলেছিলেন—সন্দেহ নেই সুনন্দ, ওর এই স্বভাবটা ওর উদারতার লক্ষণ। বাট ইট ইজ ডেঞ্জারাস। এখনই বাজে ছেলেরা ওর এই স্বভাবটার সুযোগ নিচ্ছে। পরে কী হবে? ওকে বোঝাও তোমরা....

—অল্পবয়সী ছেলেরা আজকাল কেন যে এমন মিস্‌গাইডেড্ হচ্ছে। চিত্রা বলল।

—মিস্‌গাইডেড্, রাইট, বাট ইন এ ডিফ্‌রেন্ট সেন্স, মিসেস চৌধুরী।

সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ভবেশ সান্যাল সেই সময়েই বোমাটা ফেললেন। বললেন—সেই সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পটা শুনেছেন তো? সতীন, সতীনপুত্র ইত্যাদি ইত্যাদি....।

কল্যাণ সুনন্দর দিকে তাকালো, শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল—বিশ্বাস করুন মিঃ সান্যাল আমরা কখনও ওকে সৎ ভাই বলে দেখিনি। ওর এডুকেশন যে তালেগোলে এ রকম খিচুড়ি পাকিয়ে গেল, অন গড বলছি তা একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়। আমরা ঠিক....

—আপনার ভাইটি যে সৎ, এ কথা জানাননি তো?

ঢোঁক গিলে সুনন্দ বলল—জানাবার প্রয়োজন তো হয় নি!

শিবানী বলেলন— বলার তো কথা নয় মিঃ স্যানাল! প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সুমনের মাকে আমার শ্বশুরমশাই যখন বিয়ে করেন তখন আমার স্বামীর প্রায় চব্বিশ বছর বয়স, এই কল্যাণ দশ এগারো, সুনন্দ আট নয়। জাস্ট আমার প্রথম শাশুড়ির মৃত্যুর একবছর পর। একটা শক তো লাগবেই—এটাই তো স্বাভাবিক। আমার স্বামী তখন ভয়ানক কষ্ট পেয়েছিলেন, লজ্জা পেয়েছিলেন। কিন্তু....

কল্যাণ বলল—না বউদি, এখন আমরা বাবাকে বুঝি। সংসারটা ভেসে যাচ্ছিল। বাবা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। আমরা খুব একলা ছিলাম। মামার বাড়ির দিকে মাত্র দুই মাসি। একজন নাগপুরে। আর একজন অস্ট্রেলিয়ায়, এই মেজমাসিকেই আমরা দেখিইনি, দিদিমা-দাদু সব তখন মারা গেছেন, বাবার কোনো উপায় ছিল না। আর আমরাও, অন্তত আমি কোনো গ্রাজ পুষে রাখিনি। ওঁকেই মা বলেছি, বোন আর ভাই হবার পর কোনো তফাৎ-ই ছিল না।

শিবানী বললেন—এগ্‌জ্যাক্টলি। আমার স্বামী মাঝে মাঝেই বলতেন— ছোটগুলো কী করছে, কীভাবে বড় হচ্ছে, কিছুই জানি না। কিছুই করলাম না। উনি খুব দুঃখ করতেন। উনি সারাজীবন নিজেকে এর জন্য অপরাধী মনে করেন। সুমন প্রায় আমার ছেলের বয়সী—কমই যোগাযোগ। বাট হি গ্রু আপ টু বি আ ব্রাইট ইয়াং থিং। আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম। ইন মাই ওন ওয়ে।

ভবেশ সান্যাল একবার কল্যাণ একবার সুনন্দ একবার শিবানীর দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলেন। মুখে খেলা করছিল এক চিলতে হাসি। দুঁদে উকিল। ধরে ফেলেছেন সব এমনি একটা ভাব।

তিনি একটা পোস্টকার্ড সাইজ গ্লসি ফটো বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। —দেখুন তো!

—এ কে? —চিত্রা বলল। শিবানী বললেন—কে ছেলেটি?

—চিনতে পারছেন না? হি ইজ সাপোজড্ টু বি ইয়োর সুমন পালচৌধুরী!

—এ তো সুমন নয়! সুনন্দ আশ্চর্য গলায় বলল।

—অথচ দেখুন চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। ভদ্র। একটু ভাবুক মুখ, ব্যায়াম করা মাসকুলার বডি এবং দেখুন সুনন্দবাবু মাথায় বেশ পাকা চুল। কিন্তু আপনার মতো নয়, আপনার ভাইও নয়।

নির্বাক সুনন্দর দিকে চেয়ে উনি বললেন—ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। নিজের জনপ্রিয়তা, খ্যাতি এ সব নিয়ে একটু বেশি ভেবে ফেলেছেন আপনি। এ ছেলেটি ও পাড়ার লোকেদের কেন চেনা-চেনা লেগেছিল জানেন? এ, এই জয়তু বা জয় এই পাড়ারই ছেলে। দশ এগারো বছর বয়স পর্যন্ত এখানেই ছিল। এ ছেলেটি বড় দুর্ভাগা। কিন্তু সে অন্য গল্প। অবান্তর। এখন, এই কেসটার সঙ্গে আপনাদের আর সম্পর্ক রইলো না। আপনাদের কাছে যে অগ্রিমটা আমি নিয়েছি সেটা ফেরত দিচ্ছি—বলে ড্রয়ার খুলতে লাগলেন মিঃ সান্যাল।

—কী হবে এর? এই জয়তুর? —কল্যাণ আলগা গলায় জিজ্ঞেস করল।

—আসামীর উকিল দেবার ক্ষমতা না থাকলে সরকারই একটা উকিল দেয় ওদের প্যানেল থেকে। তিনি রুটিন-পদ্ধতিতে কাজ করেন। এ ছেলেটি প্রায়, পুরোপুরি বলছি না, প্রায় নির্দোষ, কিন্তু কনভিকশন্ হয়ে যাবে। বছর সাতেকের সশ্রম কারাদণ্ড বাঁধা।

—আপনি যে বলছেন ও প্রায় নির্দোষ! চিত্রা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে টেবিলের ওপর।

—হ্যাঁ তাই তো, ওর নিজের বাবা আর সৎ-মা মিলে ওকে ফ্রেম করেছে, ফাঁদটাতে ও পা দিয়েছে বোকা গোঁয়ারের মতো, এইটে ওর দোষ। অর্ধশিক্ষিত, সহায়-সম্বলহীন, ডানপিটে, মরিয়া হলে যা হয়।

—ওর কেসটা কী? সুনন্দ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল।

—কেসটা খুব পিকিউলিয়ার। রাত সাড়ে নটার সময়ে ভদ্রমহিলা বেল শুনেই কিচ্ছু না দেখেশুনে চাবি নামিয়ে দিয়েছেন শুনেই আমার অদ্ভুত লাগে। ওই বাড়ির মালিক ধীরাজ ভদ্র লোকটা ওর বাবা।

—বলেন কী?

—তবে আর বলছি কী! ওই বাড়ি আরও কিছু সম্পত্তি-টম্পত্তি সবই ওঁর প্রথমা স্ত্রীর, জয়ের মায়ের। ও যখন দশ এগারো বছরের তখন ওর মা মারা যান। হিটার জ্বালতে গিয়ে শক খেয়ে। মিস্টিরিয়াস। আমার তো

ধারণা, ওই ধীরাজেরই কীর্তি এটি। তারপরে তিনমাস যেতে না যেতেই এই দ্বিতীয় মহিলাকে ও বিয়ে করে। সম্ভবত আগেই এর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল, বেশ প্ল্যান করে করেছে ব্যাপারটা। ছেলেটার ওপর এই মা এত মানসিক অত্যাচার করত যে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কাকার কাছে কিছুদিন ছিল, সেখানে গিয়ে বাবা ঝামেলা করতো—আমার ছেলেকে কেন আটকে রেখেছো.... ইত্যাদি ইত্যাদি। তা সে কাকাও তো ওই লোকেরই ভাই! সেখানেও ছেলেটা খুব হ্যাপি ছিল না। সেখানে থেকেও পালায়, ওর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই একসময়ে হেল্প করেছিলেন ছেলেটাকে, কিছু লেখাপড়া শেখে, ব্যায়াম-সমিতি-টমিতি করে, তবে লেখাপড়া বেশি কিছু আর কী করে হবে, ডিস্ট্র্যাক্‌টেড তো সব সময়ে! যাই হোক বড় হয়ে এইবার ও বাবার কাছে মায়ের সম্পত্তির হাফ ক্লেইম করে। বাবা মুখে ভাব দেখায় যেন ছেলেকে ফিরে পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছে।

—তারপর?

—তারপর মোটরবাইক কিনে দেয়, মাঝে মাঝে কিছু টাকা-পয়সাও দিত। গোল্লায় যাতে যেতে পারে আর কি? ক্রমাগত ওকে বোঝাতে থাকে সৎ-মা অত্যন্ত খারাপ লোক, এখন নাকি সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছে, দলিল দস্তাবেজ, গয়না-টাকা সব সৎ-মা আটকে রেখেছে। তারপর পরামর্শ দেয় ডাকাতি করে ওগুলো নিয়ে আসতে। কোথায় কী আছে স-ব বলে দেয়। দুটো লোক দেয় সঙ্গে। মুকু, ওই বন্ধুটা ওকে বড্ড ভালবাসতো, কিছুতে একা ছাড়েনি।

আপনারা খুব উত্তেজিত হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে? ভবেশ সান্যাল একটু জল খেলেন। —একটু চা বলব?

—বলুন প্লিজ—সুনন্দ বলল।

—কী বলব? চা না কফি?

—না জয়তুর কেসটার কথা বলছিলাম।

—প্ল্যান মাফিক সব হল। ধীরাজ ভদ্রর দুটো লোকই রাস্তায় নামে, বাড়ির সামনে দিয়ে ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করে পালিয়ে যায়, আর পড়শিরা এসে সামনে মুকুলকে পেয়ে মেরে ফেলে। ধীরাজের বোধহয় মাথায় ছিল জয়তুরও এভাবেই মৃত্যু হোক। গুরুবল ছেলেটা বেঁচে গেছে।

—এইরকম একটা কাঁচা কাজ? ও রাজি হয়ে গেল? সুনন্দ হতাশ গলায় বললো।

—তবে আর অর্ধশিক্ষিত, গোঁয়ার মূর্খ বলছি কেন? সৎ-মা ওর ওপর অত্যাচার করতো, বাবা তো ছিল নীরব পার্টি। বাবাকে তাই অত অবিশ্বাস

করেনি। আফটার অল বাবা তো! জয়ের কাছে কিছু গয়না পাওয়া গেছে, ওর মায়েরই গয়না, আর সব কিছু অন্য লোক দুটো নিয়ে পালিয়েছে।

—তাহলে এখন পরিস্থিতি কী? —কল্যাণ বললো।

—পরিস্থিতি এই যে জয় যা বলছে তার কোনো প্রমাণ নেই। একমাত্র সাক্ষী মুকুন্দ ডেড। ওর বাবা বলছে, জয়তু গোড়ার থেকেই খুব দুর্বিনীত ছিল, ওকে দেখাশোনা করবার জন্যেই সে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে, কিন্তু ছেলেটা তাতে ক্ষেপে গিয়ে বাড়ি থেকে পালায়। বদসঙ্গে মিশতো। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি ডাকাতি করতে আসে। তার পক্ষে সাক্ষী আছে স্ত্রী, মেয়ে, পাড়াপড়শি, স্কুলের শিক্ষকরাও সাক্ষ্য দেবেন ও কত মরিয়া ডানপিটে অমনোযোগী ধরনের ছিল।

কল্যাণ নিঃশ্বাস ফেলে বললো—তাহলে ওর কোনো আশাই নেই?

—সরকারি উকিল যদি ফরিয়াদি পক্ষকে ঠিকঠাক জেরা করতে পারে.... জেরার ওপরেই সব ভরসা।

—সে আশা কি নেই?

—ক্ষীণ।

—আপনি ছেলেটির কথা বিশ্বাস করছেন?

—ওহ ইয়েস।

—কেন, জানতে পারি সার?

—দেখুন আমি ক্রিমিন্যালদের হয়ে লড়ি। তার মানে, তালে গোলে একটা লোক আসামী দাঁড়িয়ে গেছে, কিম্বা হয়তো সে অপরাধটা করেই ফেলেছে। এরা আমার ক্লায়েন্ট, আমার প্রথম কাজই হল এদের বিশ্বাস করা। তারপর এদের গল্পের মধ্যে জোড়াতাপ্পি, ফাঁক এসবগুলো বুঝে ফেলার চেষ্টা করি। এই ডাকাতির বিবরণটা পড়ে দেখুন। ভীষণ অ্যামেচারিশ লাগবে। মেয়েটার মুখ কিন্তু বাঁধা ছিল। তাহলে ডাকাত পড়েছে বলে চেঁচালোটা কে? অন্য দুটো লোকেরই কাজ, আর কে হবে? গয়না যেমন ছিল, তেমনি বেচারি পুঁটলি করে রেখে দিয়েছে। বাবাকে হ্যান্ড ওভার করতে হবে তো! ওর ডাকাতি প্রমাণ করার পক্ষে জিনিসটা যথেষ্ট, কিন্তু আসল যেসব জিনিস, দলিল-টাকাকড়ি আরও গয়না সেসব হাপিস। পুলিশ পর্যন্ত বলছে, গয়নাগুলো ও সরায়নি। বিক্রি করেনি—এটা খুব আনইউজুয়াল। ধীরাজের আবার সব ইনশিওর করা ছিল। সে টাকাও পাবে, আসল যেগুলো ওর লোক সরিয়ে ফেলেছে সেগুলো তো রইলোই। ছেলেটা বড্ড ঘা খেয়ে গেছে বন্ধুর মৃত্যুতে। ও তো বাবার কথায় একটা খেলা করতে গিয়েছিল, নিজের জিনিস নিজেই

চুরি করবার খেলা, তার জন্যে ওর বন্ধুকে মারা যেতে হল, এটাতে ও ভেঙে পড়েছে। তারপরে এখন অভিযোগের রকম-সকম দেখে তো বুঝতেই পারছে সবই। উনিশ কুড়ি বছরের একটা ছেলেমানুষ বই তো নয়?

—ছেলেটা নির্দোষ, এক্সপ্লয়টেড্, ফ্রেম্ড্ অথচ তার শাস্তি হবে? আর ওই খুনে বদমাস— ও নির্বিবাদে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? —চিত্রা বলে উঠলো। রাগে দুঃখে ফেটে পড়ছে তার কণ্ঠস্বর।

—এই রকমই তো হচ্ছে চারদিকে মিসেস চৌধুরী। বোকা-দুর্বল, অসহায়কে উস্‌কে দেওয়া হচ্ছে, তারা মারপিট করে মরছে, আসল দুর্বৃত্ত সব বড় বড় গাড়ি চড়ে বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক, আপনাদের ভাইটি তো বেঁচে গেল।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না।

—কিন্তু আমরা আজও ওর খোঁজ পেলাম না—সুনন্দ খুব হতাশ গলায় শেষে বললো।

—শুনুন সুনন্দবাবু। শুভ সংস্কার বলে একটা কথা আছে, জানেন? আপনাদের ভাইয়ের সেই সংস্কারটি শুভ। আপনাদের একটা নর্ম্যাল পরিবার, মূল্যবোধ আছে। আদর্শ আছে। অথচ তার বাড়াবাড়ি নেই। আপনারা নিজেরা কৃতী কিন্তু ঠিক স্বার্থপর নন, একজন যদি ডেডিকেটেড সায়েন্টিস্ট তো আর একজন কবি। আপনাদের ভাই ঠিক বিপথে যাওয়ার ছেলে নয়। আমি এসব অনেক ডীল করেছি, জানি। নিশ্চিন্ত হয়ে যান। একটা উনত্রিশ ত্রিশ বছরের স্বাস্থ্যবান ছেলের জন্যে এত ভাবেন কেন? ও ভালোই আছে। দেখুন হয়তো হিমালয়ে ধুনি-টুনি জ্বালিয়ে বসে আছে।

এত দুঃখেও সামান্য একটু হাসি দেখা দিল সুনন্দর মুখে। বললো— সুমন, ধুনি?

চিত্রা বললো—জয়তুর কী হবে?

—বললাম তো সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড বাঁধা।

—তারপর?

—তারপর সাত বছর খুনে-ডাকাত কয়েদিদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে ও যে কী শেপে বার হবে ভগবান জানেন। দাগী হয়ে যাবে। সম্পত্তি ওর থাকলেও ও তো পাবে না, ফাইট করবে কী করে?

—আর ওর বাবা!

—টাকা বাড়বে, কালো টাকা, পঞ্চমকারে মজে থাকবে, মজা লুটবে ফার্স্ট ক্লাস।

সুনন্দ বললো—জয়ন্তুর কেসটা আপনি লড়ুন সার। টাকাটা আপনি ফেরত দেবেন না প্লিজ! বউদি আপনি কী বলেন?

শিবানী বললেন—আমারও তাই মনে হচ্ছিল। সুমন হলে তো খরচটা আমাদের করতেই হত! সুমন ভালো থাকুক, সুমনের কল্যাণে জয়ন্তুর জন্য না হয় আমরা এটুকু করলাম। কোনো সোশ্যাল ডিউটি বা সেবাও তো আমরা করি নি।

চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন ভবেশ সান্যাল। —আপনারা কী বলেন কল্যাণবাবু? আপনার স্ত্রী?

—আপনি ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আনুন প্লিজ, চিত্রা বললো।

কল্যাণ বললো— এতটা যখন এগিয়েছি, ইট ইজ প্রভিডেন্স, বুঝলেন মিঃ সান্যাল? ও আমাদেরই দায়।

—থ্যাংকিউ, চশমাটা নামিয়ে রাখলেন ভবেশ সান্যাল, যেন একটা ভীষণ স্বস্তিতে। —আমি আশা করছিলাম, আপনাদের শুভ সংস্কারের ওপর ভরসা রাখছিলাম, কেসটা আমি ইন এনি কেস লড়তামই। অসহায় ছেলে একটা। করাপ্ট এই সমাজ ওকে পচিয়ে গলিয়ে শেষ করে দেবে, জেনেশুনে আমি সরে দাঁড়াবো এতটা পাষণ্ড আমি এখনও নই। আপনারা আমার মুহুরী ইত্যাদির বিলটা একটু দিয়ে দেবেন। আর একটা কথা, ওর জানা উচিত ওরও শুভানুধ্যায়ী আছে, ভালো স্নেহশীল মানুষও আছে সমাজে। সবাই ধীরাজ ভদ্র নয়। জানলে ওর সাহস বাড়বে, সততায় ওর সঙ্গে দেখা করুন। মামলাটা কাল উঠলে, যদি উপস্থিত থাকেন তো বড় ভালো হয়।

সুনন্দ বললো—আমি আসবো।

চিত্রা বললো—আমিও।

শিবানী বললেন—আই হ্যাভ নো আদার এনগেজমেন্ট! আই মাস্ট সি হিম। দিস জয়ন্তু।

কল্যাণ বললো—আমি যে কতদিন ভালো করে ঘুমোইনি বউদি আজ গিয়ে একটু ঘুমোবো,—যদি কাল ঘুম ভাঙে....।

বিষণ্ণ মুখে ওরা ভবেশ সান্যালের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসছিল। বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টি বাড়ছিল। মহানন্দার জল বাড়ছিল, বোট উল্টে যাচ্ছিল, কোনোক্রমে টাল সামলাতে সামলাতে। বানভাসি মানুষ সামলানো, শুক্‌নো চিঁড়ে গুড়, পাউচে করে পানীয় জল, ওষুধ, প্ল্যাস্টিকের চাদর এইসব নিয়ে নেমে পড়েছে ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণমিশন, আরও কত এন. জি. ও, তাদের মধ্যে এক বলিষ্ঠ যুবক, অনেকের মধ্যে একজন, সেই কল্পিত একজনের ভাবুক

মুখের ওপর চোখ রেখে ইনল্যান্ড লেটারটা পড়ছিল চিনু তৃতীয়বার কি এই চতুর্থবার, আর নিজে এই চিঠির পুরো ভার বইতে পারবে না বুঝে পড়াচ্ছিল বুড়িয়াকে।

চিনু,

আশা করি তুই সুখী হয়েছিস। তোর একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে বুড়িয়ার কাছে শুনেছিলাম। অনেক সুখের মধ্যে এইটুকু তোর দুঃখ। কিছু মনে করিসনি একটু দুঃখ ভালো। তোরও, সোন্‌দারও। নাহলে পৃথিবীর অন্যান্য অসফল আশাহত, অকৃতীদের, আমাদের, দুঃখের কণাও বুঝতে পারবি না। সে সব না বুঝে তোরা কবি ও কবিপত্নী অন্য গেরস্থর মতো টি.ভি. দেখে, রোববার রোববার পাঁঠার মাংস খেয়ে পুজোর সময়ে দামি শাড়ি কিনে, ভ্রমণসঙ্গী দেখে ট্যুরিস্ট স্পট দেখে দেখে জীবন কাটাবি সেটা কি ঠিক!

তোদের প্রতি আমার যে ক্ষোভ হয়েছিল এখন তার অনেকটাই মুছে গেছে। পৃথিবীর কবিরা, পৃথিবীর কৃতীরা অন্যের পত্নী চুরি করে থাকেন, আর এ তো বান্ধবী! তবে সোন্‌দা হয়তো বুঝতে পারেনি। ইগনোর্যান্স্ ইজ ব্লিজ। কিন্তু তোর মনোযোগটা যখন কবিভ্রাতা থেকে স্বয়ং কবিতে চমৎকারভাবে ট্রান্সফার্ড হয়ে গেল, তখনই সত্যি-সত্যি বুঝলাম আমি কত অকিঞ্চিৎকর। এখন দ্যাখ, পুরুষের মতো পুরুষরা পৃথিবীতে নিজের জন্য বাঁচে, যেমন আমার দাদারা। কিন্তু নিজের জন্য বাঁচবার মুরোদ যাদের নেই, তারা তো অন্তত অন্যের জন্য বাঁচতে পারে। আমার মা সেইভাবে বেঁচেছিলেন। অন্যের জন্য। আমার বিপত্নীক বাবা, মাতৃহীন দাদা-দিদিদের জন্যও। মায়ের পথ ধরেই আমি শেষ পর্যন্ত মামার বাড়ি চলে এলাম। আমার মামার বাড়ি একটা অনাথ আশ্রম। নানা ধরনের নানা বয়সের অনাথ-অনাথার আশ্রয় এটা। এখান থেকেই আমার বাবা আমার মাকে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের যেমন অনাথ-আশ্রম আছে। তেমনি আরও নানা কাজ-কর্ম আছে। শিখছি। গতবারের মালদা মুর্শিদাবাদের বন্যায় ত্রাণ শিখেছি। এবারেও যাচ্ছি উত্তরবঙ্গে। খুব খাটুনি হয়। কিন্তু খাটবার ক্ষমতাটা তো আমি অর্জন করেছি। দাদাদের, বিশেষত বুড়িয়াকে আমার সম্পর্কে একটু নিশ্চিন্ত করে দিস। কীভাবে দিবি তুই-ই ভাব। কতকগুলো শক্ত কাজ প্রত্যেকেরই করতে পারা উচিত। আমার প্রণাম নিস, বউদি যখন।

—সুমন।

সম্ভবামি যুগে যুগে

এষা দে

—এসো সিলিয়া এইখানে বসি। দুটো লম্বা নিচু ক্যানভাসের ডেক চেয়ারের দিকে আঙুল দেখালেন মিসেস ফুতার্দো। অভ্যাসমত সিলিয়া তাঁর হাত ধরার আগেই নিজেই দিব্যি বসে পড়ে সমস্ত শরীর এলিয়ে দিলেন মহিলা। ইতস্তত করে সিলিয়া বসে।

—ও কি ওরকম শক্ত সোজা হয়ে রইলে কেন? হেলান দাও, রিল্যাক্স কর। কেমন জায়গা? ভাল না?

এমনভাবে বললেন যেন তাঁর ২৪ ঘন্টার সেক্রেটারি-কাম-কম্প্যানিয়ন মাইনে করা কর্মচারী সিলিয়া ডি সিলভাকে জায়গাটা দেখানো, ভাল লাগানো তাঁরই কর্তব্য। গোয়ার মাটিতে পা দিতে না দিতে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন এমিলি ফুতার্দো। কলকাতায় তো তাঁর অষ্টপ্রহর মেজাজ খুঁতখুঁতানি আর বায়নার ঠেলায় সকলের জীবন ওষ্ঠাগত। মিসেস ফুতার্দোর উকিল যিনি ওঁর টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি থেকে শুরু করে চিকিৎসা সংসারযাত্রা যাবতীয় দেখাশুনো করেন সেই মিঃ কোহেন সিলিয়াকে চাকরিতে নিয়োগের সময় বলেই দিয়েছিলেন মালকিন দীর্ঘকাল একা, কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত। মানিয়ে চলতে হবে।

এ হেন সাবধানবাণী সত্ত্বেও প্রথম দেখায় সিলিয়া ঘাবড়েই গিয়েছিল। মহিলার সত্তরোর্ধ্ব বয়স, লম্বা পাতলা একহারা চেহারা। পরনে সেকেলে পা পর্যন্ত ঝুল পুরো হাতা পোশাক, কবজি ও গলায় লেস। একরাশ ধবধবে সাদা চুল মাথায় চুড়ো করে বাঁধা। তাতে গোঁজা আগের দিনের কচ্ছপের খোলে তৈরি গাঢ় বাদামি রঙের কাঁটা। দু-হাতের আঙুলে চারটে চারটে আটটা আংটি। বোধহয় হীরে-পান্না-চুনি-মুক্তো। গলায় লম্বা সোনার চেনে ঝুলছে একটা পাথর বসানো ক্রুশ। পাউডার রুজ লিপস্টিকের পুরু প্রলেপে মুখখানা একটা মুখোশ। যেন সেই কবেকার হলিউড ফিল্ম থেকে সোজা বেরিয়ে এলেন। কোনও কল্পিত জগতের বাসিন্দা।

সত্যি কথা বলতে কি মরচে-ধরা গেট খুলে ঢোকার সময়ই গা-টা ছমছম করে উঠেছিল সিলিয়ার। মধ্য কলকাতার অলিগলির ভিতরে একটা প্রায় হানাবাড়ি। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। বহুকাল রঙ হয়নি। এখানে-ওখানে পলেস্তারা খসা। দোতলায় টানা বারান্দা জুড়ে কাঠের খড়খড়ি পুরনো রঙচটা। গেট দিয়ে ঢুকে সামনে ও বাড়ির দু'দিকে বেশ কিছুটা খালি জায়গায় অতীতে শৌখিন বাগানের চিহ্ন। দামি দামি গাছগুলোকে ছাপিয়ে উঠেছে আগাছার দল। মস্ত কাঠের দরজা দিয়ে ঢুকে হলঘর। ইয়া উঁচু সিলিং, সাদা-কালো চৌখুপি কাটা মেঝে। দরজা-সমান লম্বা সব জানালার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি রঙবেরঙের খোপ খোপ কাচ বসানো। কোনও কোনও খোপে কাচ ভেঙে গিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে। রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে নানা রঙের আলোর সঙ্গে মিলে একটা সাইকেডেলিক পরিবেশ। এখানে-ওখানে ভারি ভারি মেহগনি ও আবলুশ কাঠের আসবাবপত্র। ধুলো ভরা। ঘরের এক কোণে রাখা একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো যার সামনে বসে টুংটাং বেসুরো আওয়াজ করছিলেন গৃহকর্ত্রী। মিঃ কোহেনের গলা খাঁকারিতে আস্তে আস্তে তাঁদের দিকে ফিরে তাকালেন।

—চমৎকার বাজাচ্ছিলেন মাদাম। আপনার হাতের জবাব নেই।

সিলিয়া বোঝে চাটুকারিতার মার নেই। আর্থারাইটিসে আড়ষ্ট আঙুল বেহাল বাদ্যযন্ত্রে যে সুর সৃষ্টি করছে তাতে মোহিত হওয়াও প্রয়োজন। অবশ্য এই বাজনার অর্থাৎ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দৌলতেই সিলিয়ার বাবার কথা মিসেস ফুর্তাদোর জানা। এক সময়ে চৌরঙ্গির চারিপাশে দ্বিতীয় শ্রেণীর বার রেস্তোরাঁ হোটেলে ফিলিপ ডিসিলভার বেহালায় হলিউডের জনপ্রিয় গানগুলির সুর না বাজলে সন্ধে জমতই না। সে সব দিন অবশ্য সিলিয়া দেখেনি। তার জন্মের বহুকাল আগে সে জমানার ইতি। রেস্তোরাঁ-টেস্তোরাঁর মালিকানা পাল্টেছে। বদলে গেছে খদ্দেরের রুচি। ফিলিপ ডিসিলভার রোমান্টিক বিষাদময় সুরের জাল আর কাউকে টানে না। অতএব সিলিয়া জন্ম থেকে দেখেছে বাবার বেহালা শেখানোর দু-চারটে টিউশনির টাকা নিবেদিত বোতলবাসিনী দেবীর পায়ে। খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত নার্সিংহোমে নার্সের চাকরি সম্বল করে সংসার আর তাদের দুই বোনকে একাহাতে সামলেছে মা। এ ধরনের পরিবারে যা যা অশান্তি স্বাভাবিক সবই পুরোদস্তুর ছিল। বাড়ি ছাড়ার প্রথম সুযোগ চাকরিটি। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অসাধারণ প্রসারের কৃপায় বাঙালি বিহারি পাঞ্জাবি মেয়েদের মধ্যে তার মতো প্রায় অশুদ্ধ কিন্তু স্বচ্ছন্দ ইংরেজি বলিয়ে স্টেনোটাইপিস্ট অসংখ্য। মায়ের মত নার্স হওয়াও শক্ত কারণ অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসীম দূরদৃষ্টির ফলে নার্সিং কোর্সে প্রবেশাধিকারই উচ্চশিক্ষিতের জন্য সংরক্ষিত। অতএব মিঃ

কোহেনের সঙ্গে সিলিয়া দরাদরি পর্যন্ত করেনি। এক কথাতেই রাজি।

কিন্তু এরকম বাড়ি আর এমন এক মহিলার সঙ্গে দিনরাত বসবাস! টিভি দূরস্থান একটা রেডিও পর্যন্ত নেই। খবরের কাগজ আসে না। টেলিফোন ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ শুধুমাত্র ফি রবিবার সকালে চার্চে যাওয়া। আর মাসে একদিন বিকেলে নিউ মার্কেটে প্রাচীন ইহুদি দোকান 'নাহুম'-এ পুদিনা বিস্কিট, চিজ, কেক, পেস্ট্রি কেনা। এই পাঁচ দিনের জন্য একটা ভাড়া গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ঘরে-বাইরে সর্বত্র সর্বক্ষণ সিলিয়ার সঙ্গ চাই। সত্যি-মিথ্যে হাজারটা শারীরিক কষ্টের ফিরিস্তি শোনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ অর্থাৎ বাঁধা ডাক্তার বুড়ো জ্যাকারিয়ার একই যন্ত্রণা লাঘব ও টেনশন কমানোর বড়ির বিধান লিখে নেওয়া থেকে শুরু করে রাঁধুনি (কাম কেয়ারটেকার কাম দারোয়ান) আসগর আলির হাতে বেড টি-র চায়ে, ব্রেকফাস্টে টোস্টে, লাঞ্চে চিকেন রোস্টের স্লাইস কাটায় কী ঘাটতি হয়েছে, আলু পেঁয়াজ শশা ভেটকি মাছ কেনায় ক'টাকা মারছে, বুড়ি পরিচারিকা মিরিয়াম, (ভারতীয় খ্রিস্টান একদা আদিবাসী), তার নিত্যকরণীয় ঘরদোর ঝাড়াঝুড়ি বাসনকোসন জামাকাপড় ধোওয়াধুয়ি যে নমনমো করে চালাচ্ছে এবং এদের জন্য তাঁর জলের মত অর্থখরচ ইত্যাদি দৈনিক বিলাপ। তারপর তাঁর অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউ এস এ নিবাসী ভাইপোভাইঝি ভাগ্নেভাগনীদের চিঠি ডিকটেশন দেওয়া।

প্রথম প্রথম সিলিয়া তাঁর কথাবার্তা খুব মন দিয়ে শুনত। ডিকটেশন নিতে বানানে খটকা লাগলে দশবার ডিকশনারি ঘাঁটত। কিছুদিনের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করল সব বেকার পরিশ্রম। ওই একই ওষুধ তিনি বরাবর খান, আসগর আর মিরিয়ামের সম্বন্ধে একই অভিযোগ বরাবর করেন এবং চিঠিও তিনি লেখেন অভ্যাসবশত। একটি চিঠিও ডাকে দেওয়া হয় না। এ বাড়িতে চিঠিপত্র আসে শুধু ব্যাঙ্ক আর উকিলের। ছ'মাসে শুধু একবার টেলিফোন এসেছে। ছোট ভাই ফার্দিনান্দের, ক্যানবেরা থেকে। কোনও কোনও বিকেলে মৃত স্বামীর বন্ধুরা যে দু-চারজন এখনও জীবিত এবং কলকাতা ছেড়ে ছেলেমেয়েদের কাছে বিদেশে চলে যাননি তাঁরা আসেন। আর্মেনিয়ান, পার্সি, ইহুদি। স্পষ্টত বন্ধুপত্নীর প্রতি কর্তব্যের খাতিরে। তাঁদের জন্যই মহিলার নিউ মার্কেটে মাসিক বাজার। ঠাটবাটে ঘাটতি নেই। রুপোর টি সেট, রুপোর কাঁটাচামচ, সেই পুরনো বিলিতি কাপডিশ বেরোয়। দার্জিলিং পাতা চা, নাহুমের বিস্কিট পেস্ট্রি সাজিয়ে দেওয়া হয়। ভদ্রতার খাতিরে অতিথিরা আসেন, ভদ্রতার খাতিরে একটু মুখে দেন। তখন সিলিয়ার একটু অবসর। দূরে বসে শোনে ১৯৫৫ সালে জোয়ানা কী করেছিল, ৪৫-এ যুদ্ধের শেষে জনের কীর্তি ইত্যাদি পুরনো কেচ্ছা। এমন দিনও এ ক'মাসে মোটে বার তিনেক এসেছে।

সাধারণত দিনের বেশ খানিকক্ষণ সিলিয়াকে বুককেস থেকে সেই আদ্দিকালের পোকাখাওয়া রাইডার হ্যাগার্ড আর মেরি করেলির লেখা উপন্যাস পড়ে পড়ে শোনাতে হয়। মহিলা ঝিমোন, শোনেনও না। কিন্তু সিলিয়া যেই পড়া বন্ধ করে অমনি চোখবোজা অবস্থাতেই খিঁচিয়ে ওঠেন।

—থামলে যে। কী হল। এরই মধ্যে টায়ার্ড। আমাদের সময়ে মেয়েদের কত স্ট্যামিনা থাকত।

ভয়ে সিলিয়া তটস্থ হয়ে থাকে। একদিন চা-য়ে মিঃ কোহেনের সঙ্গে এক বয়স্ক গোয়ান ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পর বুড়ির মেজাজ বেশ ভাল। হঠাৎ সিলিয়াকে প্রশ্ন করেন,—দেশে গেছ কখনও?

বিস্মিত সিলিয়া জবাব দেয়,—দেশেই তো আছি।

—ডোন্ট ট্রাই টু বি স্মার্ট। ক্যালকাটা কি আমাদের দেশ? আমি গোয়ার কথা বলছি।

—না। গোয়া কখনও যাওয়া হয়নি। আমাদের ফ্যামিলি তো অনেক জেনারেশন এখানেই সেট্‌লড্।

আসল কথাটা চেপে যায়। তার মায়ের পূর্বপুরুষ চিটাগাঙের লোক, হ্যাঁ বাপের ঠাকুর্দা ছিলেন গোয়ান। কাজেই মাদামের ঠেস দেওয়া মন্তব্য— তা তো তোমার রঙ দেখেই বুঝতে পারছি, গায়ে মাখে না। মাদাম যেন নিজের মনেই বলে চলেন,

—তবে আমরাও অনেককাল আছি। কিন্তু দেশ যে গোয়া সেটা ভুলি না। বাবার আমলে ছুটিছাটায় প্রতি বছর যেতাম, থাকতাম। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর জ্যেঠামশায় জমিটমিগুলো কী যে করলেন। বাবা এখানে ব্যস্ত, আর দেখতে পারলেন না। ইন্ডিয়া গোয়া নিয়ে নেওয়ার পর এরনেস্টো মানে আমার স্বামীর ফ্যামিলিও বাড়িটাড়ি বেচে যে যেখানে পারে বাইরে চলে গেল। ব্যস সব কিছুই শেষ। সেই দেশ সেই সময়।

সিলিয়া মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। গোয়া তো ভারত রাষ্ট্রের একটা রাজ্য। অন্য দেশফেশ আবার কী।

—তোমাদের কাছে এই ক্যালকাটাই সব। ঘিঞ্জি গলি, বস্তি। ইংরেজরা নিজেরা যেখানে থাকত শুধু সেই অঞ্চলই ভাল। গোয়া কিন্তু মোটেই তা ছিল না। কল্পনাই করতে পারবে না। ইন্ডিয়ার মাটিতে একটুকরো ইউরোপ। মাণ্ডবী নদীর তীরে সব বাগানওয়ালা ভিলা। কী রাস্তাঘাট, দোকানপাট, চার্চ। গরিবদের বাড়ি ছোট, কিন্তু সুন্দর ঝকঝকে। ক্যালকাটার মত ময়লা ভাঙাচোরা চেহারা নয়। দেশ-বিদেশের লোক আসছে যাচ্ছে। লোকে বলত সোনালি গোয়া, গোল্ডেন গোয়া। পর্তুগিজ জানো একটু একটু? গোয়া ডৌরাডা। সকলে জানত গোয়া যে দেখেছে তার আর লিসবন দেখার দরকার নেই। তখন কোথায় ছিল

ক্যালকাটা? হুঁ! সুতো বেচার গঞ্জ মাত্র। ইংরেজদেরই বা কে চিনত? ইউরোপের এক কোণে একটা দ্বীপমাত্র সম্বল। আমরাই তখন সমস্ত ইস্টে দাপিয়ে বেড়াতাম।

—আমরা কারা ম্যাডাম? বিস্মিত সিলিয়ার প্রশ্ন।

—হাউ স্টুপিড! আমরা মানে পর্তুগিজরা। ইন্ডিয়ার ফার্স্ট ক্রিস্টিয়ান রুলার। ভাস্কো-ডা-গামা যেদিন কোচিনে পা রাখলেন সেদিন থেকে এদেশে মডার্ন সিভিলাইজেশন শুরু। কোচিন মালাবার। গোয়া দমন দিউ। বেংগলে সাতগাঁও, হুগলিতে কুঠি। চিটাগাং সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। তবে এদিকে বড় পাজি পর্তুগিজরা আসত। ডাকাত জলদস্যু। স্থানীয় মানুষজনদের ধরে নিয়ে দাসদাসী করে বেচত।

—কী সাঙ্ঘাতিক! কারা কিনত?

—কেন, সবাই। মুর সুলতান নবাব মনসবদারেরা, আমরা। ইন্ডিয়ায় চরে খাচ্ছে তখন কত জাত। ইস্পাহানি, তুর্কি, তুর্কমেনি, তাতার, আর্মেনিয়ান, উজবেক, আফগান। তাদের কাজের লোক দরকার। জেন্টু মানে হিন্দুরা তো স্বেচ্ছায় বিধর্মীর বাড়িতে কাজ করবে না। কাজেই বাধ্য করা ছাড়া উপায়? আর আমাদের তো বেশি দরকার। পর্তুগাল এই এতটুকু দেশ তার ওপর বহুদূর। সে সময় জার্নি কত রিস্কি। লেবারার নিজেদের দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া পোষায়? তাই দাসদাসী দিয়েই ঘরে বাইরে কাজ, চাষবাস, ব্যবসাবানিজ্য চলত। তার ওপর সকলেরই মেয়ে চাই। যারা দেশ জয় করতে আসে, যুদ্ধ করে, ব্যবসা করে, তারা তো স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে নিয়ে তখন ঘুরতে পারত না। অতএব এদেরই মধ্যে বেছেটেছে রক্ষিতা উপপত্নী। পর্তুগিজরা দেশীয় মেয়েদের বিয়েথাও করত। ইংরেজদের মত নেটিভ নিগারদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা পর্তুগিজ নীতি ছিল না। গোয়া ভর্তি মিক্সড ব্লাডের মেয়ে-পুরুষ।

তাই তোমার ফর্সারঙ মেম-মেম ঢঙ। মনে মনে বলে সিলিয়া। চট্টগ্রাম নামটায় খটকা লাগে। তার নিজের দিদিমা নাকি তার মা কার যেন দেশ ছিল চিটাগাং। এ সম্বন্ধে পরিস্কার কিছুই তার জানা নেই। একটা আবছা ধারণা আছে কয়েকশ বছর আগে কিছু পর্তুগিজ নাবিক রয়ে গিয়েছিল বাংলার প্রান্তে। ধীরে ধীরে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু নামগুলো রয়েছে।

ক'দিন যেতে না যেতেই বুঝল মিসেস ফুতার্দোর পর্তুগিজ ইতিহাস-কীর্তন নেহাত আপতিক নয়। বাৎসরিক তীর্থদর্শনের পালা আছে। অর্থাৎ গোয়াযাত্রা। তখন ট্যুরিস্ট সিজন এবং একমাত্র পাঁচতারা হোটেলটিতে একটি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন চলছে। তবুও বোধহয় বহু বছরের বাঁধা খদ্দের বলেই, মিসেস ফুতার্দোর ডাবলবেড ঘর একখানা জুটে গেল। হোটেলের মানদণ্ডে একেবারে ঝড়তি-পড়তি, সিলিয়ার কাছে দারুণ। অবশ্য মনিব-ভৃত্যের একই ঘরে বাস

ভারি অস্বস্তিকর। কিন্তু মিসেস ফুতার্দোর তাকে সর্বক্ষণ প্রয়োজন এবং দুটি ঘর নেওয়ার অতিরিক্ত খরচ তাঁর মোটেই কাম্য নয়। অতএব।

এই কি সেই সোনালি গোয়া? চারিদিকে তাকায় সিলিয়া। সত্যি এখনও কী সুন্দর। অপূর্ব হোটেলের বিরাট কমপ্লেক্সটি। মেইন বিল্ডিং, ছোট ছোট কটেজ, সুইমিং পুল, এখানে-ওখানে বাগান। সামনেই আরবসমুদ্র। শান্ত নীল জলরাশি ছুঁয়ে যায় হোটেলের নিজস্ব বেলাভূমি। নির্জন, আমজনতার নাগালের বাইরে। অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট। সিলিয়ারা বসে আছে এক নারকেল কুঞ্জে। মাটিতে মসৃণ ঘন সবুজ ঘাস। তার মধ্যে মধ্যে সমান দূরত্বে নারকেল গাছ, যাদের নাতিদীর্ঘ উচ্চতাও প্রায় সমান। স্পষ্টত মানবপ্রদত্ত। একটার ডালপালা ছুঁয়ে আছে অন্যটার ডাল। যৌবনপুষ্ট সবুজ পাতাগুলোর তেলালো গায়ে পিছলে পড়ছে সূর্যের আলো। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে আলোছায়ার খেলা। তারই ভিতর মাঝে মাঝে এমন সুখাসন। ডিসেম্বর মাস হলেও এখানে না ঠাণ্ডা না গরম। চিরবসন্তের দেশ।

উর্দিপরা বেয়ারা এক হাতে ট্রেতে পাতিলেবুর একফালা চাকা লাগানো জলের মত পানীয় ভর্তি দুটি গেলাস, অন্যহাতে ধরা ছোট টিপয়টি মাটিতে রেখে তার ওপর বসাতে বসাতে মিসেস ফুতার্দোকে বলল,---মাদাম আপনার ওয়েলকাম ড্রিংক।

---থ্যাংক ইউ গোমেস। তারপর কেমন আছ?

---ফাইন ম্যাম। সো কাইন্ড অফ ইউ। আপনি ভাল আছেন?

---হুঁ। এই যে আমার নতুন সেক্রেটারি মিস সিলিয়া। ওর জন্য ড্রিংক এনেছ তো? বাঃ ভেরি গুড।

---আপনারা এনজয় করুন। আমি আধঘন্টা বাদে আর এক রাউন্ড দিয়ে যাব। মাথা হেলিয়ে মৃদু হেসে সম্মতি জানান এমিলি। সিলিয়া অত্যন্ত বিব্রত। পিতার অতিরিক্ত সুরাসক্তি এবং মায়ের ঘোর মদ্যপান বিরোধিতার প্রতিনিয়ত তিক্ত সঙ্ঘর্ষে তারা দুই বোন মানুষ হয়েছে। বেয়ারা চলে যেতে বলে,—মাদাম আমি কিন্তু এসব খাই না।

—কেন এসব কি বিষ নাকি? আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই, আমাদের ধর্মে তো বারণ নয়। হ্যাঁ অতিরিক্ত খাওয়া ক্ষতিকর। তাছাড়া এটা কী জান? কাজু ফেনি। কোথায় ট্রপিক্যাল আমেরিকার কাজু বাদাম, কাজু আপেল। পর্তুগিজরা এনে পুঁতল এ দেশের মাটিতে। সুরা তৈরির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তৈরি করল এই মদ। কলোনি মানেই মেশামেশি। খাও খাও। আমি এ বয়সে খেতে পারি আর তুমি পারবে না। নাও তোল দেখি মুখে। একটু চুমুক দাও। চিয়ার্স। টু গোল্ডেন গোয়া, আওয়ার হোম।

—চিয়ার্স। ভয়ে ভয়ে সিলিয়া ছোট্ট একটু চুমুক দেয়। চাকরির খাতিরে কী না করতে হয়। স্বাদটা খারাপ নয়, কিন্তু কী তীব্র গন্ধ।

—এক্সকিউজ মি, আমি কি এই চেয়ারটা সরিয়ে নিতে পারি? একপাশে যেন মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে এক পাক্কা সাহেব। মাঝবয়সী, সুদর্শন, হালকা হয়ে আসা একমাথা সোনালি চুল। মুখে স্মিত ভদ্রতা।

—অফ কোর্স। তবে বসতে চান নাকি? তা আমাদের সঙ্গেই বসুন না। আমরা দুজন মেয়ে। ভারি একা-একা লাগছিল। একজন হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান তো মোস্ট ওয়েলকাম কোম্পানি। খিল খিল করে তরুণীকণ্ঠে হেসে ওঠেন মিসেস ফুতার্দো।

সিলিয়া তো থ। বুড়ির হল কী। মাথাটা বোধহয় একেবারে গেল। মাটির গুণ কিনা কে জানে, গোয়াতে পা ফেলেই মিসেস ফুতার্দো বছর পঞ্চাশেক বয়স যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। হোটেলের ওই মোটা রিসেপশনিস্টই বা কি। কাউন্টারের সামনে বুড়িকে দেখেই বলে কিনা,

—ম্যাম, আপনাকে কী ওয়ান্ডারফুল দেখাচ্ছে। আপনি ঠিক তেমনি বিউটিফুল আর গ্রেসফুল আছেন যেমনটি ছিলেন আমি যখন প্রথম আপনাকে দেখি। আমি তিরিশ বছর ধরে প্রতি সিজনে আপনাকে রিসিভ করি। আপনি ঠিক যেই-কে সেই আছেন। সময়কে আপনি হার মানিয়েছেন।

সিলিয়া তো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। অবাক চোখে দেখে ওই বদমেজাজি খুঁতখুঁতে বুড়ি হাতের জালি পাখাটা দিয়ে ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোকের ফোলাফোলা গালে আলতো টোকা মেরে উত্তর দিলেন,

—ভারি দুষ্টু ছেলে। খালি মিছিমিছি প্রশংসা করে মেয়েদের মন কাড়ার মতলব।

তখন থেকে সিলিয়া বুঝেছে গোয়ার আকাশে বাতাসে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে যাদু। নইলে এমন হাস্যকর দৃশ্য দেখেও রিসেপশনের সামনে দাঁড়ানো ওপর দুজন অতিথির মুখে কোনও ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না কেন? বরং ওই গৌরবর্ণ কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণচক্ষু দীর্ঘ নাসিকা তরুণ দুটির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীরই রয়ে গেল। যেন তাদের চোখে কিছুই পড়েনি, কানে কিছুই যায়নি। মার্কিনি উচ্চারণে নিজেদের ঘরের চাবি চাইল। সিলিয়া আড়চোখে দেখে নম্বর। তাদের পাশের ঘরটাই। আচ্ছা ওরা কোন দেশী? ইংরেজি উচ্চারণে তো মনে হয় মার্কিনি। সন্দেহ যায় না সিলিয়ার।

কিন্তু তার সামনে বসা এই ভদ্রলোকটি নিঃসন্দেহে সাহেব, তাঁর সোনালি চুল নীলচে চোখেই সাহেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। একহারা চেহারা, চোখে শেল ফ্রেমের চশমা। বসে পড়ে যথারীতি পারস্পরিক পরিচয় বিনিময়। উনি র‍্যাল্‌ফ

নিউবেরি, সামুদ্রিক যান বিশেষজ্ঞ, এখানে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য আগমন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে বাড়ি। বেশিরভাগ বক্তার মত তাঁরও বক্তব্য পেশ করা হয়ে গেছে। এবারে একটু অবসর। এমিলি নিজের ও সিলিয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন তাঁরা গোয়ান।

—হাউ ইন্টেরেস্টিং! তার মানে আপনারা এখানকারই লোক? গোয়ার? আমার ধারণা ছিল এটা বুঝি ট্যুরিস্টদেরই রেসর্ট। বেশিরভাগ অতিথি তো বাইরের, তাই না?

—উনি ঠিকই বলছেন ম্যাম। এই তো আমরা রিসেপশনে যে দুজন ভদ্রলোককে দেখলাম ওঁরা তো বোধহয় আমেরিকান। কথা শুনে মনে হল।

—দূর। তুমি এখনও মানুষ চিনলে না। ওরা নির্ঘাত মিডল ইস্টের। পরিষ্কার আরব চেহারা। ইউ এস এ-তে গিয়ে ইংরেজিটা মার্কিনি করেছে। এমিলি শুধরে দেন সিলিয়াকে।

—তা গোয়ার কোনদিকে আপনাদের বাড়ি? নবপরিচিত র‍্যাল্ফ নিউবেরির প্রশ্ন।

—আসলে এখানে আমাদের বাড়ি আর নেই। আমাদের পরিবার অনেকদিন ধরে গোয়া ছেড়ে ক্যালকাটাতে সেট্‌লড। পর্তুগাল শুধু স্মৃতিতেই। স্বীকার করেন এমিলি।

—অর্থাৎ এক হিসেবে আমরাও আপনারই মত বাইরের লোক। সিলিয়া যোগ করে। তারও মুখ খুলে গেছে। গোয়ার হাওয়া নাকি কাজু ফেনির কেরামতি।

—অতীতের কথা যদি বলেন তো দেখবেন আমরা কে যে কোথা থেকে এসেছি তার ঠিক নেই। জানেন নিশ্চয় মার্কিনমুলুকে সকলেই প্রায় এমিগ্র্যান্টদের বংশধর? আমার পূর্বপুরুষই তো ইংল্যান্ড থেকে গিয়েছিলেন। ইনফ্যাক্ট আমাদের বংশে দূরদেশ যাত্রার প্রায় ট্র্যাডিশনই আছে বলতে পারেন। ইন্ডিয়াতেও এসেছেন আমার পূর্বপুরুষ, এমনকি এই গোয়াতেই।

—তাই নাকি! মাস্ট বি আ মারভেলাস স্টোরি। সোৎসাহে বলেন এমিলি।

—ওটা আজ একরকম পারিবারিক কিংবদন্তী বলতে পারেন। অবশ্য একেবারে আজগুবি নয়। বংশলতিকা এখনও রাখা আছে। ষোড়শ শতকে আমার পূর্বপুরুষ, তার নাম ছিল র‍্যাল্ফ ফিচ, ইন্ডিয়া বর্মা মালয় ভ্রমণ করে একটা বিবরণ লেখেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পত্তনের সময় নাকি ওই লেখাটা কাজে লেগেছিল।

—বটে! তার মানে আপনার পূর্বপুরুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত তৈরির সুলুকসন্ধানটি জুগিয়েছিলেন। এমিলির ইংরেজবিরাগ চাগিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, সব নষ্টের মূলে। হেসে স্বীকার করেন র‍্যাল্ফ।

—তবে তাঁর চেয়ে আপনার যে পূর্বপুরুষ আমেরিকা গিয়েছিলেন তিনি বেশি সফল। আপনারা এখনও উত্তর আমেরিকা কব্জা করে রেখেছেন। স্প্যানিশ পর্তুগিজরা যেমন রেখেছে দক্ষিণ আমেরিকা। ইংরেজরা তো এদেশ থেকে বিতাড়িত। এমিলি র‍্যাল্‌ফের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যের কথা ভাবছেন নাকি?

—ওসব ভয়ঙ্কর কথা তুলবেন না। জানেন তো আমরা মার্কিনিরা সবচেয়ে জোরগলায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করি। আপনার মতো পর্তুগিজ বংশধররাও দক্ষিণ আমেরিকায় এই ভঙ্গি নিয়েছেন। তাঁরা আর নিজেদের পর্তুগিজ বলেন না।

সিলিয়া শুনতে শুনতে বোরড্‌। প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা সেই র‍্যাল্‌ফ ফিচের ভ্রমণকাহিনী আপনি পড়েছেন?

—হ্যাঁ, পড়েছি। বড্ড নীরস। উনি তো ব্যবসাদার ছিলেন। এসেছিলেন ইস্টে পর্তুগিজদের সঙ্গে কীভাবে পাল্লা দেওয়া যায় তারই উপায় খুঁজতে। ওই মাদাম যা বললেন সাম্রাজ্যের না হলেও বাণিজ্যের ভিত তৈরির সুলুকসন্ধান। তবে ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু কাহিনীর আভাস মেলে। যেমন গোয়া নিয়ে একটা। হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক উইথ মি ম্যাম, সামনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে, হাতে ট্রেতে পানীয়ের সরঞ্জাম। এমিলির সানন্দ সম্মতি। সিলিয়ার সনির্বন্ধ প্রত্যাখ্যান অগ্রাহ্য করে তার হাতে আরেকটি গেলাস ধরিয়ে দিয়ে এঁরা দুজনে গোয়ার বৃত্তান্তে মাতলেন।

এরমধ্যে কাজু ফেনিতে অনভ্যস্ত সিলিয়ার গেলাসে চুমুক দিতে দিতে মাথাটা কেমন হালকা হালকা লাগছে। চারিদিকে সবই খুব ভাল, এই দুপুরটা নারকেলবীথির আলোছায়া, সুদর্শন পুরুষের কথাবার্তা এমিলির তরুণীসুলভ হাস্যকৌতুক। শুনতে শুনতে কেমন যেন নিজেকে অনেক দূরে মনে হতে লাগল। সব কিছু এই নীল আকাশ সুবজ ঘাসে ঢাকা মাটি, মৃদু হাওয়া। সেই কবেকার গল্পকথা। তখন পর্তুগিজরা এদেশে দাপট দেখাচ্ছে। কোথাও রাজা, কোথাও জলদস্যু। যন্ত্রচালিতের মত সে শুধু পান করে যায় কাজু ফেনি। সব ঝাপসা লাগে। আরও গেলাস আসে।

সিলিয়ার সামনে এক অন্ধকার পর্দা। সেখানে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে একটা দৃশ্য। এখানেও সব সবুজ, প্রকৃতির অবিমিশ্র সৃষ্টির আনন্দের রূপ সবুজ, যার ফাঁকে ফাঁকে অন্য রঙের উঁকিঝুঁকি। সোনালু গামার কাঠগোলাপ বনকরবীর ছড়াছড়ি। দূরে করেলডাঙা পাহাড়। দিগন্তপ্রসারী সমতলভূমিতে নানা ফসলের চাষ, স্বর্ণপ্রসূ উর্বরতা। এরপরে গ্রামের সীমানায় আম জাম সুপারি নারকেল গাছের সমারোহ। অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় এসে ঢুকছে কর্ণফুলির উথালপাথাল জল। রাতের অন্ধকারে তাদের একটিতে আসছে ছোট ছোট

গ্যালিজ নৌকা। প্রত্যেকটিতে কয়েকটা ফিরিঙ্গি। তারা ডেরা বেঁধেছে চট্টগ্রাম শহরের উল্টোদিকে আরাকান রাজ্যের দিয়াংগায়। কেন আসছে তারা এমন নিঃশব্দে? গাঁয়ের সীমানায় কোনও মানুষজন নেই। সূর্যাস্তের সঙ্গে তাদের নিদ্রা, সূর্যোদয়ে জাগরণ। কিন্তু না, আজ রাতে কিছু গ্রামবাসী জেগে। গ্রামের মধ্যে একটা বাড়ির আঙিনায় জড়ো তারা। ভিড় ছাপিয়ে পড়েছে দাওয়ায়, পথে। আলো জ্বলছে, শাঁখ বাজছে, শোনা যায় থেকে থেকে উলুধ্বনি। বিয়ের আসরে ষোল বছরের কিশোর বর আর দশ বছরের খালি গায়ে চেলিপরা কনে শিলাবতী। সবাই হাসছে। আনন্দ করছে, কেমন মানানসই বরকনে হয়েছে। এমন সময় হঠাৎ চিৎকার, পালাও পালাও বোম্বেটে বোম্বেটে হারমাদ। কান্না চেঁচামেচি হট্টগোল বিশৃঙ্খলা। ফিরিঙ্গি বন্দুকের ফাঁকা ক'টা আওয়াজ হতে না হতে যে পারল পালাল অন্ধকারে। যারা পালাতে পারল না তারা ধরা পড়ল ফিরিঙ্গিদের হাতে। পরদিন সকাল হতে ফিরিঙ্গিরা বুড়োবুড়িদের নিলামে চড়াল, জোয়ান পুত্ররা যারা পালিয়েছিল তারা ফিরে এসে যথাসর্বস্ব দিয়ে বাবা-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে মুক্ত করল। কিন্তু বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরীদের বেলা কোনও ছাড়ান-ছোড়ান নেই। বরকনে-সহ তাদের বেঁধে তোলা হল গ্যালিজে। আকাশ বাতাস জুড়ে আর্তনাদ। গলা চিরে রক্ত উঠল। একদিকে বাবা-মা কাঁদছে মাথা ঠুকছে, অন্যদিকে কাঁদছে ফিরিঙ্গিদের হাতে বাঁধা ছেলেমেয়েরা। কর্ণফুলিতে পৌঁছে সবাইকে এক এক করে জাহাজের খোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল বোম্বেটের দল।

সিলিয়ার চোখের সামনে পর্দাটা শূন্য হয়ে যায়। কালো। আবার ভেসে ওঠে রঙিন দৃশ্য। শান্ত এক দৃশ্য, ধীরে বয়ে চলেছে মাণ্ডবী নদী। তার তীরে এক প্রান্তে ভিলা, বিশাল বাগান। সেখানে কাজ করছে কত মানুষজন। মাটিতে ফলেছে সব নতুন নতুন সবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, গোল আলু, টমেটো। কোথাও বা আনারস, পেঁপে। আবার দেশি ফলফুলুরিও আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা। আর আছে ধুতরো। কী হয় ধুতরোয়? পাশে একতলা শেডে তাঁত চলছে, আরেকটায় ছোপানো হচ্ছে কাপড়। এক লম্বা পাতলা মেমসাহেব ঘুরে ঘুরে তদারক করছেন। এখন এসে ঢুকলেন ভিলায়।

—শিলা শিলা, কোথায় গেলি। সেনিওরা এবারে রেডি হবেন।

বছর চোদ্দর একটি কিশোরী দ্রুতপদে এগিয়ে আসে। পরনে সেলাইকরা ফিরিঙ্গি জামা। এ কি সেই শিলাবতী? একটু লম্বা, একটু পুষ্ট, কৈশোরের লাবণ্যে সমৃদ্ধ। তাড়াতাড়ি সেনিওরার প্রসাধনের সরঞ্জাম হাতের কাছে জোগাতে থাকে। পাশে দাঁড়িয়ে আদেশ দিচ্ছে খাস দাসী মারিয়া।

সেনিওরা আমেলিয়া চলছেন গির্জায়। পিছনে একঝাঁক দাসী। পরনে পুরো হাতা পা-ছোঁয়া লম্বা রূপালি ব্রোকেডের পোশাক। গলায় হাতে লেসের কুঁচি। হাতের চারটে চারটে আটটা আঙুলে হীরে-চুনি-পান্না-মুক্তোর ঝিলিক। গলায় সোনার লম্বা চেনে রত্ন খচিত ক্রুশ—গির্জা স্পেশাল। মাথায় ঘন বাদামি চুলের চুড়ো করা খোঁপা। তার ওপর দিয়ে গ্রীবার দুদিক ঘেঁষে পা পর্যন্ত ছড়ানো স্বচ্ছ কালো ক্রেপের ওড়না। তাতে ঢাকা পড়ে গেছে মুখোশের মত রঙ করা মুখ। দাসী বয়ে নিয়ে চলেছে সেনিওরার উপাসনার উপকরণ। কারও হাতে ছোট্ট কার্পেট। কারও বা দামি কারুকার্যখচিত তাকিয়া, তৃতীয়ের কাছে ভেলভেটের বাক্সে রাখা বাইবেল। আর শিলার হেপাজতে তাঁর সাধের হাতির দাঁতের হাতপাখাটি। কারণ শিলা তাঁর পেয়ারের দাসী। আমেলিয়ার মায়ের দেশ ছিল নাকি চট্টগ্রাম— অন্য দাসীদের কানাঘুসা। গির্জার জানালায় কাচের বদলে লাগানো ঝিনুকের আস্তরণ। সূর্যের কিরণ যেন নরম সমুদ্রতলের আবছা আলো। সেই আলোতে শিলা দেখে একেবারে পেছনে এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে এক নতুন মুখ। সোনালি চুল নীল চোখ গোরা। পরনে পোশাক যেমন-তেমন, হাবভাবে শ্রান্তি। মুখখানা বড় নরম। যেন ভুলে-যাওয়া এক মাথায় টোপর কিশোরের মুখের আদল আসে। শুধু শিলা নয়, সেনিওরাও দেখছেন আড়চোখে। হাতের বাইবেলে চোখ রেখে পাশে মারিয়াকে ফিসফিস করে কী বললেন। গির্জা থেকে বেরুবার সময় সেনিওরা উঠলেন পাল্কিতে, অন্যরা চলল পিছন পিছন। আর শিলার হাত থেকে পাখাটা নিয়ে মারিয়া কানে কানে বলল,

—চুপচাপ ওই নতুন গোরাটার পিছু পিছু যা। দেখে আয় কোথায় আস্তানা, কী করে।

সিলিয়া যায়। আগে যেমন অনেকবার অন্য গোরার পিছু গেছে। দেখে 'রুয়া ডিরেইটা'য় জমজমাট বাজারের মধ্যে নতুন একটা দোকান দিয়েছে এই নব্য অতিথি। তার সঙ্গী আরও দুটি গোরা চাকর একটা ছোঁড়া ওলন্দাজ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে এই গোরাই দলের নেতা। তত্ত্বতালাস সেরে যথারীতি দাসীদের জন্য নির্দিষ্ট খিড়কি দরজা দিয়ে ভিলায় ফেরে। নির্বিঘ্নে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে, যেমন সেনিওরার অনুরূপ আদেশ বহুবার পালন করেছে। মারিয়াকে খবরাখবর জানায়। পরদিন সকালে মারিয়া তাকে একান্তে ডেকে বলে,

—শোন্ রুয়া ডিরেইটায় গিয়ে গোরাকে বলে আয় সেনিওরা ওর কাছ থেকে সওদা করতে চান। না, না, ও নিজে যেন না আসে। বলবি তুই সন্ধেবেলা গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। সব সেরা জিনিস যেন আনে, সেনিওরাকে খুশি করা সহজ নয়। ভাল করে সমঝে দিবি। নিজেও যেন

সেজেগুজে আসে। মুচকি হেসে মারিয়া অসভ্য পুরুষের মত চোখ মারে। সত্যি মারিয়াটা একেবারে আধামরদ।

আজ রাস্তায় বেরিয়ে শিলা দেখে লোকে লোকারণ্য। স্বয়ং ভাইসরয় চলেছেন, সঙ্গে পার্শ্বচরেরা। কী দারুণ সব পোশাক-আশাক সাজসজ্জা রত্নালঙ্কার। প্রত্যেকের পিছনে লম্বা ডান্ডিতে ছাতা ধরে একজন করে দাস আর একাধিক বিশালাকৃতি কাফ্রি দেহরক্ষী। প্রত্যেকটি ঘোড়ার পিছনে মুর সহিস চামর হাতে ঘোড়ার ল্যাজে মাছি তাড়াচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে লোক। বলাবলি করছে 'মাণ্ডবীর তীর মাণ্ডবীর তীর'। শিলার প্রশ্নের উত্তরে একজন জানাল 'আজ শাস্তিদান হবে'।

—কীসের জন্য শাস্তি? শিলার কৌতূহল মেটেনি। উত্তরদাতা ধৈর্য হারায়।

—কী বোকা মেয়ে। গোয়াসুদ্ধ লোক জানে ধর্মদ্রোহীদের বিচার করে শাস্তির কথা।

—ধর্মদ্রোহী মানে? শিলার প্রশ্নে এবারে উত্তরদাতা ক্রুদ্ধ।

—তুমি কেমন গোয়ান? খ্রিস্টান নও? জেন্টু নাকি?

—না, না, আমি খ্রিস্টান, হিন্দু নই। তাড়াতাড়ি পোশাকের মধ্যে থেকে কালো সুতোয় ঝোলানো দস্তার সস্তা ক্রুশটি বের করে দেখায়। পাশে আর একজন বয়স্ক পুরুষ ব্যাখ্যা করেন।

—আরে ছেলেমানুষ তাই জানে না। শোন বাছা, আমাদের একটা মহাসভা আছে, তার নাম রোমান ক্যাথলিক চার্চ। তার প্রধান মহামান্য পোপ। আমাদের ধর্মাচরণ তাঁর এবং সঙ্ঘের নির্দেশে। সে নির্দেশ কারও অমান্য করার জো নেই। যারা সঙ্ঘের আদেশ সমালোচনা করার স্পর্ধা দেখায়, তারা ধর্মদ্রোহী। তাদের বিচার হয় এবং পাপ অনুযায়ী দণ্ড। ওই দেখ নিয়ে আসা হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের।

শিলা দেখে মিছিলের মাঝখানে চারজন পুরুষ। প্রত্যেকের পরনে সাদা-কালো ডোরাকাটা আলখাল্লা। তার ওপর ছাইরঙা খাটো জামা, তাতে আঁকা শয়তান, তার চারিদিকে আগুনের শিখা। প্রত্যেকের মাথায় গাধার টুপি। তাতেও শয়তান আর আগুন। একজন তো শিলার জানা, বুয়া ডিরেইটারই ধনী ইহুদি ব্যবসায়ী। বাকিদেরও গোয়ান বলেই মনে হল।

—এদের কী শাস্তি হবে? শিলা জিজ্ঞাসা করে।

—ধর্মের বিরুদ্ধে ট্যাঁ-ফোঁ করলে যা হওয়া উচিত। প্রথম উত্তরদাতার সহাস্য উত্তর।

—চার্চ সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময়। রক্তপাতের অনুমতি নেই। এ পাশের বৃদ্ধ খবর দেন।

—ধানাই-পানাই রাখ তো। কচি মেয়েটাকে গ্যাস দিচ্ছ। সব বেটাকে শূলে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে। বেঁচে থাকতেই নরকের আগুন ভোগ। হা হা হা।

অন্য পথচারীদের দেখাদেখি শিলাও ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। মনে মনে বলে মা কালী রক্ষা কর। ভিড় কাটিয়ে গোরার দোকানের দিকে এগোয়।

পর্দা আবার অন্ধকার। আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে জ্যোৎস্না ভরা বারান্দা। সামনে ঘরের দরজা। ভারি সিল্কের পর্দার ফাঁক দিয়ে পড়েছে একফালি চাঁদের আলো। দরজার পাশে শিলা ও মারিয়া পাহারাদার। দেখতে পাচ্ছে ঘরের ভিতরের দৃশ্য। কোণে রাখা রুপোর বিরাট শাখাপ্রশাখাওয়ালা বাতিদানে জ্বলছে একরাশ মোমবাতি। তার নরম উজ্জ্বল আলোয় চলছে গোরা বণিক আর সেনিওরা আমেলিয়ার বিকিকিনি। আর আলাপ। সেনিওরা শুনলেন বণিকের দেশ ইংল্যান্ড, যেখানে শুধু পাওয়া যায় পশম। যাত্রাপথে তাই বেচে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সে এনেছে পাথর বসানো রুপোর কাঁটাচামচ, সোনার জল করা রকমারি পাত্র, মণিমুক্তো গাঁথা সোনার ব্রুচ। সেনিওরার চোখেমুখে অপরিতৃপ্ত বাসনা— শিলা ও মারিয়ার বহুবার দেখা পরিচিত ছবি। লীলায়িত ভঙ্গিতে এগিয়ে দিচ্ছেন খাদ্যপানীয়, সওদার জন্য চিন্তা কী, তিনি একাই সব কিনে নেবেন। এবারে গা এলিয়ে দিলেন ফরাসি ঢঙের আধশোয়া লম্বা কেদারায়। ভীতসন্ত্রস্ত বিদেশি।

—সেনিওরা আমি ইংরেজ। আমাদের দেশ একটা নগণ্য দ্বীপ, ছোট্ট রাজ্য। কিন্তু আমাদের রানীর পিতা স্বর্গত অষ্টম হেনরি ক্যাথলিক মহাসভার বিরুদ্ধে, মহামান্য পোপের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সেই থেকে আমরা ইংরেজরা অন্য খ্রিস্টানদের চোখে ধর্মদ্রোহী। বিশেষত পর্তুগাল, স্পেন যারা বাঘা বাঘা ক্যাথলিক দেশ, তারা তো আমাদের শাস্তির যোগ্য মনে করে।

—করুক না। আমাদের কী। আমরা গোয়ান, ইন্ডিয়ায় এক টুকরো ইউরোপ। পর্তুগাল এখান থেকে বহুদূর। ওসব কিছু ভয় নেই এখানে। গোয়া থেকে দু'পা গেলেই সব জেন্টু আর মুর, মানে হিন্দু আর মুসলমান। তোমার কোনও ভয় নেই। ভাল করে দেখ তো। আমাকে তোমার সুন্দর মনে হয়? তোমার এই ব্রুচটা আমাকে পরিয়ে দাও না।

গোরা কাঁপা-কাঁপা হাতে সেনিওরার উদ্ধত বক্ষে পান্নাখচিত গহনাটি লাগাতে লাগাতে বলে, —আপনি এত সুন্দর। এত দয়ালু, এত ধনী। কিন্তু আমি এরকমভাবে এখানে বেশিক্ষণ থাকলে বিপদে পড়ে যাব।

সেনিওরা গোরার হাতে হাত বোলাতে থাকেন। অন্য হাতে তার সোনালি চুলের থোকা মুঠোতে নিয়ে বলেন, —আঃ যেন সোনালি আঙুরের গুচ্ছ। গোরা তার দু'হাত ধরে ফেলে।

—সেনিওরা, আমি ওরমুজ বন্দর থেকেই পর্তুগিজদের হাতে বন্দী। এখানে এসেছি বন্দী হয়ে। আমার বেশিরভাগ মালও বাজেয়াপ্ত। সালাম ভাস ব্রাগাসের কারাগারে রাখা হয়েছিল আমাকে। ওই যে ভাইসরয়ের প্রাসাদের পাশেই। ফাদার টমাস স্টিফেন, যিনি সেদিন চার্চে প্রার্থনা পরিচালনা করেছিলেন, তিনি ইংরেজ। জানেন তো? ক্যাথলিক বলে তিনি ইংল্যান্ড থেকে তাড়া খেয়ে পর্তুগালের অধীন গোয়ায় পালিয়ে এসেছেন। আমি ওঁর দেশের লোক, ইংরেজ। সেই সুবাদে নেহাত দয়া করে বলে-কয়ে দু হাজার ডুকাটের জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খালাস করিয়েছেন মোটা অর্থের বিনিময়ে আমার সওদাগুলো। এখন দোকানে মাল বেচে আমাকে ওঁর ধার শোধ করতে হবে, নইলে—

—তোমরা ইংরেজরা খালি ব্যবসার কথা বল। সেনিওরা তাঁর তর্জনী রাখেন গোরার ওষ্ঠাধারে। ফুঁ দিয়ে একে একে নিভিয়ে দেন মোমবাতিগুলো।

বাইরের দরজার পাশে মেঝেতে বসা শিলা আর মারিয়া শোনে তাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস। প্রিয় সম্বোধন, আশ্লেষের অস্ফুট উক্তি। যেমন শুনেছে কতবার। কত নবীন পুরুষ ও সেনিওরার সংসর্গের পাহারাদার আর সাক্ষী তারা। কিন্তু আজ শিলার দেহমন উচাটন। গোড়ার নরম নরম মুখে সেই কার যেন আদল আসে। না, তার তো সোনালি চুল নীল চোখ ছিল না। শুভদৃষ্টির এক ঝলকেও দেখেছে বাদামি কালো চোখের তারা, কালো চুল। তবু। কোথায় যেন মিল। শুনতে পায় বন্দুকের আওয়াজ, মানুষের আর্ত চিৎকার। ফিরে আসে আজ সকালের দৃশ্যে। সেই ভয়ঙ্কর শোভাযাত্রা। চলেছে বধ্যভূমিতে। মৃত্যু আর কামনা, কামনা আর মৃত্যু। তার নিজের শরীরের কোন সংগোপনে তার সাড়া। মারিয়া কখন তার কাছে ঘেঁষে এসে পোশাকের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে তার পা দুটোয় হাত বোলাচ্ছে, ওপরের দিকে উঠছে হাত, জঙ্ঘা ছাড়িয়ে উরু। তার হাতটাও মারিয়া নিয়ে নেয় নিজের স্কার্টের তলায়। ফিসফিস করে কথা বলে।

—সব মজা কি শুধু মালিক-মালকিনের। সেনিওরের তো গোয়ার পাড়ায় পাড়ায় রক্ষিতা, প্রতিটি রাত কারও না কারও ঘরে। সেনিওরা নিজের জন্য যখনই পারেন এমনটি জোটান। আর আমাদের বেলায় শুধু এদের সেবা আর যিশুর নামকীর্তন! তুই আমি কি শুকনো কাঠ না ঠান্ডা পাথর। আয় কাছে আয়।

অভিজ্ঞ মারিয়ার আঙুল শিলার সুখের উৎসটিতে। চোখ আপনাআপনি বুজে যায় শিলার। তার সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরায় এক অদ্ভুত উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। এ কি মারিয়া না সোনালি চুল নীল চোখ সেই গোরা যার মুখে কোনও হারিয়ে যাওয়া এক টোপরপরা কিশোরের আদল। এত সুখ এত সুখ।

ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজনে। সেনিওরার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসে। চাঁদ ঢলে পড়েছে। রাত প্রায় শেষ। গোরাকে সাবধানে বাগানের মধ্যে দিয়ে খিড়কি দরজায় নিয়ে যায় শিলা। খুলেই সামনে রাস্তা। আর একবার বুঝিয়ে দেয় কোন দিক দিয়ে গেলে পৌঁছবে আস্তানায়।

তার পরের রাত, আরও কটা রাত। একবার দরজা দিয়ে তাকে বের করে দিয়ে ফিরে আসার সময় কেমন অস্বস্তি লাগল শিলার। মনে হল দুটো চোখ যেন তাদের দেখেছে। সমানে পিছু পিছু আসছে। ওই বোধহয় স্যাঁৎ করে সরে গেল একটা ছায়া ঝোপের আড়ালে। গলা শুকিয়ে কাঠ শিলার, বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। মারিয়াকে বলে। গম্ভীর হয়ে যায় মারিয়া।

—সেরেছে। নির্ঘাত ব্যাটা কার্ভালো। আমাদের ওপর নজর রাখাই তো ওর কাজ।। সাবধানে থাকিস। শোন্ যদি ধরে ফেলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তো উত্তর দিবি না, বুঝলি। সেনিওরার গোপন কথা ফাঁস করলে মরবি। দুজনের হাতেই মরণ।

ভয়ে দুজনেই তটস্থ। সত্যি কথা বলতে কি ওই ম্যানেজার কার্ভালোকে কেউ দেখতে পারে না। রঙটা সাহেবের মত হলে কী হবে। সরু গোঁফ, শক্ত চিবুক, হাতে চাবুক ঘন কালো সরু সরু চোখ দুটো ঠিক যেন সাপের মতো। সকলেই জানে সেনিওরের কুত্তা, এস্টেটের টিকটিকি। অন্দমহলের নজবদার এবং প্রভুর যাবতীয় দুষ্কর্মে ডান হাত।

আবার সিলিয়ার সামনে পর্দা অন্ধকার। হঠাৎ যেন ছবি ফুটে উঠল। ভোজনকক্ষ, আলো জ্বলছে বাতিদানে, টেবিলে রুপোর পাত্রে সারি সারি পদ। আজ হঠাৎ সেনিওর ডম আন্তোনিওর গৃহে রাত্রিবাস। সেনিওরা সেজেগুজে স্বামী সম্ভাষণে ব্যস্ত। সেনিওর হাতের রুপোর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলেন,—এ ক'দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম। জানো তো গোয়া জুড়ে এখানে ওখানে জমি, চাষাবাদ, বাগিচা। সব তো দেখতে হয়। তুমি কী করছিলে আমেলিয়া?

—কী আর করব? তুমি না থাকলে কি আমার কাজ থাকে না? এই এত বড় ভিলাটা ঝেড়েমুছে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা কবে তুমি আসবে তার প্রতীক্ষায়। তাছাড়া এখানেই কি কম জমি? বাগিচা আছে, তাঁত আছে। আমাকেই দেখতে হয়। সব সম্পত্তি, সব উপার্জনই তো তোমার। আমিও। তাই না? তোমার বাগিচার মতই একটা সম্পত্তি। সেনিওরা নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখেন।

—বটেই তো। ঠিক বলেছ। একেবারে আদর্শ পত্নী। গোয়াতেই তোমার মত স্ত্রী হয়, পর্তুগালে স্ত্রীরা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, নাচে-গায়, আত্মীয়স্বজন

সখীদের নিয়ে মত্ত থাকে। তা কেনাকাটা কিছু করলে নাকি? শুনছি রুয়া ডিরেইটায় ইংরেজ বণিকরা একটা নতুন দোকান দিয়েছে। জানো নাকি?

—না। আমি কী করে জানব? এক গির্জায় যাওয়া ছাড়া আমার কি বাড়ি থেকে বেরুবার হুকুম আছে? এটা তো পর্তুগাল নয় যে খ্রিস্টান নারীর মত স্বাধীন চলাফেরা করব। এটা তো গোয়া। হিন্দুস্থান। চারিপাশে মুর। থাকি মুরদের হারেমে জেনানার মত বন্দী।

—তা তো থাকতেই হবে। গোয়া তো ইউরোপে নয়। আর হিন্দুস্থানের বাদশা স্বয়ং মুর। এখানে কয়েকশ বছর ধরে মুরদের শাসন। একটু ওদের মতো চলতেই হবে। তবে ভেবো না। স্পেন থেকে মুরদের তাড়িয়েছে। আমরাও হিন্দুস্থান থেকে ওদের তাড়াব।

—আর যদি ওরাই আমাদের তাড়িয়ে দেয়? সেনিওরার নিরীহ প্রশ্ন।

—ওসব বাজে কথা বলো না। আজ মনটা বড় ভাল। দেখো তোমার জন্য কী এনেছি। সামনেই একটা কালো ভেলভেটের বাক্স রাখা ছিল। সেটি হাতে নিয়ে খুলে সেনিওর বললেন,—এটা নাকি মুর জেনানাদের ভারি প্রিয় গয়না।

সেনিওরার মুগ্ধ চোখের সামনে মেলা কালো ভেলভেটের ওপরে শোওয়া তিন লহর মুক্তোর মালা। প্রতিটির মাঝখানে ছোট্ট ছোট্ট লকেট। পান্নার চারিদিকে হীরে।

—অপূর্ব! কী ভাল স্বামী তুমি। সেনিওরা ডম আন্তোনিওর ঘন কালো চুল, কালো চোখের পাতায় চুমু খেতে লাগলেন। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট আনতেই সেনিওর বাধা দিলেন।

—মন কেন ভালো আগে শুনবে তো। ধর্মন্যায়ালয়ের দপ্তরে গিয়েছিলাম। খবর দিয়ে এলাম রুয়া ডিরেইটায় যে তিনজন ইংরেজ বণিক দোকান দিয়েছে তারা যে শুধু ধর্মদ্রোহী ইংল্যান্ডের প্রজা তাই নয়, তারা এখানে এসেছে গুপ্তচর হয়ে। ওদের জামিন তুলে নিয়ে গ্রেপ্তার করে বিচার হোক। গুপ্তচরবৃত্তি তো প্রমাণ করা শক্ত। তার চেয়ে ধর্মদ্রোহী করে দিলে, ব্যস, বাছাধনদের এখানেই পালা শেষ। আর তাদের দোকানের সম্পত্তিও ধর্মন্যায়ালয় বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। পর্তুগালের এবং খ্রিস্টধর্মের শত্রু খতম। আমাদের কিছু অর্থলাভ। এক ঢিলে কটা পাখি মরল বল তো? হা হা হা। এসো হারটা তোমায় পরিয়ে দিই। চমৎকার মানাবে তোমাকে। লিসবনে ক'জনের এমন হার আছে?

আজ কতদিন বাদে সেনিওরার ঘরে রাত কাটাবেন ডম আন্তোনিও। মারিয়া আর শিলা সেনিওরাকে শয্যার জন্য প্রস্তুত করে। মহার্ঘ্য স্বচ্ছ লেসের পরিধান বেরুল। তার ঘন আজানুলম্বিত কেশ বেণী বাঁধা হচ্ছে।

—মারিয়া, শিলা, খিড়কি দরজায় নজর রাখ গিয়ে। গোরা যেন আজ রাতে ভেতরে না ঢোকে। দরজায় টোকা দিলেই খুলে বলে দিবি আর আসার দরকার নেই। বলেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিবি। সাত-পাঁচ কথার মধ্যে খবরদার যাস না। চাপা গলায় আদেশ।

মাথা হেলায় মারিয়া, শিলা। না যাবে না।

নিজেদের ঘরে ফিরেই শিলা জিজ্ঞাসা করে মারিয়াকে,—কী হবে মারিয়া?

—কীসের কী হবে?

—ওই যে খাবার টেবিলে সেনিওরা বলছিলেন। তখন তো চারিদিকে অ্যান, মার্গারিটা, জোয়ানারা ছিল, তাই তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। শুনলে না গোরাদের ধর্মদ্রোহী বলে ধরে নিয়ে যাবে? আর ধর্মদ্রোহী মানেই তো মৃত্যুদণ্ড। পুড়িয়ে মারবে।

—তোর তাতে কী? চুপ চুপ ওসব আলোচনাও বিপজ্জনক। বুঝতেই তো পারছিস, ওই ব্যাটা টিকটিকির কাজ। গোরাকে দেখে ফেলেছে নিশ্চয়।

—কিন্তু ওর দোষ কী বলো? আমরা তো জানি সেনিওরাই—

—চুপ। খুব স্পর্ধা হয়েছে তোর। ভারি পিরিত তো গোরার জন্য। বেটা শুলো সেনিওরার বিছানায় আর প্রেমে পড়লি তুই! হি হি হি। শোন্ পুড়ে মরবে ভালই হবে। শরীরের জ্বালা জুড়োবে। হি হি হি।

—না না, মারিয়া, এ অন্যায় এ ভয়ঙ্কর অন্যায়। ও বেচারা নির্দোষ, কতদূর থেকে কত কষ্ট করে এসেছে দুটো রোজগারের জন্য। এভাবে বেঘোরে মারা যাওয়া উচিত নয়। মারিয়া দয়া কর মারিয়া। একটা কোনও উপায়, কোনও রাস্তা—

—ব্যস আর নয়, চুপ। গোয়ার মধ্যে কোথাও ওর রক্ষা নেই। তবে শুনেছি পূর্ব দক্ষিণ দিয়ে দু'দিনের হাঁটাপথে পড়ে এক জেন্টু রাজ্য। হিন্দুরা তো বানিয়া। ওরা ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ব্যবসা করে। ওদের কাছে ধর্মদ্রোহীটোহি নেই, ওরা খ্রিস্টধর্মের কী জানে। ওই রাজ্যে পৌঁছতে পারলে বেঁচে যাবে। তুই কি খিড়কি পাহারা দিবি না আগে একটু শহর ঘুরে আসবি? আধবোজা চোখের তলা দিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে মারিয়া।

সকাল। প্রাতরাশ সেরে বসে আছেন সেনিওর। সাধারণত বেরিয়ে যান। আজ চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। শিলার হাতের ফুলের ঝুড়ি থেকে সেনিওরা ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন এ মরসুমে কোন কোন ফুল ভাল হয়েছে, কোনটা হয়নি।

—সেনিওর, সেনিওর। দ্রুতপদে প্রবেশ কার্ভালোর। তার সাপের মত

সরু চোখ দুটোয় ঝলসাচ্ছে তীব্র হিংসা, ঠোঁটের কোণে ক্রোধের কম্পন।

—ইংরেজ ব্যাটাদের ধরা গেল না। গিয়ে দেখি কেউ নেই দোকানে, শুধু ওলন্দাজ চাকর ছোঁড়াটা বসে ঝিমোচ্ছে। বলে কিনা মালিকরা ভোরভোর শিকারে গেছে। আমরা ধমকধামক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, ওদের আস্তানাতে তল্লাশি চালালাম। জামাকাপড় সবই আছে, দোকানও ভর্তি মালপত্তরে। ছোঁড়াটা বলল, তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে শুধু বন্দুক আর খাদ্যপানীয়, রাতের মধ্যেই নাকি ফিরবে। আমরা পাহারাদার বসিয়ে এসেছি, ফিরলেই—

—চুপ। বুদ্ধু কোথাকার। পাখি তো উড়ে গেছে। এক ঘুসি মারলেন টেবিলে সেনিওর। সেনিওরা তেমনি পিছন ফিরে ফুলদানি সাজিয়ে চলেন শিলা তার আদেশ মত ঝুড়ি থেকে ফুল এগিয়ে দেয়। আড় চোখে শিলা তাকায়। সেনিওরের মুখখানা কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। দাঁতে দাঁত ঘষছেন, নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠেছে।

—অপদার্থ কোথাকার। কাল রাতেই পাহারা বসাওনি কেন। তারা যদি না ফেরে?

—না ফিরলে বুঝতে হবে কেউ ওদের আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। খুব শীতল গলায় বলে কার্ভালো।—কার এত সাহস! বের করব তাকে।

শিলার সমস্ত শরীর কেমন করে ওঠে, মনে হয় যেন কার্ভালোর সাপচোখ তার পিঠে ঘাড়ে ছোবল মারছে।

শিলার হাত থেকে ফুলের সাজিটা পড়ে গেল মেঝেয়। তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে ফুলগুলো সাজিতে তুলতে তুলতে মনে মনে প্রার্থনা করে, হে মা মেরী, মা কালী, রক্ষা কর গোরাকে। জামাকাপড়ের মধ্যে মণিমুক্তো নগদ মুদ্রা সব যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছি ঠিক তেমনি লুকিয়ে নিয়ে ভালয় ভালয় যেন হিন্দু রাজ্যে পৌঁছে যায়...

এ কী! তার মুখের সামনে কে একটা গেলাস ধরেছে। মারিয়ার চোখে জল। মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটা কীসের শরবত? ধুতরার নাকি? না, না সে খাবে না, কিছুতেই না। কোণে দাঁড়ানো সাপচোখ কার্ভালো হিশ্ হিশ্ করে ওঠে,

—ধর্মদ্রোহীদের মদত দিয়েছিস এত বড় আস্পর্ধা। আজ তার শাস্তি পাবি। শিলার মুখটা তুলে ধরা, একটা বড় চামচ জোর করে দাঁতের পাটি দুটোর মধ্যে কে ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁ করাচ্ছে, মুখের ভেতর দিয়ে গলা বেয়ে শরীরের মধ্যে চলে যাচ্ছে শরবত, ধুতুরা...

ছবিগুলো সব উল্টোপাল্টা ভাসতে থাকে সিলিয়ার চোখের সামনে। কে ডাকে? ঘন বাদামি চুল নিটোল চন্দ্রমুখী সেনিওরা হয়ে যাচ্ছেন কে এক শীর্ণ লোলচর্ম মুখোশমুখ বৃদ্ধা। আর গোরার অমন থোকা থোকা সোনালি চুল

পাতলা হয়ে টাক ঢেকে রেখেছে, সেই নরম মুখ কেমন ধারাল। আরব সমুদ্রের মত নীল চোখ শেলফ্রেমের চশমার আড়ালে ধূসর সাদাটে। এরা কারা?

—সিলিয়া সিলিয়া। ইস একেবারে আউট হয়ে গেছে। বেচারা। অভ্যেস নেই তো ড্রিঙ্কফিংকের। র‍্যাল্‌ফ কিছু মনে কর না।

—না, না। প্লিজ। আমার কথা ভাবার কিচ্ছু দরকার নেই। মিস সিলিয়ার জন্য একটু লেমন জুস আনতে বলি?

—দেখি যদি এমনিতে ঠিক না হয় তখন অর্ডার দিলে হবে। সিলিয়া ও সিলিয়া।

এমিলি ফুতার্দো সিলিয়ার দু'কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেন। র‍্যাল্‌ফ সামনে ছোট টেবিলে রাখা মিনারেল ওয়াটারের বোতল থেকে হাতের তালুতে খানিকটা জল ঢেলে সিলিয়ার মুখে চোখে মাথায় কপালে ঝাপটা দিতে থাকেন।

—এই তো, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। সিলিয়া, ওঠো।

চোখ মেলে সিলিয়া। এতক্ষণ যেন জ্ঞানই ছিল না। মাথাটা পাথর, জিভটা খরখরে কাগজ, গলা শুকিয়ে কাঠ।

—আমরা তো খেয়ালই করিনি আপনি কখন চুপ করে গেছেন। এখন কেমন লাগছে? র‍্যাল্‌ফের শিষ্ট সম্ভাষণে সিলিয়া মৃদু হেসে মাথা হেলাতে চেষ্টা করে।

—আমি আর র‍্যাল্‌ফ একটা ম্যারাথন আড্ডা মারলাম। ওর ওই পূর্বপুরুষের গোয়ার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হচ্ছিল। দারুণ। তুমি মিস করলে। আমি আর র‍্যাল্‌ফ তো বন্ধু হয়ে গেছি। কত তাড়াতাড়ি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয়ে যায়। যেন পূর্বনির্ধারিত। কত কালের হারিয়ে যাওয়া চেনাজানা। হিন্দুরা এই জন্যই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।

—সত্যি এমিলি। যুক্তি দিয়ে আমরা খ্রিস্টানরা বা মুসলমানরা সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি না। পুরনো সভ্যতার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।

সিলিয়া এদের মুখের দিকে চেয়ে। আচ্ছা এমন চেয়ে চেয়ে থেকেই কি অমন বিদঘুটে স্বপ্নটা দেখছিল? কর্ণফুলি নদী, বোম্বেটে, সেনিওরা, গোরা বণিক, ধর্মদ্রোহী। সমস্ত গায়ে তার কাঁটা দিয়ে ওঠে। মাথা নীচু করে কাঠের মত বসে থাকে। র‍্যাল্‌ফ তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলে,—অত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আড্ডায় বসে এক-আধজন বেশি পানটান না করে ফেললে মজা কী? এখন ঠিক লাগছে তো?

—আসলে আমাদেরই দোষ। ও তো একেবারে ড্রিঙ্ক করে না। আর কাজু ফেনি বেশ কড়া। তবে কোনও ক্ষতি করবে না। চল খেতে যাই। খেলেই ভাল লাগবে।

আশ্চর্য! এখন কেমন মাতৃসুলভ আচরণ এমিলি ফুতার্দোর। সত্যি, মহিলা গোয়াতে এসে যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন।

—তিনটে বাজে কিন্তু। এখন কি আর লাঞ্চ পাবেন ডাইনিং রুমে। তবে ঘরে ফিরে গিয়ে রুম সার্ভিসে অর্ডার দিলে পেয়ে যাবেন।

—হোয়াট আ পিটি। ভাবছিলাম লাঞ্চটা একসঙ্গে খাওয়া যাবে। তোমাকে তো ছাড়তেই ইচ্ছে করছে না।

এমিলি বছর পঞ্চাশেক আগের ভ্রূভঙ্গি ফিরিয়ে আনেন। সিলিয়ার গা-টা কেমন করে ওঠে। র‍্যাল্‌ফ মৃদু হাসেন।

—মেনি থ্যাঙ্কস। কিন্তু আমি তো পুরো লাঞ্চ খাই না। দেশে থাকলে এক-আধটা স্যান্ডউইচ আর এক গেলাস দুধ। বাইরে ওই শুধু স্যান্ডউইচ বড়জোর এক কাপ কফি। তবে সিলিয়ার তো অল্প বয়স। ওর খাওয়া দরকার। সত্যি গল্পে গল্পে বড্ড দেরি করিয়ে দিলাম। পূর্বপুরুষ র‍্যাল্‌ফ ফিচ-এর ভূত ঘাড়ে চেপেছিল আর কি। ভেরি ভেরি সরি।

—আরে না না। কী যে বল। আমি তো প্রতি মুহূর্ত এনজয় করছিলাম। দারুণ গল্প। কী ছিল বল তো গোয়ার সেদিনের জীবন! কত রঙ, কেমন থ্রিল। সবচেয়ে বড় কথা কতকাল বাদে এমন সোনালি চুল খাঁটি শ্বেতাঙ্গ তরুণের সঙ্গ পেলাম। হাসতে হাসতে এমিলি চেয়ার থেকে হেলে র‍্যাল্‌ফের চুলে হাত বুলিয়ে দেন। সিলিয়ার গা রি-রি করে। বুড়ির ঢঙ দেখ।

—হা হা হা। তুমি তো একটি কট্টর বর্ণবাদী। রেসিস্ট পুরোদস্তুর। তবে আমি মোটেই তরুণ নই, পঞ্চাশ পেরিয়েছি অনেককাল। তুমি এভারগ্রিন, স্থির যৌবনা। তোমাকে আনন্দ দিতে পারলাম এটাই তো আমার বিরাট পাওনা। চল, এবার ওঠা যাক।

—হ্যাঁ। কোনও সুখই চিরকাল টেকে না। এস সিলিয়া।

বোধহয় এতক্ষণ আধশোয়া থেকে এবং/অথবা কাজু ফেনির প্রভাবে এমিলি উঠতে গিয়ে উঠতে পারেন না। হাতলে ভর দিয়ে ভারসাম্য ও শক্তি খোঁজেন। র‍্যাল্‌ফ তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে এসে তাঁকে সযত্নে দু'বাহু ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেন। এমিলি তাঁকে আলগা জড়িয়ে ধরে দু গালে আলতো দুটি চুমু খেয়ে বলেন,

—সো নাইস অফ ইউ। আমেরিকানরা দেখছি ইউরোপীয়দের মত মেয়েদের প্রতি শিষ্টাচার মানেটানে। মানবেই তো মানবেই তো। হাজার হোক ইউরোপ তো ওল্ড ওয়ার্ল্ড।

মাথাটা ছেলেমানুষের মত ঝাঁকিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠেন এমিলি।

সিলিয়া রাগে প্রায় দাঁত কিড়মিড় করে। ছিঃ, ভদ্রলোক কী ভাবছেন তাদের। শক্ত করে হাত ধরে এমিলির।

—চলুন মাদাম।—হ্যাঁ চল।

এদিকে খানিকক্ষণ ধরেই সিলিয়ার ঘাড়ের কাছে কেমন অস্বস্তি। যেন কারও দৃষ্টি বিঁধছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ঠিক পিছনে সামান্য দূরে দুটি পাশাপাশি ডেক চেয়ারে অর্ধশায়িত দুই মূর্তি। তাদের পাশের ঘরের সেই আরব-মার্কিনি প্রতিবেশী দু'জন। একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছে র‍্যাল্‌ফ-এমিলির আলিঙ্গন ইত্যাদি। কালো চুল লম্বা পুরুষটির মুখ থমথমে, নাকের পাটা দুটি ফুলে ফুলে উঠছে। খর্বকায়টির কালো সরু চোখে গভীর বিদ্বেষ, ঠোঁটের কোণে ক্রোধ, হিংসা। সিলিয়া চেয়েই আছে। কোনও অদৃশ্য কম্পিউটারে ওদের চুল মুখের ডৌল পোশাক-আশাক বদলে দিচ্ছে। এ কী সেনিওর আন্তোনিও, আর ম্যানেজার কার্ভালো। না, না কী পাগলের মত ভাবছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয় সিলিয়া। এ ক'মুহূর্তের মধ্যে এমিলি তার হাত ছাড়িয়ে র‍্যাল্‌ফের বাহু আশ্রয় করে হাঁটতে শুরু করেছেন ঘরের দিকে।

—কালকে তোমার প্রোগ্রাম কী র‍্যাল্‌ফ? আবার ওই বোরিং সেমিনার? ডুব মারো ডুব মারো।

—সেমিনার বোরিং লাগলে কী আমার চলে এমিলি? ওটা যে আমার জীবিকা। তবে কাল কিছু নেই। আসলে ১১ সেপ্টেম্বরের পর সমস্ত পশ্চিমে এমন জেহাদি আতঙ্ক যে অনেক ডেলিগেট আসেনি। ইন্ডিয়াতে তো অনেক মুসলিম, তাই। এদিককার ফ্লাইটও অনেক বাতিল হয়ে গেছে। তাই কাল আমরা ফ্রি হলেও ফিরতে পারছি না। পরশু মুম্বই থেকে ফ্লাইট নেব।

—ভেরি গুড। তাহলে তোমরা সব বিদেশিরা ভেলা গোয়া মানে ওল্ড গোয়া দেখে আসছ না কেন? ভাল লাগবে। তোমরা তো সেদিনকার জাত। ওখানে দেখবে সেই পুরনো ইউরোপের ধ্বংসাবশেষ। আগুয়াদা ফোর্ট দেখবে, দেখবে সেকালের রাস্তাঘাট সব, যেখানে তোমার রোমান্টিক পূর্বপুরুষ এসেছিলেন, কত কী করেছিলেন। হি হি হি। তুমি কিছু না কর অন্তত সেই মাটিতে পা তো রাখ। সত্যি, ভাবতে, কেমন রোমাঞ্চ হয়, না?

—তা একটু-আধটু হয় তো বটে। তবে আমি তো কাঠখোট্টা বিজ্ঞানী, তোমার মতো চিরসবুজ কী। এদিকে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা নেই। কী করে যাব বল তো?

—দ্যাটস নো প্রবলেম। রিসেপশনে বললেই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে। এদের বাস আছে, গাড়ি আছে। রোজ যায়।

—গ্রেট আইডিয়া। দেখি বাকিরা কী বলে। থ্যাঙ্ক ইউ। কাল দেখা হবে সকালে। আজ রাতে আমাদের একটা পার্টি আছে, ভারত সরকার দিচ্ছে।

—তাই নাকি। হ্যাভ আ নাইস টাইম। আবার দেখা হবে।

মিসেস ফুতার্দোর সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে সিলিয়া। এই অবেলায় ভারি খেলে পাছে বুড়ির শরীর বেজুত হয় সেই ভয়ে সিলিয়া রুম সার্ভিসকে শুধু স্যুপ, স্যান্ডউইচ আর আইসক্রিম অর্ডার করে। দু'জনে খায়। এমিলি খুব খুশি। মুখে শুধু র‍্যাল্‌ফ বা বলা উচিত তার সেই ভারত পথিক পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত। শেষে স্বীকারই করেন যে ইংরেজরাও, অন্তত কেউ কেউ, পর্তুগিজ স্পেনীয়দের মত ডাকাবুকো দুঃসাহসী। সকলেই বানিয়া, দোকানদার নয়। সিলিয়া মনে করিয়ে দেয় র‍্যাল্‌ফ ফিচ বণিকই ছিলেন।

—আহা। কিন্তু অনেক কষ্ট তো করেছে। বন্দী হওয়া, পালানো, সহজ কর্ম্মো নয়। তাছাড়া তখনকার দিনে বণিক ছাড়া, একমাত্র পাদ্রিরা যেত বিদেশে ধর্ম প্রচার করতে, নয়ত হাড়হাভাতের দল সৈন্য হয়ে যুদ্ধ করতে। এই তিনরকম মানুষ মিলেই তো কলোনি হয়েছে।

সিলিয়া চুপ করে থাকে। মনে মনে ভাবে তাহলে ইংরেজদের বা মুসলমানদের নিন্দা কেন। শীতেরবেলা, দেখতে না দেখতে বিকেল গড়িয়ে যায়। এমিলিকে নিয়ে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বেড়িয়ে আসে সিলিয়া। তার পর ডিনারের জন্য সাজসজ্জা করতে সাহায্য করে। ডাইনিং হলে যায়। খাওয়া সারে স্থানীয় পদ গোয়ান ফিশকারি রাইস দিয়ে। সবই যন্ত্রের মত। সে যেন দুটো মানুষ। তার মধ্যে আর একজন বার বার সেই দুঃস্বপ্নে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আবার সেই সব অনুভূতি, হর্ষ বিষাদ কামনা আতঙ্ক। এদিকে রোবটের মত মিসেস ফুতার্দোর রাতের জামা এগিয়ে দেয়। লম্বা সাদা চুল যথাবিহিত ব্রাশ করে বেণী বাঁধে, নাইট ক্রিমের কৌটো হাতে ধরায়। ওষুধ ও জল খাওয়াতে ভোলে না। গুড নাইট বলে বেড সাইড ল্যাম্পটা নেভায়। ওদিকের খাটে শুয়ে অন্ধকারে সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকে। না, ঘুমোবে না। আবার যদি সেই স্বপ্নটা ফিরে আসে। একবার মনে হয় আসলেই বা ক্ষতি কী। সবটাই তো ভীষণ নয়। কী সুন্দর প্রকৃতি সেই সবুজের সমারোহ, কর্ণফুলি নদী। টোপর পরা এক কিশোরের নরম চাহনি। কেমন বদলে মিলেমিশে যায় আরেকটা সবুজে, অন্য এক নদীতে। মানুষের হাতে তৈরি সবুজ, মাণ্ডবীর কলতানে, আর একটি পুরুষমুখে। একটা থেকে আর একটা। আবার এখানে সবুজ নারকেলকুঞ্জ। নবাগতর চোখে যেন পরিচিত ছায়া। কী অদ্ভুত, চমৎকার সব ব্যাপারস্যাপার।

বুকের মধ্যে কেমন চাপ। যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ধড়মড় করে

উঠে বসে সিলিয়া। চেয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। চারিদিক কেমন বন্ধবন্ধ। এরা কি শীতকাল বলে মাঝরাতে এ সি মেশিনটা বন্ধ করে দিয়েছে নাকি। ওপর শীতলতার ঝাঁঝরির দিকে হাত বাড়ায়। না, একটু ঠান্ডা হাওয়া তো আসছে। বোধহয় কাজু ফেনি, অবেলায় খাওয়া ইত্যাদির যুক্ত প্রতিক্রিয়া। বেড সাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে ঘড়ি দেখে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। আসলে ছোট ঘর কাচের জানালা-দরজা সব বন্ধ, তাই বোধহয় অস্বস্তি লাগছে। পিঠটা ঘাম ঘাম। আলো নিভিয়ে শব্দ না করে বিছানা ছেড়ে ওঠে সিলিয়া। দরজা খুলে সামনে আলোহীন টানা বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। আঃ তাজা হাওয়ায় কী আরাম। ঘরের ভিতরের চেয়ে কত খোলামেলা। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় সিলিয়া। ইস যদি বড় বড় জানালা দুটো খুলে দিয়ে শোওয়া যেত। তার তো উপায় নেই। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশনড। সব কাচের জানালা একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ।

চারিদিক শুনশান। হঠাৎ কোথায় খুব সাবধানে দরজা খোলার আওয়াজ। প্রায় চমকে উঠে সিলিয়া নিজেকে থামের সঙ্গে সেঁটে দেয়। একতলা অ্যানেক্সের শেষের দিকে তাদের ঘর পেরিয়ে একেবারে প্রান্তে সেই আরব মার্কিনদের কক্ষটি। রাতের অন্ধকারেও বুঝতে পারে তার দরজা খুলল। দুটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। একটি লম্বা অন্যটি খাটো, শেষের জনের কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ ধরনের কিছু। দরজা আস্তে করে ভেজিয়ে রেখে তারা অ্যানেক্স থেকে নেমে হোটেলের পিছন দিকে। ওদিকে কী আছে এত রাতে? সিলিয়ার বিস্ময় ও কৌতূহল পাল্লা দেয়। ওখানে তো বাগানটাগান বেড়াবার জায়গা কিছুই নেই। খানিকটা ফাঁকা জায়গা তারপর হোটেলের গ্যারেজ অর্থাৎ একটা বড় শেডের তলায় রাখা থাকে ছোট বাস, মিনি বললেই হয়, দুটো অ্যাম্বাসাডর। দিনেরবেলা সিলিয়ার এক ঝলক দেখা। দূরত্ব বজায় রেখে পিছন পিছন সে-ও চলে।

কেন যাচ্ছে এই গভীর রাতে দুটো অজানা পুরুষের পিছু পিছু? কী যেন তাকে টানছে, না গিয়ে উপায় নেই। সেই সকালে রিসেপশনে প্রথম দেখা। তারপর নারকেলবীথিতে দুপুরে সেই অদ্ভুত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা। তার স্বপ্নের সঙ্গে কেমন জড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদুটি। যেন এক রহস্যের বন্ধনে বাঁধা তারা সবাই। লোকদুটি ঢোকে শেডে। সোজা চলে যায় হোটেলের মিনি-টার কাছে। নিঃশব্দের মধ্যে খুট করে আওয়াজ। একজন ড্রাইভারের কেবিনে। অন্যজন গাড়ির আধো আড়ালে দাঁড়িয়ে। মুখটা একটু বার করা। আরে এরা কি গাড়ি চোর নাকি। পাগল, বাইরের গেটে সিকিউরিটি আছে। পাঁচতারা হোটেলে গাড়ি চুরির জন্য কেউ আসে। অবিশ্বাস্য। সিলিয়া আর একটু এগোয় সামনে মেহেদির ঘন বেড়ার

মধ্যে দিয়ে গ্যারেজে যাওয়ার রাস্তা। মেহেদির ঝোপের আড়ালে আধ-বসা সিলিয়া। উঁকি মেরে দেখে আলোর তীর্যক রেখা, টর্চ জ্বালা। ওই তো গাড়ির বনেট খোলা, খুটখাট আওয়াজ। খাটো ঝুঁকে কিছু করছে। অন্যজন তেমনি দাঁড়িয়ে। স্পষ্টত পাহারাদার। বেশ কয়েক মুহূর্ত কাটে। আলো নিভে যায়। গাড়ির দরজা বন্ধ হল। দুজনে ফিরছে। সিলিয়া তাড়াতাড়ি আরও দূরে সরে মেহেদির সঙ্গে মিশে থাকে। ভাগ্যে ঘন রঙের নাইটি পরা। ওরা নিঃশব্দে দ্রুতপদে ছায়ার মত অ্যানেক্সে ফিরে নিজেদের ঘরে ঢুকে যায়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সিলিয়া। আবার হুট করে বেরিয়ে আসবে না তো। একবার ভাবে বাসটার কাছে গিয়ে দেখবে নাকি লোকদুটো কী করে গেল। কিন্তু গাড়ির যন্ত্রপাতি কিছুই তার জানা নেই। কী দেখবে। আস্তে আস্তে ঘরে ফেরে সিলিয়া। কেমন একটা উদ্বেগ। বাকি রাত আর ঘুম আসে না।

সকালে সিলিয়া মিসেস ফুতার্দোর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে। পোর্টিকোতে এসে দাঁড়াল হোটেলের মিনি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সিলিয়া। না, ভয়ের কিছু নেই। এ হোটেলের বোধহয় রীতি শেষ রাতে গাড়ি চেকটেক করা, ভোরেই হয়ত রেডি রাখতে হয়। কিন্তু মিস্তিরি, মেকানিক হোটেলের ঘরে থাকবে? না, ও সব আর ভাববে না। একখানা বোম্বাই স্বপ্ন না কী যে দেখেছে তার ঘোর কাটতেই চায় না। নার্ভগুলো একেবারে টানটান।

র‍্যাল্‌ফ নিউবেরি-সহ আরও ক'জন সাহেব রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এসে মিনি বাসটার কাছে দাঁড়ালেন। এমিলির সাদর সম্ভাষণ দূর থেকে। —গুডমর্নিং র‍্যাল্‌ফ।

—গুডমর্নিং এমিলি। স্মিতমুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসেন মিঃ নিউবেরি।

—এমিলি, আমি তোমার দ্বারা বশীভূত। যাচ্ছি পুরনো গোয়া দেখতে। অন্যদেরও সঙ্গে জুটিয়েছি।

—দেখো যেন আমার পূর্বপুরুষের মত কোনও মোহিনীর মায়াজালে ধরা পড়ে যেও না।

—একটু পড়লে মন্দ হয় না। ভয় তো নেই, শেষে উদ্ধার।

—বলা যায় না। ইতিহাসে কি অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়?

—তোমরা দুজনেও চল না।

—থ্যাঙ্কস। আমি বহুবার দেখেছি। তাছাড়া আজকে একটু ক্লান্ত। এক কাজ কর, এই সিলিয়াকে নিয়ে যাও। তোমার মতো তারও এই প্রথম গোয়াতে আসা। না, না, আপত্তি করো না সিলিয়া। আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

—ম্যাডাম আপনার হার্টের ওষুধটা হাতের কাছে দিয়ে যাই?

—বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ারে আছে তো? আমি নিয়ে রাখব'খন কাছে। তুমি যাও, ডোন্ট বদার। হ্যাভ আ নাইস ডে। —থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।

আহা গরিব মেয়েটা। যাক, একটু এনজয় করুক। ভারি বাধ্য। অনেকদিন বাদে মনোমত সঙ্গিনী। আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে নারকেলবীথিতে গিয়ে বসেন। ওই যা, ওষুধটা আনা হল না। পরে নেবেন। সত্যি ভারি মনোরম এই নীল আকাশের তলার সবুজের মধ্যে আলোছায়ার খেলা। ক'ঘন্টা কেটে যায়। ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে পা মেলে বসে ঘুমিয়েই পড়েছিলেন এমিলি। এখন উঠে ঘড়ি দেখেন। সাড়ে বারোটা বাজে। সামনে বেয়ারা গোমেস। হাতে যথারীতি ট্রে, নোট প্যাড।

—গুড আফটারনুন ম্যাম। একটা কাজু ফেনি দিই?

—নো, থ্যাঙ্কস গোমেস, আজ থাক, বরং একটা ফ্রেশ লাইম দাও।

—জলের সঙ্গে? চিনি ছাড়া? আপনার সেক্রেটারি মিস সিলিয়াকে দেখছি না।

—ও তোমাদের বাসে করে ভেল্লা গোয়া দেখতে গেছে।

গোমেসের চোখেমুখে আতঙ্ক।

—সে কী। রিসেপশনে জোর গুজব বাসটায় টাইম বোমা রাখা ছিল। একঘন্টা যেতেই ফেটেছে। সমস্ত বাসটা জ্বলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে। দমকল যেতে যেতে সব পুড়ে শেষ। সবাই বলছে, জেহাদিদের কীর্তি। ম্যানেজমেন্ট, বুঝলেন ম্যাম, খবরটা চেপে রেখেছে। এই তো অ্যাম্বাসাডরটা নিয়ে মিঃ মোরেস বেরিয়ে গেলেন। কেউ নাকি বাঁচেনি। ধর্মের জন্য এরা কী না করতে পারে। ম্যাম, কী হল, মিস সিলিয়ার জন্য এমন করছেন? কেন? শান্ত হোন, এখনও পাকা খবর আসেনি...

এমিলির পা থেকে বরফের স্রোত ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। বুকের মাঝখানটায় কেমন কষ্ট। দুটো লোক সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকাল। সেই আরব-মার্কিন দুজন না! গম্ভীর ভয়ঙ্কর মুখে বিদ্রুপের হাসি। সমস্ত শরীর ঘামছে এমিলির। তাকিয়ে থাকতে পারেন না। চোখ নামিয়ে নেন। নিজের দিকে চেয়ে দেখেন উদ্ধত পুষ্ট বুকে দুলছে তিন লহর মুক্তোর মালা। এক একটি লহরের মাঝখানে পান্নায় ঘিরে হীরে বসানো লকেট। এ কার শরীর? আমি কে?

উত্তর মেলে না। চোখের সামনে নীল আকাশ সবুজ ঘাস নারকেলবীথি আলোছায়ার খেলা আবছা আরও আবছা। তারপর শূন্য। তাঁর নিস্পন্দ দেহ পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে আরব-মার্কিন দুজনের মুখ গৌরবদীপ্ত। বহুশত বছরের বুদ্ধ বিজয়ের উপলব্ধি।

কথার কথায়

কণা বসু মিশ্র

মনটা ধূ-ধূ করে! বুকের মধ্যে অসংখ্য ফাটল নিয়ে রূপা ভোরের সদ্য আলো ফোটা আকাশের দিকে তাকায়। লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত নীল আকাশের জমির গায়ে উদাসীন মেঘের ভেসে বেড়ান রূপার বুকের যন্ত্রণা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দেয়। রূপা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ওই চতুষ্কোণ আকাশটার দিকে। পাখ-পাখালি উড়ে যায়। চড়ুই-শালিখের কিচিরমিচির। হ্যাংলা দাঁড়কাকটা একফালি বাগানের মধ্যে ঘুরঘুর করতে করতে খাবার খোঁজে। ক্ষিধে আর ক্ষিধে। কারো মনের ক্ষিধে, কারো পেটের ক্ষিধে। এই ক্ষিধের জমানায় বেঁচে থাকাটাই এক বিপদ। তারই মধ্যে শীতের সকালের নরম রোদ্দুর সোনালি আবির ছড়িয়ে রূপার জানালার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে ঘরের জমি দখল করে। এই বেঁচে থাকাটুকুর স্বাদ রূপা তখন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

দরজার বেল বাজে।

—কে?

ভেতরের প্রশ্নের উত্তরে বন্ধ দরজার ওপারের গলা বলে, টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম!

আসমানী তখন চায়ের কাপ হাতে রূপার শোবার ঘরের দরজায় টোকা মারছে। এ ঘরের দরজাও বন্ধ। সৌরদীপের ঘুম ভাঙে বেলা আটটার আগে তো নয়। এখন মাত্র ছটা দশ। এক কাপ চা হাতে করে আসমানী চেঁচিয়ে বলে, —বউদি! চা।

বিছানায় শুয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট না ভিজিয়ে রূপা বিছানা ছাড়তে পারে না। এই সামান্য আরাম কিংবা অভ্যেসটুকু ও বহুদিন ধরেই জিইয়ে রেখেছে।। রূপা বলে, এসো।

ওদিকে দরজার বেলের কর্কশ শব্দ, সেইসঙ্গে টেলিগ্রামের আর্তনাদ রূপার মস্তিষ্কে রীতিমত ঝড় তুলেছে। এই সাতসকালেই টেলিগ্রাম? কেউ কি মারা গেল? রূপা ভাবল শাশুড়ি? না মা? অথবা দিদিশাশুড়ি? নাকি শ্বশুরমশাই? রূপার বাবারও হাই প্রেসার। মায়ের হাই ব্লাড সুগার। কোনদিক থেকে বিপদটা আসছে কী করে ও জানবে?

ভ্যাজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে আসমানী। চায়ের কাপে ঠোঁট রেখে রূপা বলে, পিয়ন এসেছে শুনতে পাচ্ছো না?

আসমানী চেঁচিয়ে ওঠে— হারামি! দাঁড়াও। দরজা খুলতে তো সময় লাগে গো।

—ওকি গালাগাল সক্‌কাল বেলা! তোমার মুখের কোনও ট্যাক্স নেই দেখছি।

—তাই বলে, অত জোরে বেল বাজাবে বউদি? তুমিই বল?

ততক্ষণে ডোর বেলটা আর একবার বেজে ওঠে। আসমানী দৌড়ে যায়। সায়রেনের বিপদ সংকেতের মত শব্দটা রূপার বুকে ধাক্‌কা মারে। ও ধড়ফড় করে উঠে বসে। খাট থেকে মেঝেতে পা রাখে। সৌরদীপের নাক ডাকছে। রূপার ঘুম খুব পাতলা। রূপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তাকায়। সৌরদীপের সুখের ঘুমটুকুকে হিংসে করে। তারপর ঘরে-পরা রবারের চপ্পলে পা গলিয়ে বাইরের প্যাসেজের দিকে এগিয়ে যায়।

আসমানী তখন দরজার গায়ে ম্যাজিক আইতে চোখ রেখে দেখছে। ওর এই অভ্যেস অবশ্য রূপার তৈরি। কিন্তু এখন নিজের তৈরি অভ্যেসেই রূপার বিরক্তি। ততক্ষণে আর একবার কঁ্যাক। শব্দ নয়। যেন শব্দের বাণ।

—দরজাটা খুলবে তো? রূপা জোরে ধমকে ওঠে।

আসমানীর নিরুত্তাপ ভঙ্গি। —সত্যি গো বউদি পিয়ন। আমি ভাবলুম, ডাকাত-টাকাত নয় তো?

ওপাশ থেকে পিয়ন ব্যঙ্গের গলায় বলে, —হুঁ! ডাকাত! সুখীসুখী মানুষের খবরের বোঝা বইব। অপবাদ হবে, ডাকাত।

—অত চেঁচাচ্ছ কেন গো? —দরজা খুলেই আসমানীর বেজায় ধমক। পিয়ন ঢিলে কায়দায় জিজ্ঞেস করে, পূরবী সেন আছেন? আসমানী যেন আকাশ থেকে পড়ে— সে আবার কে গো?

রূপার ভ্রূ কুঁচকে যায়। নাকের ডগায় শেয়াল পণ্ডিতের মত চশমা ঝুলিয়ে পিয়ন গোল গোল চোখে তাকায়, পূরবী সেন আছেন? পূরবী... !

—এ বাড়িতে তো পূরবী সেন থাকেন না। উনি ওই সামনের বাড়ির একতলায় থাকেন।

—রূপা কথাটা বলতেই পিয়ন বলে, ভেরি সরি।

আসমানী আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে বিটকেল গলায় বলে, আমরা কি তোমার দালাল নাকি গো যে বাড়ির হদিস দোব?

—আহ্ আসমানী। —রূপার বকুনিতে আসমানী ঘাবড়ায় না। তার নাকছাবি পরা মুখটা হেসে ওঠে। জুতোর শব্দ তুলে লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিয়ন বলে, পাগলি।

পেছন ফিরে ওই তাকানোর ভঙ্গিটা বিশ্রী। আসমানীর বাড়ন্ত যৌবন। পিয়নের নারীলোভী চাউনিটা সকালের ফুরফুরে মেজাজটাই খারাপ করে দেয় রূপার।

সৌরদীপের ঘুম ভেঙে গেছে! সাতসকালেই তার গলার স্বরে তীব্র ঝাঁঝ।

—আসমানী!

ওই একটি ডাকই যথেষ্ট। আসমানী তড়িঘড়ি ছুটে যায়। —কী বলছেন দাদাবাবু?

রূপার ডাকের বেলায় অন্তত দশবার ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না যার।

সৌরদীপের চটির ফটাফট শব্দ বাথরুমে মিলিয়ে যায়। রূপা চায়ের কাপের বাকিটুকু নিঃশেষ করে। ট্রাম, বাসের শব্দ আসছে। খবরের কাগজের হকারের সাইকেলের ঘণ্টি কিছু জেগে-থাকা আর ঘুমন্ত মানুষকে জানিয়ে দেয়, খবর আছে। সেই খবরের জন্যে রূপা জানালার নিচে চোখ রাখে। কিন্তু সেই চেনা হকার, প্রতিদিনই যে কলিংবেল বাজিয়ে বন্ধ দরজার নিচে কাগজ ঠেলে দেয়, সে আজ আসে না। লোকটার হল কী? রূপা পায়চারি শুরু করে ড্রইং কাম ডাইনিং রুমটায়। হাজার স্কোয়ার ফিটের গণ্ডিটুকু হাজার বার পেরিয়ে যেতে থাকে। তবু আসে না লোকটা। যদিও তেমন জরুরি খবর কী আর থাকবে। পার্টির দলাদলি, রাজধানীর মন্ত্রীমহলের কেচ্ছা, রাইটার্সে গাদা গাদা ফাইলে লাল ফিতের ফাঁস, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কড়াকড়ি, বাংলা বন্ধের নতুন তোড়জোড়, গ্রামের ভাগচাষীর উদরের জ্বালা, পঞ্চায়েত নীরব, জমি দখল, টিউবয়েলের জলে আর্সেনিক বিষ...। ধান ক্ষেতে কিশোরীকে ধর্ষণ...। ট্যাক্সি ছিনতাই, ক্রুদ্ধ জনতার পাগলামি।

কোথাও কোনও নতুনত্ব নেই। তবু খবরগুলো নেশার মত রূপাকে টানে। জ্ঞান বয়সের পর থেকে ও যে কবে প্রথম খবরের কাগজ পড়তে শিখেছিল আজ আর মনে নেই। জন্তু-জানোয়ারের মত মানুষ মরছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দুর্ঘটনায়। পৃথিবীর জনসংখ্যার চাপ তবু কমছে না। একদল সরে যাচ্ছে আর একদল জন্ম নিচ্ছে। কেউই তো চিরকালের জন্যে জায়গা দখল করতে আসেনি।

তবু কেন এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত? হীনতাবোধের যন্ত্রণায় উন্মত্ততা? যেদিকে তাকাও, চারদিকেই শুধু ওই, কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তার লড়াই। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মানুষ শান্তি খুঁজছে, অথচ শান্তির রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

সৌরদীপের খাটের পাশে টিপয়ের ওপর চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হচ্ছে। চা থেকে আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে না। তার মানে নির্ঘাৎ জল। সৌরদীপ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার বিছানায়। আসমানী কখন চায়ের কাপ রেখে গেছে সে হয়ত জানে না। অথবা ওর ওই স্বভাব, ধূমায়িত চায়ের কাপ সামনে রেখে সে আর এক ঘুম দিতে পারে। রূপা আলগোছে সৌরদীপের খাটের এক কোণে গিয়ে বসে। আলতো করে ওকে ঠেলে বলে,

—এই, ওঠো চা খাও।

সৌরদীপ কোনও সাড়া দেয় না। রূপার আর একবার মনে পড়ে আজ রোববার। সৌরদীপ বেলা করে উঠবে। অথচ আসমানীকে চেঁচিয়ে ডাকার মধ্যে চায়ের হুকুম ছিল। সংসারে কিছু কিছু লোক থাকে, যাদের প্রতাপে চারদিক গরম। এই লোকগুলোর মেজাজকে খুব হিংসে হয় রূপার।

ইদানীং সৌরদীপ রাত করে বাড়ি ফিরছে। সম্প্রতি সে কোনও মহিলার প্রেমে পড়েছে। এটা রূপার অনুমান। অনুমান নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা রূপার স্বভাববিরুদ্ধ। ও বিশ্বাস করে, মানুষের হৃদয়ের ওপর কোনও এক্তিয়ার নেই। প্রেম খারাপ নয়। তবে স্বামী অন্য মহিলার প্রেমে পড়ছে, ওটা কোনও মেয়েই বা বরদাস্ত করতে পারে? তবু নিজেকে নিয়ে রূপা খেলা করে। যেখানে যন্ত্রণা, দুঃখ সেই জায়গাটা ও আলগোছে এড়িয়ে যেতে চায়। অথচ পুরোপুরি এড়াতে পারে না। ওই না পারা জায়গাটুকুর ক্ষত এড়াতে ও স্টিরিওতে ক্যাসেট চাপিয়ে দেয়। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো... ।'

তবু মন মানতে চায় না। হৃদয় কিংবা অনুভূতির গভীরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে রূপা। প্রবল অভিমানে নিজেকে টুকরো টুকরো করে। যন্ত্রণার পোকাগুলো ওকে কুরকুর করে কাটে। একটা প্রেম করতে পারলে বেশ হত। প্রেম আছে, অথচ প্রেমিকের দেখা নেই। যার-তার সঙ্গে কি প্রেম পোষায়? যদি ইচ্ছে আর রুচিতে না মেলে?

খোলা জানলার ওপর বসে একটা দাঁড়কাক কর্কশ সুরে চেঁচাতে থাকে। কাকের ডাক যতই কর্কশ হোক, এই মুহূর্তে করুণ হয়ে রূপার কানে বাজে। আহা। ও বোধহয় ওর কাকিনীকে ডাকছে। পৃথিবীতে একজন সাথী আর একজনকে চিরকাল ডেকে যায়। খুব কমই একজন আর একজনের সঙ্গে হাত মেলায়। রূপা কাকের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু রূপা তো একলা নয়। বন্ধুবান্ধব মহলে জনপ্রিয় বলে ওর খ্যাতি আছে। ভালবাসার মানুষেরও তো অভাব নেই। সংসারের অসংখ্য বন্ধন, সম্পর্কের মধ্যে সেই ভালবাসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

রোববারের মেজাজই আলাদা। আসমানী জানতে এসেছে সকালে খাবার কী হবে? অন্যদিনের রুটিন আর আজকের রুটিন তো এক নয়? রূপা বলে, —প্রেসারে আলুসিদ্ধ কর। আমি পাউরুটির চপ বানাব।

রূপা আসমানীকে ফরমাস করেই ফ্রিজ খোলে। দেখে ডিম, পেঁয়াজ, টম্যাটো আছে কি না। নানা ধরনের খাবার বানানো রূপার দারুণ সখ। অথচ কাজের লোক চলে গেলে রান্নাবান্না করাটা যখন রোজকার রুটিন হয়ে দাঁড়ায়, তখনই গণ্ডগোল। কিন্তু বিরক্তি নিয়েও শেষপর্যন্ত হাতা, খুন্তি তো ধরতেই হয়! এখন আসমানী থাকায়, ওকেই বরং মাঝে-মাঝে রান্নাঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের খেয়ালের হাতিয়ার হিসেবে সৌখিন খাবার-টাবার বানানোর ইচ্ছেটাকে ও প্রশ্রয় দেয়।

ডোর বেলটা বেজে ওঠে। ওই বোধহয় হকার এলো। ফস্ ফস্ শব্দ। দরজার নিচে দিয়ে কাগজ ঢুকছে ভেতরে। কাগজ পড়ার নেশাটা রূপার ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাগজে চোখ বুলিয়ে একই বাসি গন্ধ মরা মানুষের গায়ে উড়ে পড়া মাছির মত ওর ঘেন্না ধরায়। বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা আর কতদিন চলবে? আর একটা আকর্ষণীয় খবরেও ওর চোখ আটকে যায়। স্বামী হত্যা। স্ত্রী পলাতক। খবরটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে লেখা। রূপার ঠোঁটে হাসির ভাঁজ পড়ে। ও খুশি হয়, মেয়েরাও তবে পাল্টা দিচ্ছে আজকাল? যদিও খুনো-খুনির নরক ওর পছন্দ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর ভালই লাগে।

আর একবার বেল বাজে। এবারে জমাদার। রূপা বলে, —কী ব্যাপার সীতারাম? তিনদিন হাওয়া, হঠাৎ রোববারে কাজে এসেছো?

রূপার খেয়াল হয়, এখন মাসের শেষ। ঘনঘন সীতারামের দেখা পাওয়া যাবে। যখন-তখন সে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে। কী করবে? এই সীতারামের দল কতই বা মাইনে পায়? রূপার নিজেকে শোষণকারী সমাজের একজন বলেই মনে হয়। সীতারামের কামাইটাও তো অসহ্য। পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। বউ পেটায়। ওর ছেলেটা কী খায়, বউ কী খায়? লরির ড্রাইভারগুলো নাকি পয়সা দিয়ে ওর বউকে ভোগ করে, সীতারাম যখন তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ওদের জন্যে তো কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের দরকার নেই। খাও চা, ফেল ভাঁড়। এই অবস্থা। সীতারাম একদিন দুঃখ করেছিল, বউটার পেটে নয়া বাচ্চা। বাচ্চাটা হামার না। টেরাক ডেরাইভারের।

—কে বলল তোমায় এ কথা?

—দোসরা আদমি বলেছে।

সীতারামের বউ একদিন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল।

—কী ব্যাপার?

—মাইজি, হামার আদমি দোস্‌রা মাইকিকে নিয়ে রাত কাটায়।

—কোথায়?

—কাঁহা আর যাবেক? ফুটপাথেই। হামার চোখ ভি দেখে, মেমসাব। হামার কী হোবে? —সীতারামের বউ কপাল চাপড়ায়।

সীতারাম বাথরুম পরিষ্কার করে ওর স্বভাবমত হাত পাতে। রূপা জিজ্ঞেস করে, —আজ কেন এসেছ, রোববার না?

সীতারাম মাথা চুলকে বলে, কালমে নেহী আয়া উসলিয়ে। হামার মাইকিটার বেমার হল।

—যাক্‌ খুশ্‌ হয়েছে তোমার? বউকে আজকাল দেখছ-টেখছ?

—হাঁ। উ কাঁহা যাবে? টেরাক ডেরাইভার তো পালিয়ে গেল মেমসাব।

—আর তুমি যাকে নিয়ে থাক, সে কোথায়?

—উভি পালিয়ে গেল। আভি একঠো ওয়াগান ব্রেকারের সাথে বস্তিতে থাকে। মাইকিটো বেলাকে সিনেমা হলের টিকিট বেচে। উহার আদমিটো ছিন্‌তাই ভি শিখে লিয়েছে। গেল মাইনায় হাজত থেকে ফিরল, মাইকিটো উহার সাথে হাত মেলাল।। হামার তো পয়সা নাই মেমসাব? উ কেনে থাকবে হামার টিনে?

সীতারাম চলে গেল। রূপা মনে মনে বলল, —বেচারী।

ওদিকে সৌরদীপ তখন চেঁচিয়ে ডাকছে,—রূপা!

রূপা চামচে দিয়ে ডিম ফেটাতে ফেটাতে বলল, যাই। কী হল?

—টেলিফোন।—সৌরদীপের গম্ভীর গলা।

—রূপা চোট পায়ে হেঁটে যায়।

—কে করেছে ফোন?

সৌরদীপের উত্তর, জানি না। আমার তো অযথা কিউরিওসিটি নেই?

রূপা ভাবে,—কী কথার কী উত্তর! যেন আমারই আছে? ও রিসিভারটা তুলে নেয়,—হ্যালো!

—হ্যালো! আমি আত্রেয়ী। তোর কত্তা আমায় চিনতে পারলেন না।

রূপা বলে,—ও অমনিই খেয়ালি।

আত্রেয়ী —সেদিন তো দেখি কত গল্প করলেন।

রূপা আস্তে আস্তে করে বলে—সেদিন তো আমি বাড়ি ছিলুম না।

আত্রেয়ী শুনতে পায় না।—হ্যালো, হ্যাল্লো।

টেলিফোনের মধ্যে খট্‌খট্ শব্দ। আত্রেয়ীর গলা শুনতে পায় রূপা। কিন্তু ওর গলা ওখানে পৌঁছয় না। কী জ্বালা! এই তো সবে কাল টেলিফোন ঠিক হল। এতদিন কেব্‌ল ফল্ট ছিল। টেলিফোনের ভেতর একটা এন্‌গেজড্ সাউন্ড হচ্ছে।—দূর ছাই! রূপা লাইন কেটে দিল।

ও রান্নাঘরে পা দিতে না দিতেই আবার বাজল ফোনটা। সৌর ফোন ধরল। আবার চেঁচাল,—রূপা। তোমার ফোন।

—কী মুশকিল! নাহ্! আত্রেয়ীটা ফোন করার আর সময় পেল না। ও যে একজন হিটলারকে নিয়ে ঘর করে সে কথা জানা সত্ত্বেও?...

রূপা রিসিভারটা কানে চেপে আবার বলে, হ্যালো!

-হ্যাঁ আত্রেয়ী বলছি। লাইনটা কেটে গেছিল।

—বল।

—তোর কত্তাকে বলেছিলি আমার কথা? চিনতে পারলেন না কেন?

সেই এক কথা, রূপা মনে মনে ভাবে। মুখে বলে, চেনানোর চেষ্টা করলেই তো পারতিস্।

আত্রেয়ী হাসতে থাকে। —তুই বিল্লি কাটিস্‌নি কেন?

—মানে?—রূপা জিজ্ঞেস করে। আত্রেয়ী বলে,—বিয়ের রাতে বিল্লি কাটতে পারলেই তোর বরটা আর হিটলার হত না বুঝলি?

দুজনেই হেসে ওঠে টেলিফোনের দু'প্রান্ত থেকে। রূপা হাসতে হাসতে বলে,—বিল্লি কাটার ক্ষমতা কিংবা সাহস কোনওটাই আমার ছিল নারে।

—কেন? —আত্রেয়ী জানতে চায়, প্রেমে বুঝি তখন হাবুডুবু? তোর কত্তা এখন কোথায়? দে তো ওঁকে টেলিফোনটা? ভাল করে কড়কে দিই?

—ও বাথরুমে। শাওয়ারের জল পড়ার শব্দ শুনছিস না? —রূপা তাড়াতাড়ি বলে।

আত্রেয়ী বলে,—ও মা আজ তো রোববার। এখনই স্নান?

রূপা ফস করে একটা মিথ্যে বলে ফেলে,—বাইরে যাবে, অফিসিয়াল ওয়ার্ক।

—সত্যি, ব্যুরোক্রেটের বউ হয়ে তোর বড় জ্বালা। কেরানির বউ হলে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে পারতিস্।—আত্রেয়ী রগড় করে হাসে।

—উঁ হুঁ, সে ব্যাপারে আমি খুব সেয়ানা। কেরানির বউ হলে কি গাড়ি চড়া যেত? রূপা বলে।

—যা বলেছিস্। —দু'প্রান্ত থেকে দু'জনের হাসি। আত্রেয়ী বলে,—মনে পড়ে, কলেজের বন্ধু রায়ার কথা? রায়া বলত, প্রেমিকের গাড়ি না থাকলে, কিছু এসে যায় না, কিন্তু স্বামীর একটা গাড়ি চাইই চাই।

আমরা বলতুম—কেন?

রায়া বলত—প্রেমিকের সঙ্গে তো স্রেফ ওড়ার ব্যাপার। রাস্তায় হেঁটে যাওয়াতেও সুখ, পথ হোক অনন্ত ক্ষতি নেই। নৌকোয় চড়া যায় গঙ্গায়, ঝড় উঠলে মাঝগঙ্গায় দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়াজড়ি করলেও ক্ষতি নেই।

—আর যদি মৃত্যু হয়?

—হবে, গলাগলি করে মরতেও তো সুখ।

রায়া বলত—ট্রাম, বাস, শেয়ারের ট্যাক্সি যেখানে খুশি ভিড়ের মধ্যেও রোমান্টিক চোখদুটো খুঁজে নেবে দুজন দুজনকে। লোকাল ট্রেন ধরে ডায়মন্ড হারবার, কিংবা গ্রামের কোন মেঠোপথের আল ধরে চলো। পার্ক, লেক তো রয়েইছে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তো ওসব ব্যাপার নেই। ওড়াউড়ির সম্পর্ক প্রেমিকের সঙ্গেই চলে। তাই স্বামীর চাই গাড়ি। একটু আরাম, একটু বিলাসিতার জন্যে।

কথা শেষ করেই হাসতে লাগল আত্রেয়ী। বৃপা বলল—আর প্রেমিক যখন স্বামী?

আত্রেয়ী—ও চ্যাপ্টারটা আমার জানা নেই ভাই। —আবার হাসি।— সেটা বলতে পারবি তুই। আমার তো কাগজের বিজ্ঞাপনের বিয়ে। হি হি হি।

বৃপা বলে—কী জন্যে ফোন করেছিলি বল?

আত্রেয়ী—অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এ নাটক দেখবি? দুটো কার্ড আছে।

বৃপা—নাটক তো রোজই দেখছি।

—ঘরের? না বাইরের?

—ঘর আর বাইরে মিলেই তো সংসারের রঙ্গমঞ্চ? প্রতিদিনই যেখানে অভিনয়।

—যা বলেছিস ভাই।—আত্রেয়ী ফিস্‌ফিস্ করে বলে, কালও তো অভিনয় করে এলাম, ডায়মন্ড হারবার। কত্তা পাশে অথচ বুঝতেই পারল না। ওকে বোকা বানিয়ে ওরই বন্ধু সোমনাথ আমায় নিয়ে সারাদিন লঞ্চে ঘুরে বেড়াল।

—তোর কত্তা কোথায় ছিলেন?

—ও সারাদিন সাগরিকা হোটেলে পড়ে পড়ে ঘুমোল।

বৃপা চাপা নিশ্বাস ছেড়ে বলে—তারপর?

—তারপর ফিরে এসে ফের অভিনয়। কত্তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কয়েক ঘণ্টার বিরহ যন্ত্রণা যে কী প্রচণ্ড হতে পারে, কত্তাকে বোঝালুম।

রূপা বলে—আশ্চর্য, পারিসও বটে! শোন্ আমি ব্রেকফাস্ট তৈরি করছি। পরে কথা বলব।

—ব্রেকফাস্ট, তুই? কেন? কাজের লোক চলে গেছে? আজকালকার লোকজনও তেমনি বুঝলি? এরা সুখে থাকতে চায় না।

—হ্যাঁ,—রূপা সায় দেয়।

—আমাদের সন্ধ্যাও তো ড্রাইভারের প্রেমে পড়েছে। প্রশ্রয় পেয়ে আত্রেয়ী আবার কথা বাড়ায়।—কবে যে দুজনেই পালাবে?

রূপা ভুরু কোঁচকায়। ওর বিরক্তি ধরা পড়ে না আত্রেয়ীর ব্রেন কম্পিউটারে। রূপা ভাবে, আত্রেয়ীর কাছে জীবনটা যেন খেলা। একবার একে নিয়ে খেলছে আর একবার তাকে নিয়ে খেলছে। তিরিশের মাঝখানে এসেও ওর খেলা আর ফুরোল না। কত বয়স হল, আত্রেয়ীর মেয়ের? ওরা কেন বোঝে না জীবন মানেই খেলা নয়? ইচ্ছে করলেই প্রতিটি দিনকে দামি করে তোলা যায়। অথচ, আত্রেয়ী নামেরই আর একটি মেয়ে, যে ওর চেয়ে কিছুটা সিনিয়ার, আমেরিকায় থাকে, সে কিন্তু খুব চমৎকার মেয়ে। অসম্ভব গুণী। গত শীতেও কলকাতা এসেছিল। সে বলে, ডেজ আর কামিং। আমাদের হৃদযন্ত্র কিন্তু সে কথাই বলে রূপা। কাজ কর। কাজ করে যা। ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপ্।

একই নাম কিন্তু দুই নামের মালিকের মধ্যে কতটা তফাত। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রূপা লাইন কেটে দেয়। রিসিভার নামিয়ে রাখতেই দেখে, সৌরদীপ তখন শুয়ে। পাশবালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

—এই টেলিফোনটাই হয়েছে কাল। এক্কেবারে মেয়েলি আড্ডার বস্তু। এ জন্যেই কোথাও চেষ্টা করেও লাইন পাওয়া যায় না।—সৌরদীপ চোখ বুজেই গজর গজর করে। রূপা ত্যারছা চোখে একবার তার দিকে তাকিয়েই রান্নাঘরে চলে যায়।

—আসমানী! আসমানী!

সকাল হতে না হতেই আসমানী টি ভি চালিয়েছে। এ ব্যাপারে কাজের লোকজনকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলার ওস্তাদ সৌরদীপ। রূপা পইপই করে বারণ করেছিল, টি ভি'র অতগুলো চ্যানেলে আমাদের দরকার কী? স্টার টিভি, কেবল, ডিডি সেভেন...। সারাদিন ধরে অতগুলো চ্যানেল গাঁক গাঁক করে বাজে। তুমি তো অফিসে বেরিয়ে যাও। তারপরই আসমানী আর

হরিদাসীর রাজত্ব। চোদ্দটা চ্যানেলের হাঁকডাক আমায় পাগল করে দেয়।

আসমানীর সাড়া না পেয়ে রূপা বসার ঘরে গিয়ে দেখে, সে হিন্দি ছবি দেখছে। এই সাতসকালেই নরনারীর প্রেমের খেল। অত্যন্ত সস্তা দৃশ্য। সেক্সের এই কচকচানি দেখতে দেখতে আসমানীর মাথার স্ক্রু, নাট-বল্টু বেশ ঢিলে হয়ে গেছে। সাজগোজ বেড়েছে। ট্যুইজার দিয়ে ভুরু প্লাক্ট করতে শিখেছে। ঠোঁটে রঙ, নখে রঙ। বাহারি সালোয়ার-কামিজ-উড়নি। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে আসা সেই সরল-সাধাসিধে আসমানী আর নেই।

—আসমানী। টেলিভিশন বন্ধ কর। আমি বলেছি না, সকালবেলা টিভি নয়?

—পূজা বেদির ছবি, অ বউদি! একটু দেখতে দাও না গো। আমির খান নায়ক গো।—আসমানীর কাতর গলার স্বরেও মন টলে না রূপার। ও খট্ করে টিভিটা বন্ধ করে দেয়।

—তোকে না লেখাপড়া করতে বলেছিলুম আসমানী? বইটই কিনে দিলুম। সেদিকে মন নেই না?

অপমানিত আসমানী তেড়ে ওঠে—পড়ার সময় পাই? শুধু কাজ, কাজ।

রূপা হেসে ওঠে—টিভি দেখার সময় কী করে হয়? যা পেঁয়াজ কুঁচি কর। আমি চপ বানাব।—রূপা কথা শেষ করেই রান্নাঘরে চলে যায়। আসমানী খুব গোঁয়ার। সে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে। পেঁয়াজ কাটায় আর মোটেই আগ্রহ নেই। রূপারও তো বেশি খ্যাচখ্যাচ করা স্বভাব নয়। ও নিজেই পেঁয়াজ-টেঁয়াজ কেটে নেয়। রূপা ভাবে, ছ্যাকড়া গাড়ি নিয়ে কতদিন পোষায়? আসমানীটাকে ও মানুষ করতে চেয়েছিল। লেখাপড়া শেখাবে। ভেবেছিল, মাধ্যমিক আর হায়ার সেকেন্ডারিটা দেওয়াবে। সৌরদীপের আবার এ ব্যাপারে খুব আপত্তি। সে বলে, কাজের লোকগুলোকে লেখাপড়া শেখালে মাথায় চড়ে বসবে। ওদের বুদ্ধি খুলে গেলে তুমি সামলাতে পারবে? আর তুমি কাজ পাবে ভেবেছ?

রূপা তার উত্তরে বলেছে, কাজের লোক, কাজের লোক বলবে না তো? ওরাও তো মানুষ। আহা!

সৌরদীপ বলে—কে বারণ করেছে?

—তবে ওকে লেখাপড়া শেখানোতে আপত্তি কীসের?—রূপা প্রশ্ন ছোঁড়ে।

—বিপদ বাড়বে যে। চোখ-মুখ ফুটবে না? তোমার আরামটা কী করে হবে শুনি?— সৌরদীপের গলায় ঝাঁজ।

চপ বানাতে বানাতে রূপা ভাবে, আসমানীটা কিছুতেই বড় হতে চায় না।

চিরকালই কি ও কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকবে? ওর গণ্ডি পেরিয়ে ইচ্ছে করলেই তো ও সমুদ্রে পৌঁছুতে পারে। ওই দূরদর্শনের পর্দায় ফুটপাথের লোকটাকে সংগ্রাম করে টাইপিস্ট হতে দেখে, ও যখন চেঁচিয়ে ওঠে কিংবা গরিবের ছেলে যখন হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামিকে জেরা করে, প্রচুর পরিশ্রমের পর যখন তার গায়ে কালোকোট, শামলা ওঠে, আসমানী যখন তাই দেখে হাততালি দেয়, বূপা তখন বলে,—অত চিৎকার কেন? তুইও তো ইচ্ছে করলে ওইরকম হতে পারিস?

আসমানী তখন ঠোঁট উল্‌টে বলে, ওসব ভাগ্যে হয় গো বউদি। সবাই যদি উকিল-জজ হবে, তবে তোমার বাসন মাজবে কে?

বূপা ওর কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ওঠে। আসমানী বলে, আমরা হলুম গিয়ে বউদি গেরামের মেয়ে। ওটাই আমাদের কপালের নোটিশ গো। এই তো আসছে বছর মা বিয়ে দেবে। ভাতারের জন্যি ভাত রাঁধব। বাদায় ভাত নে যেতে দেরি হলিই নাথি খাব। বেশ ফুইরে গেল। ছেলে-পুলের মা হব। সোয়ামী আরও এট্‌টা-দুটো বে করবে। সতীনের ঘর করব গো বউদি। — চোদ্দ বছরের আসমানী পাকা বুড়ির মত কথাগুলো বলে আর হাসে।

বূপা হেরে যায়। ও ভাবে, এতকাল ধরে যা চলে আসছে, তাকে পাল্টান খুব কঠিন। ঠিকই তো বলেছে, ও রাজি হলেই বা ওর মা রাজি হবে কেন?

বূপার যদিও আসমানীর ওপরে এই মুহূর্তে খুব রাগ। ওর অবাধ্যতা হজম করতে হয় বলে।

আসমানীর দলের কী দুর্ভাগ্য। নইলে বূপার মত শুভাকাঙ্ক্ষীকে হাতছাড়া করে? বূপা মনে মনে আস্‌মানীকে কতবার একটা মই বানিয়ে দেয়। বলে, আসমানী। যা ওঠ। প্রথমে হোঁচট খাবি। তারপর তরতর করে উঠে যাবি। আমি ধরে আছি। কোনও ভয় নেই। কিন্তু আসমানী উঠতে পারে না।

জানলার বাইরে একফালি আকাশ। আকাশের গায়ে উড়ন্ত মেঘের আঁকিবুঁকি দাগ। বূপা অন্যমনস্ক হয়। ছাদের তারে একটা শুক্‌নো কাপড় উড়ছে। শাড়িটা খুব চেনা চেনা লাগে ওর। অথচ চিনতে পারে না বূপা। কার পরনে দেখেছিল যেন? শাড়িটা গতকাল থেকে পতাকার মত উড়ছে। অথচ তার মালিকের গরজ নেই ওটা তোলার। কোন ফ্ল্যাটের শাড়ি? বূপাও খুব হিসেবি নয়। এসব গোলমাল ওরও প্রায়ই হয়ে থাকে। ছাদের উড়ন্ত শাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনটাই হারিয়ে যায়। গ্যাসে চাপান বাদাম তেলের গন্ধ একসময় নাকে আসে। বূপা চমকে ওঠে।

বূপার পরিশ্রম বাড়ে। প্যান পরিষ্কার করে ও ফের নতুন করে প্যান

চাপায়। সৌরদীপের খাওয়া নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু প্রতিটি কাজ নিঁখুতভাবে না করলে রূপার সোয়াস্তি নেই। ও যেন জীবনের কাছে অলিখিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। কোথাও ফাঁকি দেবার উপায় নেই। কোন শিকারীর চোখ ওকে যেন সারাক্ষণ পাহারা দেয়।

আসমানী দৌড়ে আসে। ---বউদি। পুইড়ে ফেললে তো? দাও আমায় মেজে দিই?

রূপা কট্‌মট্‌ ভঙ্গিতে ওকে দেখে। কোনও কথাই বলে না। আসমানী ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নখ খোঁটে। ওর এই অপরাধী ভাবটার সঙ্গে রূপা খুবই পরিচিত। ও মনে মনে ভাবে, ছেলেমানুষের স্বভাব। কিন্তু রূপার চোখের চাউনি আর ব্যবহারের কোনও পরিবর্তন হয় না। তাড়িয়ে দিতেও তো ওকে পারে না। গরিবের মেয়েটা কোথায় যাবে? সবাই কি ওকে ক্ষমা করবে? নিজেদের সমাজের দাঁড়ি-পাল্লায় আসমানীকে মনে মনে ও ওজন করে।

শোবার ঘরে থেকে সৌরদীপের গলা ভেসে আসে। টেলিফোনে ও চেঁচিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। হাসছে। আড়িপাতার অভ্যেস নেই রূপার। তবুও কৌতূহলী হয়। সৌরদীপ বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি প্রজেক্টটা তৈরি করুন। কী বললেন, —নেক্‌সট বোর্ড মিটিংয়ে? ...ইয়েস—ইয়েস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিল্‌টা ইস্যু হতে সময় লাগবে না। কী বলছেন? কেমন আছি? এককথায় চমৎকার। কী বলছেন? সপরিবারে? দূর মশাই আজকালকার দিনে আর পরিবারটা কোথায়? হা... হা... হা। তাইতো বলছি, পরিবার শব্দটাই আজকের যুগে প্রহসন। কী বললেন? চলে আসুন। চলে আসুন। হ্যাঁ বাড়িতেই থাকব। তারপর অ্যাকরডিং টু মুড। ক্লাবে? ঠিক আছে। সেভেন পি. এম.? ও.কে.। বাই...। সৌরদীপ রিসিভার নামিয়ে রাখতেই রূপা বলে—মুখ ধোও খাবার তৈরি।

—পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে রূপা। সৌরদীপ পেছন ফিরে তাকায়।----আমি একটু বেরুব।

---যা ইচ্ছে তোমার। শুধু ব্রেকফাস্টটা খেয়ে নিতে বলছি।

—আমায় খাইয়ে তোমার লাভ?

—লাভ-লোকসানের হিসেব করে তো বলিনি।

—নিশ্চয়ই বলেছ। আমি কিন্তু টাকা দিতে পারব না।

---টাকা, কীসের টাকা?

—শব্দটা তোমার কাছে নতুন মনে হচ্ছে?

—না না, নতুন হবে কেন? কিন্তু আপাতত কোনও উদ্দেশ্যই নেই। তোমার শরীর খারাপ হবে, এম্‌টি স্টমাকে বেরিয়ে যাবে, তাই বলছি, কোলাইটিজে ভুগেছিলে কিছুদিন?

—আমায় নিয়ে তো তোমার দারুণ মাথাব্যথা। তোমার উদ্দেশ্য ধরতে পারিনি অত বোকা আমি নই। তোমার মত মহিলার ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ পড়েনি। একথা বিশ্বাসই বা করি কী করে?

রূপা রাগ করে না। ঝরঝর করে হেসে ফেলে। বলে, সত্যি কিন্তু আমার মাথায় ওসব আসেনি। আমি সরল মনেই...।

সৌরদীপের ব্যঙ্গের হাসি।—কি সরল? আচ্ছা, পরগাছার মত বেঁচে থাকতে তোমার খারাপ লাগে না?

—মানে? রূপা ভুরু কোঁচকায়। সৌরদীপ বলে, মানেটা খুব সোজা। আমার পকেটের ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বী হয়ে যাও না কেন? পরের জন্মে যেন মেয়ে হয়ে জন্মাই। পরের ঘাড়ে চেপে শ্রেফ চলব।

—সৌরদীপ সিগারেট ধরায়। বলে, পকেটটা ফাঁকা করে দিল।

রূপার অপমানটা হজম করতে একটু সময় লাগে। বলে, আহা! আমার জন্যে তোমার পকেটটা কত ভর্তি করে রেখেছ?

সৌরদীপ ফের ফোঁস করে ওঠে, সংসারে কত খরচা হয় জান?

রূপা আস্তে করে বলে, তোমার টাকা আছে, তাই খরচা হয়।

সৌরদীপের জোড়া ভুরু ধনুকের মত বেঁকে ওঠে। সে বাজপাখির চোখ নিয়ে রূপার দিকে তাকায়। চাওনিটা বড় বেশি উগ্র, রুক্ষ। রূপা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।

সৌরদীপের গলার ঝাঁঝ বাড়ে। সে বলে, স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী স্বাধীনতা করে তো গলা ফাটিয়ে মেয়েরা চেঁচাচ্ছে। সত্যি কি তাঁরা স্বাধীনতার কথা ভাবছে?

রূপা জানলায় হেলান দিয়ে বোবা চোখে ওকে সামান্য দেখে। তারপর বলে, স্ত্রী স্বাধীনতা বলতে তুমি কী বুঝেছ জানি না।

সৌরদীপ সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে রেখে বলে, পরের ঘাড়ে বসে না খেয়ে নিজের রোজগারে খাওয়া এবং আরেকজনকে অব্যাহতি দিয়ে কেটে পড়া।

রূপা হেসে ওঠে। বলে, তাই না তাই। আগে স্ত্রী স্বাধীনতার মানে বোঝো তারপর শব্দটা ব্যবহার কর।

সৌরদীপ বলে, তোমার মানে যাই হোক, আমার সাফ কথাটা জানিয়ে দিলাম।

রূপার চোখে জল আসে। অভিমানে নয়। অভিমান তার ওপরেই হতে পারে, যে অভিমানের দাম দেয়। সৌরদীপের মধ্যেও বেশ পরিবর্তন লক্ষ করছে। কিন্তু রূপা কিছুতেই বদলাতে পারছে না। ও বুঝতে পারে না, এটা সৌরদীপের ঠাট্টা কি না। কিন্তু যদি ঠাট্টাও হয়ে থাকে, তবে সেই ঠাট্টার মাত্রা কী ভয়ংকর।

রূপা চুপ করে থেকে বলে, তুমি আজকাল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায়ই কথাটা বল। আমি যদি সরে যাই তাহলে কি সুখে থাকবে?

সৌরদীপ বাঁকা গলায় বলে, নইলে আর বলছি কেন?

তখনো রূপা ওর রসিকতা ভেবে হাঁ করে তাকায়। কৌতুকের গলায় বলে, ভালই তো আমি চলে গেলে তোমার কী হাল হয় দেখব। বাড়িটাকে তো মেসবাড়ি বানিয়ে ছাড়বে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমার প্রেমিকাটি কে বলত? অবশ্য নাম্বার ওয়ান তো নয়, নাম্বার টু, নাম্বার থ্রি, নাম্বার ফোর... ।

সৌরদীপ সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে বলে, বলে যাও, বলে যাও।

রূপার মুখ গম্ভীর। সৌরদীপের ঠোঁটে হাসি। রূপা বলে, মিসেস বাগচীর তুমি ক'নম্বর নায়ক?

—কী বাজে বক্‌ছো। — সৌরদীপ বুদ্ধিমানের মত কথা ঘুরিয়ে বলে, মগজে কিস্যু নেই। চিন্তার গভীরতা ওইটুকুই।

রূপা বলে, বড় বেশি সত্যি বলে ফেলেছি কিনা।

—সত্যি? কী সত্যি?—সৌরদীপের ঠোঁটে সিগারেট পুড়তে থাকে। সে যেন রূপাকে জরিপ করতে থাকে।

বাইরে কলিং বেলের শব্দ হয়। বন্ধ দরজার ওপার থেকে আসমানীর সেই নিয়মমাফিক প্রশ্ন, কে?

প্রশ্নটা সেরেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ও দরজা খুলে দিয়েই চলে যায়। সৌরদীপ ডাকে, আসমানী?

—যাই দাদাবাবু।—আসমানী সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কে এসেছে?

আসমানী বলে, নাম তো জিজ্ঞেস করিনি।

—কাকে দরজা খুলে দিয়ে এলে একবার দেখলে না? নাহ্। এরা আর মানুষ হল না। ট্রেনিং যা পাচ্ছে, হবেই তো? —সৌরদীপ আড়চোখে রূপার দিকে তাকায়। যেন ট্রেনিংটা রূপার কাছ থেকেই পাওয়া। রূপা বিব্রতভাবে

আসমানীকে বলে, তোকে বলেছি না ম্যাজিক আইতে চোখ না বুলিয়ে দরজা খুলবি না? যিনি এসেছেন তাঁর নাম জিজ্ঞেস করবি। কাকে চান? সেটাও জিজ্ঞেস করতে হবে?

আসমানী আবার বসার ঘরের দিকে চলে যায়। নামধাম জানতে। রূপার মাথার মধ্যে সেই পুরনো চিন্তার জট পাকাতে থাকে। ও সত্যিই কি চলে যাবে? ও যে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সৌরদীপের মধ্যে কোনও ফাটল ধরেছে কি না। রূপা বিপন্নবোধ করে। দুজনে একই ছাদের তলায় বাস করছে। এক ঘরে রাত কাটিয়েও কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না কেন?

সৌরদীপের ঠোঁটে তখন সিগারেট পুড়ছে। ওকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওর চোখের সামনে বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগছে না রূপার। রূপা ট্রানজিস্টার বগলে করে পাশের ঘরে চলে যায়। ও এলোমেলো সেন্টার ঘুরোতে ঘুরোতে বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রাম শুনতে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের গান, বিজ্ঞাপনের গলার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েও রূপা তার পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলতে পারে না। নিজেকে এই মুহূর্তে ওর খুব অসহায় লাগে। সৌরদীপের এ আবার কোন খেয়াল? ও কি সত্যিই চায় না রূপাকে? ফাটল একটা তৈরি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তেমন কোনও দূরত্ব তো এখন চোখে পড়ছে না। স্ত্রীকে কোলবালিশের মত জড়িয়ে না শুলে যার ঘুম হয় না, অন্য মহিলার সঙ্গে তার প্রেমের দৌড়টা কদ্দুর হবে? ব্যাপারটা যদি এইরকম হয়? সৌরদীপ ওকে ক্ষ্যাপানোর জন্য উল্টোপাল্টা ব্যবহার করছে? ওটা স্রেফ ওর মজা। সৌরদীপের নতুন ধরনের ভান। একটু-আধটু যদি প্রেম-টেম হয়, হোক না, একটা-দুটো সন্ধে ওরা যেভাবে খুশি কাটাক, ঘরের লোক ঠিকই ঘরে থাকবে। খবরটা তো উড়ো খবরও হতে পারে? মিসেস বাগচীর খপ্পরে পড়েছে সৌরদীপ। অফিস থেকে ফেরে রোজ এগারোটায়। অফিস থেকে বেরোয় ওদিকে ছটায়। তবে সে কোথায় যায়? গড়ের মাঠ? গঙ্গার পাড়? বালিগঞ্জ লেক? ভিক্টোরিয়া? যেসব জায়গায় রূপাকে নিয়ে সে ঘুরত? পার্ক স্ট্রিটের হোটেল, পানশালা, শব্দগুলো রূপা মনের মধ্যে মাছি তাড়ানোর মত করে তাড়ায়। রূপা এখন সেই সুস্থ মানসিকতাকেই নিজের মধ্যে তৈরি করতে চেষ্টা করে। দু'জনের মধ্যেকার গুমোট আবহাওয়াটা যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে। রূপা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

আসমানী খবর দেয়, শৌভিক মল্লিক এসেছেন। বউদিকে ডাকছেন।

সৌরদীপ রূপা যে ঘরে, সেই ঘরের মধ্যে দিয়েই চটির ফটাফট শব্দ তুলেই যাওয়ার সময় রূপার দিকে একবার তাকিয়ে গেল। রূপার কৈফিয়ত দেবার মত

করে নিজেকেই যেন শোনায়, উজ্জয়িনীর স্বামী শৌভিক মল্লিক? হঠাৎ আবার কী দরকার? ওর বাকি কথাগুলো শেষ করার আগেই সৌরদীপ চলে গেছে। খালি ঘরে নিজের শেষ কথাগুলো রূপার নিজের কাছেই কেমন শোনাল।

—এই যে কী খবর?—রূপা শৌভিকের উল্টোদিকের সোফায় বসে বলল। শৌভিকের চোখ নেচে ওঠে রূপাকে দেখলেই যেমন, তেমনি প্রগলভ ভঙ্গিতে বলে বসল, তোমার পাড়ায় ফ্ল্যাট নিচ্ছি।

—কোথায়? —রূপা তাকাল।

—এই তো তোমার পাশের খালি জমিটায় যে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংটা হচ্ছে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম গুড মর্নিংটা তোমার সঙ্গেই হবে। তোমার মুখটাই প্রথম দেখব। কী বল মেমসাব? শৌভিকের সেই স্বভাবরসিক চাপল্য। যা রূপার একেবারেই পছন্দ নয়। আর সেই কারণেই সৌরদীপও একে সহ্য করতে পারে না।

তবু হাসল। বলল, হ্যাঁ, আমার দুর্ভাগ্য।

—দুর্ভাগ্য? কেন?

—আপনার মুখটা দেখতে হবে বলে।

—শুধু কি আমি? উজ্জয়িনী নয়? ও তো বেজায় খুশি রূপশ্রীর বাড়ির কাছে থাকব বলে।

—হ্যাঁ, উজ্জয়িনীর কথা আলাদা। আমরা তো অনেকদিনের বন্ধু। সেই টুকিখেলার বয়স থেকে।

শৌভিক বলল, আর আমি?

—আপনি তো উজ্জয়িনীকে বিয়ে করার পরে।

—আর সম্পর্কটা?

—বন্ধু-পতি? —রূপা হেসে বলল।

—নাহ্। রূপা! তোমার এই নীতিবাগীশ ব্যাপারটা কিছুতেই অ্যাড্‌জাস্ট করা যায় না আজকের প্ল্যাটফর্মে। আমিও তোমার বন্ধু। একথা স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

—ইচ্ছে করলেই কি বন্ধু হওয়া যায়? বন্ধু নন, কী করে বন্ধু বলি?

শৌভিক বলল—তুমি দেখি সেই রাগটা আজও পুষে রেখেছ? অথচ ব্যাপারটায় আমার কোনও হাত ছিল না, তোমার বন্ধুই একটা উড়ো চিঠি দিয়ে। আচ্ছা, তুমি কি আমায় বিশ্বাস করবে না?

রূপা বলল, সেই কবেকার কোন বস্তাপচা কাহিনি, অন্যকথা বলার থাকলে বলুন।

শৌভিক—বন্ধু যখন নই, তখন আর সময় নষ্ট করে কী হবে?

রূপা—বন্ধু-পতি হিসেবে নিশ্চয় খানিকটা অধিকার দাবি করতে পারেন। ওর চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

—উঁহু, ফিপ্‌টি ফিপ্‌টিতে আমি রাজি নই।

—শৌভিক হাসতে হাসতে সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ল। অবশ্য প্রতিবেশী হলে ব্যাপারটা উসুল করে নেব। যাক্ কবে খাওয়াচ্ছ বল?

—কী মুশকিল! খাওয়াবেন তো আপনি। নতুন ফ্ল্যাট কিনছেন সেলিব্রেট করবেন না?

—তুমি খেতে চাইলে সবসময় রাজি। তবে ফ্ল্যাটের জন্যে নয়। পকেটটি কেটে কুড়ি লাখ টাকা নিয়ে নিচ্ছে প্রমোটার। নেবে না? রাসবিহারী এভিনিউয়ের মত জায়গা।

—আপনার টাকা আছে, তাই নিচ্ছে। আমাদের টাকা নেই, তাই প্রমোটার নেই।

—কেন এই ফ্ল্যাটটা?

—এটা তো কোম্পানির ফ্ল্যাট। ওর কোম্পানি ওকে ভাড়া দেয়। চাকরি ছেড়ে দিলেই ব্যস নট।

—কিন্তু উজ্জয়িনী তো আহ্লাদে আটখানা। তা পাখি যদি উড়েই যায়, পাশের ফ্ল্যাটের শূন্য খাঁচায়, উজ্জয়িনী একা থেকে কী করবে?

রূপা বিড়বিড় করে বলল—খাঁচা? স্বীকার করছেন তাহলে?

শৌভিক সিগারেটে একটা সুখটান মেরে বলল—স্বীকার না করে আর কোথায় যাই? তোমরা আমাদের খাঁচায় পোষা পাখি। মেয়েরা পুরুষের চোখে একটা মেয়েমাত্র। তোমাদের দুঃখ আমি বুঝি।

—শুধু দুঃখ বুঝে কী হবে। শরিক না হয়ে?

কথার খেদটা ধরতে পেরে শৌভিক বলল, কেন তোমার বন্ধুটিকে তো সে ব্যাপরে আমি ঘাটতি রাখিনি? আমি তো জলেই ভেসে বেড়াই। বাড়িতে থাকি কদিন? লিবার্টি তো ওর হাতেই রয়েছে।

রূপা কথার মোড় ফিরিয়ে হঠাৎ ডাকল—আসমানী! আসমানী!

রূপার ক্ষেত্রে দুটি বাক্য খরচ না করলে আসমানীর দেখা পাওয়া দায়।

—তোমার বন্ধুটিই বরং গেঁতো, বাইরের দুনিয়ার খবর কিস্যু রাখবে না। নড়ে-চড়ে চারদিক ঘুরেফিরে একটু দেখবে না জমানা কীভাবে বদলাল। অথচ তুমি?...

আসমানী এসে দাঁড়াল। রূপা বলল, কফি কর।

শৌভিক বলল, মিস্টার রায়চৌধুরীকে দেখছি না তো? উনি কি হলিডে করতে বেরিয়েছেন?

রূপা সামান্য বিব্রতবোধ করে। কী বলবে ভেবে পায় না।—এই তো বাথরুমে ঢুকল। বেরুবে বোধহয়।

শৌভিক খুব অবাক হল—রায়চৌধুরী বাড়িতেই রয়েছেন? উনি কি জানেন না আমি এসেছি?

—জানে। আসলে ও ব্যস্ত থাকায়... । আপনি কি এখন কলকাতাতেই পোস্টেড? গার্ডেনরীচে?

—না না, ওই যে বললুম, এখনো আমি ভেসে বেড়াচ্ছি জলে? ইউরোপে ঘুরছি। লিভারপুলে জাহাজ থেকে নেমেছি। তারপর হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইটে কলকাতা। এই তো সপ্তাহখানেক আগেই ফিরেছি।

শৌভিক বলল, এই সামারে তোমরা কি কলকাতায় থাকছ? না বাইরে-টাইরে যাচ্ছো?

—ঠিক নেই। ছেলে, মেয়ে দার্জিলিঙ-এ আছে, ওদের আনতে যাবে সৌরদীপ।

—তুমি যাবে না?

—ওরা ফিরলে আমরা সবাই হয়ত কোথাও যাব। এইরকমই প্ল্যান আছে।

শৌভক বলল—যা ভিড়। বাইরে যাবার হিড়িকটা বাঙালির আজকাল খুব বেড়েছে।

রূপা কথা কেড়ে নিয়ে বলল, মোটেই না। বাঙালি চিরদিনই ভ্রমণবিলাসী। ছুটি ছাটা পেলেই কলকাতার লোকেরা বাইরে পালায়।

শৌভিক বলল, তা সত্যি। তবে সে আর কজন? সকলেরই কি আর যাবার সঙ্গতি ছিল? ট্রাভেলিং অ্যালাউন্সের টাকাটা পাবার পর থেকেই না বাঙালির কিউ পড়েছে বেশি হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে? কেউ রাজস্থানে ছুটছে, কেউ কাশ্মীর, কেউ সাউথ ইন্ডিয়া। তলপি-তলপা, আণ্ডা-বাচ্চা, ঘুর-ঘুরি সব বগলদাবা করে চলাও... । চরৈবেতি।

সিগারেটে আর একটা টান মেরে শৌভিক হাসতে লাগল। ধোঁওয়া গিলল সে। ধোঁওয়ার রিঙ ছুঁড়ল। পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁওয়াটাকে ওপরে উঠে যেতে দেখল। তারপর বলল, ওদিকে পেটে ছুঁচোর কেত্তন, ফিরে এসে খাব কী জানি না। দিব্যি পুরী, দীঘার হোটেলের খরচ জুটে যাচ্ছে। ইদানীং কাশ্মীরে কিছুটা ডিসটার্বনেস থাকায় অন্যান্য হিল স্টেশনের ভিড়টা বেড়েছে।

শৌভিক আবার নড়েচড়ে বসল। বলল, গতবছর তো দার্জিলিঙ গেসলুম আমরা? ওখানে দেখি, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পর্যন্ত ট্যুরিস্ট শুয়ে রয়েছে। হোটেলের জায়গা নেই। — শৌভিক হাত নেড়ে বলল, ইয়েস ফ্যাক্ট। হিল ডাইরিয়ায় অনেকেই রীতিমত মরতে বসেছিল।

রূপা ওঠার জন্যে উস্‌খুস্‌ করছিল। ও বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। যদি সৌরদীপ আসে। ও পালাবে। কিন্তু ওদিকে বাথরুমে জল পড়ার শব্দ বন্ধ হয়েছে। তবু সৌরদীপের পাত্তা নেই। কথা চালানোর জন্যেই রূপা জানতে চাইলে, প্রমোটারকে কত টাকা অ্যাডভান্স দিলেন?

—দুটো ক্ষেপে দিতে হবে। আজ দিলুম দশ লাখ। পজেশান পাওয়ার আগে দোব দশ। আসলে আমি ইচ্ছে করেই তো দুটো ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা করলুম। ইন্‌ ফ্যাক্ট পরে যদি ওরা আমায় ঝোলায়? তা বলছে, ফ্ল্যাট হাতে পেয়ে যাবে ছ'মাসের ভেতরে।

শৌভিকের চোখেমুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। রূপা বলল, সিমেন্টে আবার গঙ্গামাটির খেলা নেই তো, দুদিন পরেই তাসের ঘর না হয়ে যায়? ল্যান্সডাউন, ভবানীপুরে কিভাবে বহুতলগুলি তাসের বাড়ি হয়ে গেল?

শৌভিক বলল, না, আজকাল প্রমোটারদের ওপরেও খুব কড়াকড়ি হয়েছে। অতটা আর পারবে না।

রূপা হাসল, মে গড ব্লেস ইউ।

তারপরই রূপা বলল, টাকা যেন হাওয়ায় উড়ছে। লোকের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা। মাটি ফুঁড়ে টাকা উঠছে? টাকার শেকড় গজাচ্ছে? নাকি ম্যাজিসিয়ানের ভোজবাজির মত টাকার জন্ম হচ্ছে? কিস্যু বুঝি না। অথচ ফুটপাথে ভিখারীদের সংখ্যা বাড়ছে। খেতে না পেয়ে মানুষ ধুঁকছে। মরছে কুকুর-বেড়ালের মত।

শৌভিক সিগারেটের ধোঁয়া গিলল। কিছু কিছু না মরলে জায়গা খালি হবে কি করে? যারা মরার তারা মরবেই। যার ক্ষমতা আছে, সে থাকবে বেঁচে। রূপা বলল, বাহ্‌ চমৎকার। বাঁচার পদ্ধতিটা সত্যিই দারুণ। ফুটপাথে ভিখারী মরছে। তাদের চোখের সামনে বহুতল বাড়িতে জ্বলছে ফ্লুওরোসেন্ট লাইটের আলো।

—নাহ্‌! তুমি দেখছি বেজায় ক্ষেপে রয়েছ?

—শৌভিক হাসল। রূপা বলল,—হাসবেন না? চারদিকে এত কালো টাকা, চোখে যে অন্ধকার দেখছি। আসমানী কফি নিয়ে এল। কফির কাপে চুমুক মেরে শৌভিক বলল, তুমি খাবে না রূপা?

—বেশি কফি খেলে ইন্‌সমনিয়ায় ভুগতে হয়। আর রাত্তিরে ঘুম না হলেই পরদিন মেজাজ গরম।

—বুঝতে পারছি কাল ঘুম হয়নি। এক কেটলি ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসতে বল, তোমার মাথায় চাপিয়ে দিই। জলটা একটু ফুটুক।

—শৌভিক ঠাট্টার গলায় বলল। রূপাও হাসল। শৌভিক বলল, ইন্‌সমনিয়া কেন? তুমি কি সারা রাত জেগে আমার কথা ভাব? —শৌভিক টানটান দৃষ্টি ছুঁড়ে তাকাল। তার এ ঠাট্টাটিও হজম করতে করতে রূপা বলল,

—তা-যা বলেছেন, আর একজনকে স্টাডি করার এই ক্যাপাসিটিটা কবে থেকে হল? —রূপা চোখ বড় বড় করে তাকাল। শৌভিকও ঘাবড়ানোর পাত্র নয়। দুম করে বলে বসল, যবে থেকে তোমায় প্রথম দেখেছি? আচ্ছা, পালটা-পালটি করলে হয় না? তুমি লেফট রাইট ভঙ্গিতে সোজা আমার কাছে চলে এসো, আর উজ্জয়িনী চলে যাক সৌরদীপের কাছে। তোমার মত স্পিরিটেড মেয়ের খুব দরকার।

—মেয়ে? রূপা হেসে উঠল। শৌভিক হেসে বলল,

—থুড়ি! কি বলব প্রেমিকা? না বউ? তোমার দিকেই তো লাইনটা মেরেছিলুম? কোত্থেকে তোমার বান্ধবীটি এসে বাজপাখির মত আমায় ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

রূপা বলল, আহা, লাইন মারলেই বুঝি পাওয়া যায়?

শৌভিক বলল, আমার তো ধারণা পাওয়া যেত।

—তবে সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকুন।—রূপা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—বেশ, পালটা-পালটিতে রাজি তো? আরে বাবা, মুখ বদলে দ্যাখোই না একবার? স্বামী বা প্রেমিক কোন হিসেবেই আমি খুব খারাপ নই।

রূপা মুচকি হেসে বলল, ভেবে দেখি।

—কদিন সময় নেবে?—শৌভিকের প্রশ্ন। রূপার উত্তর, বছর দশেক?

—কি সাঙ্ঘাতিক। তদ্দিনে যে চুল পেকে যাবে?

রূপা বলল, ডাই করে নেব! আহা কি প্রেম। চুলে সাদা ছোপ ধরলেই ভয়?

শৌভিক বলল, ভয়টা মোটেই সাদা চুলকে নয়। মনটা যদি চুলের মত বুড়িয়ে যায়, সেই ভয়। বিউটি পারলারের পয়সা গুনতে রাজি। তার আগে... ।

রূপা ওকে শেষ করতে দেয় না। বলে, তা আগে মনটা বুড়িয়ে যাবে না এই শর্ত? বেশ তো মোক্ষম এক তালাচাবি বানিয়ে ফেলুন। খুব করে খিল এঁটে দিন। মন। তুমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক। ব্যস্ চুকে গেল ল্যাঠা।

শৌভিক ড্যাবড্যাব করে ওকে দেখল। বলল, তবুও যদি চোর এসে সিঁধ কেটে নিয়ে যায়?

সঙ্গে সঙ্গে রূপার উত্তর, চোরের ওপরেও বাটপার রয়েছে না?

—গুড্ গুড্ ভেরি গুড্। —শৌভিক হাততালি দিল। বলল, তুমি কেন যে ল পড়লে না রূপা!

—মিথ্যে কথা বলতে পারব না বলে।

—রূপা ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। শৌভিক বলল, তা এখনই কি খুব সত্যিবাদী যুধিষ্ঠিরের মত কথা হচ্ছে? বারো আনাই মিথ্যে নয় কি?

রূপা—বারো আনা কেন? ষোলো আনা বলতে কি হার্টে লাগছে?

ওর কথাটা লুফে নিয়ে শৌভিক বলল, নিশ্চয়। বেচারী প্রথম পক্ষ পথে বসে যাবে।

রূপা হেসে উঠল। বলল, টানটা সেই প্রথম পক্ষের দিকেই তাই না? অথচ একটু আগেই হাত বদলের কথা কি একটা বলছিলেন না?

শৌভিক—হাত বদল হলেই কি আমায় রেহাই দেবে? আমার প্রথম পক্ষ সেই তো প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান করতে করতে আমার কাছেই দৌড়বে। ওই ন্যাগিং মহিলার হাত থেকে আমার রেহাই নেই।

ওরা ভূত দেখার মত চমকে উঠল। সৌরদীপকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

—এই যে আসুন মিস্টার রায়চৌধুরী! আপনার কথাই হচ্ছিল।—শৌভিক বলল, আসুন, বসুন।

ওর ভাবখানা এই, যেন বাড়িটা ওরই।—নিন্ সিগারেট খান।

শৌভিক নিজের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল। সৌরদীপ ততক্ষণে বসে পড়েছে। ধীরে-সুস্থে সিগারেটটা হাতে নিল। ঠোঁটে গুঁজল। ধোঁওয়া ছেড়ে বলল—আপনাদের নাটকটা কিন্তু ভালই জমে উঠেছিল। আমি এসেই বাগড়া দিলুম। কি বলুন?

সৌরদীপ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছুঁড়ল রূপার দিকে। শৌভিক বলল, হ্যাঁ, নাটক নাটকই। নাটকটা যদি সত্যি জীবন হত, তাহলে তো ভালই উতরে যেত। সৌরদীপ আধভাঙা হাসি ছুঁড়ল। বলল, অসুবিধেটা কোথায়? জীবন বলে চালিয়ে গেলেই হত? আমার বউ কি এ ব্যাপারে পারদর্শী নয়?

সৌরদীপের কটাক্ষ রূপার দিকে। রূপা বলল, আবার আমায় নিয়ে কেন?

শৌভিক রূপার কথাটা গায়ে না মেখে সোজা সৌরদীপের দিকেই তাকাল। বলল, রূপা পারদর্শী না হলে তো বাঁচা যেত। চাহিদা সম্পর্কেই যে ওয়াকিবহাল

নয়। আসলে ও নিজেকেই ভালবাসতে শেখেনি। এটা আপনার ডিসক্রেডিট মশাই।

শৌভিকের সোজাসুজি আক্রমণটা গিলতে গিলতে সৌরদীপ হাসিমুখে বলল, কি একটা বদলির ব্যাপার শুনছিলুম?—শৌভিকের গলায় ব্যঙ্গ।

—ইয়েস মনে পড়েছে। ---সৌরদীপ সিগারেটের ধোঁওয়াটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল। —আপনার সাফ ব্রেনের জন্যে ধন্যবাদ মিস্টার মল্লিক। পালটা-পালটির খেলাটা চলুক তাহলে? দেখা যাক্ দুজনের এক্সপেরিমেন্টে কে বেশি সফল হয়? আপনি না আমি? বলুন, বউ পাঠাচ্ছেন কবে?

এভাবে সরাসরি আক্রমণে শৌভিক ঘাবড়ে গেল। রূপার চোখদুটো আগুনের ফুলকির মত জ্বলে উঠল। সৌরদীপ রূপার দিকে তাকিয়ে তার কথার প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে চেষ্টা করল। সে রূপার অপমানিত মুখটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে বলল, গেট রেডি রূপা। তৈরি হও। ইচ্ছে করলে আজই চলে যেতে পার। মিস্টার মল্লিকের প্রচুর টাকা। তোমার তো খুব ফ্ল্যাটের সখ। চলে যাও। পাশের এই বহুতল বাড়ির একটি ফ্ল্যাটের মালকিন্ হবে তুমি।

রূপার মুখটা পাংশুটে মেঘের মত দেখাল। শৌভিকও অপ্রস্তুত। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে রূপা বলল, মুখবদল করে তুমিই কি খুব রেহাই পাবে ভেবেছ?—রূপা কপালে ভুরু তুলে আড়চোখে স্বামীকে জরিপ করতে করতে বলল, উজ্জয়িনী আমার মত তোমার কোম্পানির ভাড়া করা ফ্ল্যাটে একটি রাতও থাকবে না। আর তোমার ওই সেকেন্ডহ্যান্ড অ্যামবাসাডার? ছোঃ ও এসেই যখন তোমায় মারুতি সি এল ও কিংবা মারুতি এস্টিম কিনতে বলবে? বউ বদলের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্ট্যাটাস বদলের কথাটাও মনে রেখো।

চাবুকটা মুখের ওপর পড়তেই সৌরদীপ স্তম্ভিত। রূপা যে এত কথা বলতে জানে, সেটাই ওর জানা ছিল না। সে হাঁ করে রূপাকে দেখছিল। শৌভিক উঠে দাঁড়াল। ঝরঝরে হাসি হেসে বলল, রীতিমত দাম্পত্য যুদ্ধ যে। সৌরদীপের পিঠটা একটু চাপড় দিয়ে বলল, মিস্টার রায়চৌধুরী। আর কিছু নয়, স্রেফ ঠাট্টা, বুঝলেন?

মারুতি এস্টিমের চাবির রিঙ দোলাতে দোলাতে শৌভিক বেরিয়ে গেল। চাবির শব্দটা যেন সারা ঘরে আছড়ে পড়ছিল, বউ কার? টাকা যার... । সে কথাই মনে হচ্ছিল সৌরদীপের। রূপা ভাবছিল, সৌরদীপের বদলের ইচ্ছেটা কি আরো জোরদার হল? কিন্তু বদলের পরেও তো বদল থাকে। তারপর?

আত্মপক্ষ

কৃষ্ণা বসু

ইদানিং রোজই বাড়ি ফিরতে রাত হচ্ছে নন্দিতার। নতুন অফিসে জয়েন করার পর এই অনিয়ম আরম্ভ হয়েছে। ভারতী, নন্দিতার শাশুড়ি ঘড়ির দিকে তাকালেন। দশটা বেজে গিয়েছে, অজান্তেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল তাঁর, অপাঙ্গে একবার ছেলে ও নাতনির দিকে তাকান তিনি, দুজনেই তন্ময় হয়ে টিভি-র মনোরঞ্জনী সিরিয়াল দেখছে। দু'জনের কেউই দরজা খোলার জন্য এগিয়ে এল না। অগত্যা ভারতীই উঠলেন, দরজার ম্যাজিক আই-এ চোখ রেখে দরজার ওপারে ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারার নন্দিতাকে দেখতে পেলেন। দরজা খুলে সরে দাঁড়ালেন। নন্দিতা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ক্লান্তি-কালীন ধ্বনি তুলে বলল—, "ওঃ আর পারি না—" বলতে বলতে বাপ ও মেয়েকে টিভিতে নিমগ্ন দেখে চটি জোড়া ছাড়তে ছাড়তেই বলে উঠল, "একি পরশু রিমির পরীক্ষা, ওকে পড়তে না বসিয়ে দু'জনে মিলে টিভি গিলছ?"

স্ত্রীর দিকে একবারও না তাকিয়ে টিভির পর্দায় চোখ-রাখা অবস্থাতেই ধীমান উত্তর দেয়, "মাঝরাতে বাড়ি ফিরে আর পারিবারিক কর্তব্য করতে হবে না!"

নিজের শোওয়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে নন্দিতাও একটু না-থেমে, এই কথা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে যে,—"প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি তো করতে হয় না, সরকারি বাবু বুঝবে কী তুমি!" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢোকে নন্দিতা।

পরদিন বেশ সকাল সকাল বাড়ি আসে নন্দিতা। মুখ হাত পা ধুয়ে মেয়েকে ধমক চমক লাগিয়ে পড়তে বসায়, কাজের মেয়েটিকে কড়া করে এক কাপ চা করে দিতে বলে, শাশুড়ির নির্দেশ মতো ইস্ত্রি করবার জামাকাপড় আলনা থেকে আলাদা করে গুছিয়ে রাখে এবং মেয়ে ভালবাসে বলে সকালে বাজার থেকে আসা পমফ্রেট মাছ নিজে রান্না করে। ধীমান বাড়ি ফিরে মা,

বউ ও মেয়ে তিনজনকেই যথাস্থানে দেখে খুশি হয়; আপাতত ধীমান দত্তের ফ্ল্যাটে যথারীতি শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে।

রাত্রে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ধীমান বলে মেয়ে বড় হচ্ছে এবার ওকে ওর ঠাম্‌মার সঙ্গে শোওয়ার অভ্যাস করাও। একপাশে মেয়ে ও অন্যপাশে স্বামী মাঝখানে শুয়ে আছে নন্দিতা, সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমে ডুবে যেতে যেতে বলে, "সারাদিন মেয়েটাকে পাই কতটুকু? রাতে ঘরে, গায়ে ওর হাত রেখে শুতে একটু ভাল লাগে আমার—"

নন্দিতাকে নিজের দিকে টানতে গিয়েও হাত সরিয়ে নেয় ধীমান, মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, মা বাবার শারীরিক অন্তরঙ্গতার কথা তার না জানাই ভাল। সন্ধেবেলায় একটু ঘুমিয়েছে ধীমান, টিভি দেখেনি আজ, ঘুম আসছিল না তার, পাশ ফিরে শুতে শুতে মনে হয় নন্দিতা ইদানিং একটু একটু করে দূরে চলে যাচ্ছে যেন। নন্দিতা কি তবে তনুশ্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কিছু জানতে পেরেছে? কিন্তু কীভাবে তা জানা সম্ভব? তনুশ্রীর সঙ্গে বাড়ি থেকে টেলিফোনেও তো বেশি কথা বলে না সে! ক্কচিৎ কখনও তনু ফোন করলে সে সামান্য কথায় প্রসঙ্গ সেরে অফিস থেকে ফোন করার আশ্বাস দিয়ে টেলিফোন রেখে দেয়। অফিসের কেউ শয়তানি করে কিছু জানায়নি তো? মৃদু উদ্বেগের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে ধীমান।

কয়েকদিন পরে ধীমানের ফ্ল্যাটের সামনে একটি মারুতি গাড়ি এসে থামে, গাড়ি থেকে নামে নন্দিতা। ফ্ল্যাটের বারান্দার থেকে সবই ঝুঁকে দেখেন ভারতী। রাত্রি ন'টা বেজে গেছে, সকাল ন'টায় অফিস গেছে নন্দিতা, বারো ঘন্টা বাদে বাড়ি ফিরছে নন্দিতা কিন্তু চেহারায় আজ কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই বরং অন্য দিনের তুলনায় অনেক সজীব আর সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

নিজের মনে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পেলেন না ভারতী, অচেনা মারুতি থেকে নামা, সজীব, তৃপ্ত চেহারা, কোথাও ক্লান্তির ছাপ নেই, কিছু একটা ঘটনা আছে, কিন্তু এখনই প্রশ্ন করতে পারছেন না, সামনে রিমি রয়েছে, পাশের ঘরে ছেলে খবরের কাগজ পড়ছে।

রাত্রে রিমি শুয়ে পড়েছে, ধীমান মশারির তলায়, খাবার ঘরের বেসিনের কাছে শোবার আগের দাঁত ব্রাশ করছিল নন্দিতা, রাত্রের ইসবগুল খেতে খেতে ভারতী অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করেন—"আজ কার গাড়িতে অফিস থেকে এলে, নন্দিতা?"

মৃদু চমকে শাশুড়ির মুখের দিকে তাকায় নন্দিতা, তারপর সহজ সপ্রতিভ হয়ে মুহূর্তেই বলে—"ও হো ও তো আমার অফিসের রায়দার গাড়ি। আমার ডিপার্টমেন্টের বস, এসেছিলেন আমার পাড়ার দিকে, বললেন, 'পৌঁছে দিচ্ছি।' আমিই বা বিনি পয়সার লিফট ছাড়ি কেন, মা?" বলে শাশুড়ির দিকে পিছন

ফিরে ব্রাশ-করা দাঁত বেসিনের কল খুলে জলে ধুতে থাকল নন্দিতা।

আর কথা না বাড়িয়ে ভারতী নিজের ঘরে চলে গেলেন। শুধু যাওয়ার আগে আর একবার পুত্রবধূর মুখের দিকে দু-মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন।

আয়নায় শোওয়ার আগের নাইটক্রিম মাখতে মাখতে নন্দিতার মনে পড়ল আজ শোভন রায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পরে মহার্ঘ্য রেস্টুরেন্টের পরিচ্ছন্ন বাথরুমে গিয়ে ওইরকম নতুন করে না সাজলেও পারত, এই সব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধীমান ধরতে না পারলেও ভারতীর মেয়েলি দৃষ্টিতে এ সব কিছুতেই এড়িয়ে যায় না, এ বার থেকে সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি। নিজেকে সামান্য শাসন করে রাতের পোশাক পরে মশারি সরিয়ে নিজের বালিশে মাথা রাখে সে। নিজেই নিজের মনে মনে বলে সে যদি শোভন রায়ের সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গতা না করে, তবে তার জায়গায় ওই ফ্যাকফ্যাকে ফরসা নয়না এসে অধিকার করবে আর আগামী মাসে যে ইনক্রিমেন্টটা, প্রোমোশনটা আশা করছে তা হাতের বাইরে চলে যাবে তা হলে। যে করেই হোক নয়নাকে শোভনের কাছাকাছি ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না, যতই ফর্সা হোক, নারী হিসেবে নয়নার চেয়ে নন্দিতা যে অনেকখানি আবেদনময়ী, অনেক বেশি আকর্ষণীয়া, এ কথা নন্দিতার চেয়ে আর কে বেশি জানে!

অফিস যাওয়ার সময়ে নন্দিতার সাজগোজ এবং পোশাকের পারিপাট্য অনেক বেশি বেড়ে যেতে শুধু ভারতীরই না, ধীমানেরও তা নজরে পড়ে, ---এ কথা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে গেলে নন্দিতা ইদানিং ফোঁস করে ওঠে এবং এ সব নিয়ে কথা বলাকে সে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেই মনে করে আজকাল। রিমির দিকে মন দেওয়ার সময় এখন কম পায় নন্দিতা; তাকে মাঝে মধ্যেই সান্ধ্য পার্টিতে যেতে হয়। ফিরতে রীতিমতো রাত হয়। গত মাসে প্রমোশন পেয়েছে সে চাকরিতে। তার বিজ্ঞাপন সংস্থার সুপারভাইজারের পোস্টটি তাকেই দেওয়া হয়েছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে শোভন রায়ের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার কারণে যতখানি, ঠিক ততখানিই তার কাজের যোগ্যতার কারণেও বটে। কিন্তু নন্দিতা জেনেছে এই সব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, এখানে যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুই লাগে, শুধু যোগ্যতা হলে চলে না মোটেই। ব্যাপারটিকে তার একটুও অনুচিত মনে হয় না। সে কোনও অপরাধবোধেও ভোগে না।

আজ এক তারিখ। নতুন প্রমোশনের জন্য কিছু অতিরিক্ত টাকা আজ বর্ধিত বেতনে হাতে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে চাইনিজ রেস্তরাঁ থেকে কিছু চিনা খাবার কিনে নেয় নন্দিতা। বাড়ি এসে দেখে আজ সকাল সকালই রিমি খেতে বসে

গেছে, মোটে সন্ধে সাড়ে সাতটা এখন। মাকে চিনা খাবার নিয়ে ঢুকতে দেখে উৎসাহে বাড়ির খাবার ফেলে চিনা খাবারের দিকে ঝোঁকে রিমি। খাবার টেবিলের কাছেই বসে খবরের কাগজ পড়ছিল ধীমান, চোখ তুলে মেয়েকে আর মেয়ের মাকে এক ঝলক দেখে চোখ নামিয়ে নিয়ে মেয়ের উদ্দেশে বলে,—"দেখিস আজেবাজে বাইরের খাবারের জন্য ঘরের খাবার নষ্ট করিস না।"

কথার মধ্যে নন্দিতার জন্য কিছু আঘাত আছে তা নন্দিতা আগেই বুঝেছিল, অবোধ বালিকা কন্যা সে সব কথার গূঢ় মর্ম কী বোঝে? সে সরল বিশ্বাসে বলে—"হ্যাঁ বাবা, বাইরের রেস্টুরেন্টের খাবার আমি দারুণ ভালবাসি"—বলেই উৎসাহভরে খেতে থাকে।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে ধীমানকে সেই খাবার গরম করে দিতে গেলে ধীমান তা প্রত্যাখ্যান করে; দারুণ অপমানিত বোধ করে নন্দিতা, মুখে বলে,—"ও আমার প্রমোশন হয়েছে তো, তাই তোমার হিংসে হচ্ছে, না?"

ভারতী খাওয়াব টেবিল থেকে উঠে যেতে যেতে বলেন,—"ও তোমাকে হিংসে করে না, করুণা করে।"

তীক্ষ্ণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে নন্দিতা, গলার স্বর ওপরে ওঠে তার, বলে, "আমাকে করুণা করার কোনও অধিকার ওর নেই, আমি প্রমোশন পেয়েছি নিজের যোগ্যতায়——"

তাকে থামিয়ে দিয়ে ধীমান বলে—"যাক আর নিজের যোগ্যতার বড়াই করতে হবে না।"

খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখে নন্দিতাও উঠে যায়। রাত্রে শোওয়ার ঘরে দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি, রিমি কয়েকদিন ধরে ঠাকুমার কাছে শুচ্ছে। খাটের পাশের চেয়ারে বসেছিল ধীমান, ঘরে ঢুকে নন্দিতা ধীমানের কাঁধ খামচে ধরে। বলে, "তুমি এবং তোমার মা দু'জনেই আমাকে অপমান করছ, কেন, কেন এ্যাঁ?"

ধীমান স্ত্রীর হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়, শান্ত স্বরে বলে,—"শোনো তোমাদের অফিসের নয়নার প্রমোশন না হয়ে কেন তোমার একার হয়েছে তা আমরা জানি, আমার কলিগ তুনশ্রীর ছোট বোন নয়না, সে আমায় সব বলেছে।"

"ওঃ তোমার তুনশ্রী তো তোমাকে সবই বলে, সবই দেয়, তবু যদি সব কিছু না জানতাম—"

"কী? কী বললে?" ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গর্জন করে ওঠে ধীমান; নিজের ভিতরে ভিতরে নিজের দুর্বলতা টের পাচ্ছিল সে, গলার স্বর এ কারণেই চড়ে যায় তার।

ধীমানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নন্দিতা, দু'জনেই ফুঁসছে, দু'জনেই দু'জনের সামনে নিজেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে।

বিলকিসুর মা হওয়া

নন্দিতা বাগচী

মাইডুগুড়ি থেকে উজিয়ে যসে আসতে হয়েছে ব্রতীন ও ডালিয়াকে। ডক্টর সারভেনটিস কিছুতেই রিস্‌ক্ নিতে চাইলেন না। পরপর দুটো স্টিলবর্ন বাচ্চা হয়েছে ডালিয়ার। প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ওরা, উইদাউট পে ছুটি নিয়ে লন্ডনে চলে যাবে নয়মাসে পা দিতেই। দুবাড়ির মায়েদেরও একই রায় আটে কাঠে পা দিও না। তাই ১৬ই সেপ্টেম্বরে ফ্লাইট বুক করেছিল ওরা। ১৫ই সেপ্টেম্বর আটমাস পূর্ণ হয়ে নয়মাসে পড়বে ডালিয়ার মাতৃত্ব।

ডক্টর সারভেনটিস প্রথম থেকেই ওদের এই প্ল্যানটাকে সায় দিয়েছেন। মাইডুগুড়ি জেনারেল হসপিটালে তেমন আধুনিক যন্ত্রপাতি তো নেই। ওই নামেই স্টেট-ক্যাপিটাল। নরমাল কেস হলে অবশ্য কোনো অসুবিধে ছিল না। এখানকার নার্সরা, মিডওয়াইফরা দক্ষ এ ব্যাপারে। বছর বছর গন্ডায় গন্ডায় বিয়োচ্ছে সব। যে মেয়ে যত বাচ্চা প্রসব করে, সংসারে তার দাপট তত বেশি। স্বামীসোহাগিনী বলেও চিহ্নিত হয় সে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণেই প্রতিযোগিতার ইঁদুর-দৌড়। শুধু স্থান-কালের বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়েরও রকমফের।

ডালিয়ার ব্যাপারে ডক্টর সারভেনটিস বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। ওর ইনডিউস্‌ড লেবারও হতে পারে অথবা সিজারিয়ান সেকশন। এবারের বাচ্চাটাকে বাঁচাতেই হবে। ঢাল-তরোয়ালহীন সেনাপতির মতো ছটফটানি ডক্টর সারভেনটিসের মনে। বড়োই আতান্তরে পড়েছেন তিনি। ম্যানিলার অতবড়ো হসপিটালের ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন অথচ এখানে ডালিয়ার কেসটা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। তাই ওদের এই লন্ডনে যাবার প্ল্যানটা বেশ ভালো লেগেছিল ওঁর।

লন্ডনে ডালিয়ার দিদিও সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। প্রাইভেট হসপিটালে রুম বুক করে, মাদার-কেয়ার থেকে বেবির যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে, ওদের দোতলার গেস্ট-রুম সাজিয়ে তৈরি। জিনিয়ারই কি কম উত্তেজনা! কতদিন পরে একটা বাচ্চা আসছে বাড়িতে। ওর ছেলে-মেয়ে দুটো কবে বড়ো হয়ে গেছে।

লন্ডনে দিদির বাড়ির সুবিধে ছাড়াও আরেকটা উপরি পাওনা ছিল ওদের। ডাক্তার হয়েও ব্রতীন ঢুকতে পারেনি ইংল্যান্ড-এ। কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে ফুল রেজিস্ট্রেশনটা আদায় করেছিল। সাদা চামড়ার চোখে কালো, বাদামি এসব নিকৃষ্ট রঙ। তৃতীয় বিশ্বও অন্য পৃথিবী। অনেক ধৈর্য, অনেক অবহেলার বিপত্তি ডিঙিয়ে তবে হাতে এসেছিল ছাড়পত্রটা। কিন্তু চাকরির বাজার মন্দা। চাকরিটা আসবেই বা কোত্থেকে? রোগ-বালাই কি আর আছে ওদেশে? সবাই-ই তো স্বাস্থ্য সচেতন। আর ব্রতীনের সিনিয়র দাদারা তো আগে থেকেই খুঁটি গেড়ে বসে আছেন সব চাকরি দখল করে। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনেক হ্যাপা। হয় কারো জুনিয়র হয়ে জয়েন করো নয়তো নিজের সার্জারি সেট-আপ করো। জুনিয়র হয়ে ঢুকলে সারাজীবন ওই ছোটো হয়েই থাকতে হবে। আর নিজের ক্লিনিক তৈরি করার মতো পয়সা নেই ব্রতীনের।

সদর ফটক বন্ধ থাকলে খিড়কিদোর দিয়ে ঢোকারও তো একটা রাস্তা থাকে। তাই ডালিয়ার দিদি-জামাইবাবুর প্রস্তাবটা ভারি মনে ধরেছিল ব্রতীনের। বাচ্চাটা লন্ডনে হলে সিটিজেনশিপ পেয়ে যাবে জন্মসূত্রে। পড়াশুনাটা নিখরচায় তো হয়েই যাবে—চিকিৎসাতেও কোনো খরচাপত্র থাকবে না। পড়াশুনায় ভালো হলে তো কথাই নেই—না হলেও পরোয়া নেই। ডোল পেয়ে যাবে ব্রিটিশ সরকারের পোষ্যপুত্তুর হয়ে। আর ওর লেজটি ধরে ব্রতীন-ডালিয়াও টুক করে ঢুকে পড়তে পারবে। ব্যস, এইটুকুই ভেবে রেখেছিল ওরা। এর বেশি আর এগোনোর সাহস হয়নি। দিবা-স্বপ্ন কাচের ঝুড়ির মতোই ঠুনকো—ভাঙতে কতক্ষণ?

নাইজেরিয়া এয়ারওয়েজেই টিকিট বুক করেছিল ব্রতীন। কানো থেকে সোজা হিথ্‌রো গিয়ে নামবে। মোটে পাঁচ ঘন্টার তো ফ্লাইট। ডালিয়ার ইচ্ছে ছিল ব্রিটিশ-ক্যালেডোনিয়ান-এর ফ্লাইট নেবার। ওর আবার অত কালো প্রীতি নেই। কিন্তু গেট উইক এয়ারপোর্ট জিনিয়ার বাড়ি থেকে অনেকটা দূর পড়ে যায়, তাই সে প্রস্তাব বাতিল হল। ডালিয়ার এই দেমাকেপনাগুলো পছন্দ করে না ব্রতীন। তাছাড়া সাদা-কালো-বাদামি সব এয়ার হস্টেসরাই তো এসব এমারজেন্সি সামলাবার জন্য ট্রেন্ড থাকে। যদি ফ্রান্স বা সুইজারল্যান্ডের

আকাশে জন্ম নেয় বাচ্চাটা বেশ হবে। ব্রতীনের মন আবার প্রজাপতি হয়ে যায়। রঙবেরঙি পাখনা মেলে। যে দেশের আকাশসীমায় জন্মাবে সেখানকারই তো নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে ওদের সন্তান। ব্রতীনের ভবিষ্যৎটির পায়ে চাকা লাগে। চলমান হল ঘুরতে থাকে এদেশ-সেদেশ।

কিন্তু ব্রতীনের আকাশ-কুসুম রচনায় বাদ সাধলেন ডক্টর সারভেনটিস, রওনা হবার একসপ্তাহ আগে ডালিয়াকে চেকআপ করতে গিয়ে বললেন, বাচ্চার হেড এনগেজ করে গেছে—এখন আর কিছুতেই এয়ার ট্র্যাভেল করা চলবে না। উনিই যসের ইভানজেল মিশনারি হাসপাতালে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ডক্টর রুডল্ফ জার্মান-আমেরিকান। ওখানকার গায়নোকলজিস্ট। ডক্টর রুডল্ফ-এর সুপারিশে মিশনারি গেস্টহাউসের একটা খোলা-মেলা শ্যালেও পেয়ে গেল ওরা মাসখানেকের জন্য।

ব্রতীনের ওয়ার্ডের সিস্টার রুথ একটা ন্যানির ব্যবস্থা করে দিল। আগের বাচ্চা দুটো না থাকাতে ডালিয়া বেশ নার্ভাস হয়েছিল। রুথ বলল, চিন্তা কোর না, বিলকিসু দারুণ এক্সপার্ট বেবি-নার্স। সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল যসের মিশনারি গেস্ট হাউসে। বিলকিসু সহ।

ব্রতীনেরও একমাসের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পেটারনিটি লিভ। ডক্টর সারভেনটিসের কভারিং লেটারটা খুব কাজের হয়েছিল। গতবছরেই দেশে ঘুরে এসেছে ওরা—আর্নড লিভ বেশি নেই। আবার আসছে বছর দেশে যাবে—তাই জমানো ছুটি খরচাও করা যাবে না। তাও তো দারুণ মজা এদেশে। একমাস কাজ করলে বিদেশিদের জন্য পাঁচদিনের ছুটি বরাদ্দ। ব্রিটিশদের তৈরি করা নিয়ম। দু বছর বাদে বাদে একশো কুড়ি দিন ছুটি। যাতায়াতের জন্য পনেরোদিন ফাউ। দেশের লোকেরা অবাক হয়। জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের চাকরি-বাকরি আছে তো?

ডালিয়া অবশ্য খুব ক্যালকুলেটিভ। স্ট্যাটিসটিকস্ পড়ানো মগজ তো। ওদের বছরে তিনবার লম্বা ছুটি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে তিন সপ্তাহের, মার্চের শেষে তিন সপ্তাহের, আবার জুলাই-এর মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আট সপ্তাহের ছুটি। তাই ধর্মপ্রাণ কৃষকের মতো দিন-ক্ষণ দেখে বীজবপন করেছিল ওরা। জানুয়ারি মাসে হার্মাটানের ঠান্ডা হাওয়ায় জমে গিয়েছিল প্রকল্পটা। ই-ডি-ডি অক্টোবরের শেষ দিকে। ফার্স্ট টার্মের পুরো তিনটে মাস মেটার্নিটি লিভ নিয়েছে ডালিয়া। অর্থাৎ জুলাই থেকে জানুয়ারি ছয় মাস টানা ছুটি।

হাসপাতালটা চমৎকার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমেরিকান যন্ত্রপাতি, ডাক্তার।

যেন ইংল্যান্ডের বদলে আমেরিকায় পৌঁছে গেছে ওরা। শুধু ওই সিটিজেনশিপটার ব্যাপারেই মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল ব্রতীনের।

শ্যালেটা ভারি পছন্দ হল ডালিয়ার। একটা সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র রয়েছে অথচ বাড়তি বিলাস নেই। ছোট্ট লিভিং রুমের একপাশে চারজন মানুষের বসবার মতো ব্যবস্থা। অন্যপাশে ছোট্ট কিচেনেট কাম ডাইনিং স্পেস। রান্নার গ্যাস, বাসনপত্র সব মজুত। বেডরুম-বাথরুমও পরিচ্ছন্ন। ম্যানেজার মালাম (মহাশয়) মুসা ভারি যত্নশীল মানুষ, সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্ব। সর্বদা আলখাল্লার মতো জাতীয় পোশাকে সুসজ্জিত। মায় সুতোর নকশা-কাটা টুপিটি পর্যন্ত নড়ে না মাথা থেকে।

বিলকিস্ সারাদিন ঘরের কাজকর্ম করে। রান্নার জোগাড় করে দেয়। বিকেলে মালাম মুসার স্ত্রীদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। তখন সে ধোপদুরস্ত রাপা (লুঙ্গি) পরে—সাথে ম্যাচিং জামা। মাথার স্কার্ফটাকে পাগড়ির মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চূড়ো করে বাঁধে। চোখে বোধহয় কাজলও দেয় একটু। কানে লম্বা পুঁতির দুল। ঠোঁটের দু'পাশে, গালে কালো উল্কির নকশা সারা গায়ে ঘসে ঘসে ভেসলিন লাগায়। তখন ওকে একটা পালিশ করা আবলুস কাঠের মূর্তি মনে হয় ব্রতীনের।

যসের বাঙালিরা ডালিয়াকে নিয়ে ভলিবলের মতো লোফালুফি শুরু করলেন। কেউ তরিবত করে সাধ দিচ্ছেন ওকে। দেশ থেকে নিয়ে আসা শখের টাঙাইল শাড়িটি বেরিয়ে আসছে মোড়ক খুলে। কেউ বা ফ্রিজে লুকিয়ে রাখা ডালের বড়ি দিয়ে পাবদা মাছের পাতলা ঝোল রেঁধে খাইয়ে যাচ্ছেন। কেউ বাচ্চার জিনিস-পত্র কিনে নিয়ে আসছেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে। আফ্রিকায় আছেন বলে তো আর সহজাত প্রবৃত্তিগুলো ছেড়ে দেওয়া যায় না। নিজের বোন, ভাই, বউ, ননদ, জা নাইবা থাকল কাছে। দেশতুতো বোনই বা কম কিসে?

এরই মধ্যে দুর্গাপূজো এসে গেল। যসে অনেক বাঙালি। মূর্তি আনা সম্ভব না হলেও পূজো হয় নিয়ম মেনেই। মোটা প্লাইউডের ওপরে একচালার ঠাকুর এঁকে কেটে রাঙিয়ে কী চমৎকার ঠাকুর হয়েছে। সেকেন্ডারি স্কুলের আর্টের টিচার পল্লব কুশারী তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাসখানেক ধরে অনেক পরিশ্রম করে রূপ দিয়েছেন দেবীর অসুর-দলনী ভাবমূর্তিটিকে। ছেলেমেয়েগুলো নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল, ইজ ইওর গডেস আ মার্শিয়াল পার্সন?

অষ্টমীর দিন ভোর থেকেই ডালিয়ার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। তলপেটে একটা অস্বস্তি। মস্ত পেটটাকে সামলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে হলঘরের

কোণের দিকটায়। মিনিস্ট্রি অফ ওয়ার্কসের চিফ অটোমোবাইল এঞ্জিনিয়ার সুবিমল চক্রবর্তী সিল্কের জোড় পরে পুজোয় বসেছেন। পুরোহিত দর্পণের পাতা উল্টে পূজো হচ্ছে। কাচের পুষ্পপাত্রে ফুল-চন্দন-তিল-হরতকী। কোষা-কোষীর স্থান নিয়েছে চিনেমাটির স্যুপ খাবার বাটি-চামচ। আচমন শেষ করে পুরোহিত হাতজোড় করে বিষ্ণুস্মরণ করছেন, ওঁ অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং...

হঠাৎ লেবার পেইন শুরু হয়ে গেল ডালিয়ার। এ গাড়ি, সে গাড়ি। এ দাদা, সে বউদি। ছোট্-ছোট্-ছোট্। ছেলে হল ডালিয়ার। কৃষ্ণের মতো কালো-কোলো নাদুস-নুদুস।

সপ্তাহখানেক বাদে মাইডুগুড়িতে ফিরে এল ওরা। বাচ্চাটাকে নিয়ে ডালিয়ার বিশেষ অসুবিধে হয় না। বিলকিসুই সব করে। নাওয়ানো-খাওয়ানো-পটি-হিসি, সবকিছু। সিস্টার রুথ ঠিকই বলেছিল। জানুয়ারিতে যখন কলেজে জয়েন করল ডালিয়া, বাচ্চাটা তখন মাস আড়াই-এর। বিলকিসু নাওয়া-খাওয়া ভুলে তার বোম্বোই (খোকন)-এর যত্ন করে।

বাচ্চাটাও অদ্ভুত। ডালিয়ার এত কাঙ্ক্ষিত সন্তান অথচ তাকে যেন অবজ্ঞা করে। তার যত কমিউনিকেশন সব বিলকিসুর সঙ্গেই। ওকে দেখলেই খিলখিল করে হাসে। চোখ দুটোও কেমন চক্‌চক্ করে ওঠে। মর্জি হলেই দু পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো মুখে পুরে চকাস্ চকাস্ করে চোষে বাচ্চাটা। তার ওই গোলাকৃতি শরীরের ন্যাপি-জড়ানো পশ্চাদ্দেশে থাবড়া মারে বিলকিসু। ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে হেঁচকি ওঠে বাচ্চাটার। ওই আবলুস-কালো রঙে, থ্যাবড়া নাকে, পুরু ঠোঁটে, কুতকুতে চোখে যে কী সৌন্দর্য দেখে সে, কে জানে। ডালিয়ার তো ওকে গরিলার মতো লাগে।

কলেজ থেকে ফিরে বাচ্চাটাকে খাবার খাওয়াতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যায় ডালিয়া। বিলকিসু নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বাটি-চামচ তুলে নেয়। খাবার টেবিলে বসে পেট দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে বিলকিসুর বোম্বোই। সিরিয়াল-ডিম-কলা চেটেপুটে সাফ।

দাঁত উঠছে বাচ্চাটার। হাতের কাছে যা পায় মুখে পুরে দেয়। দামি টিদিং-রিং নিয়ে আসে ডালিয়া লেবেনটিস স্টোর থেকে। 'মেড ইন্ ইংল্যান্ড' লেবেলটা দেখে নেওয়া জরুরি। এশিয়ান দেশগুলোর তো কোনো ভরসা নেই—সবকিছুতেই কারচুপি। হংকং, চায়না আর তাইওয়ানের জিনিসপত্রে ছেয়ে গেছে এ দেশ। কিন্তু দুপুরে কলেজ থেকে ফিরে ডালিয়া দেখে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে বিলকিসু। মাথার স্কার্ফটা খুলে পাশে রাখা। আর তার বোম্বোই মহানন্দে তার পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে। বিলকিসুর

মাথার কালো সুতো-পেঁচানো অসংখ্য শিং-এর মতো বিনুনির একটা বাচ্চাটার মুখে। চিবিয়ে-চিবিয়ে ভিজিয়ে ফেলেছে সেটাকে।

রাগে ফেটে পড়ে ডালিয়া। চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে। ব্রতীনকে বকাবকি করে। বিলকিসু দৌড়ে আসে, বা ফাডা মাডাম বা ফাডা (রাগ কোরো না ম্যাডাম—রাগ কোরো না)। নি বাইক্যাও (আমি খুব খারাপ)। হাঁটু গেড়ে বসে একবার ডালিয়ার কাছে, একবার ব্রতীনের কাছে ক্ষমা চায়।

বাচ্চাটার মুখে বুলি ফুটছে একটু একটু করে। বিলকিসু ডাকে,—বোম্বোই। তার বোম্বোই টাল-মাটাল পায়ে ছুটে আসে,

—এন্না জুয়া, এন্না জুয়া (আসছি, আসছি)।

—কা জউনা মানা (এখানে বসো সোনা)।

—তো (আচ্ছা)।

পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বাচ্চাটা। ডালিয়া বাংলা, ইংরেজি, হাউসা, কানুরির খিচুড়ি ফোটায় মুখে,

—বিলকিসু তুমি ওর সঙ্গে হাউসায় কথা বলবে না, তোমাকে যে ইংরেজিগুলো শিখিয়েছি সেগুলো বলবে ওর সঙ্গে।

—শিকেনা মাডাম (ঠিক আছে ম্যাডাম)।

ওদিকে বাচ্চাটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে,

—বিক্কি — কিজো (এসো) — মাজা মাজা (তাড়াতাড়ি)।

কী করে বাঁচাবে ডালিয়া তার এই ঈপ্সিত ধনটিকে! বিলকিসুর মায়াজালে জড়িয়ে পড়ছে ছেলেটা দিন-কে-দিন। একটু বড়ো হলে নয়তো দেশের বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন কী করবে ও? চাকরিটা ছেড়ে দেবে? অতগুলো টাকার মায়াও ছাড়া যায় না। দেশেব চাইতে চার-পাঁচ গুণ বেশি রোজগার।

পেডিয়াট্রিশিয়ান ডক্টর খালিলের কাছেই ব্রতীন প্রথম পাড়ল ওদের আশঙ্কার কথাটা। ভদ্রলোক পাকিস্তানি তো, ওদের সমস্যার কথাটা বুঝতে পারবেন হয়তো। বাচ্চাটাকে বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি কিছুই শেখাতে পারছে না। সর্বক্ষণ হাউসাতে কথা বলছে বিলকিসুর সঙ্গে। শুনে ডক্টর খালিল হেসেই অস্থির। হোয়াই আর ইউ সো মাচ উওরিড ডক্টর পাকড়াশী? লেট হিম গো এহেড। এ বয়েসে ও তো মাল্টি-লিঙ্গুয়াল হতে পারবে না। দু-তিন রকম ভাষার এক্সপোজারও ঠিক নয় এই টেনডার এজ-এ। কনফিউজড্ হয়ে যাবে। পরে শিখে নেবে মাতৃভাষা। আমরা বড়ো হয়ে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি না? এই দেখুন না, আমরা সবাই হাউসাতে কেমন এক্সপার্ট হয়ে গেছি কটা বছরেই।

অথচ আপনার মাদার টাং বেঙ্গলি আর আমার উর্দু। আপাতত হাউসাই আপনার বেবির মাদার টাং বলতে পারেন। আসলে অনেকদিন পরে বাচ্চা হয়েছে তো আপনাদের — ইউ আর টু-উ পজেসিভ।

বুথকে একদিন একা পেয়ে ব্রতীন ওকেও বলে ফেলল কথাটা। বাচ্চাটা ওদের থেকে ডিটাচড্ হয়ে যাচ্ছে। বিলকিসুকেই আঁকড়ে ধরছে। ও কি কানুরিদের ট্রাইবাল জাদু-টাদু জানে নাকি?

বুথ নিজেও কানুরি সম্প্রদায়ের। তবে খ্রিস্টান। নিজের গাঁয়ের মেয়ের নিন্দে শুনতে ভালো লাগে না তার। কিন্তু বিরক্ত হলেও প্রকাশ করে না। বস্ বলে কথা। কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট যাবে ডক্টর পাকড়াশীর হাত দিয়েই। তাই শান্তভাবে শোনায় বিলকিসু-বৃত্তান্ত।

চাড লেকের পাশেই ওদের গ্রাম। আর একটু উত্তরে গেলেই সাহারা মরুভূমি। বিলকিসুর বিয়ে হয়েছিল গ্রামেরই এক সম্পন্ন আলহাজির সঙ্গে। আলহাজির দ্বিতীয় স্ত্রী সে। তারপর আরও দুটো বিয়ে করেছেন তার স্বামী। বছর বছর সন্তান প্রসব করে তারা। আলহাজিকে পিতৃত্ব দেয় বছরে দু-তিনবার। সাহারার মতো অনুর্বর বিলকিসুও। তাই সে স্বামী-পরিত্যক্তা। ওকে শহরে এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছে বুথ। কিন্তু ওর ফ্যালোপিয়ান টিউব দুটোই ব্লক হয়ে গেছে। ট্রাইবাল রীতি অনুযায়ী গ্রামীণ ধাইরা ওর শরীরকে কেটে-ছিঁড়ে সংবেদনহীন করেছিলেন ছোটো বয়সেই। কুমারীত্ব বজায় রাখার জন্যও নানা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ইনফেকশন হয়ে তার মাতৃত্বের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আধুনিক কৃত্রিম ব্যবস্থাগুলোকেও পাপ হিসেবে গণ্য করা হয় বলে ওদের সমাজে বিলকিসুর মতো মেয়ের কোনো মর্যাদা নেই। উৎপাদনহীন কারখানার মতোই তার সামাজিক মান।

বিলকিসুর ফিরিস্তি শেষ করে একটুক্ষণ চুপ করে থাকে বুথ। ওর অহং আর ভৃত্য সত্তার দ্বন্দ্ব চলে। তারপর সাহস করে বলেই ফেলে, আচ্ছা ডক্টর পাকড়াশী, আপনার কি মনে হয় না বিলকিসু আপনাদের উপকার করছে? বোম্বোইকে কিন্তু ও নিজের সন্তানই মনে করে। আপনাদের তো তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ ছেলেটাকে বড়ো করতে ম্যাডামের গায়েই লাগবে না। পুরোপুরি না হলেও কিছুটা যেন আশ্বস্ত হয় ব্রতীন।

ওরা দেশে গেল যখন, বাচ্চাটার তখন বছব দুয়েক বয়েস। এবাড়ি-ওবাড়ি — কত আদর — কত উপহার। দুটো বাচ্চা মারা যাবার পর এসেছে ছেলেটা — বড়ো মূল্যবান। কিন্তু বাচ্চাটা খালি ঘ্যান্-ঘ্যান্ করে। কিচ্ছুটি খায় না। খালি বলে, বিক্কি, কিজো মানা (বিলকিসু আমার কাছে এসোনা)। ঠাম্মা-দিদা-মাসি-

পিসিরা সব নাজেহাল। ডালিয়ার ছোটোভাইয়ের বউটা ভারি ট্যাস। কনভেন্টে পড়া মেয়ে। কটকট করে কথা বলে। বলল, আসলে ও নিগ্রয়েড মুখগুলো মিস্ করছে — আমাদের এরিয়ান মুখ পছন্দ হচ্ছে না। আফটার অল হি ইজ আ নিগার। গায়ের রঙ্টা দেখো না। আর বুলিটাও শিখেছে বেশ। কথা কটা হুল ফোটাল ডালিয়াকে। রাতে আবার ব্রতীনের সঙ্গে ঝগড়া।

ব্রতীনের বন্ধু প্রতীক খুব পসার জমিয়েছে কলকাতায়। যুগোপযোগী বিষয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একাকিত্ব, মানসিক অবসাদ, তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার প্রবণতা, সবই তো বাড়ছে দিন-কে-দিন। প্রতীক বলে, স্টেম-সেল নিয়ে গবেষণা চলছে -- চলবে। যতদিন না জিন্ বাহিত প্রোটিন মলিকুলগুলো শুধরানো যাচ্ছে ততদিনই আমাদের রমরমা। প্রতীকের সঙ্গেই ব্রতীন আলোচনা করে বাচ্চাটার ব্যাপারে। প্রতীক ধমকে ওঠে ওকে, তুই এসব প্রাগৈতিহাসিক কথাবার্তা বলছিস কেন? কি আফ্রিকান জুজু করবে রে ওই নিরীহ মেয়েটা? তুই যদি বাচ্চাটাকে মাসিমার কাছে রেখে যেতিস্, তাঁর জন্যও ওমনি ভালোবাসা তৈরি হত ওর। তোরা দু'জনেই যদি নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিস তবে ন্যানির ওপরে বাচ্চাটার একটা মেন্টাল ডিপেন্ডেন্সি আসবেই। তাছাড়া বিলকিসুই তো ওর একমাত্র কমপ্যানিয়ন। তবে একটা কথা ব্রত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যা তোরা, নয়তো বাচ্চাটার একটা মেন্টাল ট্রমা হবার চান্স থাকবে।

ছুটি শেষ না হতেই ফিরে গেল ওরা। বাচ্চাটা না খেয়ে-খেয়ে রোগা কাঠি। খালি বিক্কি-বিক্কি বলে কাঁদে।

এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন ডক্টর খালিল। ওদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, স্নান-টান করে বিশ্রাম নিন আপনারা। লাঞ্চের আগে পিক-আপ করে নেব আমি। আপনাদের গাড়ির ব্যাটারি নিশ্চয়ই ডাউন হয়ে আছে।

ঘরবাড়ি ধুলোয় ধূসরিত। হার্মাটান চলছে। মাইডুগুড়িতে হার্মাটনের প্রকোপটা একটু বেশি। সাহারা কাছে বলেই হয়তো। পাউডারের মতো মিহি ধুলোর ঝড় চলে সারা শীতকাল। কাজের ছেলে দুটোকে খবর দিয়ে রেখেছিলেন ডক্টর খালিল। বোনো আর এডওয়ার্ড ওদের বাংলোর বারান্দায় বসেই অপেক্ষা করছিল। ওয়েলকম সা, ওয়েলকম মাডাম বলে এগিয়ে এল দু'জনে। ওদের কোঁকড়ানো চুলে ময়দার মতো সেঁটে রয়েছে মিহি ধুলো। দরজার তালা খুলে মালপত্রগুলো ঘরে ঢুকিয়ে ঝাড়-পোঁছ করতে শুরু করে দেয় দু'জনে। খবর পেয়েছে বিলকিসুও। মোটা থলথলে শরীর কাঁপিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। সান্নু দা জুয়া বোম্বোই (সুস্বাগতম খোকন) — সান্নু দা জুয়া

(সুস্বাগতম)। কালো পটভূমিতে সাদা ধবধবে দাঁতগুলো ঝিলিক মারে। দুপাশে দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে যেন উড়ে উড়ে আসছে মস্ত একটা ঈগল পাখির মতো। বাৎসল্য চুইয়ে পড়ছে ওর প্রতিটি অভিব্যক্তিতে। বাচ্চাটাও ডালিয়ার হাত ছাড়িয়ে বিক্কি-বিক্কি বলে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বিলকিসুকে। ওর ময়লা রাপায় (লুঙ্গি) মুখ ঘসতে থাকে। ছেলেটার চোখদুটিতে কোন্ এক অলৌকিক নক্ষত্রের জ্যোতি।

আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে ওদের জীবনযাত্রা। ব্রতীন তো এসেই জয়েন করেছে — ডালিয়াও কলেজ খুলতেই জয়েন করল। ক'টা মাস পরেই ছাত্র ছাত্রীদের এ-লেভেল পরীক্ষা। সিলেবাস এখনও কিছুটা বাকি। বোম্বোই আবার বিলকিসুর হেফাজতে। ওর ওপরে যতই বিরক্ত হোক ডালিয়া, ও ছাড়া কোনো গতিও তো নেই। বিলকিসু তার বোম্বোইকে স্নান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, খেলা করে।

অনেকগুলো ছবির বই কিনে এনেছে ব্রতীন। সন্ধেবেলা ওরা দু'জনে বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে। বুবুসোনা, এই দেখ ম্যাঙ্গো, এটা পটেটো, এটা ফিশ, এটা স্নেক...। ছেলেটা ঘ্যান্ঘ্যান্ করে, বিরক্ত হয়। শেষপর্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যায় বিলকিসু।

ডালিয়াদের বাংলোর পেছনেই স্টুয়ার্ড কোয়ার্টার। সেখানেই থাকে বিলকিসু। বছর তিনেকের মধ্যে বেশ একটা সংসার পেতে বসেছে ও। প্লাস্টিকের বালতি, এনামেলের থালা-বাটি, কালাবাসের (লাউ) খোলের গামলা-হাতা, উনুন জ্বালাবার কাঠের টুকরো গড়াগড়ি খায় ওর উঠোনে। দড়িতে ঝোলে রাপা-ব্লাউজ-মাথার স্কার্ফ-অর্ন্তবাস। ওর পাশের ঘরেই রাতটা কাটায় এডওয়ার্ড। সকালের দিকটায় কোনো একটা অফিসে আর্দালির কাজ করে। বেলা তিনটে নাগাদ ডালিয়ার বাড়ির কাজে ঢোকে। বোনো থাকে শহরতলিতে। বাবা-মায়ের সঙ্গে। প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। বেলা দুটোর পর স্কুল থেকে সোজা চলে আসে কাজে। অসংখ্য ভাই-বোন ওর। এডওয়ার্ড খ্রিস্টান ছেলে আর বোনো মুসলমান।

সন্ধের পর বিলকিসু উনুন জ্বালায়। টুমাটর (টমেটো), বোরকোনো (লংকা) আর আলবাসা (পেঁয়াজ) কষায় লালচে, ঘন পাম অয়েলে। লাল টুকটুকে মিয়া (ঝোল) তৈরি করে নামা (মাংস) দিয়ে। গরমজলে গিনিকর্নের আটা গুলে টুয়ো (মন্ড) বানায়। এডওয়ার্ড আর বোনোকে ডেকে নিয়ে একই থালায় চলে তাদের আহারপর্ব। তর্জনী ও মধ্যমার ডগায় অল্প পরিমাণ টুয়ো তুলে বাটি থেকে মিয়া মাখিয়ে খায়। গোরুর মাংসের শক্ত খণ্ডগুলো চিবিয়ে

ছাতু করে ফেলে। অসম্ভব দাঁতের জোর ওদের। দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে তো খায়-ই, পাকা আম খোসাসুদ্ধ খেয়ে ফেলতেও দেখেছে ডালিয়া। কিচেনের পেছনের কাচের দরজাটা দিয়ে আড়চোখে ওদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা দেখে ডালিয়া।

পরদিন দুপুরে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে ডালিয়া দেখে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে বিলকিসু। বোম্বোই তার দু'পায়ের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছে। বিলকিসুর চর্বিবহুল পেটে হেলান দিয়ে। নরম গদি আঁটা সোফার আয়েস তার হাবেভাবে। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে খোশমেজাজে দোলাচ্ছে পা-জোড়া। ছবির বইখানা তার হাতে। বিলকিসুও ঝুঁকে পড়েছে বইটার ওপরে। আর একটা-একটা ছবি দেখিয়ে বুবু বলছে, ডুবা বিক্কি (দেখো বিলকিসু), ওয়ান্না মংগোরো (এটা আম), ওয়ান্না ডেংকালি (এটা আলু),... ওয়ান্না কিফি (এটা মাছ), ওয়ান্না মাচিজি (এটা সাপ)। ডালিয়া বুঝতে পারে সহজ পাঠের প্রথম অধ্যায়ের হাতেখড়ি হয়ে গেছে তার ছেলের।

অঞ্চল প্রধানের বাড়িতে সাল্লার (ঈদ) নিমন্ত্রণ ছিল ব্রতীনের। মাইডুগুড়ি শহর ছাড়িয়ে বামার পথে মাটির দেওয়াল তোলা মস্ত চৌহদ্দিটিতেই তাঁর রাজ্যপাট। একমাস রামাদানের (রমজান) কঠোর নিয়মের পর আজ উৎসবের আমেজ। দর্শনার্থীরা এসে বরকা দা সাল্লা (ঈদ মুবারক) অভিনন্দন জানিয়ে যে যার সামর্থ্যমতো ভেট রাখছেন বৃদ্ধপ্রধানের পায়ের কাছে। কোসে (বড়া), কুলি-কুলি (কুড়মুড় ভাজা), মোই-মোই (ইডলি), নামা (মাংস) সব সাজানো রয়েছে বড়ো বড়ো এনামেল-করা থালায়। যে যার ইচ্ছে মতো তুলে খাচ্ছেন।

ব্রতীনের প্রায়ই ডাক পড়ে এখানে। চিফের বয়েস সত্তর-বাহাত্তর, আর তাঁর ছাপ্পান্নটি সন্তানের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ থেকে শুরু করে সদ্যোজাত। জ্বর-জারি, পেটব্যথা তো লেগেই থাকে। তবে বাহির বাড়ি পর্যন্তই, ভিতর বাড়িতে পুরুষ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে মৌরুসি পাট্টা প্রধানের চারজন জাঁদরেল স্ত্রীর। বাকি বাইশ-তেইশ জন তরুণী-যুবতী স্ত্রীর মর্যাদা না পেলেও তাঁদের থাকতে হয় দেওয়াল-ঘেরা হারেমেই। নানা গ্রাম থেকে ভেট হিসেবে এসেছেন তাঁরা নানা উপলক্ষে। বছরে দু-তিনটি সন্তান জন্ম নেয় বিভিন্ন মায়ের গর্ভে। পিতা একজনই — আলহাজি গিডাডো আহমেদ ইডি। রুথের কাছে শুনেছে ব্রতীন, এই হারেমবাসী মহিলারা বেশির ভাগই ডিপ্রেশনে ভোগেন।

আলহাজি গিডাডো ইংরেজি বলতে পারেন না। হাউসাও বলেন কাজ চালানো গোছের। কানুনির ও হাউসা মিলিয়ে ব্রতীনকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রতীনের কোমরে

একটা ঝকঝকে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। ব্রতীন ভারি বিব্রত বোধ করে। ওর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বৃদ্ধ অনেক কিছু বললেন। কিন্তু ব্রতীন তার একটি বর্ণও বুঝতে পারল না।

হার্মাটানের বালুকা পাত কমে এসেছে। এবারে বৃষ্টি শুরু হবে। ডালিয়াদের কম্পাউন্ডের গাছগুলোর সাজগোজের আর অন্ত নেই। যে যার পছন্দমতো প্রসাধনী-আচ্ছাদনী নিয়ে ব্যস্ত। পত্রহীন মরু গোলাপের ডালে-ডালে গোলাপি প্লাবন। আর কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো মাথাভর্তি সিঁদুর মেখে ভাব জমিয়েছে আকাশের সঙ্গে। ডালিয়ার বেশ ভালো লাগে এখানকার এই বসন্ত শেষের আলাপ। এ সময়টায় ওর মনের ভেতরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা বিরক্তিগুলো সরে যায়। কী যেন এক ভালোলাগায় ভরে ওঠে মনটা।

হোলির পার্টি এবার মিস্টার শ্রীবাস্তবের বাড়িতে। এবারেও জোরজবরদস্তি করে আড়াইশো রসগোল্লার দায়িত্ব ডালিয়ার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। এমনিতেই বাচ্চাটাকে নিয়ে নাজেহাল অবস্থা, তার ওপরে এই ঝামেলা। কেন বাবা, তোরা গুলাবজামুন-টামুন বানা না। তা না বঙ্গালি মিঠাই চাই। আর নিজেরা নেবে সব সহজ ডিশগুলো। পুলাউ-পুরী-মটরপনির। রসগোল্লার ছানাটানাও তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। গুঁড়োদুধ গুলে ভিনিগার দিয়ে ছানা কাটো কিলো-কিলো। তবু বাঁচোয়া, কাজের ছেলে দুটো চটকে দেয় ওই পাহাড়-প্রমাণ ছানার তাল। কী শক্তি ওদের গায়ে! মুহূর্তে নরম তুলতুলে করে ফেলে।

রসগোল্লার ভেতরে সুগার কিউব ভেঙে ঢুকিয়ে দেয় ডালিয়া। বেশ টসটসে হয় তাহলে। এসব ট্রেড সিক্রেট। সবাইকে শেখায় না ডালিয়া এসব খুঁটিনাটি। মিসেস রহমান কি বিরিয়ানির সব কৌশল ফাঁস করেন? খালি বলেন, বিরিয়ানি তো সোজা কাম। ওই বয়েল কইর‍্যা কইর‍্যা নিবেন। রসগোল্লার ভেতরে ভরার এলাচদানা কম পড়বে, তাই বিকেলের দিকে একটু চেলারামে ঢু মারে ও। কেনাকাটা শেষ করে ফিরে গাড়িটা বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢোকাবার সময়ে ডালিয়া দেখে ট্রাই-সাইকেলটার ওপরে বুবু বসে আছে পা ঝুলিয়ে। বিলকিসু কৃষ্ণচূড়া গাছটায় চড়ে ফুল পাড়ছে বোম্বোই-এর জন্য। কাঠি দিয়ে হোসপাইপের একটা ছোটো টুকরো নাড়াচাড়া করছে বুবু আর নিজের মনে বলে যাচ্ছে, ডুবা বিক্কি, ওয়ান্না মাচিজি (দেখো বিলকিসু, এটা সাপ)।

গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে বেরোবার সময়েই বিলকিসুর আর্ত চিৎকার — মাডাম, মাচিজি... ই... ডালিয়া প্রাণপণে দৌড়য়। কাছে গিয়ে দেখে ওটা হোসপাইপের টুকরো নয়, একটা বিষাক্ত সাপ। বিবর্ণ হয়ে যায় ডালিয়ার

মুখ। আতঙ্কে আর্তনাদ করার চেষ্টা করে। শুধু ঘড়ঘড় করে গলার কাছটায়। বিলকিসুর পরিত্রাহি চেঁচানিতে আশেপাশের আউট হাউসের স্টুয়ার্ডরা সব ছুটে আসে। বোনো আর এডওয়ার্ড-এর পেছন পেছন খালিপায়ে ব্রতীন। দা-কুড়ুল-লাঠি-নিড়ানি যে যা পেয়েছে হাতের কাছে এনে জড়ো করেছে। কিন্তু বিলকিসু ততক্ষণে তার মুঠোর ভেতরে ধরে ফেলেছে সাপটার মাথা। ছোবলে-ছোবলে ওর হাতটা ক্ষত-বিক্ষত।

হাসপাতাল-সুদ্ধ ডাক্তার-নার্স বিলকিসুকে নিয়ে হামলে পড়েছেন। সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে গেছে ওর। চামড়ার তলায় বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটা। ক্রমে রক্তশূন্য হয়ে পড়ছে মেয়েটা। এক্ষুনি রক্ত দিতে হবে ওকে। অথচ কোনো ব্লাড-ব্যাঙ্ক নেই শহরে। ব্লাড গ্রুপটাও বি নেগেটিভ হওয়াতে মুশকিল হয়েছে। বোনোর সঙ্গে গ্রুপ ম্যাচ করলেও ব্রতীন জানে বোনো সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়ার রুগী — ওর রক্ত সাপের বিষের মতোই বিষাক্ত।

ব্রতীন ও ডালিয়ার স্বদেশি-বিদেশি কলিগরা সবাই পৌঁছে গেছেন। আর কী আশ্চর্য! টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পোলিশ গেমস্ টিচার কামিল বিয়ালকোভিচের সঙ্গে বিলকিসুর ব্লাডগ্রুপ ম্যাচ করে গেল। তাজা জোয়ান ছেলে। চর্চা-করা শরীর। টগবগ করে ফুটছে উৎসাহে। খবর পেয়েই ছুটে এসেছে খেলার মাঠ থেকে। গাল দুটো, নাকের ডগা টুকটুকে লাল।

পাশাপাশি দুটো বেড-এ শুয়ে আছে বিলকিসু আর কামিল। যেন এবনি আর আইভরির দুটি ভাস্কর্য। ব্লাড ট্রান্সফিউসন চলছে। বিলকিসু মাঝে মাঝেই কোমায় চলে যাচ্ছে। একটু জ্ঞান ফিরতেই বিড়বিড় করছে — বোম্বোই কা ফিতা — কা ফিতা মানা — মাচিজি — (খোকন সোনা পালাও, পালাও সাপ আসছে)।

ওদিকে গভর্নমেন্ট রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় গাছে ঘেরা বাংলোটার লিভিং রুমে বসে বাচ্চাটা ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে, বিক্কি — কি জো মানা — বোম্বোই এনা কুকা (বিলকিসু — এসো না — তোমার খোকন কাঁদছে)।

ডালিয়া বিপর্যস্ত। বিভ্রান্ত। মিসেস খালিলের হাত দুটো ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদছে ও। মিসেস খালিল পেশোয়ারের মানুষ। আবেগ কম। ভেবে পান না ডালিয়ার এত ব্যাকুলতার কারণ কী। আল্লার শুকরের কথা উল্লেখ করছেন বারবার। কী ভাগ্যি যে বাচ্চাটা বেঁচে গেছে। কিন্তু ডালিয়া কেঁদেই চলেছে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, গোঁ-গোঁ করে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে বলেই চলেছে, আমি কেন সাপটাকে মেরে ফেলতে পারলাম না? কেন পারলাম না?

বিকেল ফুরিয়ে যায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

স্কুল থেকে বেরিয়ে মিনিট পনেরো হাঁটার পর, গলির মুখে এসে দুজন দুদিকে। মানসী, মানে মানি, বাঁয়ে। আমি ডান দিকে। ডান দিকে ঘুরে বাঁ দিক, বাঁ দিক ধরে সোজা এক ছুটে বাড়ি।

বাড়ি ঢুকতেই কাঁধের ব্যাগ ছিটকে গেল খাটের ওপর। ভেতরবারান্দার চেয়ারে বসে ঝড়ের গতিতে খোলা হয়ে গেল কালো রঙের ব্যালেরিনা জুতো, নীল বর্ডার দেওয়া নাইলনের মোজা। হুড়ুদ্দুম করে হাত দুটো খুলে ফেলছে নীল-সাদা ইউনিফর্ম। নীল কাপড়ের বেল্ট মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠের পিঠে। খোলার চেয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিচ্ছি কুলোর মতো কানঅলা বুলগানিন জামা। মা এসে সামনে দাঁড়ানোর আগেই পুটপুট বোতাম লাগিয়ে ফেলেছি।

-- কী হচ্ছেটা কি অপু! এইভাবে জামাকাপড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে! এত বড় একটা ধিঙি মেয়ে....ওঠা, ওঠা সব। পাট করে তুলে রাখ্। হিঁইই, দ্যাখো বেল্টটাকে কেমন ছিটকে ফেলে দিয়েছে! কাল স্কুল যাওয়ার আগে কেঁদে দেখিস, মা আমার বেল্ট পাচ্ছি না....

---অঁঅঁঅঁ! রতনের মা তুলে রাখবে। ত.মাকে চটপট খেতে দাও। জলদি। কুইক।

---কেন? কী এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ শুনি?

বলার সময় নেই। একটি শব্দও এখন সময়ের অপচয়। হাতের চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবার টেবিলের গায়ে। ঢাকা বাটির বুকে নাক ঝুঁকে পড়ল,—এ কি! মাছ রাখোনি? ভাত খাবো কী দিয়ে?

—কে তোমাকে আজ ভাত দিচ্ছে? চিঁড়ে ভেজানো আছে, দই দিয়ে আম দিয়ে মেখে খেয়ে নে। কী রে, হাত না ধুয়েই বসে পড়লি যে! তোর কি ঘেন্নাপিত্তিও নেই রে? যা, আগে হাত মুখ ধুয়ে আয়। যা বলছি।

ধমক খেয়ে দম বন্ধ করে দৌড় চানের ঘরে। হাতে পায়ে মুখে এলোপাথাড়ি জল ছিটোতে ছিটোতে মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছি,—এখনও এত কীসের খেলার নেশা? বড় হয়ে গেছ, এবার ছুটোছুটি লাফালাফি বন্ধ করো। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে এভাবে আর ট্যাং ট্যাং করে নেচে বেড়ায় না। লোকে কী বলবে?

ওফ্! আজকাল সারাক্ষণ ওই একটা কথা। বড় হয়েছো! বড় হয়েছো! মা যে কী না! বড় হয়েছি বলে সব সময় ঘরে বন্দি থাকতে হবে নাকি! কই, দাদার বেলায় তো ওকথা বলতে শুনি না! নাকি ছেলেরা বড় হয় না! মেয়েদের বেলাতেই শুধু যত রাজ্যের সীমা টানা। শরীরে ভাঙচুর। নিয়ম করে লজ্জাজনক কষ্ট পাওয়া। ভাল্লাগে না। বিশ্রী। বিশ্রী। এভাবে মেয়েদেরই কেন যে শুধু দাগ টেনে বড় করে দেওয়া হয়!

খাবার টেবিলে ফিরে আসার পরও মা'র একঘেয়ে সুর কানের কাছে পোঁ-পোঁ,—আগেকার দিনে তেরো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সব ঘরকন্না করত। আর আমার এই ধাড়ি মেয়েটাকে দ্যাখো....

'রোজকার সুর এক কানের পর্দা ভেদ করে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।। চিরতা খাওয়া মুখে চিঁড়ে দই আম গিলছি।

—ইহ্‌হ, আজ একটু লুচি করতে পারোনি?

—হ্যাঁঅ্যা, রোজ রোজ লুচি। কোনও কাজে হাত লাগানোর নামে নেই, শুধু লম্বা লম্বা হুকুম।

আমের আঁটি পিছনের উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাঁ হাতে বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি ডান হাত। ভিজে হাতেই দৌড়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পিছনের গলিতে চক দিয়ে দাগ পড়ে গেছে। এখখুনি শুরু হয়ে যাবে আমাদের লম্বি ধাস্‌সি খেলা। আমি কি আজও শেষে পৌঁছব? কখ্খনো না। মায়ের চিৎকার তাড়া করে চলেছে পিছনে,—একটা কথাও কানে তোলা হয় না, সাপের পাঁচ পা দেখেছ, না? আজ আসুক তোর বাবা। তোর হবে।

কথাগুলো ফুসমন্তরে ঠিকরে গেল পাড়ার বাতাসে।

প্রায় প্রতি দিন এভাবেই শুরু হত আমার তেরো বছরের বিকেল। পড়াশুনা, স্কুল, আবার পড়াশুনার ফাঁকে এইটুকু এক রত্তি নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়। একেবারে নিজের মতো করে বুকভর্তি শ্বাস টানা। এর মধ্যেই বড় জোর কোনওদিন অদলবদল হত খাওয়ার মেনুতে অথবা খেলায়। বড় জোর মায়ের গলায় সুর বদলে যেত মালকোষ থেকে দরবারীতে, কাফী থেকে ইমনে, ঝিঁঝিট থেকে খাম্বাজে। তবে ব্যাপারটা ছিল মোটামুটি এই রকমই। বিকেল মানেই গাঢ় হলুদ রং। বিকেল মানেই সোনার পিরিচে সূর্যের আলো ঠিকরোচ্ছে।

বিকেল মানেই মোড়ের জামরুল গাছের পাতাগুলো হলুদ মেখে কাঁপছে এলোমেলো। এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছি। লম্বা দাগের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডাক ছাড়ছি, লম্বিইই....। কখনও এক পায়ে নুন নুন নুন কিংবা আব্বা আব্বা আব্বা। দু হাতের ডানা মেলে আমাকে আটকাতে চাইছে বিপরীত দলের খেলুড়েরা। মানসী কিংবা রুপা চেঁচাচ্ছে,—এই অপু, ওদিকটায় ফাঁক আছে, চলে আয়। চলে আয়। বড় বুড়িটা তো আবার কোন দিন আমাকে অপু বলে ডাকতও না। অপরাজিতাও নয়। কী যে খালি চি দিয়ে কথা বলার অভ্যেস ছিল বড়বুড়ির! ডাকতে গেলেই চিঅচিপু, নয়ত চিঅচিপচিরাচিজিচিতা। বাপ্‌রে, পারতও বটে। অমন একটা লম্বা নামে আমিও দিব্যি সাড়া দিয়েছি। তখন আসলে নাম নয় ডাক নয়, চোখ বুজে শুধু শেষ ঘরে পৌঁছনোর দিকে মন। যেন ওই ঘরটাতে লুকিয়ে আছে আমার প্রাণভোমরা। খেলা নিয়েই আড়ি ভাব, খেলা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, বন্ধুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

তা সত্যি কি আর আমার প্রাণভোমরা লুকিয়ে ছিল লম্বি ধাস্‌সির কোর্টে? কিংবা বুড়িবসন্তী খেলায়? উঁহু, আমার প্রাণভোমরা তো আসলে ছিল আমার বন্ধুদের হৃদয়ের কুঠুরিতে। সেটা মনেপ্রাণে টের পেলাম চোদ্দ বছর বয়সে পৌঁছে।

স্কুলে আমরা চারজন খুব বন্ধু সেই সময়। আমি মানসী, দীপিকা আর অর্চনা। মানি থুড়ি মানসী কাছেই থাকে, সে আমার পাড়ারও বন্ধু। দীপিকা অর্চনা দূরে দূরে। দীপিকা ভবানীপুর, অর্চনা রাসবিহারী।

তো একদিন হল কি, ক্লাস এইটের হাফইয়ার্লি পরীক্ষার ঠিক আগে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই পর পর পাঁচ দিন স্কুলে এল না দীপিকা। আমরা তো ভেবে আকুল। শেষে ঠিক করলাম ওর বাড়িতে খোঁজ করতে যাব। বিকেলবেলা তিনজনে মিলে ট্রামে তো উঠে পড়লাম, ঠিক ঠিক নামলামও যদুবাজার স্টপে, তারপর? কাছে ঠিকানা নেই। আগে মাত্র একবারই গেছি ওদের বাড়ি, তবু খুঁজে খুঁজে শেষে বার করা গেল। পুরনো দোতলা বাড়ি। বাইরের প্লাস্টার খসা। কালচে শ্যাওলার দাগ প্রাচীন বাড়ির শরীরে। দোতলার ঝুল বারান্দায় নকশা করা কাঠের রেলিং। দরজা জানলাগুলোর মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে লাল সবুজ কাচ বসানো।

কাঠের প্রকাণ্ড সদর দরজার এপারে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তিনজন। ভরা বিকেলেও কেমন যেন থমথম করছে চারদিক। কে জানে বাবা, এই বাড়িটাই তো! দেখাই যাক না। সাহস করে মানসী আগে দরজা ঠেলল। ঠেলতেই সিংহদুয়ার খুলে গিয়ে সামনে এক শ্যাওলাধরা উঠোন, মাঝখানে মানুষসমান এক চৌবাচ্চা, পাশ দিয়ে লোহার রেলিং দেওয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

ডাকব কি ডাকব না করেও অর্চনা ডেকে ফেলেছে,—দীপিকাআআ....

গোটা বাড়ি ভূতুড়ে রকমের স্তব্ধ। বার দুয়েক ডাকার পর দোতলায় খুট করে একটা শব্দ। নীচ থেকেই সোজা দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ দরজা খুলে গেছে। বাদামি লুঙি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা একজন বেরিয়ে এল। গায়ের রং তার ফ্যাকাসে রকমের ফর্সা, অনেকটা চুনের দেওয়ালের মতো, মাথাজোড়া টাক, চোখের তলায় কালশিটে রঙের কালি।

মানসী কনুই দিয়ে কোমরে খোঁচা দিল,—দীপিকার বাবা।

আগে কোনওদিন দীপিকার বাবাকে দেখিনি। গুটি গুটি পায়ে আমি আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে প্রণাম করে ফেললাম,—আমরা দীপিকার বন্ধু।

দীপিকার বাবা হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল,—তো?

আমরা ভয় পেয়ে গেলাম,—দীপিকা বাড়ি নেই?

—কেন?

—না মানে ও কদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছে না তো....

—আর যাবে না।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

এ আবার কি কথা? দীপিকার বাবা কি পাগল নাকি?

অর্চনা সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেলল,—কেন মেসোমশাই?

—কেন আবার কি! পড়তে পাঠাবো না তাই। লেখাপড়া শিখে মেয়েছেলের আর দিগ্‌গজ হয়ে কাজ নেই। তোমরা আর ওর খোঁজ করতে আসবে না।

ভদ্রলোকের কথায় এমন একটা ঝাঁঝ ছিল যার তোড়ে আমরা হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছি। চলে যাওয়ার জন্য উঠোনও পেরিয়েছি, হঠাৎই দোতলার কোনও ঘর থেকে ছিটকে এসেছে দীপিকা,—অ্যাই অপু, মানি, অর্চনা, তোরা যাস না, প্লিজ। দাঁড়া।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের হুঙ্কার,—খবরদার খুকু, এক পা'ও বেরোবে না।

—কেন বেরোব না? নিশ্চয়ই বেরোব। আমি স্কুল যাব। পড়াশুনো করব।

দীপিকার পরনে আধময়লা স্কার্ট ব্লাউজ, চোখমুখ ফোলা ফোলা, চুল দেখে মনে হয় বেশ কদিন চান করেনি। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দীপিকার বাবা দীপিকার হাত চেপে ধরল,—আমি তোমাকে বেরোতে বারণ করেছি খুকু। যাও। ঘরে যাও।

দীপিকা জোর করে হাত ছাড়াতে গেল, অমনি গালে সপাটে এক চড়। আমাদের সামনেই। ঘাড় ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দীপিকাকে ঢুকিয়ে দেওয়া

হল ঘরে, দিয়েই দরজায় শিকল,—কী হল? তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? দীপিকার সঙ্গে দেখা হবে না। যাও।

অর্চনা আর্তনাদ করে উঠল,—আপনি ওকে ওভাবে মারলেন?

দীপিকার বাবা উত্তর দিল না। একই রকম কড়া চোখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমরা বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এসে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি।

—কেসটা কী বল তো? কেমন যেন মিস্টিরিয়াস না?

—এ আবার কী কথা! পড়তে দেবে না কেন? কেন ঘরে আটকে রাখবে?

—ওর মাকেও তো দেখলাম না! মা কিছু বলছে না বাবাকে?

অর্চনা বলল,— অন্য কোনও গন্ডগোল হয়ে থাকতে পারে। দীপিকা কারুর সঙ্গে প্রেমটেম করছে নাকি? সেটাই জানতে পেরে....

—দূর, ওর লাভার থাকলে আমরা জানতে পারতাম না!

—তাহলে দ্যাখ, ওর বাবা হয়ত কোন মালদার অশিক্ষিত বনেদি পাত্রটাত্র জোগাড় করে ফেলেছে। ও হয়তো বিয়ে করবে না বলে জেদ ধরেছে তাই....

আমরা তিনজনই মোটামুটি শেষ সম্ভাবনাটার ব্যাপারে একমত হলাম। আবার মনটাও কেমন খুঁতখুত করতে লাগল। এরকমও হয়? একবার মনে হল হতেও তো পারে। এই তো সেদিন বি সেকশনের ভারতী দিন পনেরো ডুব মেরে আচমকা এক মাথা সিঁদুর নিয়ে ভেসে উঠল স্কুলে। কী হাসিখুশি হাবভাব, কথায় কথায় গড়িয়ে পড়ছে বন্ধুদের গায়ে, শাঁখা চুড়িতে ঝমঝম আওয়াজ তুলে অসভ্য অসভ্য গল্প বলছে নিজের সম্পর্কেই।

সে যাই হোক, ভারতীর কথা ভাবতে একটুও ইচ্ছা করছিল না আমাদের। দীপিকার কথা ভেবেই সুন্দর সোনালি বিকেলটা কেমন পাঁশুটে মেরে গেল। একটা একদম অচেনা যন্ত্রণা আমাদের বিকেলের ফুসফুসটাকে নিংড়ে নিচ্ছে। এক বুক মন খারাপ নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেছি। খুব মন খারাপ আমাদের। পরদিন। তার পরদিন। তার পরদিনও। লম্বি ধাস্‌সির কোর্ট হঠাৎই কেমন বিস্বাদ। আমি মানসীর বাড়িতে যাই। মানসী আমাদের বাড়িতে। কোনও কোনও দিন অর্চনাও আসে। বারান্দার ধাপিতে, সিঁড়ির কোণায় বয়ে যায় আমাদের পাঁশুটে বিকেল।

সবাইকে চমকে দিয়ে হাফইয়ার্লি পরীক্ষার দিন আচমকা হাজির দীপিকা। সাদা ব্লটিং পেপারের মত মুখ, সেলাই করা ঠোঁট, ঘাড় নিচু করে পরীক্ষা দিয়ে গেল একের পর এক। আমরা কথা বলতে গেলে উদাসীন চোখে শুধু

জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। পরীক্ষা শেষ হল। আমরা তিন জন গোলা পায়রা হয়ে উড়তে উড়তে বাড়ির কাছে হতশ্রী পার্কটায় গিয়ে বসলাম। প্রচুর কথা জমেছে বুকে। প্রচুর। ঠিক তখনই দীপিকা আমাদের খুঁজে বার করেছে পার্কটাতে।

আমরা হতবাক।

দীপিকা আমাদের পাশে বসে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাস ছিড়ে দাঁত দিয়ে কাটল একটুক্ষণ। কিছু বুঝি বলতে চায়, পারছে না। একসময়ে দুম করে অর্চনাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওরকম বুকফাটা কান্নায় আমার আর কোনও বন্ধুকে কাঁদতে দেখিনি আগে। কখন যেন অর্চনাও কাঁদতে শুরু করেছে। মানসীও। দেখাদেখি আমিও। কেন কাঁদছি না জেনে অবিরাম কেঁদে চলেছি আমরা। তারই মধ্যে হেঁচকি তুলতে তুলতে দীপিকা বলল,—তোরা শুনলে আমার গায়ে থুতু দিবি, কিন্তু তোদের ছাড়া আর কাদেরই বা বলব! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

আমাদের কান্না ফুরোল।

—কেন রে?

—কী হয়েছে আমাদের খুলে বল।

—তুই মরতে যাবি কেন? আমরা আছি না।

দীপিকার ভারী ভারী চোখ স্থির কয়েক পলক,—আমার মা পালিয়ে গেছিল।

'মা পালিয়ে গেছিল' বাক্যটার অর্থ ঠিকটাক বুঝতে পারলাম না। আমার কাছে তখনও মা হল গিয়ে মা। সামান্য ছুতোনাতায় যে কান ডলবে, চুলের মুঠি ধরবে, বকবক করে নড়িয়ে দেবে কানের পোকা, যতসব অপ্রিয় কুখাদ্য খেতে বাধ্য করবে আমাদের, আর সুযোগ পেলেই বাবার কাছে তিনকে সাত করে বলে বকুনি খাওয়ানোর চেষ্টা করবে, পুজোর সময় দুসাইজ বড় জামা কিনে তাই পরতে বাধ্য করবে, ক্বচিৎ কখনও দাদাকে লুকিয়ে ফুচ্‌কা আলুকাবলির পয়সা দেবে আমাকে। সেই মা কি কখনও পালাতে পারে! বললাম,—ভ্যাট। কী বলছিস তুই?

—মা কালীর দিব্যি, সত্যিই মা পালিয়েছিল। রবিনকাকার সঙ্গে।

—রবিনকাকাটা কে?

—ও, তোদেরকে তো রবিনকাকার কথা বলিনি। রবিনকাকা বাবার খুব বন্ধু। ভীষণ সুন্দর দেখতে। দারুণ জমিয়ে গল্প বলতে পারে। গুড ফ্রাইডের আগের দিন সন্ধেবেলা মা আর রবিনকাকা কী সব কিনতে বেরিয়েছিল, তারপর

আর ফেরে না, ফেরে না। ....বাবা বার বার বাসরাস্তায় যাচ্ছে আর আসছে। মাঝরাতে রবিনকাকার বাড়িতে গিয়েও খুঁজে এল। নীলাকাকিমা মানে রবিনকাকার বউ, বাচ্চা কোলে কাঁদতে কাঁদতে সেই রাতেই আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। বাবা রাতভোর অবিরাম গজরাচ্ছে। সে কী খারাপ খারাপ গালাগাল! আছড়ে আছড়ে সব জিনিসপত্র ভাঙছে আর লাল চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে, কাল থেকে যদি বাড়ির বাইরে পা রাখিস, কেটে আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। ভোর হতেই কাকিমাকে নিয়ে নালিশ করতে থানায় ছুট। তোরা যেদিন এলি সেদিনই থানা থেকে পুলিশ এসেছিল বাড়িতে, খোঁজখবর করে নাকি জেনেছে মাকে আর রবিনকাকাকে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে দেখা গেছে। তারপরই বাবার আবার নতুন করে আস্ফালন....

শুনতে শুনতে কাঁটা দিচ্ছিল সর্বাঙ্গে। নিজের বাবা মা চোখের সামনে দুলে উঠছে। দুলে দুলে ভেঙে যাচ্ছে, যেভাবে পাথর পড়ে ছায়া ভাঙে শান্ত দীঘির জলে।

—তারপর তো হাফইয়ার্লি পরীক্ষার চার দিন আগে মা নিজে নিজেই এসে উপস্থিত। যেন কিছুই হয়নি। যেন জাস্ট পাশের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরল। ....মাকে দেখেই বাবার সে কী মেজাজ! এমন চোটপাট শুরু করল যে মজা দেখতে বাড়িভর্তি লোক জমে গেল! ভাবলেই আমার.... বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলেছে দীপিকা।

আমরা ওর মাথায় পিঠে হাত বোলাচ্ছিলাম। ও কেঁপে কেঁপে উঠছিল কান্নার দমকে,—আমি মরে যাব। আমি মরে যাব। আমি মরে যাব।

মানসী নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—আর তোর মা? মা কী বলল?

—মা তো বাবার থেকেও বেশি চেঁচাচ্ছিল। বলল, বেশ করেছি গেছি, আমার যেখানে ইচ্ছে যাব, যখন খুশি ফিরব, তুমি কৈফিয়ত চাওয়ার কে? মদোমাতালের ঘর করি, পুরুষমানুষ হয়ে এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই....

—তোর বাবা মদ খায়?

—খায় না আবার। প্রায়ই তো রাত্তিরে চুর হয়ে ফেরে....

এবার আর নিজের বাবা নয়, এবার চোখের সামনে হাবুর বাবার ছবি। হাবুর বাবা আমাদের পাড়ার গোকুল পরামানিক, গলির মোড়ের খুদে সেলুনটার মালিক। সেই গোকুলকাকা যখন রোজ রাত্তিরে সামনের রাস্তা দিয়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে হেঁটে যায়, তখন কাজের শেষে ফুটপাত জুড়ে তাস পেটাতে বসা বদ্রিঠাকুর, সুরিন্দরঠাকুররা চেঁচায়,—আরে ও গোকুলদাদা, সামহালকে চলো সামহালকে, আগাড়ি তুমহারা ভঁইসবা....

গোকুলকাকা সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে, ছুটতে থাকে খিস্তির ফোয়ারা,—কোন শালা আমায় ভঁইস দেখায় রে? আমি কি কারুর মায়ের ভাতারের পয়সায় মাল খাই? ভঁইস দিয়ে গোক্‌লোর সঙ্গে চালাকি চলবে না, হ্যাঁ। বলতে বলতে সোজা হেঁটে নেমে যায় পাশের নর্দমায়, এক হাঁটু পাঁকে। সেখান থেকেও চলে তার গালাগালির পিচ্‌কিরি।

আমি আর দাদা তো খড়খড়ি ফাঁক করে হেসে কুটিপাটি। মা দেখলেই টেনে সরিয়ে দেয় আমাদের। বাবা হুঙ্কার ছাড়ে,—এই গোক্‌লো কী হচ্ছেটা কি? এটা ভদ্রলোকের পাড়া। বলেই রেডিওর শব্দ বাড়িয়ে দেয় দুগুণ।

দৃশ্যটা ভাবতেই পেট গুলিয়ে হাসি এল আমার। নিজের মনে ফিক করে হেসেও ফেলেছি। অর্চনা কটমট করে তাকাল আমার দিকে। তারপর দীপিকার কাঁধে হাত রাখল আলতো.—আগে এসব কথা তো বলিসনি কোনও দিন?

দীপিকা হাঁটুতে মুখ গুঁজল,—এ সব কথা কি বলে বেড়ানো যায়? সত্যিই তো বাবা কিছু করে না। দাদু মানে আমার মা'র বাবার রেখে যাওয়া টাকাতেই তো সংসার চলে আমাদের। বাড়িটাও তো দাদুর। বাবা তো ঘরজামাই।

ঘরজামাই শব্দটাও খট্‌ করে বেজেছে কানে। তখনও জানতাম ঘরজামাই শব্দটা প্রায় একটা গালাগাল। নিজের শব্দকোষে গালাগালির সংখ্যা তখনও বড় অপ্রতুল। শালা শব্দটাকেই কী যে নিষিদ্ধ, গর্হিত মনে হত তখন! ঘরজামাই ঠিক ততটা খারাপ না হলেও.... আমাদের বাড়ির ভোজপুরী ধোপা সুর করে গাইত, পহেলা কুত্তা পালতু কুত্তা, দুসরা কুত্তা ঘরজামাই!

আমি জিজ্ঞেস করে ফেললাম,—কেন? তোর বাবার ঘরদোর কিছু নেই?

—থাকবে না কেন? সেখান থেকে ভাইরা তাড়িয়ে দিয়েছে বহু দিন। আমার কাকা জ্যাঠারা কেউ বাবার মুখ দেখে না।

কান্নার সঙ্গে তীব্র বিষ উগরে দিচ্ছিল দীপিকা। বিষ নয়, ঘৃণা। নিজের বাবা মা'র প্রতি ঘৃণা, জীবনের প্রতি ঘৃণা, গোটা বিশ্বসংসারের ওপর ঘৃণা। সঙ্গে একই কথা, বাঁচব না, বাঁচব না। আর আমি তখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম আমার বাবা মার মুখ। বাবা মানে যেমন হওয়া উচিত, অন্তত আমার তখনকার ধারণায়, আমার বাবা তো তেমনই। বাবা মানে একটু গম্ভীর ধরনের এক মানুষ, বেশি কথা বলে না, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাজার যায়, ফিরে এসে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, তারপর চান খাওয়া সেরে মা'র হাতে তৈরি টিফিনটা নিয়ে সারাদিনের মত অফিসে চলে যায়, ফেরে সেই রাস্তার আলোগুলো জ্বলে যাওয়ার পর, সন্ধেবেলা নিয়ম করে রেডিওতে খবর শোনে, মাঝে মাঝে আমাদের অঙ্ক ইংরিজি দেখিয়ে

দেয়, কখনও কখনও ঠোঙাভর্তি গরম জিলিপি কিনে আনে মোড়ের দোকান থেকে, কখনও বা বচ্ছরকার আমটা, লিচুটা, জামটাম, আর হঠাৎ হঠাৎ পড়া ধরে বকাঝকা করে ভীষণ। এই বাঁধাধরা সংজ্ঞার বাইরেও তবে অন্যরকম বাবা আছে! বাবা মানেই তবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা নয়! বাড়ি ফিরে সেদিন বার বার সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিলাম নিজের বাবা মা'র দিকে। মুখের ওপর কোনও মুখোশ আছে কি? হয়তো আছে, হয়তো নেই। কে জানে!

ক্লাস এইট থেকে নাইন ওঠার পরীক্ষায় খুব খারাপ রেজাল্ট করল দীপিকা। সায়েন্স তো পেলই না, প্রোমোশনটাও অন ট্রায়াল। বড়দিনের ছুটির সময়ই খবর পেলাম ওকে অন্য কোথায় যেন পাঠিয়ে দিচ্ছে ওর রবিনকাকা আর মা, সেখানেই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবে। এর পর ওর আর কোনও খোঁজখবর পাইনি। দীপিকা ক্রমশ হারিয়ে গেছে আমার বিকেল থেকে। এখন বন্ধু বলতে আমরা দুজন। আমি আর মানসী। অর্চনা মাঝে মাঝে আসে বিকেলবেলায়, তবে মাঝে মাঝেই। ক্লাস নাইনে ওঠার পরই পড়াশুনা নিয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল। রোগা সোগা মেয়ে, নানারকম অসুখেও ভুগত মাঝেমধ্যে।

স্কুল থেকে ফিরে আমি আর মানসী হেঁটে বেড়াই এদিক-ওদিক। তখন আর আমরা শিশু নেই, কেঁচো, ব্যাঙের প্রজনন প্রণালী পড়ে রোমাঞ্চ বোধ করি। পুংকেশর গর্ভকেশরের মিলন কল্পনা করে পুলকিত হই। লুকিয়ে লুকিয়ে মানসীদের ছাদে বসে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের অনুবাদ পড়ে শিউরে উঠি, কিছু দাগ দেওয়া পাতা বেছে বেছে পড়তে থাকি বার বার। রবিবার দুপুরে অনুরোধের আসরে শোনা কোনও গানের মোহজড়ানো বিভ্রমে আপ্লুত হই সারা সপ্তাহ। দূরের কোনও বাড়িতে গ্রামাফোন রেকর্ডে বাজতে থাকা 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' শুনতে শুনতে বইয়ের অক্ষরগুলো চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যায়। বিকেলবেলা ঘাসের লন ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অর্থহীন কথায় নিজেরাই হেসে কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাই। আর তখনই অনুভব করি ছায়া ছায়া অদৃশ্য অনুসরণকারীদের উপস্থিতি। হঠাৎই কোন সাইকেল অসম্ভব ধীরগতিতে চলতে থাকে পাশে পাশে। পরিচিত গানের কলি স্বরযন্ত্রে ধাক্কা দেয়। দু-একটা চিঠিও পায়ের কাছে হুসহাস উড়ে এসে পড়ে,—ডার্লিং, তুমি নেই তো পৃথিবী নেই। মা তোমাকে বউ হিসেবে পেলে খুব খুশি হবে। কোনা পার্কের সামনে কাল বিকেলে অপেক্ষা করব। চলে এসো। ইতি, তোমার পথ চেয়ে থাকা একজন। কী সাহস! কী সাহস! আমরা বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলি। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেদিন আর দেখা পাই না সেই অচেনা প্রেমিকের। চিঠি

ছুঁড়েই উধাও বীরপুঙ্গব। আমরা আবার কাঁঠালি চাঁপার গন্ধমাখা সবুজ ঘাস ধরে হাঁটতে থাকি। বিরক্তির সঙ্গে মেশে কৌতূহল, রাগের সঙ্গে অহংকারী পুলক। আমরা টের পাই প্রতিটি বিকেলে এখন নীরবে কুসুমের মতোই প্রস্ফুটিত হচ্ছে সে। আমাদের যৌবন।

তা সেই যৌবনের ডাক প্রথম এল মানসীর কাছে। একদিন বিকেলে মানসীকে ডাকতে গেলাম, মানসী নেই। ম্যাজেনাইন ফ্লোরে সদ্য আসা তাদের পেয়িংগেস্টের কাছে কেমিস্ট্রি পড়ছে। দরজা ধাক্কা দিতে বেরিয়ে এসে বলল,—তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি। প্রবীরদার কাছে ক'টা কেমিক্যাল ইকুয়েশান বুঝে নিচ্ছি।

নীচে নেমে অপেক্ষা করলাম, মানসী এল না।

পর দিনও একই ঘটনা। মানসী হাসিমুখে বেরিয়ে এল,—কাল বেরোতে পারলাম নারে, আজ ঠিক যাব। ট্রিগনমেট্রির দুটো অঙ্ক করে নিয়েই....

সেদিনও আমার বিকেলটা একা একাই কাটল।

পর দিন আবার একই ঘটনা। মানসী হি হি হাসছে,—মা কালীর দিব্যি, কাল পার্কের দিকে গিয়ে তোকে খুঁজেছিলাম, তুই চলে গেছিলি। আজ একটু অ্যামোনিয়ার প্রপার্টিগুলো বুঝে নিয়েই....

সেদিন দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেতর থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসছে না? শব্দই তো! শব্দগুলোর কোনও অর্থ নেই। অন্তত সে অর্থ অ্যামোনিয়ার চ্যাপ্টারে তো নেইই।

নীচে নেমে আর অপেক্ষা করিনি। পরিচিত রাস্তা ধরে কৃষ্ণচূড়ার ফুল মাড়িয়ে একা একাই হেঁটেছি। দুর্বোধ্য অপমানে কান গরম। ক্ষোভে দুঃখে বন্ধুর মিথ্যাচারিতায় ক্লিষ্ট আমি একই পথ চক্কর দিয়ে ফিরছি। ধীরে ধীরে একটা চাপা কষ্ট আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আমাকে। কষ্ট, না হিংসে? আমার একমাত্র বন্ধু মানসী প্রেমের সন্ধান পেয়ে গেছে আমার আগেই। ঠিক করলাম ওর সঙ্গে আর কথা বলব না।

কিন্তু মানসী পর দিনই স্কুলে আমার হাত চেপে ধরেছে,—অপু বিশ্বাস কর, তুই কী ভাবছিস জানি না....

—তোর কি ধারণা প্রেমে পড়লে বন্ধু টের পায় না?

মানসী মুহূর্তের জন্য লাল,—প্রবীরদার সঙ্গে তোর পরিচয় নেই, না রে? চল, আজ তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

—আমি আলাপ করে কী করব? তোর লাভার, তুই....

—আহ অপু, ছেলেমানুষি করিস না। জানিস তোর কথা কত বলেছি প্রবীরদাকে! তোকে আজ নিয়ে যাবই।

আমি তখন অনেক উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। জানি প্রেমের সিনে তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে কাবাবমে হাড্ডি। তাছাড়া আমি কেন ওদের মধ্যে....?

মানসী কানের কাছে মুখ নিয়ে এল,—ভাবতে পারবি না, প্রবীরদা কী ভীষণ রোমান্টিক। সেদিন আমার হাত ধরতে.... দ্যাখ্ দ্যাখ্ ভাবতেই আমার কেমন গায়ে কাঁটা গিয়ে উঠছে....

আমার তখন হিংসে ভেসে গেছে কৌতূহলে,—কী কথা হয় রে তোদের দুজনের?

—কত কথা। মানসী গা মুচড়োল,—এই আমি কী ভালবাসি, ও কী ভালবাসে, আমার মা বাবা কেমন, ওর দেশে কে কে আছে, এম-এসসি করে ও কী করবে, বিয়েতে কারুর আপত্তি হবে কি না....

—তোরা বিয়ের কথাও ভেবে ফেলেছিস?

—ভাবব না? তাড়াতাড়ি বিয়ে না করে ফেললে ওর যদি অন্য কারুর দিকে মন ঘুরে যায়?

—যাহ, প্রকৃত ভালবাসা থাকলে লক্ষ বছর অপেক্ষা করা যায়। প্রাজ্ঞ প্রেমিকার মত বললাম,—তুই লায়লামজনু পড়িসনি? হীর্‌রনঝা?

—তুই ঠিকই বলেছিস রে। প্রবীরদাও তাই বলে। বলে দরকার হলে দশ বছর অপেক্ষা করব। বলে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো? মা কালীর দিব্যি, আমার অত ধৈর্য নেই রে।

মানসীর কথার ভঙ্গিতে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলাম আমি। কোনও রকমে বললাম,—বালিকা, রহু ধৈর্যং, রহু ধৈর্যং....

এক দিন বিকেলে অর্চনার বাড়ি থেকে একটা বই নিয়ে ফিরে দেখি মানসী আমাদের বাড়িতে বসে দিব্যি তেঁতুলের আচার খাচ্ছে। আমাকে দেখে চোখে আঙুলে ঠোঁটে এক রহস্যময় ইঙ্গিত করে বলে উঠল,—কী রে, কাল যাচ্ছিস তো?

—কোথায়?

—কেন তুই কাল স্কুল থেকে যাচ্ছিস না৷ বেনহার দেখতে? স্কুলে টাকা জমা করিসনি?

ভীষণ চমকেছি। মানসীর কথা মার কানেও গেছে। মা আমাকে প্রশ্ন করল,—তুই তো বলিসনি বাড়িতে এসে!

মানসীর রহস্যময় ইশারা ততক্ষণে বুঝে গেছি, বললাম—সে তো কাল টাকা দিলেও হবে। আমি ভেবেছিলাম আজ তোমাদের জিজ্ঞোস করে....

দাদা ভেতরের বারান্দায় বসে জলখাবার খাচ্ছিল। সদ্য তখন ফার্স্ট ইয়ারে

পড়ছে। বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বলল,—যা যা দেখে আয়, যা একটা চ্যারিয়ট্ রেস আছে না!

রাস্তায় এসে মানসীকে বললাম,—ব্যাপার কী রে? গুল মারলি কেন?

মানসী আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরল,—মা কালীর দিব্যি, প্রবীরদা এমন করে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইল....

—ইস, চাইলেই হল? আমি আলাপ করলে তো....

—প্লিজ অপু, ও তিনটে টিকিট কেটে ফেলেছে। জংলীর। শাম্মী কাপুর আর সায়রাবানু।

—স্কুল থেকে বেরোবি কী করে?

—আমি কাল স্কুল যাচ্ছি না। তুই টিফিনের সময় পেট ব্যথাট্যাথা কিছু বলে....

মিথ্যা কথা বলতে কী যে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করেছিল স্কুলে। হলে পৌঁছেও মনে হয় জনঅরণ্যের প্রতিটি মানুষ যেন আমার ভীষণ পরিচিত, সকলেই যেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আমারই দিকে, যেন এখখুনি বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসবে মা বাবাকে। অল্পবয়সী যে কোনও ছেলে দেখলেই মনে হয় দাদার বন্ধু না! হল অন্ধকার হতে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এতো আর বাবা মার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা, পথের পাঁচালি, লালুভুলু কি কাবুলিওয়ালা দেখা নয়, এ হল সবথেকে প্রাণের বন্ধু আর তার প্রেমিকের সঙ্গে বসে প্রায়নিষিদ্ধ এক হিন্দি সিনেমা দেখা, যার এক বর্ণ ভাষাও আমার বোধগম্য নয়। চোখের সামনে শুধু এক উদ্দাম দস্যু পুরুষ ইয়াহু চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পদ্মের পাপড়ির মতো কোমল রূপসী এক প্রেমিকার ওপর। বরফের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমারই যেন গায়ে জ্বর এসে গেল। প্রতি পলে পাশে বসা প্রেমিকযুগলের ফিসফিসানিও কানে আসছে, অন্ধকারেও টের পাচ্ছি মানসীর শরীরকে বেড় দিয়ে আছে প্রবীরদার বলিষ্ঠ হাত।

শো-এর আগেই আলাপ হয়েছিল প্রবীরদার সঙ্গে, হাফটাইমে দু একটা টুকটাক কথা, পর্দায় যখন বুনো প্রেম শেষ হল তখন আর ভয় সংকোচ নেই, মুখে আমার কথার খই ফুটছে—তারপর মশাই, এই যে আমাকে পাপের ভাগী করলেন, তার শাস্তিটা পাবে কে? প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে ঈশ্বরও থাকতে ভয় পান, আমি তো নেহাতই এক ফচকে শয়তান।

কী করে যে বলছিলাম ওসব কথা! তা যাই হক, হল থেকে বেরিয়েই আমি আর মানসী আলাদা, প্রবীরদা আলাদা। বাসে উঠে প্রবীরদা দূরের সিটে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক মুখ এক অচেনা তরুণ।

পাড়ায় এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল মানসী,—এই অপু, বল্ না, বল্ না, কেমন লাগল প্রবীরদাকে?

গম্ভীর বিচারকের মতো মুখ করে রায় দিলাম,—মন্দ নয়। বেশ উইটি। তোর টেস্ট আছে।

মানসী বিশাল লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল,- -যাক, আমার যা ভাবনা হচ্ছিল।

সময়ের মনে সময় এগোয়। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ফুরিয়ে শীত এসেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলাকালীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় পাড়ার জুনিয়ার মেয়েদের খেলা দেখছি, সেদিনই অঙ্ক পরীক্ষা ছিল, ট্রিগনমেট্রিটা ভাল হয়নি, সেজন্য মনটাও বেশ খারাপ, পর দিন বায়োলজি পরীক্ষার জন্য পড়তে বসায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না, এমন সময় মানসী এল। তার মুখচোখও কেমন আনমনা, আমারই পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে অথচ কোনও কিছুই যেন দেখছে না। গত ক'মাস ধরে ওর যেন কী রকম ছাড়া ছাড়া ভাব। প্রায়ই বিকেলে কোথাও না কোথাও অভিসারে নিপাত্তা হয়ে যায়, পুজোর ক'দিন একটি সন্ধেতেও ওর টিকি দেখা যায়নি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—খুব সাহস বেড়েছে দেখছি, মাসিমা যদি জানতে পারে?

—তুই কি ভাবছিস মা কিছুই আন্দাজ করে না? প্রবীরদাকে মারও খুব পছন্দ। হবে না'ই বা কেন বল্? ব্রাইট স্টুডেন্ট, অত সুন্দর চেহারা, ভাল ফ্যামিলি, দেশে কত জমিজমা বাড়িঘর....

তাই তোর এত সাহস? আজ বেলুড় দক্ষিণেশ্বর, কাল সিনেমা, পরশু লেক.... খুব চালাচ্ছিস্? তো এখনও কি শুধু হাত ধরাধরিই, না একটু এগিয়েছে?

---যাহ্। প্রচণ্ড জোরে চিম্‌টি কেটেছে মানসী,—তুই বড় ফাজিল হয়েছিস! বলতে বলতে গলা নামিয়েছে,---কিস্ করেছে।

মিস্ মার্পলের মতো ওর চোখের দিকে তাকিয়েছি আমি,---কেমন লাগে রে? টকটক? মিষ্টিমিষ্টি? ঝালঝাল?

---ও বলে বোঝানো যায় না। তোর হোক, বুঝতে পারবি। স্বর্গসুখ রে, স্বর্গসুখ।

প্রবীরদার সঙ্গে এর মধ্যে দু একবার দেখা হয়েছে এদিক ওদিক, হেসে কথাও বলেছি এক আধটা, ভালই লেগেছে। হিংসে এখন অতীত। মনের গভীরে ওদের প্রেম অনুক্ষণ এক গোপন আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে আমার। কীভাবে ওদের প্রেম পূর্ণতা পাবে তাই নিয়ে ভাবি দিনরাত। যেন ওদের প্রেমের সার্থকতাতে আমারও কিছু অংশীদারি রয়ে গেছে।

পাশে দাঁড়ানো মানসীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী রে মানি, পরীক্ষার সময়তেও ধ্যান চলছে?

মানসী মাথা ঝাঁকাল, নাহ্, কালকের বায়োলজি পরীক্ষার কথা ভাবছি।

—বাজে বকিস্ না। তোর নাক টানা দেখেই আমি বুঝতে পারি সর্দি হয়েছে কিনা। প্রবীরদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্?

শীতের শুকনো পত্রপুষ্পবিহীন কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়েছিল মানসী। দুট্ করে আমার হাত চেপে ধরেছে,—ও কেমন বদলে যাচ্ছে রে অপু।

—কেন? কী বলেছে তোকে?

—বলবে আবার কী। দুচার মিনিট কথা বলেই আমাকে আজকাল কাটাতে চায়। বেরোতে বললে পড়াশুনোর ছুতো দেখায়।

—বারে, পড়াশুনো করবে না? রেজাল্ট ভাল হলে তো তোরই লাভ। সে'ও তো তোরই জন্যে।

—হুঁহ্, আমার জন্যে না হাতি। মেয়েদের চোখ ঠিক বুঝতে পারে। তুই একবার ওর সঙ্গে কথা বলবি?

—আমি! আমি কী বলব! সদ্য পড়া উপন্যাস উগরে দিলাম মানসীকে,—দ্যাখ্ মানি, প্রেম হল এক ধরনের সাধনা, ব্রত। দুজন নারীপুরুষের মধ্যে চিরন্তন সম্পর্কের ইমারত গড়ে ওঠার শক্ত ভিত। এখানে তৃতীয় মানুষের ভূমিকা নেই রে। প্রবীরদাকেও তো দেখেছি, মিথ্যে ভাবিস না, প্রবীরদা খুবই ভালবাসে তোকে।

মানসী হঠাৎই খেপে গেল,—থাক, তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। যদি কোনও দিন মরে যাই....

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম,—তুই তো লায়লাকেও হার মানালি রে। অল রাইট, কাল পরীক্ষা শেষ হোক, ধরছি প্রবীরদাকে।

পরীক্ষার পর মানসীর ঘ্যানঘ্যানানি এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এক বিকেলে গেলাম প্রবীরদার ঘরে। আমাকে দেখে প্রবীরদা প্রথমটা খুবই অবাক। শুধু অবাক নয়, কেমন যেন খুশি খুশিও।

সরাসরি কথা পাড়লাম,—অ্যাই মশাই, আমার সুন্দর বন্ধুটাকে আপনি এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

প্রবীরদা অল্প থমকাল,—কষ্ট দিয়েছি? কই না তো!

—বাজে কথা বলবেন না। ওর সঙ্গে আপনি ভাল করে কথা বলেন না, বাইরে বেরোতে চান না, কথা বলতে গিয়ে হাই তোলেন, ব্যাপারখানা কী?

আমার আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় প্রবীরদা, মিটিমিটি হেসেই চলেছে,—তোমার বন্ধুর কথা ছাড়ো। নিজের কথা বলো। তোমাকে যে কী সুন্দর দেখতে লাগছে আজ। এখখুনি যদি সুচিত্রা সেন তোমাকে দেখত....

একটা শিরশিরে চোরা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। জীবনে প্রথম কোনও পুরুষের মুখে আমার রূপের স্তুতি!

—ইস্, ফাজলামি হচ্ছে? দেব মানিকে বলে তখন টেরটি পাবেন।

চকিতে প্রবীরদা এগিয়ে এল আমার দিকে,—তোমার মনে হচ্ছে আমি ফাজলামি করছি? তুমি জানো তুমি কত সুন্দর? আয়নায় ভাল করে দেখেছ নিজেকে?

প্রবীরদার চোখ ক্রমশ ঘোলাটে, অস্বচ্ছ। আমি সরে আসার আগেই আমার হাত চেপে ধরেছে,—বিশ্বাস করো অপরাজিতা, তোমাকে দেখার পর থেকে, তোমার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে, মানসী অসহ্য হয়ে গেছে। ম্যাড়মেড়ে। জোর করে ওর সঙ্গে বেরিয়েছি, এদিক ওদিক গেছি, কিন্তু সে প্রায় বাধ্য হয়ে। তুমি ছাড়া....

কেউ যেন সিসে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে আমার কানে। সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে দু হাতে কান চেপে ধরলাম,—কী পাগলের মত যা তা বলছেন! এ তো ট্রেচারি, চিটিং, ছি ছি ছি....ছিঃ।

পলকে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল প্রবীরদা। দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে আমার কোমর। এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে ছিটকে এসেছি ভেজানো দরজার কাছে। নিচু স্বরে হিসহিস করে উঠলাম,—জানোয়ার। জানোয়ার কোথাকার। মানি একটা জানোয়ারকে ভালবেসেছিল।

নীচে উদ্বিগ্ন মানসীর সামনে এসে দাঁড়ানোর সময়েও হৃৎপিণ্ড পাগ্‌লা ঘন্টি বাজাচ্ছে। মুঠো শক্ত করে চোয়ালে চোয়াল ঘসলাম। মানসী যেন কিছু আঁচ করতে না পারে।

—কী বলল রে?

—কিছুই না, এমনি হাসিঠাট্টা করছিল। শক্ত রাখতে গিয়েও আমার গলা কেঁপে গেল,—তুই ওকে ভুলে যা মানি। ও বোধহয় অন্য কাউকে....

মানসী অন্ধের মত আঁকড়ে ধরল আমাকে, বলল? বলল সে কথা? বলল আমাকে ভালবাসে না?

—বলেনি। কথা শুনে মনে হল। আমি ঢোক গিললাম,—হয়ত ইউনিভার্সিটিতে কাউকে....হয়ত নিজের দেশেরই কেউ....

মানসী এক ছুটে দোতলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়েছে শব্দহীন কান্নায়, কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠেছে।

আমারও চোখ ফেটে যাচ্ছিল। নিজেকে প্রাণপণে সামলানোর চেষ্টা করছি,—

কাঁদিস না মানি। একটা নোংরা বাজে লোকের জন্য তুই কাঁদবি কেন? ও তোর মতো মেয়ের কান্নার যোগ্য নয়।

বলতে গিয়ে বমি এসে যাচ্ছে। তখনও যেন আমার শরীরটাকে চাটছে ওই পুরুষ নেকড়েটা। নেকড়ে নয়, শেয়াল।

এই তবে প্রেম? ঘেন্না। ঘেন্না। ঘেন্না।

এর পর বেশ কিছুদিন কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিলাম আমরা। মানসী তো পুরোপুরি বিধ্বস্ত। মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবেও। নিয়ম মতো স্কুলে যায়, একেক দিন বিকেলবেলা জোর করে ওকে টেনে বাইরে বার করি, কখনও নিজেই বাড়িতে বসে থাকি চুপচাপ, চোখে জমে থাকে বিষাদের বরফ। তবে সময় তো সম্মোহনের মন্ত্রমাখা একমুখী ধাবমান তীর, সেই সম্মোহনেই বিষাদ মুছে যায়, নিরাময় হয় শোকের ক্ষত। সেই সম্মোহনেই প্রথম পুরুষের দেওয়া অপমান ভুলি আমরা। আবার নতুন করে হাঁটতে শুরু করি হলুদ বিকেলে। ঘুমন্ত রিক্সাঅলার কাঁধের গামছা চুরি করে হাসিতে গড়িয়ে পড়ি, পাড়ার ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলা করি। দাদার কাছে অ্যালজেব্রা কষি দুজনে। আমরা দুজনেই ঠিক করেছি হায়ার সেকেন্ডারির পরে ডাক্তারি পড়ব। হাজার হাজার রুগী আসবে আমাদের কাছে, তাদের কাছে আমরাই ঈশ্বর, ভাবলেই কী যে শিহরণ জাগে! তার জন্য অবশ্য ভাল রেজাল্ট করা দরকার। অর্চনার চিন্তা নেই, ও যা লেখাপড়ায় ভাল, ডাক্তারিতে চান্স পাবেই। তবে ইদানীং মেয়েটা একটা বিশ্রী মাথার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই বড় কষ্ট পায়। ইলেভেনে ওঠার পর থেকে তো প্রায়ই কামাই করছে। প্রিটেস্টের আগে পাক্কা কুড়ি দিন দেখা নেই। এখন আর অর্চনার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ না থাকলেও পুরনো একটা টান তো আছেই। সেই টানেই আমি আর মানসী ওকে দেখতে গেলাম।

অর্চনাদের বাড়িটা আগে একতলা ছিল। এখন দোতলা তিনতলা উঠে গেছে। লোহার ব্যবসায়ে অর্চনার বাবা জ্যাঠার নাকি এখন দারুণ রমরমা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর বাগান, বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ। সাজানো বাগানের মাঝে আলটপকা গাছটা কেমন যেন বেমানান লাগে।

অর্চনা দোতলার ঘরে শুয়েছিল, আমাদের দেখে উঠে বসেছে। খুবই রোগা হয়ে গেছে কদিনে, চোখের তলায় নীলচে ছোপ। ক্ষীণ স্বরে ডাকল,—আয়। এতদিন পরে খোঁজ নিতে এলি?

মানসী বলল,—রোজই ভাবি আসব, হয়ে ওঠে না রে। এত পড়ার চাপ....

আমি ঢোক গিললাম। শুধু কি পড়ার চাপ? যোগাযোগের অসুবিধে?

নাকি অন্য কারণও আছে? নিজেদের তৈরি করা জগতে ডুবে আমি আর মানসী একটু স্বার্থসচেতন হয়ে যাইনি কি? নিজেদের নিয়েই নিজেরা মগ্ন আছি। দীপিকার কথাও তো আজকাল মনে পড়ে না আমাদের। অপরাধী মুখে প্রশ্ন করলাম,—এখন কেমন আছিস?

অর্চনার মা ঘরেই ছিল, করুণ মুখে বলে উঠল,—দ্যাখো না, এত ডাক্তার দেখানো হল, এবার আর মাথার ব্যাথাটা কিছুতেই যেতে চাইছে না। হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তখন কী হয়ে যায় ওর! হাত পা ছুঁড়তে থাকে, চোখ উল্টে যায়, গোঁ গোঁ শব্দ ওঠে গলা থেকে, দেওয়ালে পাগলের মত মাথা ঠোকে তখন।

—ডাক্তারবাবুরা কী বলছেন?

—একেক ডাক্তারের একেক মত। মাথার ছবিও তো তোলা হল, কিছু পাওয়া গেল না। কেউ বলছে এ এক ধরনের হিস্টিরিয়া, কেউ বলছে নার্ভের দোষ, কেউ বলছে ব্রেনে কোথাও কিছু হয়েছে....। অর্চনার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল,—কী যে হল!

অর্চনা চোখ বুজে ফেলল। ঠোঁট দুটো কেমন সাদাটে হয়ে গেছে। কাঁপা গলায় বলল,—কবে যে আবার স্কুল যেতে পারব!

মানসী বলল,—ওষুধ পড়ছে তো। দ্যাখ্ না, দু চার দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠবি।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে অর্চনার জেঠিমা আমাদের জন্য সিঙ্গাড়া মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। অর্চনার মা'র মতো এঁর কপালেও এক ধ্যাবড়া সিঁদুর, সিঁথি জবজবে লাল, ঘরেও এঁরা খুব দামি দামি তাঁতের শাড়ি পরেন। অর্চনার জেঠিমার চেহারা বেশ দশাসই, অর্চনার মা'র মতো রোগাসোগা ছোটখাটো নয়, চোখ দুটো জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের মত বড় বড়, টানা টানা। তিনি বললেন,—আর গুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে কাজ নেই। ডাক্তারদের কেরামতি বোঝা গেছে। পরশু গুরুদেব এসে পড়ছেন, তাঁর ছোঁয়াতেই অনু আমাদের ঠিক সেরে উঠবে।

রাস্তায় এসে মানসীকে বললাম,—কী হয়েছে ডাক্তাররা ধরতে পারছে না কেন বল্ তো?

—কে জানে, ডাক্তাররা তো আর ধন্বন্তরি নয়। অনেক অসুখই তো আছে ধরা পড়ে না। বড় বড় ডাক্তাররাও....

—তার মানে ডাক্তার হলে আমরাও অনেক রোগ ধরতে পারব না? রুগী মরে যাবে?

মানসী হেসে ফেলল, —আগে থেকে এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? হয়তো

ওরা যাদের দেখিয়েছে তারা ধরতে পারেনি। বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নতি করেছে, কত সব জটিল রোগের ওষুধ বেরিয়ে গেছে....

আমি বললাম,—তাছাড়াও মাথার ওপর তো ভগবান আছেন। অর্চনাকে ভগবানই ঠিক ভাল করে দেবেন।

মানসী অল্প উত্তেজিত হল,—ওষুধ না খাওয়ালে ভগবানের বাবারও সাধ্যি নেই ওকে ভাল করার। শুনলি না ওর জেঠিমা কী বলল?

—দূর, ওটা কথার কথা। নিজের ছেলেমেয়েকে কেউ ওষুধ না খাইয়ে রাখতে পারে! দ্যাখ হয়তো গুরুদেবই কিছু ওষুধ বিষুধ জানেন....তাঁর ওষুধেই হয়তো ভাল হয়ে যাবে অর্চনা।

তখনও আমাদের মনে এরকমই অনেক সাদামাটা সরল বিশ্বাস। জীবনের প্রতি। মানুষের প্রতি। বাড়ি ফিরেও তাই ঠাকুরপ্রণাম করতে গিয়ে মনে মনে বলছি,—হে ঠাকুর, অর্চনাকে তুমি ভাল করে দিয়ো। যে করে হোক।

এর পর ক'দিন প্রিটেস্টের চাপে অর্চনাকে আর দেখতে যাওয়া হয়নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের মেয়েরা এক জায়গায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করছে, তখনও প্রেয়ারের সময় হয়নি। অন্যদের মতো আমি আর মানসীও ভিড়ে ঢুকে পড়লাম,—কী হয়েছে রে?

—ওমা, তোদের সঙ্গে এত ভাব, তোরা জানিস না? অর্চনা মা কালী হয়ে গেছে। ওদের গুরুদেব নাকি বলেছেন....

পুরোটা শোনার আগেই প্রার্থনার ঘন্টা পড়ে গেল। খোলা আকাশের নীচে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমরা হাতজোড় করে গাইছি,—তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে....

ক্লাসে ফিরে আবার সেই জটলা। আবার সেই রোমহর্ষক আলোচনা।

মানসী জিজ্ঞেস করল,—তোরা কেউ নিজের চোখে দেখেছিস্?

কেয়া চোখ ঘোরালো,—দেখে কাজ নেই, যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। দুনিয়াশুদ্ধ লোক সবাই জেনে গেছে। প্রত্যেক শনি মঙ্গলবারে নাকি ভর হচ্ছে অর্চনার, মা কালী আসছেন ওর শরীরে।

মানসী অবিশ্বাসী গলায় বলল,—যাহ্, এই আমরা সেদিন গিয়ে দেখে এলাম....

—আমিও তো প্রথমে বিশ্বাস করিনি। ওরা নাকি আর ডাক্তারও দেখাচ্ছে না। গুরুদেব কীসব শেকড়বাকড় খাওয়াচ্ছে, তাই খেয়ে নাকি মড়ার মতো পড়ে থাকে সারাদিন। বিশ্বাস না হয়, আজ তো মঙ্গলবার, গিয়ে দেখে আয় না।

ছুটির পর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি।

অর্চনা দোতলার সেই ঘরেই চোখ বুজে শুয়ে। পরনে চওড়া লালপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি, আরও শীর্ণ প্যাকাটির মতো চেহারা, শুধু মেঘলা বিকেলের শেষ আলো এসে ওর ফ্যাকাসে মুখটাকে যা একটু উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমাদের দেখে অনেক কষ্টে চোখ খোলার চেষ্টা করল, পারল না, আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জড়ানো স্বরে শুধু বলতে পারল,—স্কুল হচ্ছে? পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল নারে? অনেক পড়া এগিয়ে গেছে?

মানসী অর্চনার অস্থিসার হাতে হাত রাখল,—তেমন কিছু না। তুই সেরে ওঠ্, ঠিক ধরে নিতে পারবি।

অর্চনার বন্ধ চোখের কোলে দুফোঁটা জল টিল্‌টিল্‌,—ফিজিক্সটা এখনও কত বাকি রয়ে গেছে আমার....

কথা শেষ হওয়ার আগেই অর্চনার মা ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠেছে,—একি! তুমি ওকে ছুঁয়েছ কেন? শনি মঙ্গলে ওকে ছোঁয়া একদম বারণ।

মানসী ভয়ে ভয়ে হাত ছেড়ে দিল,—কেন মাসিমা?

—গুরুদেব বলেছেন যেদিন ওর শরীরে মা অধিষ্ঠান করবেন, সেদিন ওকে বাইরের লোক স্পর্শ করতে পারবে না। তোমরা এক কাজ করো, নীচের ঘরে গিয়ে বোসো, একটু পরে ওর আরতি আরম্ভ হবে, প্রসাদ নিয়ে যেয়ো।

ভদ্রমহিলার স্বরে এমন কিছু ছিল, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নীচে নেমে এলাম। বড় হলঘরটায় এর মধ্যেই ধুপধুনো দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। অর্চনার জেঠিমা গরদের শাড়ি পরে গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন গোটা ঘরে। ফাঁকা ঘর আমাদের চোখের সামনেই ভিড়ে ভিড়। আরও খানিকক্ষণ পর, লাল পোশাক পরা, বাবরিচুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, সৌম্যদর্শন এক উজ্জ্বলচোখ সন্ন্যাসী খড়ম খটখটিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে। মুহূর্তে দিব্য গন্ধে চতুর্দিক মাতোয়ারা। সকলে ভক্তিভরে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখাদেখি আমরাও। অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—কী অলৌকিক গন্ধ রে মানি!

মানসী জোরে জোরে নাক টানল,—গন্ধটা খুব চেনা চেনা লাগছে রে আমার! কোথায় যেন....কোথায় যেন....! বড়মাইমার ফ্রেঞ্চ পারফিউমটা কি....!

ভক্তদের বাবা বাবা রবে মানসীর গলা ঢাকা পড়ে গেল। তিনি সযত্নে পাতা অজিনাসনে বসলেন। মন্দ্র কণ্ঠে সকলকে বললেন,—বোসো। বলেই অর্চনার বাবার দিকে ফিরেছেন,—কই, আমার বেটি কোথায়? আমার খ্যাপা মা?

অর্চনার বাবা আর জ্যাঠতুতো দাদা প্রায় কোলপাঁজা করে নিয়ে এল

আধা অচেতন অর্চনাকে। জ্যাঠা তাকে স্থাপন করলেন শাটিনমোড়া বেদির ওপর। অর্চনার দুই বোন দ্রুত এসে তিনদিকে তিনখানা তাকিয়া দিয়ে দিল। সেই তাকিয়ার ঠেকাতে আধশোয়া অর্চনা কেমন নির্জীব নিষ্প্রাণ ভাবে ঝুলছে। টকটকে লাল একটা শাড়ি তার শরীর ঘিরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, গায়ে ব্লাউজ নেই, মাথার চুল খোলা, কপালে অ্যাত্তো বড় একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা। গুরুদেব তার গলায় পঞ্চমুখী জবার মালা পরিয়ে জলদগম্ভীর গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন,—মা মাগো করালবদনী তারা ব্রহ্মময়ী, একবার বুকে চেপে বোস্ মা, বদরক্ত সব বেরিয়ে যাক....মা....মাগো....

চিৎকারের জন্য কি না জানি না অর্চনার স্থির শরীর একটু নড়েচড়ে উঠল। তারপর আচমকাই গলা থেকে ছিটকে এসেছে গোঁগোঁ শব্দ, ঠোঁট বেয়ে কষ গড়াচ্ছে, এক মাথা চুল ঝপাং করে নেমে আসছে মুখের ওপর, আবার ঝাঁকুনি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘর জুড়ে অস্ফুট মা মা ধ্বনি। আচমকা কে যেন কাঁসর বাজাতে শুরু করল, অর্চনার মা শাঁখ বাজাচ্ছে, বাবা জ্যাঠা জেঠিরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত মেয়ের পায়ের কাছে। গুরুদেব একটু করে ফুল ছিঁড়ে ভক্তদের হাতে দিচ্ছেন আর প্রশ্ন করছেন, --বলো, তোমার কী জিজ্ঞাস্য আছে? মা'র কাছে কী জানতে চাও তুমি?

এক এক করে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, মাকে প্রণামী দিয়ে জানতে চাইছে নিজের ভূত-ভবিষ্যত, আর গুরুদেব মায়ের থরথর ঠোঁটের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুনে নিচ্ছেন উত্তর। আমার কী রকম গা ছম্‌ছম্ করছিল, সুগন্ধী ধোঁয়ায় সব আবছা হয়ে আসছে। হঠাৎ দেখি নীলসাদা স্কুল ইউনিফর্ম পরা মানসী এগিয়ে যাচ্ছে বেদির দিকে। একেবারে সামনে গিয়ে প্রশ্ন করল,— মা, আমাদের অর্চনা কবে ভাল হবে মা?

এবার আর গুরুদেব অর্চনার দিকে ফিরলেন না, মানসীকে কাছে টেনে নিয়েছেন। মণিমুক্তোখচিত আঙুলগুলো মানসীর মাথার ওপর,--ভাল হবে কী রে বেটি, তোর বন্ধু তো ভাল হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে সবিস্তারে সকলকে বর্ণনা দিলাম পুরো ঘটনাটার। মা তো শুনে গদগদ,—আমাকে সামনের শনিবার একবার নিয়ে চল্ তো।

বাবা ধমকে উঠল,—খবরদার না। যত সব বুজরুকি। ভণ্ডামি।

দাদা বলল,—পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। গুরুদেবটাকে ইমিডিয়েট্‌লি অ্যারেস্ট করুক।

আমি তর্ক করে উঠলাম,--কেন? তিনি কী দোষ করলেন? তাঁর ওষুধ খেয়ে মাথার যন্ত্রণা আর একটুও নেই অর্চনার, সেটা জানিস্? তাছাড়া

আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি ওর ভেতরে সত্যি সত্যি মা কালী....

দাদা রেগে গেল,—হায়ার সেকেন্ডারি দিবি, এখনও এত গাধার মতো কথা বলিস কী করে রে অপু?

আমি দাদার ওপর রেগে গেলাম। তর্ক করলাম না বটে, তবে বাবার কথাও মানতে পারলাম না মনে মনে। বিশ্বাসেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় আমি জানি। ঠিক করলাম এর পরদিন মা কালীর কাছে গিয়ে পরীক্ষার রেজাল্টটা কী হবে জেনে আসব। অর্চনার বোন বলছিল ওর বাবা জ্যাঠারা নাকি একটা মন্দির করে দেবেন গুরুদেবকে, সেখানে মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই মা কালী অর্চনার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে অর্চনা।

অর্চনাটা অবশ্য তার আগেই মরে গেল।

সেদিন ছিল রাখিপূর্ণিমা। সকাল থেকেই টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি। কেয়ার মুখে খবর পেয়ে আমি আর মানসী পড়িমরি করে ছুটেছি। গিয়ে দেখি ক্লাসের প্রায় অর্ধেক মেয়ে পৌঁছে গেছে। কয়েকজন দিদিমনিও। ভেঙে পড়েছে গোটা অঞ্চল। অত লোক, তবু কারুর মুখে একটা শব্দ নেই।

উঠোনের ফুলে ভরা গন্ধরাজ গাছটার নীচে বিশাল এক বোম্বাই খাটে শুয়ে আছে অর্চনা। রক্তলাল শাড়ির আড়ালে শুকনো সরু কাঁঠালিচাঁপা ডালের মতো শরীর প্রায় দেখাই যায় না। ছোট্ট কপালে টিপ যেন শেষ বিকেলের সূর্য, গলায় জবাফুলের মোটা মালা।

আমার সমস্ত শরীর ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অর্চনা চোখ খোলার চেষ্টা করছে, পারছে না ...স্কুল হচ্ছে অপু? অনেক দূর পড়া হয়ে গেল নারে? ফিজিক্সটা এখনও কত বাকি রয়ে গেছে আমার....।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললাম। চারদিকে এ কী ভয়ানক ভাঙচুর চলছে? ভাঙছে, ভাঙছে। ভাঙনে সব ভেসে গেল। শ্রদ্ধা। প্রেম। সমর্পণ। ভক্তি। বিশ্বাস। আমার ভেজা চোখ মাড়িয়ে অর্চনা চলে গেল। দীপিকা চলে গেল। প্রবীরদারাও। বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এল। আমাদের বিকেল। আমাদের হলুদ বিকেল।

এখন শুধু সামনে এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। শরতের বাতাস কাঁপিয়ে মাঝে মাঝেই সাইরেন বেজে ওঠে। এয়াররেড। অল ক্লিয়ার। এয়াররেড। ছদ্ম মহড়ায় স্কুলে খোঁড়া ট্রেঞ্চে কিংবা বালির বস্তার আড়ালে লুকোই আমরা। সন্ধে হতেই রাস্তার বাতিগুলো মুখ ঢাকে কালো ঠুলিতে, বন্ধ জানালাদরজার কাচে আড়াআড়ি ভাবে সাঁটা হয় কাগজের ফালি। পুজোর আগে শহর জুড়ে প্রতিরোধের সাজসাজ রব।

আমার মনের ভেতরেও এক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে অবিরাম। ক্রমশ বড় হয়ে উঠি আমি। সত্যিকারের বড়।

শোণিত-কথা

জোৎস্না কর্মকার

চাষ পেরিয়ে বাসটা থামল গিয়ে বোকারোর নয়ামোড়ে। সেখান থেকে ট্রেকার ধরে সোজা বোকারো হাসপাতাল। উর্মির অস্থিরতা। কতক্ষণে দেখা হবে বোনটার সঙ্গে। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেল না তো? হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকায় সে। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। জলের বোতলটাও আজ ফেলে এসেছে তাড়াহুড়োয়।

হাসপাতালের গেট পেরিয়ে ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে দেখা মেলে পিঙ্কির স্বামী বিনোদের। উর্মিকে দেখেই অনেক কথা বলতে শুরু করে দেয় সে। উর্মির কানে তার কিছু কিছু শব্দ ঢুকলেও মস্তিষ্ক সবটা নিতে পারছিল না। কোনো রকমে সে বলল : পিঙ্কি কই? আগে আমি পিঙ্কির কাছে যেতে চাই। উর্মির হাত থেকে বিনোদ ব্যাগটা নিয়ে পিঙ্কির কাছে তাকে নিয়ে যেতে যেতে রিপোর্ট বলে যেতে থাকে। বায়প্সি রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। খারাপ কিছুই নেই। কালই অপারেশন, রক্ত লাগবে চার বোতল। টিউমারটা বেশ বড়, এই যা চিন্তা। তাছাড়া পিঙ্কিটা যা নার্ভাস।

উর্মি, উর্মি—ডাকসহ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল কেউ। প্রভা—পাড়ারই মেয়ে। অসুস্থ রোগীর মতো। সাদা ফ্যাকাসে। কিছু একটা বলতে চায় সে। কিন্তু আগে তো পিঙ্কি। তারপর শোনা। তাই তাকে হাতের ইশারায় নিরস্ত করে। তীব্র ওষুধ-গন্ধ পেরোতে পেরোতে, দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারে লাল-হলুদ বড়বড় ছবি পেরিয়ে পিঙ্কির কাছে উড়ে যেতে চায় উর্মি।

ঐ তো পিঙ্কি। সাদা চাদরে বুক অবধি ঢেকে আধ-শোয়া। দৃষ্টিতে বিষণ্ণ শূন্যতা। দিদিকে দেখতে পেয়েই ক্লিষ্ট হাসি ছড়িয়ে পড়ে পিঙ্কির মুখে। চোখ ছলছল। বলে ওঠে,

মুশকিল আসান হাজির তা হলে।

—কেমন আছিস রে? একটা হাত জড়িয়ে ধরে উর্মি পিঙ্কির হাতে তার উষ্ণতা, ভরসার মৃদু চাপ।

ভালো। বলেই চোখ নামায় পিঙ্কি। চোখের কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে।

—দূর পাগলি, চোখে জল কেন? কিচ্ছু ভাবিস না। আমি তো এসে গিয়েছি। তুই একদম সেরে উঠবি। তোকে ফিট করে নিয়ে তবেই আমি যাব।

—তোর স্কুল?

—ওসব তোকে ভাবতে হবে না, আমি ছুটি নিয়েছি। আর নার্ভাস হওয়া আমার একদমই পছন্দ নয়, জানিসই তো— পিঙ্কির হাতে মৃদু চাপ দেয় উর্মি—আশ্বাসের, আস্থার। এই চাপের অর্থ পিঙ্কিরও জানা ছোটবেলা থেকেই। তাই সে শক্ত করে উর্মির হাত আঁকড়ে বলে ওঠে— জানি, মৃদু হাসিতে বিষণ্ণতা আর নেই যেন।

ঘন্টা বেজে ওঠে। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ। এবার উঠতে হবে। রাউন্ডে বেরোবেন ডাক্তারবাবু। রোগীর আত্মীয়-পরিজনদের বেরিয়ে যেতে মৃদু তাড়া লাগাচ্ছিল নার্স-আয়া। সবাই যেন দম দেওয়া পুতুলের মতোই সদ্য জেগে ওঠা। কেউ রোগীর বেড চাদর ঠিকঠাক করে দিচ্ছে, চার্ট ঝুলিয়ে রাখছে জায়গা মতো। রোগীদের আত্মীয়জন বাধ্য হয়ে হাঁটা দিচ্ছিল। ঠেলাঠেলিতে উর্মিও অনেকটা দূরে সরে যায়।

—মেয়েটাকে দেখিস। কাল আসবি তো? সকাল আটটায় অপারেশন। পিঙ্কির গলা কেঁপে যায় একটু।

—আসব তো অবশ্যই। তোর চিন্তার কোন কারণ নেই। তোর মেয়েকে আনব, আমরাও আসব—সবাই, বলো বিনোদ?

বিনোদের কোয়ার্টারে পৌঁছে উর্মি দেখে নেয় পিঙ্কির সংসারের বেহাল অবস্থা। মাকে কয়েকদিন আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পিঙ্কির দু'বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে নিকিতাকে কোলে নিয়ে মা। মুখখানি তার এই কদিনে শুকিয়ে এতটুকু। হাতে মুখে জল দিয়ে এসে উর্মি নিকিতাকে কোলে তুলে নিতেই—লড়কি জাত ইত্না শিরপর মত উঠাও। উর্মি চমকে চোখ ফেরায়। ঘরের অন্ধকার কোণায় দেওয়াল ঠেসে পিঙ্কির শাশুড়ি। বড় একটা স্টিলের গ্লাস ভর্তি দুধ-চা খাচ্ছে। চায়ের সঙ্গে নিমকি-সেউ, যেমন খায় বরাবর।

নিকিতাকে কোলে রেখেই উর্মি গিয়ে প্রণাম করে—কেমন আছেন?

—আর কেমন! আমার একমাত্র বেটা। সাধের ছেলে। তার বংশ থাকবে না। বিনা বাচ্চাদানি আবার বউ থাকে কি?

—অমন কেন বলছেন! এমন ফুলের মতো একটা মেয়ে তো আছে।

—এত বড় অপারেশন, বাঁচে কিনা দেখ!

—এ কী বলছেন আপনি! বলি বাঁচবে না কেন শুনি? এতবড় কোম্পানির হাসপাতাল। তাছাড়া ডা. লিমাই-এর মতো এক্সপার্টের হাতে কেস, আর বায়প্সি তো...

—তার আর ভরসা আছে কিছু? বাপরে, এই এত্তবড় টিউমার!

উর্মিদের মা আর স্থির থাকতে পারেন না। বলেন—এসব অলক্ষুণে কথা এসময় নাই বা বললেন বেয়ান। গেলে তো যাবে আমার মেয়েটাই, আপনার আর কী! —মা'র গলা কেঁপে যায়।

কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতোই তবুও সমানে বলেই চলেছেন বিনোদের মা, আমার আর কী মানে! আবার অন্য একটা বউ আনা। তাকে ঘর-গৃহস্থলির কাজ সব শেখানো-পড়ানো কী চাট্টিখানি কথা। তার উপর একটা ফেউ—এই মেয়ে। কে সামলাবে এসব? আমার চিন্তা হয় না?

বিনোদের মায়ের মানস ছবির এহেন প্রতিফলন দেখে উর্মি বাক্‌হারা। মা তো পাথরবৎ। দিশেহারা। মা এসে নিকিতার ভার তো তুলে নিয়েছিলেনই নিজের হাতে। মাস খানেকের ছুটি পেতেই উর্মি এসে হাজির। মেয়ের চিন্তায়, উদ্বেগে মায়ের শরীর-মন কাহিল। ক্লান্ত উর্মিও। কিন্তু বিশ্রামের উপায় কী! গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রাঁচি থেকে, ধানবাদ থেকে বিনোদের আত্মীয়-পরিজন একের পর এক আসছে, দু'একদিন থেকে পিঙ্কির শাশুড়ির সঙ্গে গাল গল্প করে বিদায় নিচ্ছে। যেন শেষ দেখা-দেখতে এসেছে সব পিঙ্কিকে। পিঙ্কিটা গেলেই যেন সব বাঁচে—ভাবখানা এই। কাজের কাজে কেউ নেই। বিনোদকে সান্ত্বনা-ভরসা দেওয়া, মেয়েটাকে একটু দেখা, সংসারটা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাওয়া—না, সেসব কিচ্ছু না। বরং এরই মধ্যে একটু খুঁত, একটু ত্রুটি যত্ন-আত্তিতে, অমনি নিন্দের সাত কাহন। দু'বেলার রান্না, শিশু মেয়েটির যত্ন, রোগীর পথ্য তৈরি, দু-বেলা হাসপাতালে যাওয়া-ধকল কম নাকি! উর্মি খানিকটা সামাল দিলেও নাজেহাল অবস্থা। এই তো পিঙ্কির মেজ ননদ এসেছিল। সেলাই স্কুলে কামাই হয়ে যাচ্ছে অজুহাতে পরদিনই চলে গেছে। আর বিনোদের মা, তিনি বাতে গা তুলতেই পারেন না, কথার মকদ্দোমাতেই শুধু জেতা।

পিঙ্কির অপারেশন ভালোভাবেই হয়েছিল। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হওয়ায় ইনটেনসিভ কেয়ারে। আজ আবার জেনারেল ওয়ার্ডে দেবে। রিলিজ করবে হয়তো কাল বা পরশু। এতদিন ধরে উর্মির হাসপাতাল বাড়ি, বাড়ি হাসপাতাল,

পিঙ্কির মেয়ে সামলানো, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ চলছে। এসবের মাঝে নিজের দিকে নজর দেওয়ার একটুও অবসর পায়নি উর্মি। তবু এরই মধ্যে দু'একবার প্রভার সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তা হয়েছে।

প্রভা উর্মির থেকে বছর সাতের বড়। ছোট বেলায় উর্মি দেখেছে প্রভার বিয়ে। সেই বয়সে প্রভা যেমন সুন্দরী, তেমনি ছিল তার দেমাক। সেই প্রভার একী হাল! চেহারা অর্ধেকও নেই। ফ্যাকাসে, গালে মেচেতা। হাড় জিরজিরে। বাংলা ভাষাটাও ভালো করে বলতে পারে না। ওর স্বামীর কীসের যেন ব্যবসা আছে সেকটর নাইনে। স্বামী আর ছেলে—তিনজনের সংসার। প্রভারও ইউট্রাস বাদ দিতে হবে। অপারেশন হচ্ছে না, খুব বেশি মাত্রায় অ্যানিমিয়া বলে: চার বোতল রক্তেরও জোগাড় হয়নি এখনও। আর হয়নি বলেই তিন-তিনবার ডিসচার্জ করে দিয়েছে। এই নিয়ে চতুর্থবার ভর্তি হয়েছে। এক বোতল গতবারে কিনেছে। এক বোতল এমাসে—মোট দু'বোতল হয়েছে। আরও দু'বোতল জোগাড় করে দিতে না পারলে এবারও ডিসচার্জ করে দেবে।

সব শুনে উর্মি বলে— কেন তোমার ছেলে আর স্বামী দু'জনে দু'বোতল রক্ত দিলেই তো চুকে যায়। ওদের বলো না প্রভাদি।

—ওরা খুন দিতে রাজি থাকলে তো কোন চিন্তা ছিল না। উর্মি তুহি পুছনা উলোগ সে। ঐ আসছে তোর বর্মা-জিজাজি ছেলেকে নিয়ে।

উর্মিকে প্রভাই দেখিয়ে দেয় পিতাপুত্র দুজনকেই। চেহারা বদলে গেছে বর্মাজির। ছেলেও তো মনে হয় স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছে। বহুদিন তো কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই। বিয়ের পর প্রভারাও পুরুলিয়া গেছে কমই। গেলেও দেখা হত না উর্মির সঙ্গে। আর এখন তো উর্মি মানবাজারে পোস্টেড, থাকেও সেখানে।

ওরা কাছে আসতেই প্রভা গদগদভাবে স্বামী পুত্রের পরিচয় করিয়ে দিল উর্মির সঙ্গে। দু'জনেই গায়ে-গতরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। গত পরশু যখন পিঙ্কির জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে উর্মি বাইরে পায়চারি করছিল, তখনই দেখেছে দু'জনকে ভালো করেই। এরাই তবে প্রভার আপনজনেরা। দু'জনেই এক বোতল রক্ত দেওয়ার জন্য পরস্পরকে চাপাচাপি করছিল আর দু'জনেই নানান অজুহাতে চালাচ্ছিল বিতণ্ডা।

পাণ্ডুরবর্ণা প্রভা তার ছেলে রাহুলকে দেখিয়ে বলে—রাহুল আমার লিখা পড়ার খুব তেজ আছে। কলেজে পড়ছে, বিজ্ঞান নিয়ে।

—বাঃ খুব ভালো। তোমার ছেলে তো বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে প্রভাদি।

—তুই তো বিয়েই করলি না। বেকার হয়ে গেল জীবনটা তোর।

—সায়েন্স নিয়ে পড়ছ রাহুল, তা কোন ইয়ার হল?

—আর বলবেন নাই। বিহারের কলেজে পড়া তো। রিজাল্টের কুনো ঠিক নাই। যা দেশের অবস্থা। পাশ করে বেরুতে চুল-দাড়িতে পাক ধরে যাবে।

পাণ্ডুরবর্ণা প্রভার হাতের শিরা গালের হনু উঁচিয়ে উঠেছে। চোখের কোলের কালিতে স্পষ্ট অশুভ ইঙ্গিত। তবু বর্মাজির নিজের আকাট রসিকতায় নিজেরই হেসে ওঠা। প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাহুলেরও জোরে হেসে ওঠা বিসদৃশ, বিরক্তিকর লাগে উর্মির।

—প্রভা তোমার ভালো ছেলেকে কটা প্রশ্ন করি! কী রাহুলবাবু বলোতো রক্তের কটা গ্রুপ। রাহুল তার নর্থস্টার জুতো সমেত পা ঠোকে মাটিতে। উত্তর দেয় না। উর্মিও থামে না।

—রাহুল বলোতো একজন পূর্ণ মানুষের শরীরে মোট কত সি.সি. রক্ত থাকে? বলো বলো চুপ করে থাকে না। এইমাত্র তোমার মা বললেন, লেখা পড়ায় তুমি নাকি খুব ভালো!

—পড়ে না একদম। খালি দাদাগিরি করে। প্রভার স্বামী বর্মাজি একথা বলে পরিস্থিতি হালকা করতে চায়। উর্মির মাথাতেও কেমন যেন রোখ চেপে যায়। সে এবার রাহুলকে ছেড়ে বর্মাজিকে নিয়ে পড়ে।

—আপনিই বলুন না, একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের গায়ে কতটা রক্ত থাকে। আর, কাউকে রক্ত দিতে গেলে কতটুকু রক্ত দিতে হয়?

হতচকিত প্রভা, বর্মাজি আর ছেলে রাহুল। আর উর্মি থেকে সে উর্মি দিদিমণি হয়ে নিরুত্তর বাপ-ছেলেকে পড়া বোঝানোর মতো করেই বলে চলে—রক্তের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বি পজিটিভ, তারপর ও পজিটিভ, এ পজিটিভ, আর এবি পজিটিভ। এছাড়া আছে নেগেটিভ আর এইচ ফ্যাক্টরগুলি। আর আপনার মতো একজন সুস্থ সবল মানুষের দেহে আছে পাঁচ হাজার সি.সি. রক্ত। রক্ত দিতে হলে দিতে হয় এর থেকে এক বোতল। মানে মাত্রই আড়াই শো সি.সি. রক্ত। এই সামান্য পরিমাণ রক্তটুকু দু'জনের কেউ-ই দিতে পারছেন না? প্রভা তো পর কেউ নয়। আপনারই স্ত্রী, রাহুলের মা!

...আ-আপনি ঠিক বুঝবেন নাই। আমি ভারি কাজের মিস্ত্রি মানুষ, তাগদ লাগে। আর রাহুল তো আভি বাচ্চা আছে। এহি তো খুন বানাবার, তাগদ বানাবার টাইম। অগর হামদোনো বাপবেটাকো কুছ হো যায়ে গা তো পরভা কী জিন্দগি তো বরবাদ, বেকার হ্যায় না!

—আড়াইশো সি.সি. রক্ত কতটুকু রক্ত মশাই, এইটুকু। এ রক্ত অল্প ক'দিনেই পুরণ হয়ে যায় ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করলে।

—ওটাই তো কথা। পরভা হাসপাতালে আছে। ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া তো হচ্ছে নাই। রান্না কে করবেক?

উর্মি থামে না বলেই যায়—এই কয়েক ফোঁটা রক্তের অভাবে কত মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে অকালে ঝরে যাচ্ছে। এই যে প্রভা, প্রভাই যদি...

—না না, মেমসাব। পহলি বাত তো ই কি কভি খুন দিয়া নাহি। ক্যা জানে ক্যা সে ক্যা হো যায়ে গা। ঔর মালুমভি নহি, কৌন গ্রুপ হ্যায় মেরা। আরে পরভা দশ-পন্দরা দিন রুখ যা। আদমি আয়েগা, খুন দিবে। চিঠি ভেজে হ্যায় হম খুদ।

পিঙ্কিকে ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে বের করে সাধারণ কামরায় নয়, কেবিনে দিয়েছে—জানায় বিনোদ। উর্মি পিঙ্কির সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায়। হাঁফ ছাড়ে প্রভারা।

—দিদিরে, তোর মুখটা ক'দিনে কেমন কালো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা ঝড় বয়ে গেছে তোর ওপর দিয়ে। এবার ক'দিন বিশ্রাম নে।

—আর বিশ্রাম। তুই ভালো হয়ে উঠেছিস এটাই সব থেকে বড় কথা। দেখতে দেখতে পনেরোটা দিন কীভাবে কেটে গেল। ওঃ যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। শোন, তোর মেয়েকে আমি নিয়ে যাব। কয়েক মাস পরে নিয়ে আসিস। বিনোদ রাজি আছে। এখানে থাকলে তো তোর কোলে উঠতে চাইবেই। তোর পক্ষে এখন এ ধকল সহ্য করা সম্ভব নয়। ভারি কিছু তোলা, কাজ করা চলবে না। নিয়ম করে চলবি। সব ঠিক হয়ে যাবে। মা তো রইল কিছু দিন।

বাড়িতে ফিরে যাবে শুনে খুবই খুশি পিঙ্কি। ওর হাসি মুখে উর্মিও উদ্ভাসিত। বিনোদের শুকনো মুখেও হাসি ফুটেছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে সে। কালকের দিনটা অবজার্ভ করে পরশু রিলিজ দিয়ে দেবে। খানিকটা নিশ্চিন্ত বিনোদ আর উর্মি যখন বেরিয়ে আসছে, দেখা হয়ে গেল আবার প্রভার সঙ্গে। প্রভা দেওয়ালে মাথা ঠুকে খুব চাপা স্বরে বিলাপ করে চলেছে। ওকে নাকি এবারও হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেবে। অযথা বেড দখল করে থাকতে দেবে না। অদূরে পকেটে হাত দিয়ে আগের মতোই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বাপ বেটা। যথারীতি হেঁট মাথা।

ডিউটিরতা নার্স ওদের বলে, রিলিজের কাগজপত্র নিয়ে যেতে। নার্সের

চোখে মুখে বিরক্তি। প্রভা উর্মিকে দেখতে পেয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কিছু একটা করার জন্য কাতর অনুনয় জানায়। উর্মিকে দাঁড়াতেই হয়। সে নার্সের পিছন পিছন হাজির হয় ডাক্তারের কাছে।

—ডাক্তারবাবু, প্লিজ, একটা অনুরোধ রাখবেন? আমার বোনের জন্য দেওয়া চার বোতল রক্তের মধ্যে এক বোতল রক্ত তো বেঁচেছে। আর এক বোতল না হয় আমি দিচ্ছি। দেখুন না, প্রভার অপারেশনটা যদি হয়ে যায়!

—আপনি রক্ত দেবেন? আপনার কে হয়?

—আমার কেউ নয়। পুরুলিয়ায় আমাদের পাড়ায় বাড়ি। ওর স্বামী ছেলে কেউই রক্ত দিতে রাজি নয়। মেয়েটার অবস্থাও তো দেখছি ভালো নয়। সারা মাস ব্লিডিং হচ্ছে। অ্যানিমিয়া। প্লিজ ডিসচার্জ করবেন না ওকে।

—হ্যাঁ, ডেটোরিয়েট করেই চলেছে। অপারেশন ছাড়া তো গতি নেই। দেখি ডা. লিমাই কী বলেন!

আয়া উর্মিকে নিয়ে যায় রক্ত নেওয়ার ঘরে। সঙ্গে কয়েকদিনের দেখাসাক্ষাতে পরিচয় হয়ে যাওয়া মাদ্রাজি নার্সটিও। বিনোদ আমতা আমতা করেও চুপ ক'রে যায়। উর্মি তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে এটা বিনোদের মনঃপূত হল না। শুধু বলে—এখানেও সেই মুশকিল আসান দিদি।

উর্মির আগে কখনও রক্ত দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি। এই প্রথম সুযোগ। রক্ত দিতে দিতে ভাবে, কেন যে রক্ত দিতে মানুষের অনীহা! আপনজনের জীবন বাঁচাতেও রক্ত দিতে রাজি নয় মানুষ। কঠিন রোগ-অসুখ হলে লোকে ছাগল বলির মানত করে কেন, নিজের রক্ত দেওয়ার মানত করে রক্ত দিয়ে আসতে পারে না? গতবার উর্মি যখন বোকারোয় পিঙ্কিদের কাছে এসেছিল বিনোদ ওদের নিয়ে রাজারাপ্পায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন শনি না মঙ্গলবারের কী একটা তিথি ছিল। ওঃ। সে কী বলির ধুম। আগে তো কত মায়েরা অসুস্থ স্বামী পুত্রের জন্য নিজের বুক চিরে রক্ত দিত—এখন কোথায় তারা? এখন তো তাও বুক-টুক চিরতে হয় না, ছুঁচ ফোটালেই চোঁ করে নেওয়া হয়ে যায় রক্ত। কবে যে মনোভাব পাল্টাবে? প্রভা ওর স্বামী-পুত্র নিয়ে সার্থক নারী নাকি! কই পাচ্ছে ক'ফোটা রক্ত? এমনভাব করছে যেন খুন দিলে খুন হবে যাবে সব।

—এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?—বলে উর্মি উঠে বসতে গেলে হা হা করে ছুটে এসে বাধা দেয় বিনোদ। হাত ভাঁজ করে মুড়ে রাখতে বলে। বলে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে। অগত্যা চোখ বুজে আরও মিনিট কয়েক শুয়ে থাকে উর্মি। চোখ বুজেই টের পায় সে, মাথাটা তার অল্প অল্প ঘুরছে।

পনেরো দিন নাওয়া-খাওয়া ঘুমহীন একটা মানুষের ক্লান্তি তার আপাদমস্তক। তবু তার মন ভালো আছে।

ভালো লাগছে তার, পিঙ্কি সুস্থ হয়ে উঠছে বলে। আর এই রক্ত পেয়ে প্রভাও বেঁচে যাবে ভেবে।

চোখ খুলতেই দেখতে পায় কাচের একটা গ্লাসে করে ওয়ার্ডবয় একগ্লাস হরলিক্স নিয়ে এসেছে। হাত বাড়াতে গিয়েও সে হাত সরিয়ে নেয়। দেখতে পায় গ্লাসে সেডিমেন্ট। উর্মির গা গুলিয়ে ওঠে। খাব না বলে বেড থেকে নেমে পড়ে নিজেই। বিনোদ উর্মিকে ধরতে চাইলে উর্মি বলে, আমি ঠিক আছি।

উর্মিরা প্রভার সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে। উর্মি 'চলে যাচ্ছি' বলে প্রভার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করে কিন্তু প্রভার সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ওরা তিনজনে গুজগুজ করে কী যেন আলোচনা করছিল। যেন খুব জরুরি কিছু। নতুন কোন সমস্যা না কিরে বাবা? নাঃ! বাড়ি যাওয়া যাক। আর ভাবতে পারছে না সে। যা পারে করুক গে এবার ওরা। ভাবতে ভাবতেই চলার গতি কমিয়ে দিতে হয়। ডা. লিমাই তার সৌম্যরূপের বিভা ছড়াতে ছড়াতে হেঁটে যাচ্ছেন। হালকা গোলাপি শাড়ির উপর সাদা কার্ডিগান। রাউন্ড শেষ। হয়তো শেষ আজকের ডিউটিও। বাড়ি ফেরার মেজাজ!

প্রভার স্বামী প্রায় ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরে তাকে।

—ফির ক্যা হুয়া? বোল তো দিয়া সোমবার দশ বাজে অপারেশন হোগা।

—নহি নহি উ বাত নহি।

—তো ফির ক্যা বাত হ্যায়?

—ডাক্তার সাহেবা, ই ঔরৎ জাতকা খুন সে কাম হোতা হ্যায় ন? চলে গা?

উর্মি ডাক্তার লিমাই-এর উত্তর শোনার অপেক্ষায় না থেকে পা বাড়ায় সামনের দিকে। মাথাটা এখনও ঘুরছে। টলে যাচ্ছে কি পা?

নদীর নাম বহতা

জয়া মিত্র

আজ কনকলতা রিটায়ার করলেন। ডি আই অফিস বলেছিল ইচ্ছে করলে এক্সটেনশন নিতে পারেন তিনি। 'ইচ্ছে করলে' কত সহজে বলে মানুষ। যেন নির্দিষ্ট কোনও মানে নেই কথাটার। তাঁর ইচ্ছে আছে কিনা সে কথা জানবে কে? কাকে বা বলবেন?

মনে পড়ছে নাকি এত বছরের সহকর্মীদের কথা? তার চেয়েও অনেক বেশি করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে না ছাত্রছাত্রীদের গোলগাল কালো চকচকে মুখগুলো আর তাদের বাপমায়েদের নিরাশ দুঃখভরা সব চেহারা? তারা বেশ জোর দিয়েই বলেছিল, ও দিদিমনি, তুমাকে আমরা ছাড়ব নাই। আমাদের গাঁয়ে জমি দিব, ইস্কুল কইরে দিব, তুমার ঘর কইরে দিব— তুমি থাকো। তুমি গেলে আমাদের ছেলাগুলানের আর লিখাপড়ি হবে নাই।

তবু থাকতে পারলেন কই! শরীরের ক্ষমতা আর মনের ইচ্ছার মধ্যে অনেক তফাত হয়ে গেছে। ওই ছাত্রছাত্রীদেরই একজনের বাবা এই সাত কিলোমিটার রাস্তা পার করে আজ কনকলতাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছে। কনকলতা জানেন ওই মানুষটিকে ভাড়া দিতে পারবেন না। দেওয়া যায় না। দিতে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাকে মুছে ফেলে এক মুহূর্তে ওকে শুধুমাত্র রিক্সাওয়ালাই করে ফেলতে হয়।

বাড়ির সামনে রিক্সা থামতেই পুত্রবধূ রঞ্জা বেরিয়ে এল। সে হাত থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে নিলে কনকলতা রিক্সা থেকে নামেন। নামবার সময়ে এবং উঠতে, হয়ত উঠতে আরও বেশি, অবধারিত ভাবে ভুলে যাবেন কোন পায়ের হাঁটুতে ব্যথা। অন্যমনস্ক ভাবে সেই পা-টাই এগিয়ে দেবেন, তার পর শরীরের ভার রাখতে গিয়ে হাঁটুতে এমন খচ করে লাগবে যে উপুড় হয়ে পড়ে যাবার জোগাড় হয়। আজ রঞ্জা ধরে ফেলল। বিষুণ নিজেও রিকশা ছেড়ে এগিয়ে

এসেছিল। ব্যথাটা সামলে নিয়ে তাকে ঘরে আসতে বললেন। একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল বিষুণ। কনকের ভাল লাগল। এইটুকু একদিনে হয়নি। কখনও কোনও দরকারে বাড়িতে এলে কিছুতেই ঘরে ঢুকত না এরা, যদি বা ঢুকত তা হলে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরের উঠোনে। মাটিতে বসতে বারণ করলে, মোড়া বা জলচৌকি এগিয়ে দিলে আড়ষ্ট হয়ে বরং দাঁড়িয়ে থাকত।

অথচ তিনি তো কখনও করুণা করে বা কোনও সমাজ সংস্কারের মন নিয়ে সে সব করেননি। সহজ ভাবেই এই সব লোককে অন্য অতিথি বা গৃহাগতদের থেকে আলাদা করে দেখতে পারতেন না। কোনওদিনই পারেন না। রঞ্জা চা জলখাবার করে আনল। কনকলতা তার সঙ্গে বিষুণের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিষুণ প্রশ্ন করে— আর নাতি রাজাটি?

—আজ ঘরেই। আম্মার জন্য এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

—হুঁ, ইবার তো মা আমাদিগে ছাইড়লেন, নাতির কাছে রইবেন দিনভরই। বিষুণের গলা ধরে আসে।

কনকলতা বলেন, মায়ে কি ছেলেমেয়েকে ছাড়ে বিষুণ? বুড়ো যে হয়েছি, তাই আর রোজ যেতে পারব না বাবা।

বিষুণ যুক্তি বোঝে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে,—হুঁ, সিটো ঠিকেই বটে। আমরাই আসব মা, দেইখে যাব আইসে।

খানিকক্ষণ বসে চলে যায় বিষুণ। যাবার আগে প্রণাম করে। বড় অস্বস্তি, তবু বাধা দেন না কনকলতা। হাতজোড় করে এই প্রণামটি তিনি মনে মনে নিজের ঠাকুরকে উৎসর্গ করে দেন। বাধা দিলে ওরা ভারী সংকুচিত হয়। ফরসা কাপড় পরা, পাকা ঘরে বাস করা, উঁচু জাতের লোকেদের থেকে অনেকখানি দূরে থাকার যে স্মৃতিময় সংস্কার, নিমেষের মধ্যে তা পুনরুজ্জীবন পায়।

মনে আছে এ শহরে যখন প্রথম এসেছিলেন, কাজের বউটি নিজেই বাসনপত্র মেজে রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় উপুড় করে দিয়ে তাঁকে বলেছিল, এ গুলা ধুয়ে তুলে লিও।

কনকলতা অবাক হয়েছিলেন, তুমি পরিষ্কার জল দিয়ে ধোওনি?

—হুঁ, ধুয়েছি। বাবুঘরের লোকেরা আমাদের মাজা বাসন রান্নাঘরে লেয় না।

—তা হোক, আমি ও সব মানি না। তুমি নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, পরিষ্কার করে কাজ করবে, তা হলেই হল।

কতদিন হয়ে গেছে সে সব কথা।

বাইরের কাপড় পাল্টে ভেতরের ঘরে এসে বসেন কনকলতা। এক ঘটি জল খান। বুবুন এতক্ষণে কাছে এসে বসে। বসেই তার চোখ যায় পাশের টেবিলে রাখা জিনিসপত্রের দিকে। সেগুলো নামিয়ে আনে, এগুলো কী আম্মা?

রঞ্জাও এসে দাঁড়ায় কাছে।

—খোলো তুমি, দেখো কী আছে।

বুবুন আর রঞ্জা মিলে খোলে রঙিন কাগজে জড়ানো ভারী বইয়ের প্যাকেটটা। মহাভারত, কাশীরাম দাসের। একটা ছাতা, একটা চাদর খদ্দরের।

কনকলতার হাতে একে একে এনে দেয় বুবুন। তাঁর গলার কাছে কী ঠেলে ওঠে। তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর ছাদখোলা দেওয়াল জানলা ভাঙা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা! ষোল বছরে একটা কাজ ওরা করেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে। তাঁকে কিচ্ছু না জানিয়ে।

—খোকা?

—এসে পড়বে এখুনি। বলেছিল স্কুটারে কী হয়েছে, দোকানে দেখিয়ে নিয়ে আসবে। ঘরের কোণে নিচু টেবিলে ছোট ডিশে কটা শিউলিফুল আর দূর্বা সাজিয়ে রেখেছে রঞ্জা। ফুল কটা শুকিয়ে ন্যাতা হয়ে গেছে। এখনও বর্ষা, তাঁর এই গাছটা অনেক আগে থেকে ফুল দিতে শুরু করে। প্রতি বছর বর্ষায় আগের বছরের বীজে ফোটা চারায় বাগান ছেয়ে যায়। অনেক বিলিয়ে দিয়েছেন, এ পাড়ায় এখন অনেক বাড়িতে শিউলি গাছ। তাঁর রুক্ষ লালমাটির গ্রামের স্কুল, সেখানকার ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়ত 'শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এলো'— কোনওদিন শিউলি গাছ শিউলি ফুল চোখে দেখেনি। বাগান থেকে প্রায় শ'খানেক চারা এ পর্যন্ত তিনি নিয়ে গিয়েছেন। সারা গ্রামে লাগিয়েছিল ওরা। সব বাঁচেনি, তবু অনেক বেঁচে গেছে। এ বছরও মুখস্থ কবিতার পড়া দেবে ওরা 'শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এলো/টগর ফুটিল মেলা'।

বুবুন বইটার আয়তন দেখে স্পষ্টতই অবাক হয়েছে।

—এটা কী বই আম্মা?

—এটা দাদা, একটা খুব পুরনো মস্ত বই।

—পুরনো নয়, আম্মা, নতুন বই।

—হ্যাঁ দাদা, নতুনই।

—এতে কী আছে আম্মা? গল্প আছে কি, নাকি খালি পড়ার বই?

—গল্পও আছে। খুব লম্বা একটা গল্প।

—ফাইটিং আছে?

রঞ্জা ধমকে ওঠে, হ্যাঁ, সব কিছুতেই খালি ফাইটিং থাকবে। বুবুন মায়ের

কথায় কান দেয় না, বানান করে বড় বড় লেখা নামটা পড়ে ফেলে, ও আম্মা, এর নাম মহাভারত? আমি তো মহাভারত জানি, আমি টিভিতে দেখেছি, খুব ফাইটিং টিসুম টিসুম... এটা তো বই গো আম্মা।

কনকলতা এই মুহূর্তে ঠিক করতে পারেন না কী করে বুবুনের কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। আবছা আবছা মনে পড়ে তিনি এ বই দেখেছিলেন কি বুবুনের বয়সে? নাকি তার চেয়েও ছোট ছিলেন? কবে থেকে যে ঠিক করে মনে পড়ে না, জ্ঞান হবার সময় থেকেই তো দেখেছেন এই স্থূলবপু বই, ওপরে গীতার কৃষ্ণার্জুনের ছবি, ব্যবহারে ব্যবহারে মলিন চেহারা। কিন্তু প্রতিদিন সেই ব্যবহৃত, প্রায়-জীর্ণ বইটির পাশে জলচৌকিতে দু'তিনটে টাটকা ফুল। হয়তো টগর না হলে কলকে কোনওদিন বা একটি গন্ধরাজ আর একটি তুলসিপাতা। মা যখন তাঁর গোপালকে ফুল দিতেন অমনি ফুল রেখে প্রণাম করতেন এই বইটিকে। দুপুরবেলা সব কাজ সেরে খোলা চুলের ডগায় একটি গিঁট দিয়ে জলচৌকির সামনে পিঠ সোজা করে বসে একমনে গুনগুন করে পড়ে যেতেন। ঘন্টাখানেক পড়তেন রোজ। রোজই অমন সটান সোজা বসা। সেই মা, সোজা হয়ে হাঁটতে পারতেন না শেষ বয়সে। কোমর থেকে দু'ভাজ হয়ে গিয়েছিল পাতলা শরীরটা। বসে থাকতে পারতেন না।

রাত্রের রান্নাবান্না শুরু করবার সময় হয়ে গিয়েছে। তিনি আর রান্না করেন না এখন জোগাড়যন্ত্র করে দেন, তরকারি কেটে গুছিয়ে দেন। রান্না করতে ইচ্ছে করে। খোকাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে। খোকা বরাবর মায়ের হাতের রান্না ভালবাসত। এক একসময় মনে হয় রঞ্জাকে বলবেন, রান্নাটা করতে তো খাটনি বেশি নয়, বরং কেটে ধুয়ে গুছিয়ে দিলে তিনিই করে নিতে পারেন। কিন্তু বলেন না। থাক, এখন তো ওদের সংসার, করুক। রঞ্জা অবশ্য খুব ভাল মেয়ে। তিনি নিজেই আস্তে আস্তে একে একে সংসারের সব দায়িত্ব হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের কাছে কি সহজ হয়েছিল সেই ছাড়া? হয়নি। কত বছর ধরে পাখির মায়ের মতো একটি একটি কুটো জড়ো করে তুলেছেন, তিনি তো সাজানো সংসার হাতে পাননি বউ হয়ে এসে। বিয়ের আগেও কোনওদিন শশিশেখরের ঘরপরিবারের টান ছিল না। জঙ্গলে পাহাড়ে চাকরি করেছেন, ক্যাম্পে ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছেন। মিলিটারির ইঞ্জিনিয়ার, সে তো মিলিটারিই। সে সব জায়গায় কনকলতা যাননি কখনও। ডিব্রুগড় কি তেজপুর এ রকম শহর অঞ্চলে হয়ত কখনও দু-একবার নিয়ে গিয়েছেন স্বামী। নতুন নতুন সুন্দর জায়গা, সেই মানুষটির কাছাকাছি থাকা, খুব ভাল কেটেছিল

সেই সামান্য কটি দিন। হয়তো আরও ভাল লাগত যদি ছুটির পর বাড়ি ফিরে এসে একেবারে বাড়ির হয়ে থাকতেন শশিশেখর। কিন্তু তা হত না। ওই সব শহর অঞ্চলে থাকবার সময়ে যেমন ধরা-বাঁধা কোনও অফিস থাকত না শশিশেখরের, একেবারে ছুটিও থাকত না। বাংলোতে বা গেস্ট হাউসে থাকাও যেন কেমন অফিস-চাকরির আবহাওয়ার মধ্যেই থাকা। আর সন্ধ্যার পর নিয়মিত ক্লাবে যাওয়া। এইটেই সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে ভীতিকর ছিল কনকলতার কাছে। আনন্দ-উৎসব তাঁরও ভাল লাগত, অসাধারণ ভাল গান গাইতে পারতেন, কিন্তু সে গান নাচ সেই আনন্দের চেহারা একেবারে আলাদা। ক্লাবের চলাফেরা কথা কৌতুক পানফুর্তি কোনও কিছুই এতটুকুও ভাল লাগাতে পারতেন না তিনি। এ কথা সত্যি, শশিশেখর কখনও সেভাবে রাগ করেননি তার ওপর কিন্তু স্পষ্টতই ক্ষুণ্ণ হতেন। অবশ্য কদিনই বা আর! আবার তো ফিরে আসতেন নিজের সংসারে, যেখানে সম্বচ্ছরে একমাস কি কুড়িদিনের অতিথি হয়ে আসতেন শশিশেখর। সে কটা দিন রোজই উৎসব। কত রাত্রি পর্যন্ত উঠোনে চাঁদের আলোয় বসে একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনানো, ছোট্ট সুগত বাবার কোলে বসে থাকত। তাঁর প্রিয় গান ছিল 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর'। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সুগতও গাইত 'তোমায় নইলে ত্রিভুবনের সর'। আর কত গল্প! আশ্চর্য সব জায়গার! অদ্ভুত সব ঘটনার!

বছরে একমাস করে জুড়লে হতো ঠিক এক বছরই হবে। বুলবুলি আট বছরের যখন শশিশেখর গেলেন। আর কেমন সেই যাওয়া! অতদূরে বিজনে ও রকম কেউ যায়? শেষবারের চোখের দেখাও দেখেননি কনকলতা। ধস নামা জায়গায় তাড়াতাড়ি তৈরি রাস্তা ইন্সপেকশন করতে গিয়েছিলেন, গাড়ওয়াল হিমালয়ের ভিতরে কোথায়। ঠিক তখুনি নতুন ধস নামে। ছ'সাতজন কর্মী সমস্ত যন্ত্রপাতিসুদ্ধ সকলকে নিয়ে নেমে যায় কত হাজার ফুট নীচের পাতালে, সামান্য দূরে দূরে থাকা লোকজনের স্তম্ভিত চোখের সামনে। প্রথমে টেলিগ্রাম, তারপর চিঠি এসেছিল তাঁর কাছে। তাঁর দাদারা এসেছিলেন খবর পেয়ে। সেই মাত্র একবারই তিনি নিজের ছেলেমেয়ে ছেড়ে একা গিয়েছিলেন দাদার সঙ্গে হরিদ্বার, সেখান থেকে মিলিটারি জিপে রুদ্রপ্রয়াগ, সেখান থেকে আরও ভিতরে। ওই বিশাল হিমালয় দেখেছেন আর কেবলই মনে মনে ভেবেছেন— এত বড় তুমি, তোমাকে কি মানায় আমাকে ধ্বংস করা? যাকে তুমি টেনে নিলে তোমার কাছে সে কতটুকু? কিন্তু আমার সংসারে সেই যে ছিল অবলম্বন! মুহূর্তে মুহূর্তে ওই বিশাল পর্বতমালা যেন বুঝিয়ে দিয়েছিল মানুষের দুঃখ, মানুষের হাহাকার কত অকিঞ্চিৎকর তার সামনে! আয়তনে, কালে উপস্থিতিতে মানুষ

তার সব সুখ সব দুঃখ নিয়ে কতটুকুমাত্র এই প্রকৃতির! অথচ সেই অস্তিত্বটুকুর মধ্যে কত তার স্বপ্ন কত আকাঙক্ষা কত বা হতাশা, দম্ভ, রক্তপাত!

আর ফিরে আসবারও কতদিন পর শ্রদ্ধাপূর্ণ এক চিঠির সঙ্গে এল রসিদ। যে মানুষটি চলে গেছেন এক কাপড়ে, তাঁর নিত্য ব্যবহারের সমস্ত জিনিস, আসবাব, পোশাক, কাগজপত্র বড় বড় কালো সেই মিলিটারি ট্রাঙ্কে ভরে রেলওয়ে বুকিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে।

আর এসেছিল চাকরির প্রস্তাব। ফোর্ট উইলিয়াম স্কুলে, সমস্ত সুযোগ নিয়ে শিক্ষিকার কাজ নিতে পারেন তিনি। ছত্রিশ বছর বয়সী কনকলতা ঠিক করেছিলেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আর ওই আবহাওয়ায়, ওই জীবনযাত্রার কাছাকাছি নিয়ে যাবেন না।

রয়ে গেলেন বাংলাদেশের প্রান্তবর্তী এই শহরেই। ধুলোটে রুক্ষ এই শহর কিন্তু তাঁকে, তাঁর ছেলেমেয়েকে ভালবাসা দিয়েছে অনেক। সহমর্মিতা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। খুব কঠিন দিনেও একা ছাড়েনি। সেই তাঁর চাকরি-জীবনের শুরু। খোকা এগারো, বুলবুলি আট। তখন ছিলেন শহরেরই ইস্কুলে।

ছাদে ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ লেগে গিয়েছিল জানতেই পারেননি কনকলতা। খোকার ডাকে খানিকটা চমকে জেগে ওঠেন, তখনই বুঝতে পারেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। খোকা একটু উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। ছেলের হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান।

—কখন এসেছিস?

—এই একটু আগে। রঞ্জা বলল তুমি ছাদে শুয়ে আছ। অসময়ে শুয়ে আছ কেন? শরীর ঠিক আছে?

—হ্যাঁরে, এমনি শুয়েছিলাম।

নীচে এসে বসামাত্র বুবুন উঠে এসেছে পড়া ছেড়ে— বাবা, আম্মাও আজ অ্যাতো মোটা বই এনেছে স্কুল থেকে। আম্মাকেও রোজ পড়া করতে হবে কিন্তু।

—হ্যাঁ দাদা, হবেই তো। তুমি রোজ স্কুলের পড়া শেষ করে আমাকে পড়াবে— পড়াবে তো?

বুবুন একটু গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে। একে একে বাবা মা আম্মা সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চায় কথাটা সত্যি না ঠাট্টা!

রঞ্জা বুবুনের কাছে বসে কিছু সেলাই করছিল। কনকলতা বারান্দায় রাখা

নিজের চেয়ারটাতে এসে বসলেন। এই এক নেশা, একটি ছোট কৌটো ভরা তামাকপোড়া ছাই, তাই দিয়ে বারে বারে দাঁত মাজা। আগে কেবল রাত্রে একবার মাজতেন, সেইটে বেড়ে বেড়ে এখন দিনে অনেকবার হয়ে যায়। মনে কোনও ভার পড়লেই একবার একটু মাজতে ইচ্ছে করে। নিজেই কত সময় মনে মনে হাসেন, দ্যাখো কাণ্ড, পাছে অভ্যেস হয়ে যায় ভয়ে একটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট দুদিনের ওপর তিনদিন খাইনি আর কোত্থেকে কিনা—

খুব দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছিলেন একসময়, তখনই স্কুলের কে যে ধরিয়েছিল অভ্যাসটা! এটা নাকি দাঁত ব্যথার অব্যর্থ ওষুধ। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরে রেখে দাঁত তোলাবার সাহস হত না। মনে হত যদি খুব রক্ত পড়ে, কোনও ইনফেকশন হয়ে মরেই যান যদি, ওদের দুজনের কী হবে? কে দেখবে ওদের? সেই ছত্রিশ বছর বয়স থেকে নিজের আর সমস্ত পরিচয় ভুলে কেবল মা হয়েছিলেন কনক। আর কে থাকবে— তাঁকেই মা বাবা শিক্ষক সব হতে হত। সন্ধ্যাবেলা ওদের কাছে বসে ওদের পড়াবেন বলে সারাদিন কোনও পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে জ্ঞান করতেন না। স্কুল থেকে ফিরে এসে পা পেতে দাঁড়াতেন না কোথাও। সন্ধ্যার আগে রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা সেরে রাখতেন। নিজেদের পড়া ওরা নিজেরাই করত, কখনও হয়ত একটা কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসত। কিন্তু সমস্ত সময়টা কনক শান্তভাবে হয় একটা বই না হলে সেলাই বা বোনা কিছু একটা হাতে করে ওদের কাছে বসে থাকতেন। তাঁর একটু চাপা স্বভাবের জন্য ছেলেমেয়েকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে কখনও আদর করতে পারেননি, কিন্তু মনে হত এই কাছে বসে থাকাটুকু যেন তাঁর আদর হয়ে ওদের স্পর্শ করে। মনে হত, যখন ওরা বড় হবে যখন নিজেদের সংসার করবে তখন এই সব সন্ধ্যার শান্ত স্মৃতি ওদের মনে থাকবে। কী জানি, এতদূর কি ভাবতে পারতেন তখন? তখন তো প্রতিটি দিন একা একা এক লড়াই। কতজন পরামর্শ দিয়েছিল, মাথার ওপর বাবা নেই, হোস্টেলে দিয়ে দাও ছেলেমেয়েকে। তিনি ভেবেও দেখেননি প্রস্তাবটা। বাবা নেই বলেই তো আরও বেশি করে নিজের কাছে রাখতে হবে ওদের। ডাক্তার ভাসুরও খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নিজের কাছে বম্বেতে। সুগত ঘরে কনকলতার বিছানা করছিল। শেষ করে কাছে এসে বসল। মাথাটা তাঁর চেয়ারের হাতলে রাখার ছল করে গায়ে গুঁজে দিয়ে। ফর্সা ঘাড় পিঠ বাহু হাতের নীচের দিকটা রোদে পোড়া তামাটে। বড় রোগা ছেলেটা। গেঞ্জির ভেতর থেকে শিরদাঁড়াটা ভেসে উঠেছে। কব্জিগুলো দেখলে মাঝে মাঝে চিন্তা হয়। বাবার রঙ পেয়েছে, গড়ন-গঠনও বাবার মতো, কিন্তু স্বাস্থ্যটা পায়নি। কোথা থেকে থাকবেই বা ওর স্বাস্থ্য?

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন দুজনেই। তারপর সুগত জিজ্ঞাসা করে, স্কুলে কী হল আজ সেই কথা। তোমাকে তো একেবারে রীতিমতন আচার্য সংবর্ধনা দিয়েছে দেখি! ছাতা-চাদর—

—দ্যাখ না, হৃষিকেশ আর প্রদীপ তো কেঁদেই ফেলল। হরেনবাবুও এমন চোখ ছলছল!

—আর পড়ুয়ারা?

—পড়ুয়াদের থেকে বেশি তো তাদের মা-বাপেরা। বড় ভাল রে মানুষগুলো! বাসরাস্তা পর্যন্ত সব চলে এসেছে বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে— শেষে বাসে তো আসতেই দেবে না, বিষুণ রিক্সা করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

—আর তুমি! তুমি কাঁদছিলে তো? আবহাওয়াটা ভারী হয়ে যাচ্ছে দেখে মাকে খ্যাপাবার মতো করে বলে সুগত।

—এ হে হে— বুড়ি মেয়ে কাঁদছিল— এ এ—

এমন গোলমাল জুড়ে দেয় লজ্জায় পড়ে যান, কনকলতা, যাঃ আমি কাঁদিনি।

ততক্ষণে হাসি-হাসি মুখে রঞ্জা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, কেন মাকে বিরক্ত করছ!

ঠাকুরকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন কনক। তারপর শুতে যান। চশমাটা চোখে দিয়ে বালিশের পাশে রাখা বইটি হাতে নেন। দেখে নেন খাবার জল, মশারির গায়ে বেডসুইচ, বালিশের নীচে টর্চ সব ঠিকঠাক আছে কিনা। জানেন থাকবে, তবু ওই দেখে নেওয়াটুকু অভ্যেস। হাতের বইটি চোখের সামনে খুলে ধরেন। সুলেখা স্যানালের 'নবাঙ্কুর'। আগে কোনওদিন নাম শোনেননি এই লেখিকার, কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। একটি গ্রামের মেয়ের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার গল্প। গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে পিসির সঙ্গে চলে যাচ্ছে মাকে ছেড়ে, শহরের স্কুলে ভর্তি হবার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা বই। কিন্তু এখনও কি খুব একটা পাল্টেছে ছবিটা? মনে পড়ে এই শহরের যে স্কুলে প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিল, ক্লাস এইট পর্যন্ত ছিল সেই স্কুল। অবাঙালি মেয়েদের স্কুল। তিনি পড়াতেন জিওগ্রাফি আর ইংরিজি। দুটোই ভয়ের সাবজেক্ট। কিন্তু কেমন করে যেন ধীরে ধীরে সেই ছোট ছোট ফুটফুটে মেয়েগুলি তাঁর পরম ভক্ত হয়ে পড়ল। এমনকি তাদের বাবারা। বাবারাই কেবল— কেননা গার্জেন হিসেবে কারও মাকে আসতে দেখেননি কোনওদিন, আলাদাভাবে সমীহ করতেন কনকলতাকে। অন্য লেডি টিচাররা ওদেরই সম্প্রদায়ের এবং প্রায়ই পারিবারিক ভাবে পরিচিত।

কনকলতা বাইরের, কনকলতার মধ্যে এক রকম শান্ত দূরত্ব ছিল, হয়তো সে জন্যই সেই বিশেষ মর্যাদা। কারণ যাই হোক, ওটুকু তিনি বোধ করতেন। আর তাই বোধহয় সম্ভব হয়েছিল সেই আপাত অসম্ভব ঘটনা। বেশ মনে আছে আজও, ছটি মেয়ে ক্লাস এইটের ইয়ার্লি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করল। পরদিন স্কুলে দেখেন তারা ক্লাস টুর সিঁড়িতে সারি দিয়ে বসে আছে চোখ-ভর্তি জল নিয়ে। কী ব্যাপার! হেডমিস্ট্রেস মিসেস শ্রীবাস্তব পর্যন্ত অবাক। তাদের আকুল প্রার্থনা— বহিনজি, হম লোক তো পাশ হুয়ে হ্যায়, তো হম লোগোঁকো অওর পড়নে দিজিয়ে... তাঁদের সকলেরই কষ্ট হয়েছিল মনে। বিশেষত ওদের নিজেদের সম্প্রদায়ের শিক্ষিকাদের ভয় বা অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছিল, একজনের সকরুণ প্রশ্রয়ও প্রচ্ছন্ন ছিল না।

সত্যিই, এই যে বাড়িতে ঢুকে যাবে মেয়েগুলো, বিশ্বের প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে ওদের মুখের উপর। অথচ এরা মনোযোগী, ভাল ছাত্রী। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সেদিনকার মতো মেয়েদের বুঝিয়েসুঝিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়। তারা গেল, কিন্তু বলে গেল কাল আবার আসবে। মেয়েরা যেতে সেক্রেটারি এলেন, প্রেসিডেন্ট এলেন। তাঁদের কাছে আর্জি রাখা হল। প্রথমে তো তাঁদের এককথা— ক্যা হোগা পাস করকে। ঘর মে রহেগি, নৌকরি তো নহি করনা হ্যায়—

অবশ্য মিসেস শ্রীবাস্তব নিজে চুপ করে থাকলেও সুষমা দেবী মিসেস সিংয়ের মতো সিনিয়র টিচাররাও বলেছিলেন মেয়েদের পক্ষ নিয়ে। কনকলতা চুপ করেই ছিলেন। বৃদ্ধা প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপ কুছ কহনা নহি চাহতি? মেয়েরা তো আপনার কথা খুব শোনে!

কনকলতা বলেছিলেন, দেখুন লেখাপড়া শিখতে থাকলে একটা নিয়মে পাস করবে। কিন্তু পাস করাটা তো দোষের নয়। আমার মত যদি জানতে চান, পাস করাটাই পড়াশুনোর সব নয়। এতবড় পৃথিবীতে মানুষ এসেছে, কত সুন্দর তার জীবন, কেবল লেখাপড়া শিখলেই সে এসব কথা বুঝতে পারে। বোঝে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ। নিজে নিজে চিন্তা করতে পারা তো সব মানুষেরই দরকার—

শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল স্কুল কমিটি। মেয়েরা ক্লাস করতে থাকুক, তাঁরা চেষ্টা করবেন পরীক্ষা দেবার পারমিশান পাবার। তবে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, নতুন কোনও টিচার কিন্তু তাঁরা নেবেন না এই নতুন ক্লাসের।

নীলম, সরস্বতী, বিনীতা, রেখা আরও কী যেন দুটোর নাম— সেই ছটা কৃতজ্ঞ ঝলমলে মুখ, একজন টিচার আর কী আশা করতে পারেন এর চেয়ে

বেশি? দুজনই টেস্টে অ্যালাউ হয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। বিনীতাটা বোধহয় পাশ করেনি, নীলম আর রেখা হাই সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছিল। তার চেয়েও বড় মুক্তি তো ওরা পেয়েছিল! ছাত্রী থাকবার, পড়বার অধিকারের মুক্তি।

সকালে— খুব সকালে ওঠেন কনকলতা। এ তাঁর চিরকালের অভ্যাস। খুব ছোটবেলায় সেই যে মা উঠতেন অন্ধকার থাকতে, তখন একটি পাখিও ডাকত না, তারপর কখন উঠে পড়তেন বাবা, বাবার গানের আওয়াজ কানে যেতেই ঘুম ভেঙে যেত। কত ভোর থাকত তখন! তাও উঠে দেখতেন মায়ের স্নান সারা। নিজেও এতদিন স্নান করেছেন ভোরবেলা। ইদানীং একটু ভয় হয়। বয়স হচ্ছে শরীরের। অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করেছে এ। এখনও তেমন রোগ বলতে কিছু নেই তাঁর— প্রেসার না, ব্লাডসুগার না। এই ক'বছর ধরে কেবল হার্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে কিছুটা। মোটামুটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন কনকলতা। অসুখ করে পড়ে থাকাকে বড় ভয় তাঁর। তাঁর ভোর তাঁর মায়ের শান্ত ভোর তো ছিল না। যখন ছেলেমেয়ে ছোট ছিল-- রান্না, ওদের স্কুলের টিফিন, নিজের টিফিন শেষ করে সংসারের উনকোটি হাজারটা কাজ সেরে খোকা-বুলবুলিকে খাইয়ে নিজে খেয়ে দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হত বাড়ি থেকে। তারপর কতদিন গেল, খোকা ছিল না তাঁর সংসারে—

এখন রাত থাকতে ওঠেন না। আলো ফুটে যায়। ডাকেন না ওদের। থাক, ঘুমোক একটু। উঠোনে শিউলি গাছের গা বেয়ে যুঁইয়ের একটি লতা। এক ফালি মাটিতে কটা দোপাটি গত বছরের বীজ থেকে উঠেছে। এখানেই শীতে গাঁদা ফুটবে। রঞ্জা করে এসব। ওর বাগানের শখ। ছোট ছোট কয়েকটা টবে নানারকম ক্যাকটাস। ভোরে ফুলের গন্ধ পেলে আজও প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে বুলবুলির কথা মনে পড়ে। কিছুতেই ভোরে উঠতে চাইত না, ভারী ঘুমকাতুরে ছিল। কিন্তু তিনি স্নান সেরে এসে উঠোনের দিকে বারান্দায় সিঁড়িতে বসে গান গাইতেন যখন, ঠিক উঠে চলে আসত। ঘুমঘুম চোখ, গায়ে বিছানার গরম। এসে গা ঘেঁষে বসত। স্কুলে পড়ত তখনও। সেটা এ বাড়ি নয়। এর চেয়ে অনেক বড় ছড়ানো জায়গা ছিল সে বাড়িতে। ভাড়াবাড়ি ছিল। শশিশেখর যাবার পর তাঁর প্রাপ্য যেসব টাকাপয়সা এসেছিল, তা দিয়ে এই বাড়ি কিনে কিছুটা রি-মডেলিং করে নেওয়া হয়। ভাসুর নিজে দেখে সমস্ত কিছু করিয়েছিলেন।

এখনও সকালবেলা জামাকাপড় পাল্টে, ঠাকুরপ্রণাম করে একটি সুগন্ধি ধরিয়ে দিয়ে সকালের শান্ত আকাশের নীচে বারান্দায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে কনকলতার। বাতাসে একটু ঠাণ্ডা আভাস। বেশ বৃষ্টি হয়েছে কদিন ধরে।

রঞ্জা উঠে পড়েছে, ওদের বাথরুমের জলের শব্দ পাচ্ছেন। এবার রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমেই চা করবে। এই একটি জায়গাতেই এখন ওদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন কনক। গ্যাস ধরাতে পারেন না। চেষ্টা করলে কি আর পারতেন না? ভেতর থেকে চেষ্টা করার ইচ্ছেটাই যেন কমে আসছে। মনে হচ্ছে থাক, অনেকদিন তো তুমি শিখেছ, করেছ, চালিয়ে নিয়েছ— এবার থাক। একেই কি ক্লান্তি বলে? তিনি কি বুড়ো হয়ে গেছেন? কী জানি, সে কথা খেয়াল করবার সময় পেলেন কখন? কেবল যেন দেরি না হয়ে যায়— এই ঊর্ধ্বশ্বাস তাড়াহুড়ো করতে করতেই তো সব সময় চলে গেল। চা নিয়ে এল রঞ্জা। চেয়ারের পাশে ছোট টুলের ওপর রাখল। প্রতিদিনের মতো একই কথা জিজ্ঞেস করল, সকালের জলখাবার কী হবে মা?

কী করবে দ্যাখো! রুটি তো করতেই হবে, কিছু ভাজা বা তরকারি করে দাও। চলো আমি কেটে দিচ্ছি।

এখন না। এখন বোসো। ভাত ডাল রুটি হয়ে গেলে আমি বলব, আজ তো তাড়া নেই—

সকালের দিকে খুব তাড়া থাকে। সুগত বেরোবে সাড়ে আটটায়, ভাত খেয়ে লাঞ্চ প্যাকে টিফিন নিয়ে। বুবুনের স্কুলের রিকশাও আসবে ওরকম সময়েই। সে এখন রুটি খেয়ে যায়। দুটোয় ছুটি হয়, তারপর ফিরে ভাত খায়। নটা থেকে দুটো— কীরকম অদ্ভুত স্কুল আওয়ার্স এইটুকু বাচ্চাদের, ভেবে পান না। আড়াইটেয় বাড়ি ফিরে শান্ত হয়ে ভাত খেতে খেতে তিনটে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে। সামনের বছর থ্রি হবে, এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত স্কুল হবে। সে একরকম ভাল।

তাঁর কোঁয়ারবডি গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম যখন গেলেন, এক-একদিন বাড়ি ফিরে খাবারের থালার সামনে বসতে পারতেন না। সারি সারি ভাত না খাওয়া কচি মুখ ভেসে উঠত চোখের সামনে। চিরকাল টিফিনে খান-দুই আটার রুটি, একটু তরকারি, একটা কলা বা লেবু নিয়ে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। সকালে নাকেমুখে গুঁজে খেয়ে বাস ধরতে বেরোনো আর তিনটেয় স্কুল ছুটি হলে সোয়া চারটেয় বাড়ি— মাঝখানের এই এতখানি সময় না খেয়ে থাকলে শরীর অস্থির করত। কিন্তু আপনিই বন্ধ হয়ে গেল টিফিন নিয়ে যাওয়া। দিনে তিন বার খাওয়া, ছেলেমেয়ের সামনে যত্ন করে খাবার থালা ধরে দেওয়া— যেন কী রকম অপরাধী মনে হত নিজেকে। প্রথম প্রথম দেখেছেন বাচ্চারা আসে না স্কুলে। দুজন মাস্টারমাশাইও এগারোটা নাগাদ একবার আসেন, একটু ঘোরাফেরা করে সামনে পড়া দুচারজনকে—

কী রে, ছেলাগুলাকে ইস্কুলে পাঠাস নাই কেন? বলে চলে যেতেন। বসার জায়গাও ছিল না। কয়েকটা খুঁটি পুঁতে ওপরে একটা টিনের চৌচাল, একটা যেমন-তেমন টেবিল, আর হাতলঅলা কাঠের চেয়ার একটি।

কোঁয়ারাডির মোড়ে বাস দাঁড়ায় না। বাঁকুড়াগামী এক্সপ্রেস বাস তাঁকে যেখানে নামিয়ে দিয়ে যেত, সেখান থেকে টানা রাস্তা ধরে প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে কোঁয়ারডি পৌঁছতেন। সাড়ে দশটায় পৌঁছে প্রথম দুদিন তিনি প্রায় একাই বসে ছিলেন সেই চৌচালার চেয়ারে, হাতে একটা বোনা নিয়ে। দ্বিতীয়দিনে আলাপ হল হেডমাস্টার হরেনবাবুর সঙ্গে। মধ্যবয়সী পাকানো চেহারার ছোটখাটো মানুষ। এ অঞ্চলের তুলনায় বেশ ফর্সা রঙ, যদিও রোদে পোড়া তামাটে। তিনি যে কনকলতার আসার খবর পেয়েই এসেছেন সে কথা বলে বোঝা গেল। সম্ভবত খবর দিয়েও এসেছেন, খানিকক্ষণের মধ্যেই অন্য শিক্ষক হৃষিকেশও হাজির। এই তিনজনেই ছিলেন তখন তাঁরা। রেজিস্ট্রার খাতা হরেনবাবু সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যান, যেদিন আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন। স্কুলে যে খাতা রাখার কোনও জায়গাই নেই।

দ্বিতীয়দিন এসে দু-এক কথার পর কনকলতাকেও বুঝিয়েছিলেন হরেনবাবু, দেখুন দিদিমণি, সরকারের যা নীতি সে তো মানতেই হবে। খাতায় একশো ছয়ের মতো ছেলেমেয়ে আছে। এরা ইস্কুলে আসবে না, পড়বেও না। এদের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও 'ক' পড়েনি। আপনি ঘরসংসার ফেলে শহর থেকে এখানে এসে একা একা বসে রইবেন তার কিছু দরকার নেই। হপ্তায় একদিন এলেই চলবে।

একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন কনকলতা। তারপর খুব স্থিরভাবে বলেছিলেন, এটা আমি মানব না মাস্টারমশাই। এই গ্রামের বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য আমি মাইনে নেব অথচ স্কুলে আসব না— পড়াব না তা কী করে হবে?

হরেনবাবু তাঁর কথাটা তখনও ধরতে পারেননি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, কোনও অসুবিধা নাই, এরা কমপ্লেন-টমপ্লেন করে না। নিজেরাই ছেলে পাঠায় না। ওদের ছেলেরা পড়া করলে গরু বাগালি করবে কে?

—মাস্টারমশাই, যাতে ওরা স্কুলে আসে, পড়াশুনো শেখে সেজন্যই তো গ্রামে স্কুল হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে জানবে যে তাদের মা স্কুলের টিচার অথচ স্কুলে যায় না— তারপর তারা নিজেরা কী শিখবে? আমি তাদের কী শেখাব বলুন?

এই সময়টা আর বসবার সময় নয়। খোকা এই যে বেরোয়, তার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। ওদের খাবারটা তিনি বেড়ে দেন। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে সুগত জিজ্ঞাসা করে, মা, বুলবুলি চিঠিপত্র দিচ্ছে না?

—না, বেশ কিছুদিন হল খবর দেয়নি। অবশ্য লিখেছিল টিমের সঙ্গে উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ যাবে। এই আজকালের মধ্যে কলকাতায় ফিরবার কথা।

—বাবলি?

—বাবলি আছে অঞ্জনের কাছেই। সে তো সকালেই অফিসে বেরোয়, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। কী যে করে অতটুকু মেয়েটা!

সুগত আর কথা বলে না। তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করে। রঞ্জা দুজনের টিফিনবক্স টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বুবুনের জুতো-মোজা গোছাচ্ছিল!

এরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাড়িতে একেবারে ঝড় বইতে থাকে। অবশ্য সুগত নিজের জিনিসপত্র পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে, কিন্তু বুবুন একাই একশো। ঠিক এই সময় ওর মুহূর্তে মুহূর্তে খেলা আসে— মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করে কতদূর থেকে বেসিনে ফেলা যায়, এক পায়ে মোজা পরে ছুটে চলে যাবে পোকা দেখতে—

কোনওমতে ওকে তৈরি করে ঠেলে স্কুলের রিকশায় তুলে দেওয়া পর্যন্ত। একবার রিকশায় উঠে বসলেই যেমন শান্ত তেমনই লক্ষ্মী ছেলে। স্কুলে খুব সুনাম ভাল ছেলে বলে।

এতদিন এরপরে তাঁর নিজের তৈরি হবার কথা। রঞ্জাকে জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের কিছু আরও টুকিটাকি শেষ করে সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়া। তিনি তাড়াহুড়ো করতে পারেন না এখন আর। দশটায় বেরিয়ে বাস ধরে স্কুল।

আজ কী রকম অদ্ভুত লাগছে। আর স্কুল যেতে হবে না তাঁর। বাসে সেই সব পরিচিত মুখ, গ্রাম, ছাত্রছাত্রীরা। আজও স্কুল বসবে। তাঁর নিজের ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলো ফাঁকা বসে থাকবে। বসে তো থাকবে না, গোলমাল লাফালাফি করতে থাকবে। এ বছর ওঁর ক্লাসে— ক্লাস ওয়ান আর টুতে ভর্তি হয়েছিল চুরাশিটা বাচ্চা। যেটা স্পষ্ট কথা বলতেও শেখেনি সেটাকেও এনে তার মা কিংবা বাপ বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে, 'একটুকু শিখে নিক দিদিমণি, তুমি চলে গেলে কে আর আমাদের ছেলেকে যতন করে শিখাবেন!'

যত তিনি বলেছেন— তোমাদের স্কুল, তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা মাস্টারমশাইদের কাছে বলবে এসে— কেউ কিছু বলে না সত্যিই, কিন্তু তিনি জানেন, এরা বেশির ভাগই হরেনবাবুর খাতক। দিন অনেক পাল্টেছে এই পনেরো-ষোলো বছরে, হরেনবাবুরও সত্যিই অনেক বদল হয়েছে, তবু এরা ভয় পায়। একে মহাজন তায় ব্রাহ্মণ— এই সব ভয় যে অনেক অনেক পুরনো! ষোলো বছরে কি তার শিকড়সুদ্ধ ছেঁড়া যায়?

খোকার জামাগুলো ধুতে দেওয়ার জন্য বার করে রেখেছে রঞ্জা। পকেটগুলো

দেখে নেন একবার। জামাগুলোয় খোকার গায়ের গন্ধ। এখনও যখন এঘর ওঘর করে, কথা বলে মাঝে মাঝে— স্বপ্নের মতো লাগে তাঁর। ভাবতে পারেননি আর ও ফিরে আসবে এই ঘরে, 'মা' বলে ডাকবে আবার, আবার ওর মুখে খাবার ধরে দিতে পারবেন!

সবে হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছে ছেলে, সতেরো পুরো হয়নি তখনও— হঠাৎ রাত্রিবেলা পুলিশ এল বাড়িতে। ভয়ের চেয়েও বেশি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙা বুলবুলি সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। পরে যেসব ঘটনা শুনেছেন, তার তুলনায় ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন সেদিনের অফিসারটি। বলেছিলেন— আপনাকে আমরা চিনি। কিন্তু আপনি জানেন না কী দিনকাল পড়েছে, কী অবস্থা চলছে চারপাশে! কমবয়সী বুদ্ধিমান ছেলেদের ভুল রাস্তায় পাঠিয়ে দিচ্ছে কিছু নেতা। আপনার ছেলে কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে আপনি জানেন না— আমরা জানি। ছেলেকে এসব সঙ্গ ছাড়িয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন এখান থেকে। নাহলে এরপর অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়াবে।

তবু কনকলতা দৃঢ় ভাবে ভাবছিলেন, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে পুলিশের। কিন্তু খাটের ওপর থেকে খোকার বিছানা তুলে ফেলল ওরা। তাক ও পড়ার টেবিল ঘেঁটে তুলে নীচে ফেলল। কনকলতা দেখলেন— বই, অজস্র চটি-চটি বই, কার্বন পেপার, চিনের নেতা মাও সে তুং-এর একটা ছবি। খোকা বাড়িতে ছিল না। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, দিনতিনেকের জন্য সে গিয়েছিল রাঁচিতে বন্ধুর বাড়ি— তাঁকে বলেই গিয়েছিল।

কিন্তু বাড়িতে তাঁর গায়ের কাছাকাছি থেকেও না বলে এত দূর চলে গেছিল খোকা, এই বোধই তাঁকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল, সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে আবার কিছু সদুপদেশ দিয়ে পুলিশ চলে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে যেন বিপদটা দেখতে পেয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, কাপড়ে আগুন ধরে গেছে আর সেই আগুন নিয়েই তিনি ছুটছেন কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিসের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তাঁর শান্ত ছেলেটা যে, প্রকারান্তরে এ রকম করে ভয় দেখিয়ে গেল পুলিশ? এই মাঝরাত্রে তাঁর ঘর সার্চ করে বইপত্র তুলে নিয়ে গেল? এসব কিসের বই? তিনি এত নিশ্চিন্তে ছিলেন যে একবারের জন্যও মনে আসেনি, খোকা এমন কিছু করছে যা তিনি জানেন না? বুলবুলি কাঁদছিল আর তাঁর পিঠে হাত বোলাচ্ছিলেন।

—ও মা, দাদা কোনও খারাপ কাজ করেনি মা! দাদারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভালর জন্য যুদ্ধ করতে চায়।

—তুই জানতিস! তোকে দাদা বলেছিল?

কাঁদতে কাঁদতে মাথা নেড়েছিল সে।

—কোথায় যায় দাদা? কাদের সঙ্গে মেশে?

—তা আমি জানি না। কিন্তু দাদা অনেক বই পড়ে। তুমি যখন থাকো না তখন এক-একদিন দাদার বন্ধুরা আসে, সবাই কথা বলে, আলোচনা করে। দাদা বিকেলে গরিব লোকেদের বস্তিতে গিয়ে এই সব শেখায়।

—তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন?

—দাদা বারণ করেছিল। বলেছিল সময়মতো আমি নিজেই মাকে বলব। মা রাগ করবে না।

সকাল হয়েছিল। কী ভারী সকাল! আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন এসেছিল খবর নিতে। শহরের এক প্রান্তে কনকলতার বাড়ি। পাড়ায় দু-চারটে পাকাবাড়ি থাকলেও সাধারণ কিছুটা গ্রামীণ লোকজন, গ্রাম ধরনের মাটির বাড়িই বেশি। তাদের সেই খবর নিতে আসার মধ্যে কৌতূহলের চেয়ে বেশি ছিল উৎকণ্ঠা। ভেতরে যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন কনক।

আবেগকে বাইরে প্রকাশ করায় তাঁর চিরকালই এক ধরনের অক্ষমতা। যতখানি পারেন, সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেদিনও স্কুলে গিয়েছিলেন তিনি। কাজের বউটি এসেছিল। বাইরে থেকেই হয়তো শুনে এসেছিল সে। সুগতর ঘরের ছড়ানো জিনিসপত্র সযত্নে তুলে গুছিয়ে রাখল।

স্কুল থেকে ফিরতে বুলবুলি বলেছিল, মা সরমাদি আজ সারাদিন আমার কাছে ছিল। অন্য বাড়ির কাজ শেষ করে এসে এখানেই বসে ছিল। বুলবুলির কীসের একটা ছুটি চলছিল সে সময় কয়েকদিন।

—সরমা খেয়েছে দুপুরে?

—বলল খেয়ে এসেছে। আমি কত বললাম আমার সঙ্গে খেতে, খেল না।

সরমা বলল, আমি ওই দু'তলা ঘরে দুপুরে ভাত খাই, উয়াদের গোহালের কাজ করি। সন্ধ্যাবেলার মুখে আঁধারে এসেছিল বাড়ির ঠিক পেছনে যারা থাকে, সেই চাষী বউ। ওরা দরকার-অদরকারে আসে। ঘুঁটে বিক্রি করতে, ছাদে নিজেদের ধান শুকোতে দিতে, বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখে। সেদিন এসে হাতের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বলে গিয়েছিল, অ মা, যদি কোনও দিন খোকা ঘরে রইতে পুলিশ আসে, তুমি দরোজা খুইলবার আগে পাঁচিল পার কইরে আমাদের ঘরে পাঠায়ে দিও, আমরা রাখে লিব, তুমার ছেলে বইলে পাঠায়েছে। আমরা হইতে তুমার কুনও ডর নাই মা।

পরদিন সুগতর ফেরার কথা ছিল। ছুটি নিয়ে এসেছিলেন স্কুলে। ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির মন। অন্যদিনের মতোই কাজকর্ম করেছেন কিন্তু থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল ভেতরটা। এতটুকু শব্দে চমকে উঠেছিলেন। কী হতে যাচ্ছে তাঁর সংসারে? কী হবে? যে খোকা-বুলবুলি ছাড়া তিনি নিঃশ্বাস নেননি কোনওদিন, সেই খোকা কি দূরে চলে যাবে? তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে কোথাও?

সুগত ঘরে ঢুকেই অস্বাভাবিকতা বুঝতে পেরেছিল। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কাঁদতে শুরু করেছিল বুলবুলি। সুগত দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। কখন এত লম্বা হয়ে গেল!

—মা, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

না, রাগ করবার কথা তো একবারও মনে পড়েনি তাঁর। শুধু ভয় হয়েছিল, উৎকণ্ঠা হয়েছিল।

খেয়ে উঠে সারাটা দুপুর ধরে মায়ের পাশে শুয়ে সুগত মাকে বুঝিয়েছিল তাদের— তার আদর্শের কথা।

—কিন্তু, তোরা যা চাইছিস সে তো ভাল জিনিস, তার জন্য পুলিশ ধরবে কেন?

—মা, তুমি তো নিজেই দেখেছ, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে চিরকাল পুলিশ ধরে। জেলে দেয়। ব্রিটিশ আমলেও দিত, এখনও দেয়।

দেখেছেন তো কনকলতা অনেক কিছুই, কিন্তু সেই সব কিছু যে তাঁর নিজের ঘরে, নিজের রক্তের মধ্যে নিয়ে বুঝতে হবে তা যে কোনওদিন ভাবেননি! ব্রিটিশ আমলের হামলা, পুলিশি অত্যাচার দেখেছেন নিজের বউদির বাপের বাড়িতে। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষক আন্দোলন, ট্রামভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা শুনেছেন। চোখে দেখেছেন এই সেদিনের খাদ্য আন্দোলন। কিন্তু সবদিক থেকে আড়াল করে রাখা তাঁর শান্ত সংসারে যে এসে লাগবে সেরকম কোনও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ধাক্কা, এ সম্ভাবনা তাঁর মনে এক মুহূর্তের জন্য আসেনি। সেরকম কোনও আন্দোলনই ভেবেছিলেন তিনি, তখনও কল্পনা করতে পারেননি কী বিশাল উতালপাথাল হবে দেশজুড়ে আর কী বর্বর হিংস্রতায় কম বয়সী ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি দাঁড়াবে দেশের মালিকরা, তাদের পাহারাদারেরা। সেদিন তখনও তিনি এসব কিছুই ভাবতে পারেননি। ভাগ্যিস পারেন নি।

সুগত বুঝিয়েছিল, মা, বাড়িতে থাকলে পুলিশ আবার আসবে, ধরে নিয়ে আটকে রাখবে। তাতে তো কোনও লাভ নেই। আমি অন্য জায়গায় থাকব।

—কোথায় থাকবি তুই?

—কত জায়গা মা, এই সারাদেশই আমাদের জায়গা। আমার জন্য চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক খবর দেব।

আজ মনে করতে পারে না কেমন করে কেটেছিল তার পরের দিনগুলো। কদিনের মধ্যেই বাড়ি ছাড়ল খোকা। কিচ্ছু নিয়ে গেল না সে। তারপর থেকে শুরু হল পুলিশ আসা। কতবার যে মধ্যরাতে বিপুল, বূঢ় ধাক্কা পড়েছে দরজায় তার গোনাগুনতি ছিল না। তখন আর কোনও ভদ্রতা ছিল না। সার্চ করার নামে রান্নাঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলেছে উঠোনে, বাগানের ফুলগাছ উপড়ে দিয়েছে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে শেলফের বই, এত বই কীসের বাড়িভর্তি? এই মন্তব্য একাধিকবার শুনেছেন তিনি। পুলিশের বুটের তলায় পড়ে থেকেছে রবীন্দ্ররচনাবলী কালিদাস বার্ট্রান্ড রাসেল। অনেকবার তিনি বলেছেন, আপনারা তো জানেন বাড়িতে থাকে না আমার ছেলে। উত্তরে শুনেছেন, কীভাবে মানুষ করেছেন যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়? সেই তো! সেকথার জবাব দিতে হবে উর্দিপরা এই লোকটিকে যে মাঝরাত্রে গৃহস্থালি তছনছ করে দিয়ে মায়ের বয়সী এক শিক্ষিকার সঙ্গে ধমকে কথা বলার মতো চাকরি করে।

মাঝে মাঝে আচমকা পাঁচমিনিটের জন্য এক-দুবার এসেছে খোকা গ্রামের লোকেদের মতো ছোট ধুতি শার্ট পরা, মুখে দাড়ি, কোটরে বসে যাওয়া চোখ। যা ঘরে থেকেছে হাতে ধরে দিয়েছেন কনকলতা আর মুখে বার বার কেবল বলেছেন, শিগ্‌গিরি চলে যা!

সেই চার-পাঁচ মিনিটের প্রতিটা মুহূর্তকে মনে হয়েছে ঘাতক। কেবল মনে হয়েছে, এই বুঝি ধাক্কা পড়ল দরজায়। এক-একবারে বুকের মধ্যে কেটে বসেছে সেই শুকনো মুখ আর মায়ায় ভরা হাসি। রোগা হাত দুটো দিয়ে মাকে একবার জড়িয়ে ধরা। বোনের মাথায় হাত দেওয়া। 'ভেবো না মা, আমাদের সবাই খুব ভালবাসে।' সেকথা তিনি এতদিনে জেনেছেন খানিক। সাধারণ লোকজনের কথাবার্তায়, ব্যবহারে। স্কুল যাবার পথে বাসে একদিনও দাঁড়িয়ে যেতে হয় না, কোনও দোকানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় না, পথে ঘাটে দু-একবার কারও চাপাগলা কানে এসেছে, 'সুগতদার মা'। প্রথম প্রথম বুলবুলি বাড়ি থেকে কোথাও বেরতো না। বেরোলে সাদা পোশাকে পুলিশের লোক যেত পেছনে। সোজা স্কুল যেত আর ফিরত মেয়ে! ধীরে ধীরে নাচের স্কুলে যাওয়া শুরু করল আবার। কনকলতা ভয় পেলে বলত, আমি তো দাদার বোন মা, কেন ঘরে ঢুকে বসে থাকব? আমি তো লুকিয়ে কোথাও যাচ্ছি না। কিংবা হেসে বলত, ভয় পেও না মা, দু'দুটো বডিগার্ড থাকে সঙ্গে, আমাকে ঠিকঠাক বাড়িতে ঢুকতে দেখা ওদের চাকরি।

স্কুল থেকেও খবর নিয়ে ফিরত মাঝে মাঝে। ততদিনে খোকার সাথীদের দু'চারজনকে চিনে গেছেন তিনি। কোন কোন মায়ের বুক খালি করে এসেছে এরা! এমন সব চোখ জুড়োনো ছেলে, এমন হাসিমুখ, এমন মমতাভরা কথা। সব কজন যেন একইরকম মনে হয়।

পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা, একবেলা হলেও কী করবে তারা, দিদিমণি বলে দিক। আরেক সমস্যা অসুখ! কনকলতা দেখতেন স্বাস্থ্যের কোনও নিয়ম কোনওভাবেই জানে না এরা, কেবল দারিদ্র নয়, জানেই না। খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখা বা হাত ধুয়ে খেতে বসার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বেশ অনেকদিন লেগেছিল। গ্রামসুদ্ধু ছেলে মেয়ে বুড়ো দাঁত মাজে তামাক দিয়ে। লালচে রঙের চট্‌চটে কী একটা জিনিস, উগ্রগন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে, সকলেরই মুখে সেটা, যে বাচ্চাটা মায়ের কোলে, তারও। তামাক খুব দ্রুত নেশা তৈরি করে। বহুদিনের পুরনো অভ্যেস যাঁদের তারা নিজেরা চেষ্টা করলে হবে না ধরে নিয়ে ওই সকালবেলা বসে বসে কনকলতা ওদের বোঝাতেন বাচ্চাদের নিমের কি বাবলা গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে শেখানোর কথা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের কথা, যে কোনও পাত্র মাটি থেকে তুলে খাবার জলের কলসীতে ডুবিয়ে দিতে নেই, বাচ্চাদের পেচ্ছাপের কাঁথা জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়, ভাতের হাঁড়ির ঢাকা বা হাতাটা সটান মেঝেতে রেখে দিতে নেই— এই সব হাজার সংসারী টুকিটাকি নিয়ে কনকলতা ওদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁর আশপাশের শিক্ষিত বা শহরের লোকজনকে কোনও কথা বোঝাতে বা মেনে চলাতে যত সময় লাগে, তিনি খেয়াল করতেন এরা এই সব কথা তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শোনে। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছিল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। তাদের দাঁত নখ চোখ পরিষ্কার থাকছে এবং শ্লেট পেন্সিল প্রায় নিয়মিত ক্লাসে নিয়ে আসছে। এখানে অন্যান্য স্কুলের মতো নিয়ম চলে না। লেখায় আগ্রহী মেয়েটি হঠাৎ কদিন স্কুলে না এলে খোঁজ করতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় তার মা একটি নতুন সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে তার সাত বা আট কি দশ বছরের যথাসাধ্য ক্ষমতা দিয়ে মায়ের সাহায্য করছে। কখনও ভাই বা বোনকে কোলে নিচ্ছে, কখনও কাপড় কাচতে যাচ্ছে, মা ঘরের অন্য কাজ করতে থাকলে নতুন বাচ্চা পাহারা দিচ্ছে। সে হঠাৎ শেষ ঘন্টা দুটোয় যদি ক্লাসে আসবার অবসর পায়, তাকে আসতে দিতে হয়। দুই ভাই মিলে গরু চরায়, গরু পিছু বছরে চল্লিশ কিলো ধান পায়। কখনও একভাই স্কুলে আসে, কখনও অন্যজন। প্রথমদিকে আষাঢ় মাসে আর অঘ্রান মাসে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা খুব কমে যেত। এই সময়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের রুয়ান আর কাটাই চলে যথাক্রমে, বড়রা সব সেই কাজে চলে যেত ভোরবেলা

আর যতটুকু সম্ভব সংসার সামলানো, ছোটবোনদের খেতে দেওয়া, ঘরের মুরগি বা ছাগলদের খেয়াল রাখা, এসব করতে হত যাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রী হওয়ার কথা তাদের। কিন্তু ওদের নিজেদের আগ্রহ বেড়ে ওঠার কারণে মোটামুটি সারা বছরই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক, এমনকি কখনও কখনও তার চেয়ে একটু বেশিই। বাড়িতে অশান্তি হলে, ভয় পেলে, ব্যথা পেলে বাচ্চারাও ক্লাসে কনককে বলত সে সব কথা। এই শেষদিকের ছাত্রছাত্রীরা আর দিদিমণি বলত না, বলত মাসিমা। এদের অনেকেরই মা-বাবারা তাঁর ছাত্রছাত্রী ছিল। ছোটোখাটো অসুখ-বিসুখে নজর লাগা বাণ মারা নিয়ে অশান্তিতেও কনককে বহুবার মধ্যস্থতা করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য গ্রামের সাধারণ লোকেদের শুধু নয়, দুই গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরও বিশ্বাস একই রকম দৃঢ় ছিল। বহুবার অনেক কথা আলোচনা কখনও বা বই পড়তে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা একটা মাঝামাঝি জায়গায় এসেছিলেন। কনকলতাও জোর করেননি কখনও। নিজেদের সুখদুঃখ সমস্যা নিয়েও তাঁরা কথা বলতেন নিজেদের মধ্যে। হরেনবাবুর সংসারের অবস্থা ভাল। যথেষ্ট জমি, গরু, বসতবাড়িতে দুটো ঘর পাকা করিয়েছেন। সারাবছর নানা জায়গায় পুজোপালায় পুরোহিত হবার ডাক পড়ে তাঁর। কিছু টাকা সুদে খাটান গ্রামের লোকদের কাছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই তাঁর, স্ত্রী চিররুগ্‌ণ। কনকলতা দেখেছেন হরেনবাবুর স্ত্রীকে। বাড়ির দুর্গাপুজোয় অনেক আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কনকলতা এসেছিলেন খোকা আর বুলবুলিকে সঙ্গে করে। অসম্ভব খুশি হয়েছিলেন হরেনবাবু। তখনই দেখেছিলেন ফর্সার চেয়েও বেশি সাদা মানুষটি, চারিদিকে ছড়ানো সংসার নিয়ে নাস্তানাবুদ। ছুটির পর স্কুলে এসে হরেনবাবুকে বলেছিলেন ডাক্তার দেখাতে স্ত্রীকে। তাবিজ কবচ জলপড়া অনেক কিছু করেও ফল হয়নি অথচ শহরের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না মহিলা। শেষে কথাবার্তা ঠিক করে একদিন কনকলতা নিজে ওঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার কোনারের কাছে। তাঁর আন্দাজ ঠিকই ছিল। গ্যাসট্রিক-এ ভুগছিলেন রুগী। খাওয়াদাওয়ার কড়া নিয়ম বেঁধে দিলেন ডাক্তার। অনেক সেরেছিলেন হরেনবাবুর স্ত্রী। আনন্দের ঘটনাও ঘটেছে— হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিসন নিয়ে পাশ করল হৃষিকেশের বড়ো ছেলে। কী যে খুশি আর কত গর্বিত মুখ হৃষিকেশের! সেই স্কুল। কত সমস্যা আর কত ছোট ছোট সার্থকতার স্মৃতি। বছরের পর বছর, প্রচণ্ড বর্ষায় ক্লাস করা যাচ্ছে না, ইস্কুলের ঘরময় জল, পাশে শ্যাম মাহাতোর বাড়ি ডেকে নিয়ে গেছে মাহাতোর বুড়ি মা। ছাত্রছাত্রী মাস্টার দিদিমণি সবসুদ্ধ। পড়া হয়নি, গল্প বলা হয়েছে, বাচ্চারা গেয়ে শুনিয়েছে ওদের

ভাদুর গান, হাসির গান, নানারকমের ছড়া। গরমের সময় স্কুল বসত সকালে। এগারোটায় যখন বাস স্ট্যাণ্ডে এসে নামতেন, গরম বাতাসে মনে হয় রক্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। চিন্তা হত এত গরমে বুলবুলি সাবধানে আছে কিনা! গরমের ছুটিতে এসেও পুরোটা থাকত না, নাচের ক্লাস বাদ পড়ে যায়। ততদিনে রঞ্জা এসেছে। খোকাদেরই সঙ্গী ছিল ও। কলকাতার মেয়ে।

ওর মাকেও দেখেছেন। শান্ত। বড় বড় ছেলেরা, তাদের বউরা আছে সংসারে। রঞ্জার জন্য দুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে যেতেন, শান্তি পেয়েছিলেন রঞ্জার ঘরসংসার দেখে। রঞ্জা এক-একবার এসে দেখে যায়। হয়ত বসেই আছেন বারান্দার চেয়ারে অনেকক্ষণ, কিংবা বসার ঘরের চৌকিতে। এক-একবার মনে হয়, গরম কাপড়ের ট্রাঙ্কটা বার করে গোছালে হয়। শেষে সেও ইচ্ছে হয় না। আগের রাত্রের বইটা হাতে নিয়ে শুলেন গিয়ে। মেয়েদের বেশি জেদ ভাল নয়। ভাল বলে না কেউ। কিন্তু কনকলতা ভাবেন, কেন নিয়মটা বরাবরই এরকম যে, যা কিছু ছাড়ার সব মেয়েদেরই ছাড়তে হবে। একটা মেয়েকেই কেন সংসারের দাবী অনুযায়ী নিজেকে বদলে নিতে হবে? বেশির ভাগ মেয়ে সেটাই করতে অভ্যস্ত, তারা বিয়ে হয়ে গেলে নিজেকে স্বামী কি শ্বশুরবাড়ির পছন্দমতো বদল করে নেবে, এরকম ভেবেই রাখে। কিন্তু যারা তা করতে চায় না? যাদের পছন্দ-অপছন্দ বড্ড পরিষ্কার? তাদের কেবলই খোঁচা খেতে হয়, ঠোকর খেতে হয়। তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না একটা মেয়ের নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া কি খারাপ? বিশেষত যখন সে মা হয়ে যায়? নিজের বেলায় তাঁর মধ্যে কোনও দ্বিধা কোনও প্রশ্ন আসেনি। এটা তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ যে ছেলেমেয়েরা এসে গেলে একটি মেয়ে কেবলমাত্র মা-ই হয়ে যায়। সন্তানদের জন্য ছাড়া তার আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যদি কেউ সেরকম করে না ভাবে? বুলবুলিকে নিয়ে স্বস্তি নেই তাঁর। ও যে কোনও খারাপ কাজ করছে কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতা করে মেয়েকে ছেড়ে খেয়ালখুশিতে সময় কাটাচ্ছে তা নয়। ওর কেবল নাচ। এই নাচের বাইরে সংসার আর কোথাও কিছু নেই ওর। নাচ রাখতে পারবে না ভয়ে বিয়ে করতে চায়নি, যখন তাঁকে সবাই তাড়া দিচ্ছিল, উপদেশ পরামর্শ দিচ্ছিল বুলবুলির বিয়ে দেবার জন্য। মেয়ে সেই কলেজ থেকেই তো কলকাতায়। বিয়ে করল দেরি করে, নিজেরাই পরস্পরকে পছন্দ করে। কোথায় ওর নাচ দেখে অঞ্জন নাকি এমন মুগ্ধ হয়েছিল যে যেখানেই নাচ হত সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হত। শেষে মন-বোঝাবুঝি করে বিয়ে। অঞ্জনের বাড়ির সম্পূর্ণ অমতে। মঞ্জীর জন্মেছে বুলবুলির বত্রিশ বছর বয়সে। আর তারপর থেকেই ওদের মধ্যে চাপা অশান্তি। বুলবুলি বলে না

কোনওদিন, কিন্তু ওদের দেখে একটা খটকা জাগত মনে, সে কথাও জিগ্যেস করতেন ওদের সেই দুচার মিনিটের ফাঁকে। হ্যাঁরে মানুষ খুন করিস তোরা?

—ও মাসিমা, গরিব লোকেরা যে রোজ খুন হয় তখন তো কোনও খবরের কাগজ খবর লেখে না? যাদের আমরা মারি সবাই জানবেন অনেক অনেক অনেক লোককে মেরেছে। আর তারপর একদিন রাতদুপুরে বাড়িতে ঢুকে পুলিশদের আনন্দ উল্লাস— ধরা পড়েছে সুগত গুপ্ত এতদিনে...

ধড়মড় করে উঠে পড়েন কনকলতা। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। ডাকবেন রঞ্জাকে? খোকাকে? স্বর বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে। টর্চটা জ্বালবার চেষ্টা করেন, আঙুলে জোর নেই। বেডসুইচটা খুঁজতে গিয়ে সাইডটেব্‌ল থেকে জলের ঘটিটা মেঝেতে পড়ে যায়। সুগত পাশের ঘর থেকে প্রায় ছুটে আসে। ডাকে, মা? নিঃশব্দে বুকের ওপর রাখা খোকার মাথায় হাত বোলান কনক। অনেক পুরনো হয়ে যাওয়া জল খোকার দু'হাতের তাপে গলে চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসে।

শরীর যে এত ভেঙে গেছে, এত ক্লান্তি জমেছে ভেতরে, এ যেন আগে বোঝা যায়নি। কেবলই ঘুম পায় কনকলতার। ঘুম আসে না তবু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সেইসব অন্ধকার পাথুরে দিনগুলোয় স্কুল যাওয়া একদিনও বন্ধ করেননি তিনি। ধরা পড়ার প্রায় দশদিন পর যেদিন খোকাকে কোর্টে নিয়ে এল, তাঁকে যেতে দিল না বুলবুলি। দাদার জামাকাপড় কিছু খাবার নিয়ে সে নিজেই গেল। কিন্তু কনকলতা তো না গিয়ে পারেননি। তাঁকে তো দেখতেই হবে কী করেছে তাঁর তিলতিল করে বড় করা খোকাকে!

দেখলেন দূর থেকে। দাঁড়াতে পারছে না উঠে, দুপাশের লোকেরা তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া চোখে সামনের ভিড়ে কী খুঁজছিল, বুলবুলিকে দেখতে পেল। তাঁকে দেখেনি। তিনি আরও দাঁড়াননি। বুলবুলি ফিরবার আগে স্নান করে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। দু'জনে দু'জনকে ফাঁকি দেবার জন্য খাবার নিয়ে বসেছেন। উঠে গেছেন। বুলবুলি তাঁর কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেছে, তিনি কাঁদেননি।

সেই সময় থেকেই বুকের ব্যথা শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে অসুস্থতা বাড়ছিল। জা ভাসুর এসেছিলেন খোকার খবর পেয়ে। তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে ভাসুর চিন্তিত হয়েছিলেন। এই প্রকাশরহিত মানুষটি সর্বদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বিপদের সময়। তখনই একবার এমন মনে হয়েছিল, যখন শশিশেখরের মৃত্যুর পর এই নিঃসন্তান মানুষ দুটি খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তখন দিয়ে দিলে হয়তো এরকম হতো না। কিন্তু কীরকম হত? তাঁর খোকার মতো হত কি? গুছিয়ে কিছুই যেন বোঝা যায় না। কেস কোর্টে উঠলে যেন তাঁকে অবশ্যই খবর দেন কনক, এই বলে ভাসুর ফিরে যান জাকে নিয়ে। তাঁদের পরামর্শেই বুলবুলিরও সায় ছিল,

বিশ্রাম দরকার কনকলতার। বারে বারে সে বলেছিল স্কুল ছেড়ে দিতে। তাকে বোঝান কনকলতার পারিবারিক ডাক্তার, ডাক্তার কোনার। বহুদিন ধরে এই পরিবারে যাওয়াআসা তাঁর, শশিশেখর ছিলেন তখন থেকে। ছেলেমেয়েদের ধাত যেমন বোঝেন তিনি, কনকলতাকেও যে বোঝেন খানিকটা সেটা দেখা গেল যখন বুলবুলিকে জোর দিয়ে বলেন মায়ের স্কুল যাওয়া বন্ধ না করতে। বলেন ওই স্কুল আছে বলে স্থিরভাবে সহ্য করতে পারছেন উনি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কাছাকাছি আছেন। স্কুল না থাকলে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়বেন। প্রতি সপ্তাহে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন ডাক্তার কোনার। সত্যিই সেই সময়টা যেন স্কুল দিয়েই ভরা। বুলবুলির ফাইনাল ইয়ার। গ্রামে বাচ্চারা ততদিনে দিব্যি রপ্ত হয়ে গেছে স্কুলে আসায়। প্রথমবারের যেসব ছাত্রী ছিল তারা ক্লাস ফোর পাশ করেছে অনেকদিন। বেশ ক'জনের বিয়েও হয়ে গেছে। আর স্কুলে ঘর তৈরি হয়েছে। মাটির গাঁথনি দেওয়া ঘর, গ্রামের লোকেরাই গড়েছে নিজেদের হাতে। দু'জোড়া দরজার আর দু'জোড়া জানলার পাল্লা পাওয়া গিয়েছিল অনেকবার ডি. আই আর পঞ্চায়েত অফিস করে। হরেনবাবুই করেছিলেন ছুটোছুটি। হেডমাস্টার হিসাবে মান্য পান তিনি, উল্লেখ করেন আমাদের স্কুল বলে। সত্যিকারের ভাল ছেলে ঐ হৃষিকেশ। ওরও জমি আছে পাশের গ্রামে। প্রথম দিন কথা শুনে পরদিন কনকলতা আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছিল সে। বলেছিল, দিদি, আপনি শিক্ষা দিলেন আমাকে। আমি কোনও দিন ভাবি নাই এমন করে। তিনটে ছেলে আছে আমার, তাদের শিখাই লেখাপড়া করো, বড় হও, লোভ কইরো না। কিন্তু কোনও দিন মনে আসে নাই যে আমি নিজে কতবড় অন্যায়টি করেছি, কীসে ভাল হবে আমার ছেলেরা?

ভারী আন্তরিকতা ছিল ছেলেটির কথার মধ্যে। ক্লাসে পড়াতও খুব ভাল। মারধর করত ছেলেদের প্রথম প্রথম, তারপর সেটা ছাড়ল। ছড়ি এনে রাখত, মারব বলত, কিন্তু ওই মুখে প্রচণ্ড ধমকাধমকি পর্যন্তই। একদিন বারবার বলে দেওয়া পড়া বলতে না পারায় একটা ছেলেকে চড় মেরেছিলেন কনকলতা। পড়ে গিয়েছিল ছেলেটা, বসিয়ে দিতে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে। অন্য বাচ্চারা বলেছিল— খায়নি ও। সেই একদিন, আর কখনও হাত তোলার কথা চিন্তা করেননি। অভাবের সঙ্গে আরও কতরকম যে সমস্যা এদের। বাসের সময়মতো এসে স্কুল শুরুর প্রায় আধঘন্টা আগে পৌঁছতেন কনকলতা, হেঁটে আসতে আসতে দেখা যেত দূরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট পাহাড়। এদের ভাষায় বলে ডুংরি। শীতলপুরের ডুংরি ওটা। কেন একদিন মনে হয় যেন ওটাও মাঠের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে তিনি আসবেন বলে। আধঘন্টা আগে পৌঁছে তিনি বসতেন স্কুলবাড়ির দাওয়ায় আর তখন তাঁর কাছে এসে বসত গ্রামের বউরা। কখনও বুড়িরাও।

হাজার সমস্যা তাদের। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা নেশা। গ্রামের মধ্যে ভাটিখানা নেই কিন্তু পাশের গ্রামেই আছে। বাস রাস্তার উপরে। সারাদিন রিকশা টেনে হোক, জন খেটে কি চাল ছাওয়ার কাজ করে যা পয়সা উপার্জন করে প্রায় প্রতিটি পরিবারের পুরুষরাই সেটা খরচ করে আসে এই দেশি মদের দোকানে। গ্রামের মধ্যেও দু'চার জন হাঁড়ি করে এনে বিক্রি করে। বউদের মারধর করা নিত্যদিনের ব্যাপার। কনকলতা দেখে অবাক হতেন মার-খাওয়া নিয়ে বউদের নালিশ অপেক্ষাকৃত কম, যেন ওটাকে বিবাহিত জীবনের একটা অংশ বলে ওরা ধরেই নিয়েছে। নেশা নিয়ে নালিশের প্রধান কারণ খালি হাতে বাড়ি ফেরা। বাচ্চাদের খাবার জোটানোর পুরো দায়িত্বটাই মায়ের, কিন্তু সত্যিই তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় দিনে চারটে কি পাঁচটা পেট রোজ ভরাট করার।

চোখের প্রতিটি চাউনি প্রতিটি বাঁক চেনেন। তিনি বুঝতে পারেন সুখে নেই বুলবুলি। তিনি নিজের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন দু'একবার কিন্তু মেয়ে সে কথা মানতে রাজি নয়। সে কেবল বলবে, ও তো আমার নাচ দেখেই বিয়ে করেছিল। তাহলে সেই নাচ আবার ছাড়তে বলছে কেন? আমি তো বিয়ের আগেই বলেছিলাম নাচ ছাড়ব না। কিন্তু মঞ্জীর সে এখনও খুবই ছোট। বাবা-মার জেদা-জেদিতে তার আর কোনও ভাগ নেই। একা পড়ে থাকা, আয়ার কাছে থাকা ছাড়া। বুলবুলির কথা হল, আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন তো অঞ্জনকে মেয়েকে দেখতে হয়না, বছরে দুবার কি তিনবার আমি বাইরে গেলে ও মেয়েকে সময় দেবে না কেন? ও যদি অফিসের ট্যুরে যেত আমি কি মঞ্জীরকে দেখতাম না?

এসব কথার উত্তর কনকলতা জানেন না। তিনি কেবল চুপ করে থাকেন আর কষ্ট পান। কত যত্নে, কত কষ্টে বড় করেছেন ছেলেমেয়েদের, তারা কেন বড় হয়ে এতরকম কষ্ট পায়? তাঁর নিজের ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে। তবে কি এটাই নিয়ম যে চিরকাল সব বাবা-মা চাইবে তাদের সন্তান যেন জীবনে কোনও কষ্ট না পায়, অথচ প্রতিটি মানুষই বড় হয়ে উঠে তাদের নিজেদের জীবনে দুঃখকষ্ট পাবে? তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না বাবার, মায়ের? ভালবাসা, নিজেকে উজাড় করে দেওয়া ভালবাসা কি তাহলে কোনও কাজেই লাগে না?

কত যে খুঁটিনাটি কাজ থাকে সংসারে! সবই তাড়াহুড়ো করে করবার নয়, সময় নিয়ে খাঁটিয়ে করবার কাজ। বহুদিন ধরে বাকি পড়ে থাকা সব কাজ। তাকের বইগুলো নামিয়ে বাছবেন ভাবছেন কদিন ধরেই। সাজানো সারির মাঝে মাঝে ফাঁক। কে নিয়েছে, ফেরত দিয়েছে কিনা জানেন না তিনি। একটু একটু রাগ হয়।

সারাজীবনে কোন শখকে প্রশ্রয় দেননি কখনও। পোশাক পরিচ্ছদের চাকচিক্য অলঙ্কার এ সবের কথা তো চিন্তাই করেননি। খোকা-বুলবুলিকেও দামী পোশাক প্রায় কখনও পরাননি। শুধুমাত্র নিজে পছন্দ করতেন না বলে এমন নয়। ওরা যেন বুঝতে শেখে, কোন দেশের ওরা ছেলেমেয়ে। একই কারণে যখন ওরা বেশ ছোট ছিল, অনেক সময় শীতের দিনে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন স্কুলে। দুই ভাইবোনে খুব ভালবাসত সেই যাওয়াটা। একে মায়ের সঙ্গে যাওয়া মায়ের স্কুলে, যে স্কুলে মা সারাদিন থাকে, তা ছাড়া শীতের হালকা রোদ ওঠা সকাল থেকে দুপুর অবধি খোলা মাঠ, তীব্র শীতে নাক লাল করে দেওয়া হাওয়া, ছোলা, মুগ, মটরের ক্ষেত, একগুচ্ছ সমবয়সী বাচ্চা— দুজনে একেবারে মেতে উঠত। ওদের ছোট হওয়া জামাপ্যান্ট কনকলতা তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে আসতেন। সেটা প্রায়ই স্কুলের আর ঘরের দূরে থাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একরকম সেতু হত। দু-একবার দেখেছেন জামা বা প্যান্ট কোনওভাবে ছিঁড়ে ফেললে দু'ভাইবোনই খুব অপরাধী হত, মা এই জামাটা যাকে দেবে, ছেঁড়া বলে তার কত দুঃখ হবে না?

বেড়াতে যাননি তেমনভাবে কখনও। শশিশেখর থাকতে ছেলেমেয়েরা বড় ছোট ছিল আর যখন ছেলেমেয়ে বড় হল, শশিশেখর রইলেন না। শখ বলতে সঙ্গী এই বইগুলো। অতি সংযমে মাস চালিয়ে প্রতি মাসে একটা, ক্বচিৎ কখনও দুটো বই নিয়মিত কিনে এনেছেন। তাও হয়ত নিয়মিত কেনা হত না বলাই ছাড়া। এ শহরে যখন প্রথম এসেছিলেন, সেই পুরনো পাড়ার প্রতিবেশী ছিল বলাইরা। স্টেশনারী দোকান ছিল বলাইয়ের বাবার। তিনি স্কুল যাওয়া আসার পথে প্রায়ই দেখতেন ছোট ছেলেটি বাবার পাশে চেয়ারে বসে আছে দোকানের মধ্যে। তাঁর কেমন অস্বস্তি হত। ভাবতে ভাবতে শেষে একদিন জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, স্কুলে যায় না ছেলে?

এক মহিলার মুখের প্রশ্ন বলেই বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন ভদ্রলোক, না মানে— ফোর পর্যন্ত পড়েছে— তারপর আর কি— এই মানে দোকানেই নিয়ে আসি, বুঝলেন, কাজকর্ম দেখুক শিখুক— একদিন তো ওকেই বসতে হবে এখানে। তবু একটা ছোট ছেলে দিনরাত ওই একটা দোকানের মধ্যে বসে বুড়োদের মতো হিসেব কষবে এটা ঠিক সহজভাবে নিতে পারেননি।

আবার কথা বলেছিলেন বলাইয়ের বাবার সঙ্গে। ব্যাপারটা এই দিক দিয়ে ভেবে দেখেননি মানুষটি। সত্যি ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন স্কুলে। সেই ছোট বলাই মাঝে মাঝে আসত। সুগতর সঙ্গে খেলত, সুগতর ছবি আঁকার খাতা ছবির বই দেখত মাঝে মাঝে। কখনও বা তাক থেকে লাইফ

টাইমস লাইব্রেরির বড় বড় বইগুলো নামাত সুগত ছবি দেখার জন্য। বলাই ভয় পেত— এই, বই নামাচ্ছ? তোমার মা বকবে না?

বই দেখলে তো মা বকে না।

যদি নষ্ট হয়ে যায়?

নষ্ট হবে কেন? যত্ন করে দেখতে হবে। আর সেই সময়েই নিজের গুরুত্ব আর গাম্ভীর্য জাহির করত খোকা। যখন আমি বড় হব, এই সব ইংরেজি লেখা নিজেই পড়ব। সারাদিন ধরে পড়ব।

স্কুলে পড়তে পাওয়া আর সুগতর সেই ছোটবেলাকার বন্ধুত্ব মিলিয়ে কী মনে হয়েছিল বলাইয়ের, যখন খোকা ছিল না সেই সময়ে অনেকে আসা বন্ধ করলেও বলাই সে সময় প্রায় নিয়মিত আসত। হয়তো বিশেষ কিছুই বলত না, চুপ করে বসে থাকত, খুব সাধারণ সুবিধা-অসুবিধার খবর নিত, এইটুকুই। বাবার ইচ্ছেমতো দোকানও করেছে বলাই। দোকানের কাউন্টার আরও বাড়িয়ে স্টেশনারির সঙ্গে একদিকে কিছু বইপত্রও রাখছে। প্রত্যেক মাসে ওই একদুটো বই এনে দেয় কনকলতাকে। নিজের দোকানে বলাই রাখে প্রধানত স্কুল কলেজের বই কিন্তু কনকলতার জন্য কলকাতারই বড় প্রকাশনাগুলোর ক্যাটালগ নিয়ে আসে। জীবনের অনেক একাকিত্ব, অনেক অসহ্য দুঃখে তাঁর সঙ্গী হয়ে থেকেছে বইগুলো। শেল্‌ফের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা দেখে একটু বিরক্ত হল তাই।

কলিংবেল বাজল। দরজা খুলে দেন কনকলতা। ডাকপিওন। রঞ্জার চিঠি। ঠিকানার হাতের লেখা দেখে মনে হয় ওর বড় বউদি। 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পাঠিয়েছে তাদের নতুন ডিকশনারির চক্‌চকে বিজ্ঞাপন। চিঠি। তাঁর নামের খাম। বুলবুলির, কদিন ধরেই মন অশান্ত মেয়েটার জন্য। আজই একটু আগে বার করেছেন গতবছরের বেঁচে যাওয়া কিছু উল। যখন এসেছিল বলে গিয়েছিল, মা, আমাকে এবছর একটা হাতকাটা স্কিউই বুনে দিও তো। বাইরে কোথাও গেলে খুব শীত করে। আসলে শীত করাটা ছুতো। ওরকম করে মায়ের কাছে আবদার করা। হায়দ্রাবাদ থেকে লিখেছে— মাগো, আসবার আগে তাড়াতাড়িতে তোমাকে গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারিনি। এবারের ট্যুর ভাল হয়েছে, যেখানেই আমরা প্রোগ্রাম করেছি, সবাই খুব খুশি। কাল এখানে একটা খুব বড় প্রোগ্রাম আছে, তারপর ফেরা। মা, কালকেরটা হয়তো অনেকদিনের জন্য আমার শেষ পারফরমেনস, হয়তো শেষবারও হতে পারে। আশীর্বাদ কোরো কাল যেন আমি এমন পারফরমেনস করি যে লোকে অনেকদিন মনে রাখে।

এবারে আসবার আগে অঞ্জনের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। ও আমার সব কথা মেনে নিয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলেছে, আমি কলকাতায় পারফরমেনস

করলে ওর কোনও আপত্তি নেই কিন্তু বাইরে গেলে আপত্তি। সেই আপত্তিটা কেন জানো? বাবলিকে ও রাখতে পারে কিন্তু এর বন্ধুবান্ধবরা এবং ওর আত্মীয়স্বজনরা (বুঝতে পারলাম 'বন্ধুবান্ধব'টা কথার কথা) নাকি ওকে নানারকম বিদ্রূপ করে। যখন আমি থাকি না তখন ফোন করে সমবেদনা জানায় বেবি সিটিং করতে হচ্ছে বলে. কবে কোন বিয়ে না বউভাতে অনেক লোকজনের মধ্যে ওর বোন নাকি ওকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করেছিল--- 'দাদা তুই মেয়ের ন্যাপি পাল্টাতে পারিস? চিন্তা করো। ওরা সবাই জানে চার বছরের মেয়ের ন্যাপি পালটানোর কথা ওঠে না। কিন্তু অঞ্জন বলছে. এসবে ও ভীষণ হিউমিলিয়েটেড ফিল করে! আচ্ছা মা, মায়েরা তো বাচ্চাদের কেয়ার নিতে কোনওদিনই হিউমিলিয়েটেড ফিল করে না! আর যদিও বা করে, মনে আছে মা, আমাদের টিমের অদিতি ওর নতুন ছেলের পটিতে হাত দিতে ঘেন্না পেত বলে সবাই ওকে ন্যাকা অসভ্য কত কী বলেছিল? কিন্তু অঞ্জন যদি অন্যান্যবারের মতো রাগ করত, মেজাজ দেখাত, আমিও অন্যান্যবারের মতোই গ্রাহ্য না করে চলে যেতাম, এবারে ও তা করেনি। খানিকটা ছোট ছেলের মতো, খানিকটা হেল্‌পলেসের মতো নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েছে। বলেছে ও জানে এটা আমার প্রতি অন্যায় করা, কিন্তু সব থেকে নাকি ওর মধ্যে কেমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরী হচ্ছে। ও মনে কোনও জোর পাচ্ছে না, অফিসে ঠিকমতো মন দিতে পারছে না। রাত্রে ঘুমোতে পারে না। একজন লোক সারেণ্ডার করবার পর আর কী করা যায় বলো? তাছাড়া ওকে তো আমি ভালবাসি। প্রচণ্ড ভালবাসি। সুতরাং এই আমার শেষবার বাইরে আসা। আর জান তো মা. এই লাইনেও দারুণ কম্পিটিশন। যখনই আমার একটা শর্ত হয়ে যাবে. আস্তে আস্তে আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। খুব কষ্ট হচ্ছে মা, তবু তাই করছি যা বেশির ভাগ মেয়ে করে। বুঝতে পারছি কেমন করে আমরা নিজেদের কাছে হেরে যাই। অঞ্জন খুব খুশি। যেদিন ফিরব ও বাবলিকে নিয়ে আমাকে নিতে আসবে এয়ারপোর্টে। এই প্রথমবার, জানো মা!

তাড়াতাড়ি করে একবার তোমার কাছে যাব। বুবুনকে আদর দিও। দাদাকে রঞ্জাকে ভালবাসা দিও মা। রঞ্জাকে বলো না—সেতার বাজানোটা আবার শুরু করতে।

তোমার বুলবুলি।

সারাটা দিন মনের মধ্যে ভারী হয়ে রইল বুলবুলির চিঠিটা। কী বলবেন তিনি? তিনি নিজেও যে বুঝতে পারেন না কোনটা ঠিক। তাহলে তাঁর শাশুড়ির আমলই কি ভাল ছিল? লেখাপড়া শেখা দূরস্থান, ভাল করে জ্ঞানও ফুটত না, আটবছর পার করামাত্র বিয়ে দিয়ে দেওয়া। তাদের যাই হোক. এত মনে কষ্ট তো পেতে হত না!

স্কুলে একবার 'নীল রং' দিয়ে পাঁচটা করে বাক্য লিখে দেখাতে বলেছিলেন ক্লাস ফোরকে। যামিনী তাঁতি লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। সে মেয়ে খাতায় লিখেছিল— 'আকাশের রং নীল। লাল রং নীল রং শাড়ি হয়। আমি শাড়ি পরি না, শাড়ি পরলে বিয়ে হয়। বিয়ে হলে খুব দুক্খ'।

রঞ্জার মা চিঠি লিখেছিলেন। যদি রঞ্জা ছেলেকে নিয়ে এবারে পুজোর সময়ে—

তিনি জানেন রঞ্জা আর খোকা এবার পুজোয় বেড়াতে যাবে ঠিক করে রেখেছে। তিনি বারে বারে বলেছেন তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না একা থাকতে। তবু তারা অপেক্ষা করছে বুলবুলি ফিরলে খবর নেবে পুজোর কদিন বুলি এসে মায়ের কাছে থাকবে কিনা। খোকা আজ অফিস থেকে ফিরল একটু আগে। ক্লান্তিতে মুখখানা কালি। বললেন, বুলবুলির চিঠি এসেছে। কনকলতা আর রঞ্জা চা নিয়ে বসেছিলেন, খোকা চা খায় না। বলে দিল, এখন কিছু খাবে না, অফিসে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা খাওয়া হয়েছে। তারপর হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কই মা বুলবুলির চিঠি? সাধারণত তিনি নিজেই দেন, খোকা নিজে থেকে চায় না। এই মুহূর্তে একটা দ্বিধা হল, দেবেন? তারপর মনে হল, থাক জীবনে সব সুখদুঃখই তো ভাগ করে নিয়েছে দু'ভাইবোন। চিঠি পড়ে চুপ করে বাইরের ঘরের চৌকিতে গিয়ে শুল খোকা। মিনিট পনেরো পর হঠাৎ উঠে এসে কনকলতার কাছে বসল, চোখ দুটো লালচে। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল, মা, আমাকে আজকে আপিসের কাজে কলকাতা যেতে হবে, তুমিও চলো।

কনকলতা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন— ওরা নিজেরা একটা ঠিক করেছে, ওদের একটু থিতিয়ে নিতে দে, এক্ষুণি তার মধ্যে গিয়ে পড়াটা ঠিক নয়।

—তার মধ্যে গিয়ে পড়ছি না, চলো আজ রাত্রের ট্রেনেই যাব, কাল রাত্রের ট্রেনে ফিরব। রঞ্জা, মায়ের একটা-দুটো কাপড় গুছিয়ে দাও।

এত তাড়াতাড়ি এরকমভাবে যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু খোকা হঠাৎ জেদ করল। একটা কারণেই এলেন কনক, খোকাকে যখন আসতেই হবে, তিনি না এলেও হয়তো ও যেত বুলবুলির বাড়ি। হয়তো কেন নিশ্চয়ই যেত, সেক্ষেত্রে যদি ও কোনও চড়া কথা বলে ফেলত অঞ্জনকে! খোকা তেমন নয়, সারাজীবনে কখনও রাগতে দেখেননি, সবই সত্যি। কিন্তু বোন যে ওর কাছে বড্ড বেশি! তিনি থাকলে অন্তত সেরকম কিছু হবে না। আসবার সময়ে রঞ্জা বলল, মা বাবলিকে বরং নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

সেটা করলে হয়। ওরা দুজনে থাকুক ক'দিন।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে ট্রেনের দোলায়। নীচের বার্থে শুয়েছেন, ওপরেই মিডল বার্থে খোকা। দু'বার তিনবার দেখেছে তিনি জল খাবেন কিনা। জলের বোতল তো আছে কাছেই।

খুব সকালে হাওড়ায় ঢোকে এই ট্রেনটা। ট্যাক্সিতে বসে শ্যামবাজার বলতে শুনে একটু অবাক হন। বুলবুলিরা থাকেন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে।

—আগে সাদার্ন অ্যাভিনিউ যাবি না?

হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গাকে দেখে অভ্যাসে কপালে হাত ছোঁয়ান কনকলতা আর খোকা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে থাকে তাঁকে। হঠাৎ কী রকম ভয় হয় তাঁর— কী রে?

—মাগো, মা কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছে খোকার স্বর। কালকের কাগজে... মা... বুলবুলি অঞ্জন অ্যাক্সিডেন্টে...

কালকের কাগজ! কাগজ তো দেখেন নি কাল, কাগজ আসবার আগেই চিঠিটা এসেছিল।

—খোকা, খোকা, ঠিক করে বল... কী বলবে খোকা? কী শুনবেন?

পরশু দমদম থেকে ফিরবার পথে ভি. আই. পি রোডে সরাসরি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে গাড়ির। অঞ্জন চালাচ্ছিল বুলবুলি পাশে বসেছিল। বুলবুলির সুটকেস দেখে বাসন্তিকা মিত্রের নাম গিয়েছিল কাগজে। কেবল বাবলির কিছু হয়নি। ঝাঁকুনি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

দু'দিন লাগল। হাসপাতাল থেকে ওদের শরীর নিয়ে গিয়েছিল শ্যামবাজার, অঞ্জনদের বাড়ি। গতকাল খোকার অফিসের ফোনে খবর দিয়েছিল ওরা। ঢাকা দিয়ে রেখেছে, বলল খুলে কিছু দেখবার মতো নেই। বুলবুলি নিয়ে যায় নি খোকাকে দেখতে। খোকা নিয়ে এসেছে বুলবুলিকে দেখতে। নেই।

তাই রঞ্জনা বলে দিল বাবলিকে নিয়ে যাবার কথা?

বাবলিকে কাছে পেয়ে সবচেয়ে খুশি বুবুন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ বোন। খেলা, হাসি। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে ঘুম ভেঙে চুপ করে কনকলতার দিকে চেয়ে থাকে মেয়ে। সন্ধ্যাবেলা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে শুধোয়, আমার মা কই, আম্মা?

কনকলতা রাত্রির আকাশের তারা চেনান তাকে। সকালে ঘুম ভেঙে তাকালে দেখতে শেখান গাছের নতুন পাতা, কোলের কাছে বসিয়ে ছড়া শেখান। —বলো দিদি, আলো হয়, গেল ভয়।

বয়সের তুলনায় একটু আধো-আধো উচ্চারণ বাবলির— আলো অয় গেল বয়।

মাধবীলতা

চিত্রা লাহিড়ী

সদ্য ঘুম ভাঙা শিথিল শরীরে রিয়া বারান্দার গ্রিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আশ্বিনের শেষের পড়ন্ত বেলার আকাশটার দিকে তাকালো রিয়া। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছোট বেলার দিন। খানিক পরে ঝপ করে সন্ধে নেমে আসবে। সবুজ গ্রিলে মাথা চেপে রিয়া চোখ নামিয়ে আনল সামনের না জলা না জঙ্গল জমিটার দিকে। জমিটা আগে একটা পুকুর ছিলো। রাবিশ ফেলে পুকুরটাকে বোজানো হলেও দীর্ঘদিন জমিটা এ ভাবেই পড়ে আছে। বেশ বড় জমি। কোন প্রমোটার হয়ত ভেবেছিল ওখানে মাল্টি-স্টোরিড বানাবে। শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। সবাই জানে ডিস্‌পিউটেড্। আশঙ্কা হয় একদিন জঙ্গুলে জমিটা কংক্রিটের জঙ্গলে বদলে যাবে হয়ত। রিয়া অন্যমনস্ক হলো। জমিটাতে বেশ খানিকটা জল দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার পরেও এই শরতে প্রায় রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। আজও তো সকালে ঝপঝপ করে খানিক বৃষ্টি হয়ে গেলো। তড়িঘড়ি বোজানোর ফলে জমিটা বেশ নিচু। সারাবছর আগাছার জঙ্গলে ভরে থাকে যে জমি, বর্ষায় সেটাই বেশ গাঢ় জঙ্গল হয়ে ওঠে। ঘাসগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দু-চার হাত। মান, কচু, ফণিমনসা আরো কত কী নাম না জানা গাছে ভরে আছে জমিটা। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নোংরা কালো জল দেখা যাচ্ছে। জমিটাকে ঘিরে আছে আরো নানা রকমের বড় বড় গাছ। গুলঞ্চগাছটায় এখন ফুল কম। জারুল গাছটারও প্রায় একই দশা। সাদা কাঞ্চন ফুলের গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে বেশ মাথা চাড়িয়েছে। দু-চারটে পেঁপে গাছও আছে। পাখিরা মুখে করে কখনো বীজ নিয়ে এসে ফেলেছিল হয়ত। সারাদিনই জমিটাতে পাখিদের ওড়াউড়ি করতে দেখা যায়। ওদের বাহাদুরি দেখতেই অবরে সবরে চলে আসে রিয়া এই বারান্দায়।

ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চোখ সরালো রিয়া। একটা একলা পাখিকে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে রিয়া উদাস হলো। পাখিরা নাচানাচি করলে রিয়ার শরীরের বিন্যাস বদলে যায়। সে হাত বাড়িয়ে তখন নিমগাছটার ডাল ধরতে চেষ্টা করে। নিমগাছটার পাশে ঐ সজনে ডাঁটার গাছটায় বড্ড শুঁয়োপোকা। মাঝে ওগুলো দেয়াল বেয়ে ঢুকে পড়ে একেবারে ঘরের মধ্যে। শুঁয়োপোকাতে রিয়ার দারুণ ভয়। শুধু শুঁয়োপোকা! টিকটিকি, গিরগিটি, আরশোলা, ব্যাঙ, কেন্নো সব পোকামাকড়েই ভয় রিয়ার। এমন কি ভুতের ভয়ে সে সন্ধে থেকে আড়ষ্ট। কিন্তু প্রজাপতি উড়ে এসে গায়ে বসলে আজও রিয়া কেমন যেন বদলে যায়। একটা মধুর সুখ অনুভব করে। একটু রোমাঞ্চও। বিয়ের সময় বাবা মায়ের কাছে রিয়ার একমাত্র দাবি ছিল ওর বিয়ের কার্ডে যেন একটা মস্ত প্রজাপতি আঁকা থাকে। কথাটা অবশ্য রিয়া সরাসরি বাবামাকে বলতে লজ্জা পেয়েছিল। দাদা বৌদিকে জানিয়ে দিল নিজের ইচ্ছেটা। প্রমিত আর মল্লিকা বাবা মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে সত্যিই এক অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতি আঁকা রিয়ার বিয়ের কার্ড ছেপেছিলো অনেকগুলো বাড়তি টাকা খরচ করে। ভাবলে রিয়া এখনো লজ্জা বোধ করে।

রিক্সার ঘন্টির আওয়াজে রিয়ার অন্যমনস্কতা ভেঙে গেলো। মনে পড়লো আজকে নিচের তলার মাধবীদির কাশী চলে যাওয়ার কথা। একবার নিচে গিয়ে মাধবীদির সঙ্গে দেখা করার কথাও ভাবল রিয়া। সকালে অবশ্য উনি নিজেই এসেছিলেন দেখা করতে। কাশী ফিরে যাওয়ার বেদনায় মাধবীদি খুব কাতর ছিলেন মনে হলো। রিয়াকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। নিচে মাধবীদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে চলে গেল রিয়ার। জয়াদি রঞ্জনদার মুখোমুখি হতে চাইল না সে। ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এসে বারান্দার বাঁ পাশে বসে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল রিক্সাটাকে। চলে যাওয়ার আগে মাধবীদিকে আর একবার দেখার ইচ্ছে। রিয়া মনে মনে চাইছিল রিক্সাটা শূন্য ফিরে যাক। কোন অজানা কারণে যেন মাধবীদিকে কাশী ফিরে যেতে না হয়। মাধবীদির জন্য বড্ড মন খারাপ করছিল রিয়ার। অথচ প্রথমদিন মাধবীদিকে দেখে বেশ অবাক হয়েছিল রিয়া। সেদিন স্নান সেরে দুপুর দুপুর এই বারান্দায় এসেছিল রিয়া রোদ্দুরে চুলটা একটু শুকিয়ে নেবে বলে। হঠাৎ পায়ের আওয়াজের শব্দে সে বারান্দার ডান দিকে গ্রিলের দরজার ওপাশে একজন দীর্ঘ প্রৌঢ় পুরুষকে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার ছাদে উঠে যেতে দেখলো। পায়ের শব্দটা বেশ জোরালো ছিল। সাদা সিল্কের কাপড়টা লুঙ্গির মতো বেড় দিয়ে পরা। গায়ে সাদা সিল্কের উত্তরীয়। উত্তরীয়র

নিচে জামাটা দেখা যাচ্ছিল না। উত্তরীয়টা চাদরের মতো গায়ে জড়ানো ছিল। চুলগুলো পুরুষদের মত ছোট করে কাটা, নাক থেকে কপাল পর্যন্ত দীর্ঘ রসকলি আঁকা মুখে পুরুষের কাঠিন্য। হাত দুটিতেও তিলক আঁকা। অনেকগুলো ভিজে জামাকাপড় নিয়ে উনি ছাদে উঠে গেলেন। বিস্ময় কাটতে সময় লাগলো রিয়ার। ভাবল ভদ্রলোকটি নিচের ভাড়াটে বাড়ির কেউ হবেন হয়ত।

বিকেলে রিয়া ছাদে গিয়েছিল টবের ফুলগাছগুলোতে জল দিতে। নিচের তলার জয়াবৌদি ঐ সময় এলো শুকনো জামাকাপড় তুলে নিয়ে যেতে। রিয়া কৌতুহল না চেপে দুপুরের দেখা ভদ্রলোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে জয়াবৌদিই জানালো উনি জয়াবৌদির স্বামী রঞ্জনের থেকে বয়সে অনেক বড় একমাত্র দিদি মাধবীলতা। বাল্যবিধবা। কাশী থেকে সেদিনই এসেছেন। রিয়া অবাক হলো। উনি একজন মহিলা! আসলে জয়াবৌদি প্রেগন্যান্ট তো। তিনমাস চলেছে। মাধবীলতাকে তাই রঞ্জন গিয়ে নিয়ে এসেছে সংসারের হাল ধরার জন্য। প্রথম মাধবীদিকে দেখার অভিজ্ঞতাও আজ প্রায় আট বছর হয়ে গেলো। তারও বছর দুই আগে সোমেন ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দমদম পার্কে জমি কিনে এই বাড়িটা তৈরী করে রিয়াকে নিয়ে এসেছে।

সন্ধ্যের পরে সোমেন অফিস থেকে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত রিয়া এই বাড়ির দোতলায় বিকেলের পর থেকে একলাই থাকে। সোমেনের অফিস থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। কোম্পানীর হেড্ অফিস দিল্লীতে। হেড অফিস থেকে কোনো না কোনো অফিসার প্রায় কলকাতায় আসেন। ফাইভস্টার হোটেলে অথবা কোন ক্লাবে তাদের নিয়ে সোমেনকে মিটিং করতে হয়। মিটিং মানেই তো আকন্ঠ মদ্যপান আর রাত করে বাড়ি ফেরা। একলা থাকতে রিয়ার দমবন্ধ হয়ে আসে।

রিক্সার হর্ণের আওয়াজে রিয়ার চমক ভাঙলো। মাধবীদিকে নিয়ে রঞ্জনদা রিক্সায় উঠলেন বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। হাওড়া স্টেশন থেকে কাশীগামী দুন এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে রঞ্জন ফিরে আসবে এমনটাই সকালে বলেছিলেন মাধবীদি রিয়াকে।

রিয়াদের এই দোতলা বাড়ির একতলায় রঞ্জন আর জয়া ভাড়া এসেছিল বৃন্দাবন থেকে মাধবীদি আসার প্রায় দুবছর আগে। সোমেন আর রিয়ার দমদম পার্কের বাড়িতে পাশাপাশি বাস করার কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা এসেছিল। তখন ওদের সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে। দুজনেরই একটু বেশী বয়সে বিয়ে এবং দুজনেই একই অফিসে চাকরি করে। যদিও চাকরির ক্ষেত্রে জয়া রঞ্জনের থেকে একটু সিনিয়ার। বিয়েটা অবশ্য দিয়েছিলেন মাধবীলতা নিজে দাঁড়িয়ে

থেকে এবং বিয়ের দু-মাসের মাথায় মাধবীলতা কাশীতে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিলেন। নিজের জায়গা বলতে কেদারনাথ ঘাটের কাছে একটি মন্দির লাগোয়া ছোট একটি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে একটুখানি জায়গা। সে বারেই মাধবীলতা কাশী ফিরে যাওয়ার পরে পরেই রঞ্জনরা রিয়াদের এই বাড়িতে ভাড়া আসে। তার আগে ওরা হুগলির চন্দননগরের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত। ট্রেনে যাওয়া আসা করে অফিস করার অনেক অসুবিধা। তাই রিয়াদের এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসা। চন্দননগরের বাড়িটা অবশ্য এখন আর নেই। ওটা বিক্রি হয়ে গেছে আগেই বাবা মারা যেতে।

এ সব কথা অবশ্য রিয়া শুনেছে জয়ার কাছ থেকে। মাঝে মাঝে জয়া অফিস থেকে ফিরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে রিয়ার কাছে চলে আসে। রিয়ারও ভালো লাগে। জয়ার কাছেই রিয়া প্রথম মাধবীলতার কথা শুনেছিল। হুগলি চন্দননগরের এক সময়ের দুঁদে উকিল অভয়পদ মুখার্জি ও তাঁর স্ত্রী অমিয়লতা দেবীর দুই সন্তানের বড় মেয়ে মাধবীলতা আর ছোট ছেলে রঞ্জন। পনেরো বছর বয়সে অভয়পদ মাধবীলতার বিয়ে দেয় বর্ধমানের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। জমি জিরেত বাগান পুকুর পাকাবাড়ি সব মিলিয়ে এক স্বচ্ছল পরিবার। মাধবীলতার স্বামী প্রশান্ত বর্ধমান শহরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াতেন। হঠাৎ কী যে হল মাত্র দু-দিনের জ্বরে প্রশান্ত মারা গেলেন। বছর না ঘুরতেই মাত্র ষোলো বছর বয়সে বিধবা মাধবীলতা বাপের বাড়ি চন্দননগরে ফিরে এলো। শ্বশুর বাড়িতেই মাধবীলতা থাকতে চেয়েছিলো। কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি রাখেন নি। কারণ অবশ্য একটা ছিলো। প্রশান্তর আরো দুটো ভাই ছিল। তাদের একজন কোর্টে চাকরি করত আর একজন কলেজে পড়ত। মাধবীলতার মতো অমন সুন্দরী সোমত্থ বিধবাকে সাহস করে তাঁরা বাড়িতে রাখতে চান নি। মেয়েকে বিধবা হয়ে ফিরে আসতে দেখে অভয়পদর মন ভেঙে পড়ল। তাঁর শরীরও আসতে আসতে ভেঙে গেলো। ছেলে রঞ্জন তখন মাত্র চার বছরের। অভয়পদ চলে গেলেন। মাধবীলতার মা অমিয়লতা দেবী পড়লেন অগাধ জলে। শোক সামলে উঠে তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হলো। অভয়পদ প্রায় কিছুই রেখে যান নি। তিনি রোজগারও করেছিলেন যেমন খরচও করে গেছেন তেমনি। অতএব বাড়ি বিক্রি করে অমিয়লতা দেবী চন্দননগরেই একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিলেন। বাড়ি বিক্রির টাকা পোস্ট-অফিসে রেখে তার সুদেই চালিয়ে নিচ্ছিলেন কোন ভাবে। অভাবের সংসারে মাধবীলতা হয়ে উঠলেন বাড়তি ভার। অমিয়লতা প্রায় উঠতে বসতে অপমান করতেন মাধবীলতাকে। মাঝে মাঝে দড়ি কলসি নিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতে কিংবা গাছে ঝুলে পড়তেও বলতেন। আসলে ঐ

সামান্য সুদে বাড়ি ভাড়া দিয়ে রঞ্জনকে স্কুলে পড়িয়ে আর সংসার টানতে পারছিলেন না তিনি।

মাধবীলতার মেজোমামা সুশীল ব্যানার্জী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। মাধবীলতার বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন তিনি। সেদিন সকালে মাধবীলতাদের বাড়ি এসেছিলেন সুশীলবাবু। তাঁকে দেখতে পেয়ে মাধবীলতা খুব কান্নাকাটি করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি তাঁর অপারগতার কথা জানান। কারণ মেজোমামির পক্ষে এমন একটি বাড়তি ভার মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কোন উপায় না দেখে মেজোমামা একদিন মাধবীলতাকে ছেড়ে আসেন কাশীর কেদারনাথ ঘাটের কাছে ঐ মন্দিরে। মেজোমামির এক বিধবা মাসি তখন ঐ মন্দিরে থাকতেন। তাঁরই সূত্র ধরে মাধবীলতার এই মন্দিরে আসা। কাশীতে মাধবীলতার এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। মন্দির পরিষ্কারের কাজ করে তার দুবেলা দু'মুঠো খাবারও জুটে যেতে থাকল। মন্দিরের বিগ্রহ কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সঁপে বিভোর হল মাধবীলতা।

' মাধবীলতার ছোট ভাই রঞ্জন এখন স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়াশোনা করছে। কলেজের প্রথম বছরেই রঞ্জনের মা মারা গেলেন। রঞ্জন একেবারে একা। সংসার সামলাবে কে? সংসারের প্রয়োজনে রঞ্জন ছুটে গেলো কাশীতে দিদি মাধবীলতার কাছে। মাধবীলতাকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর মাধবীলতা ফিরে এলেন চন্দননগরে রঞ্জনের বাড়িতে। সামান্য টাকায় রঞ্জনের পড়াশোনা আর সংসার চালিয়ে নিতে থাকলেন মাধবীলতা। একমাত্র কাজের লোক রমাকে ছাড়িয়ে দিয়ে তিনি সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

এ সব কথা অবশ্য জয়া বিয়াকে বলে নি। মাধবীলতার কাছে শুনেছিলো রিয়া। মাধবীলতা দোতলায় রিয়াদের ঘরে খুব একটা আসতেন না। একদিন সোমেনের একটা গেঞ্জি বাতাসে উড়ে গিয়ে নিচের উঠোনে পড়েছিল। রিয়া গেঞ্জিটা আনতে নিচে গিয়ে দেখেছিল মাধবীলতা একতলার বারান্দার বাঁ দিকের কোণ ঘেঁষে বসে আছেন। বাঁহাতে একটি ছোট আয়না মুখের সামনে ধরে ডান হাত দিয়ে নাকে আর কপালে তিলক কাটছেন। এই কাজটা উনি খুব যত্ন সহকারে করতেন। রিয়াকে দেখতে পেয়ে মাধবীলতা কাছে ডাকলেন। তারপর একটা আসন পেতে রিয়াকে বসতে ইশারা করে বললেন, তোমার সঙ্গে তো সারাদিন দেখাই হয় না। তোমারও নিচে আসা হয় না আর আমারও সময় হয় না। সেদিন রিয়াকে নিজের জীবনের অনেক কথা বলেছিলেন মাধবীলতা।

রঞ্জন এম. কম. পাশ করে কিছুদিন এটা-ওটা করে শেষপর্যন্ত একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকরি পেয়েছিল। রঞ্জনের বউ জয়া ঐ একই অফিসে

চাকরি করত। চাকরি করতে করতেই দুজনে ঠিক করে তারা বিয়ে করবে। মাধবীলতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। জয়াদের বাড়ি উত্তরপাড়ায়। বাবা দয়াল চ্যাটার্জি কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। দুই মেয়ের বড় জয়া। ছোট কৃষ্ণা তখন শ্রীরামপুর কলেজে পড়ছে। রঞ্জনের বিয়ের পাঁচ মাসের মধ্যেই রঞ্জন-জয়ার মনে হলো মাধবীলতা তাদের সংসারে একটা বাড়তি বোঝা। বরং ওনার জায়গায় একটা কাজের লোক রেখে দেওয়া ভালো। সকালে আসবে কাজ করবে, চলে যাবে। চাকরি থেকে ফিরে এসে যা হোক জয়া একটু সামলে নেবে রান্নাঘর। কী দরকার শুধু শুধু মাধবীলতার। অভিভাবক গোছের কাজের লোক বই তো নয়। জয়ার আবার অভিভাবক একদম পছন্দ নয়। প্রাইভেসি তো মোটেই থাকে না। সে স্বামী নিয়ে একলা থাকতে চায় অতএব রঞ্জন আবার পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে মাধবীলতাকে রেখে এলো কাশীর সেই কেদারনাথ ঘাটের কাছে মন্দিরে। ততদিনে মন্দিরে মেজোমাসির সেই মাসি মারা গেছেন।

দমদম পার্কের এই বাড়িতে আসার পাঁচ বছর বাদে জয়া প্রেগন্যান্ট হলো। খুবই অসুবিধায় পড়ল ওরা। জয়া অফিস আর বাচ্চা একসঙ্গে সামলাবে কী করে। আর বাচ্চা বড় করা মুখের কথা। নাওয়ানো খাওয়ানো ডাক্তার দেখানো সে যে অনেক ঝামেলা। অনেক ভেবেচিন্তে জয়ার অনুরোধে আবার দুদিনের ছুটি নিয়ে রঞ্জন গেলো কাশী থেকে মাধবীলতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। আট বছর আগে সেই প্রথম মাধবীলতাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল রিয়া।

জয়ার একটি মেয়ে জন্মালো চৈতালী। চৈতালীকে নিয়ে মাধবীলতার সময় কাটতে লাগল। রিয়ার সঙ্গে তখন মাধবীদির বেশ ভাব হয়ে গেছে। মাধবীদির হাতের রান্না খুব ভালো ছিল। অনেকটা রিয়ার মায়ের মতো। মাধবীদি মাঝে মাঝে এটা সেটা রান্না করে রিয়াকে দিয়ে যেতেন। রিয়া খুব লজ্জা পেতো। রিয়ারও ইচ্ছে করত কিছু রান্না করে মাধবীদিকে খাওয়াতে। কিন্তু মাধবীদি একে বাল্যবিধবা আর তাছাড়া দীর্ঘদিন কাশীতে রাধামাধব মন্দিরে বাস করায় তিনি অন্যের হাতের রান্না খান না। স্বপাক খান।

চৈতালী জন্মের তিন বছর বাদে জয়ার কোলে রণিত এলো। জয়া অফিস নিয়ে ব্যস্ত। আর মাধবীলতা ব্যস্ত চৈতালী রণিতকে নিয়ে। রিয়ার চোখের সামনে চৈতালী আর রণিত আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে থাকলো মাধবীদির আদরে আর পরিচর্যায়। চৈতালী এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ছে। আর রণিত কেজিতে। একবেলার কাজের মেয়েটা ওদের সকালে স্কুলে দিয়ে আসে আবার দুপুরে নিয়ে আসে। বাচ্চা দুটো তাদের পিসিমাকে পিমা বলে ডাকে। ওরা মাধবীলতার

কাছে নিজের সন্তানের মত। মাধবীলতাও ওদের কাছে মায়ের মতো। বাচ্চা দুটো ধীরে ধীরে তাদের পিমার খুব আপন হয়ে উঠতে থাকলো। জয়া অফিস থেকে ফিরলেও বাচ্চারা তাদের মায়ের কাছে না থেকে পিমার কাছে থাকত। পিমা ছাড়া তাদের চলে না। পিমার কাছেই তাদের যত আহ্লাদ আবদার।

চৈতালী রণিত যত বড় হয়ে উঠতে থাকলো মাধবীলতার প্রয়োজনও তত ফুরিয়ে যেতে থাকল রঞ্জন জয়ার সংসারে। ইতিমধ্যে জয়ার বাবা মারা গিয়েছেন। জয়ার বোন কৃষ্ণার বিয়ে হয়েছে দূরে শিলিগুড়িতে। জয়ার মার একা ভালো লাগে না। তিনি কৃষ্ণার কাছে যাবেন না কারণ উত্তরপাড়া থেকে দূরে থাকতে তার ভালো লাগে না বেশীদিন। তিনি জয়ার কাছে এসে থাকতে চান। জয়ারও খুব ইচ্ছে মা কাছে এসে থাকুক।

রঞ্জনের এবার একটু খারাপ লাগলো মাধবীলতার কাশী ফিরে যেতে বলতে। চৈতালী রণিত যে তাদের পিমাকে ভীষণ ভালোবাসে। মায়ের থেকেও বেশী। আর জয়ার কাছে এটা মাতৃত্বে অপমান। সে এখন জোর করে চৈতালী রণিতের মা হতে চায়। আর তাছাড়া মাধবীলতাকে প্রয়োজনটাই বা কী। এই তো মা এসে থাকবে, বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে। রঞ্জন মাধবীলতাকে কাশী ফিরে যাওয়ার কথা কথা বলল খুব মৃদুভাবে। এই প্রথম মাধবীলতা কাশী ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। কারণ চৈতালী আর রণিতকে নিয়ে তিনি তখন স্নেহ মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছেন। এই মাতৃত্ব তার সারা জীবনের অর্জন। ওদের ছেড়ে তিনি অতদূর কাশীতে থাকবেন কি করে। মাধবীলতা এই বাড়ির একটি ঘর বা বারান্দার একটি কোণ আর দুমুঠো দুটো খাবার ভিক্ষে চাইলেন রঞ্জনের কাছে। বিনিময়ে এই সংসারে কায়িক পরিশ্রমে জীবন দিতেও তিনি রাজি। বাচ্চাদের ছেড়ে তিনি কিছুতেই থাকতে পারবেন না।

মাধবীলতাকে নিয়ে বাঁকের মুখে রিক্সাটাকে ঘুরে যেতে দেখল রিয়া। আবার কোনদিন কি রঞ্জনের সংসারে মাধবীলতার প্রয়োজন হবে? সেদিন তিনি কি ফিরবেন? রিক্সায় ওটার আগে মাধবীলতা দোতলায় রিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। বোধহয় কান্না চাপছিলেন। পাশে রঞ্জন। চৈতালী আর রণিত মনে হয় কিছু বুঝতে পারছিল না। ওরা ওদের পিমার চলে যাওয়া দেখছিল। রিয়ার মনে হল ওরা যদি সংসারটাকে একটু বুঝতো, কেন ওরা আর একটু বড় হলো না। রিয়া অনুভব করলো আকাশ ভেঙে অনেকগুলো বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা বারান্দার গ্রিল ভেদ করে তার চোখের পাতা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

ফুলপিসি, তোমাকে

চন্দ্রা ঘোষ মিত্র

ফুলপিসি যখন আমাদের বাড়িতে এল, সেই প্রথম আমি আমার বাবার তরফে কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হ'লাম। হাতিশালার বাড়িতে দেখেছি অনেক লোক, নিকট সম্পর্কের সূত্র ধরে তাদের ডাকতেও হ'ত। কিন্তু এত কাছ থেকে কখনও দেখিনি। আশ্চর্য লাগলেও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আমার দশ বছরের জীবনে সেখানে গেছিও মাত্র বার কয়েক। একবার ছোটকাকার বিয়ের সময়, একবার ঠাকুমার অসুস্থতার সময়, আর শেষবার ঠাকুমা মারা যাবার পর।

কেন এরকম হ'ল—নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথাও ছিল না আমার। ঐ যে বললাম না, অভ্যেস। তবু কি করে যেন বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরে গিয়েছিলাম আসল কারণটা কি। ঠাকুমা আমার মাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। মা-র অপরাধের মধ্যে প্রথমটা বাবা মাকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন, দ্বিতীয়টা জাতের অমিল, তৃতীয় —মা লেখাপড়া শিখেছে, চতুর্থ —শিখেছে শিখেছে, বিয়ের পর ঘরে বসে স্বামী সেবা কবতে পারত, তা না করে দুপুরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে চাকরি করতে, পঞ্চমত, ষষ্ঠত এরকম আরো কত করতে করতে একেবারে চক্ষুশূল। তবে আমি বোধহয় অতটা চোখের বিষ ছিলাম না। অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়েও ঠাকুমা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন—এ আমার বেশ মনে আছে। ততদিনে মার গ্রহণ ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

এমত অবস্থায় ফুলপিসির আমাদের বাড়িতে থাকতে আসাটা এক দৈব নির্বন্ধন। ঠাকুমা মারা যেতেই হাতিশালার সংসারে ফুলপিসি বোঝা হয়ে গেল। বিয়ে দেওয়ার দায়টাই সবচেয়ে বড় দায়। সেই সময়ই আমাদের বাড়িতে যে কাজের মাসী আমাদের সংসারটাকে এবং আমাকেও আগলে

রেখেছিল সে কাজ ছেড়ে তার দেশের বাড়িতে চলে গেল। এরকম যোগাযোগকে দৈব বলব না তো কি! বাবারও জ্যেষ্ঠপুত্রজনোচিত কর্তব্যবোধ চাগিয়ে উঠল, কলকাতায় নিয়ে এসে সর্বকনিষ্ঠ ননদটির বিয়ের ব্যবস্থা করা খুবই উচিত— মা-রও মনে হল। আর ফুলপিসি? স্রেফ প্রজাপতির মত পাখনা কাঁপাতে কাঁপাতে তার স্বপ্নের ফুলবাগানে এসে হাজির হল।

বাবাকে অসম্ভব সমীহ করে চলত। আমার বাবার মত শান্ত, ভালমানুষ লোকটাকে এত ভয় পাওয়ার কি আছে, কিছুতেই মাথায় আসত না আমার। এক কাপ চা-ও কোনোদিন নিজে হাতে বাবাকে দিতে পারত না। কেবল আমাকে সাধত, যা না ঝিমলি, তোর বাবাকে চা টা দিয়ে আয় না।

আমিও সুযোগ বুঝে দর বাড়াতাম, কি দেবে তাহলে আমায়?

কি চাস বল? আজ দুপুরে তেঁতুল মাখব বেশ করে কিম্বা আমের আচার। দেব'খন তোকে।

বাবাকে বলি পাকা তেঁতুল আনতে? তেল, নুন, লঙ্কা আর একটু গুড় দিয়ে এত চমৎকার মাখ তুমি, ভাবতেই আমার জিভে জল আসছে। বল বাবাকে বলব কি, না?

ও আমার পোড়া কপাল, এতে আবার বাবাকে বলার কি আছে? বাসন মাজার জন্য বৌদি বলে কত পাকা তেঁতুল জমা করে রেখেছে। তার থেকে এক খাবল নিলে কেউ বুঝতে পারবে না।

এমনই ভয় করত বাবাকে। বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকত ও এটা-সেটা কাজের ছুতো করে রান্নাঘর ছেড়ে নড়তই না। অথচ ওরই তো দাদা, আপন মায়ের পেটের ভাই। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ না থাকলে এত দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়?

মায়ের জন্যই কি কম করত? সবসময় তোয়াজে তুষ্ট রাখার চেষ্টাও তো ভয়েরই আর একরকম ভাব। হাতের থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে সেরে রাখত। সাফা ঘরকে আবার সাফাই করত, মাজা বাসন আবার মেজে তার চেকনাই ফেরাত— এমন মানুষকে কি বলা যায়?

তারপর মা, বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে, সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত আমার আর ফুলপিসির রাজত্ব। আর যত রাজ্যের শাসন আমার ওপর। মাথায় তেল দে, পায়ের পাতায় ঝামা ঘষ, ভাল করে গায়ে জল ঢাল, গলা পর্যন্ত ভর্তি করে ভাত খা—আর চারদানা বেশি হ'লে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে এমন করে, খেয়ে উঠে লাফালাফি করবি না, হয় ঘুমো নয়তো ঐ দেখ তোর বিজনমামা এসেছে, যা অঙ্ক করগে যা, একি, পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে আবার একটা ভুল, মাথা খাটাস না কেন, বকুনি খেতে তোর ভাল লাগে?

।। দুই ।।

বিজনমামা মায়ের মামাত ভাই। আমার মামাবাড়ির সমাজে ভাল ছাত্র নামে বিখ্যাত। সে নাকি দুনিয়ায় লেখাপড়া ছাড়া কিচ্ছু জানে না। আমাদের সব ভুতো ভাইবোনদের চোখে একটা করে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে সব দিক ঢেকে দেওয়া হ'ত, শুধু বিজনমামার দিকটা খোলা। আমরা যারা ভাল হ'তে চাই, বিজনমামাতে উঠতাম, বিজনমামাতে বসতাম। এ হেন মামা ছিল মা-র বিশেষ স্নেহের পাত্র। সে বাড়িতে এলে মা কি করবে আর কিনা করবে ভেবে পেত না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা মা অফিস থেকে সবে ফিরেছে, দরজায় ঘন্টা। এ সময়টা মা-র একান্ত বিশ্রামের সময়। তবু আগন্তুককে দেখে মা লাফিয়ে উঠল, ও মা, বিজু এসেছিস? কি খাবি বল?

বিজনমামা একপলক রান্নাঘরের দিকে চোখ চালিয়ে নিয়ে বলল, তোমার কাজের মাসী তো চলে গেছে শুনলাম। এটা আবার কোথ্ থেকে আমদানী?

যাঃ, এরকম করে বলিস না। তোর জামাইবাবুর বোন।

গেঁয়ো ভূত একেবারে।

ভাল কথা বললি তুই। গ্রাম থেকে এলে গেঁয়ো হবে না তো কি সুচিত্রা সেন হবে?

আমার মনে হল মা সবটা ঠিক বলছে না। একটা ছুটির দিন, কানাঘুষোয় কানে এল, আজ ফুলপিসিকে কোন এক পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। দেখতে এলে ঘটা করে সাজতে হয় আমি জানি। সামনের চুলে আলবার্ট কাটা, কপালের মাঝখানে কালো টিপ ম্যাগী হাতা বেগুনী রঙের ব্লাউজ, জল-গোলাপী রঙের শিফন শাড়ির এলান আঁচলের প্রান্ত বাঁ কাঁধে আটকানো, আমার ফুলপিসিকে দেখে মনে হল অনেকটা, অনেকটাই সুচিত্রা সেন।

মা কিন্তু দেখে একেবারে জ্বলে উঠল, এ কি করেছ, মাথার সামনে চূড়ো করে চুল বেঁধেছ কেন? এরকম পাতলা জ্যালজেলে শাড়ি কেউ পরে? ল্যান্সডাউনের লোকদের তোমাকে দেখে পছন্দ হবে?

মা-র আশঙ্কাই ঠিক। তাদের পছন্দ হয় নি। না হোক গে, আমি ঠিক করে রেখেছি বড় হলে ফুলপিসির মত সাজব। ওরকম আঁচলের কোনটা কাঁধের কাছে ধরে রেখে মোড়ার ওপর একপাশে পা বেঁকিয়ে এমনভাবে বসব যেন শাড়ির কুঁচিগুলো সমুদ্রে ঢেউয়ের মত একটার পিঠে পড়ে থাকে আর একটা।

কত শেখান'র চেষ্টা হয় ফুলপিসিকে। শুধু সাজগোজের ধরণই নয়, কথা বলার টানও। 'খাগা যা' কে খেতে যা, 'গ্যিইছিলাম' কে গেছিলাম—এরকম কত কি শুধরে দেওয়া হয়। বাধ্য ছাত্রীর মত সব মেনে নেয় সে। আবার কৈফিয়ৎ দেবার মত করে বলবে, আমি কি অত জানি? তোদের মত শহরে থাকি, না টি ভি দেখি?

তা সত্যি, তখন অত গ্রামে গঞ্জে ঘরে ঘরে টি ভি পৌঁছয়নি। আমাদেরই একটা সাদা-কালো টিভি ছিল, রাত্তির বেলা কয়েক ঘন্টা চলত সেটা। ঠিকই ধরেছে ফুলপিসি। টি ভি-র প্রকোপেই না সারা বাংলা, কি বলি সারা পৃথিবীই এক চালে চলছে?

তরমুজের সরবৎ নিয়ে দরজার কাছ থেকে ফুলপিসি আমাকে ডাকাডাকি করে। লজ্জা পাচ্ছে বুঝতে পেরে মা বলে, এসো না ফুলটি, ঘরে এসো। ও আমার ভাই, বিজু। ওকে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

সরবতের গ্লাস এগিয়ে দিতে গিয়ে বিজনমামার হাতে ফুলপিসির হাত ঠেকে যায়।

নিমেষে গলার স্বর কঠোর করে মা বলে, ফুলটি, তোমাকে কতদিন না বলেছি, কারুকে কিছু দেবার সময় গ্লাসটা ডিসের ওপর রেখে তারপর দেবে।

কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফুলপিসি।

ওসব কায়দা-কানুন অন্য লোকের বেলায়। আমি এ বাড়ির ঘরের লোক, আমার জন্য ওসব না মানলেও চলবে।

যা হোক, বিজনমামাব কথায় ঘরের হাওয়া খানিক সহজ হল। ফুলপিসি হাঁফ ছেড়ে রান্নাঘরে দৌড়ল। আমি মনে মনে বিজুমামাকে ধন্যবাদ জানাতে যাব, শুনলাম সে বলছে, রাতারাতি কেতাদুরস্ত করতে যেও না রাঙাদি, একবার চোখ খুলে গেলেই মুশকিল।

।। তিন ।।

মা, বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলেই কিন্তু ফুলপিসি খুব সহজ, স্বাভাবিক। বিজুমামা প্রায়ই আসে আমাকে অঙ্ক করাতে। কিন্তু অঙ্ক যে কি হয় সে আমিই জানি।

বিজু-দা, কি খাবে? চা, না সরবৎ?

আমি ঘুমোচ্ছিলাম। চোখ খুলে অবাক হয়ে যাই। কি রে বাবা, কখন এসেছে বিজনমামা? আমাকে ডাকেনি কেন ফুলপিসি? আগে তো আমাকেই দরজা খুলে দিতে হত, এত লজ্জা ছিল ফুলপিসির বিজনমামার সামনে বারই হত না।

তুমি বস'তো ফুলটি। ঝিমলি আজ আমাদের চা করে খাওয়াবে।

ঝিমলি? আহা, ও যে বড্ড ছেলেমানুষ। বৌদি রাগ করবে। ব্যস্ত ফুলপিসির হাত টেনে রাখে বিজনমামা, এত জোর করে টেনে ধরে যে ফুলপিসি বিজনমামার বুকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে।

ছাড়, ছাড় বিজুদা। ঝিমলি গ্যাসের উনুনে ঠিকমত পারবে না। ও কোনোদিন করেনি। বৌদি বকবে আমাকে।

ছেড়ে দেওয়ার বদলে আরও সাপটে জড়িয়ে ধরে বিজনমামা। ধরা পড়া পাখির মত ঘাড় উঁচু করে ঠোঁট ফাঁক করে রাখে ফুলপিসি।

আমি রান্নাঘর থেকে চেঁচাই, উঃ মাগো, আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল।

ছটফট করতে করতে নরম গলায় ফুলপিসি বলে, বিজুদা, আমি যাই।

না, ও শিখুক। সব সময় তো তুমি থাকবে না ফুলটি, তখন ও কি করবে? বলতে বলতে বিজনমামার চোখের দৃষ্টি ঘোর হয়ে ওঠে।

আমি কাল্পনিক ফোস্কার ওপর ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বিজনমামাকে দেখি। একটুও ভাল লোক বলে তাকে আর মনে হয় না আমার। কিন্তু সে কথা ফুলপিসি মানলে তো?

মাঝখান থেকে আমাদের টইটম্বুর দুপুরবেলাগুলো একদম মাটি। ফুলপিসি আসাতে আমার পুতুলের সংসারে কত সুরাহা হয়েছিল। সব মেয়ে পুতুলগুলোর বিয়ে দিতে পেরেছিলাম। রঙ-চটা ছেলে পুতুলগুলোও নাক চোখ আঁকার পর একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। সবচে' বড় কথা সেগুলো ঝড়তি-পড়তি মাল হয়ে জুতোর বাক্সে পড়েছিল, এখন রীতিমত পোষাক-আষাক পরিয়ে দিয়ে চিলেকোঠায় তাদের ঘর-বসত করাতে পারলাম। সেখানেও বিজনমামা।

অঙ্ক কষান বন্ধ রেখে বিজনমামা মাঝে মাঝে ঘোষণা করত, সবসময় লেখাপড়া করা উচিত না। ওতে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

আমার তো ভালই। শুরু হত লুকোচুরি খেলা। চোখ কষে রুমাল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। বলা থাকত মনে মনে একশ' অব্দি গুণে নিয়ে আমি বাকি দুই খেলুড়েকে খুঁজতে বেরোব। একশ' সংখ্যাটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচশ হাজার পর্যন্ত করে ফেলা হত। গুণতে গুণতে অস্থির হাতে রুমাল ছুঁড়ে ফেলে আমি দৌড়ে বেড়াতাম এ ঘর, ও ঘর। খাটের নীচ, দরজার পাশ, আলমারীর খাঁজ। যেখানে মানুষ থাকতে পারে আবার পারেও না। খুঁজতে খুঁজতে চিলেকোঠার ঘর।

ও ফুলপিসি, বিজুমামা, দরজা বন্ধ করে কি করছ তোমরা এ ঘরে?

কারুর সাড়া নেই, ভেতরে থেকে দু চারটে খুটখাট আওয়াজ ছাড়া। মাঝে মাঝে ইঁদুরের কিচ্‌মিচ্‌, পাখির ঝটপটির মত শব্দ। আমি তবু দরজা ছেড়ে নড়তাম না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দরজার গায়ে একটা ফুটো আবিষ্কার করলাম। তারপর সেটার গায়ে চোখ পেতে দিয়ে, আবছা আবছা মানুষ, বিজুমামা ফুলপিসিকে কি করছে?

দুম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফুলপিসি। বিশ্রস্ত শাড়ি কোনমতে গায়ে জড়ান।

ওমা, তুই ঠিক খুঁজে বার করেছিস? চল্, এবার আমি চোর দেব।

পিছন পিছন বিজুমামা,—রাঙাদি এই মেয়েটাকে আদর দিয়ে দিয়ে একদম মানুষ করতে পারে নি।

ভীষণ রাগ হয় আমার। আদর দেওয়ার কি হল? খেলার শর্তই তো এই। খুঁজে বার করাটা যেন আমার অপরাধ।

।। চার ।।

অচিরেই অঙ্ক শেখা আমার ডকে উঠে গেল। আমি তো বাঁচলামই, মা-ও খুশিতে ডগমগ। কি, না, তাঁর বিদ্বান ভাইটি আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। দেশের মাটি ছেড়ে দিগ্বিজয়ে বেরোচ্ছেন তিনি। কেবল একজন ছাড়া।

ফুলটি, এরকম মড়ার দড়ি চেহারা হয়েছে কেন তোমার? চোখের নিচে কালি?

না, না ও কিছু না, বৌদি। বড্ড গরম পড়েছে কিনা, কদিন রাতে ঘুম হয় নি তাই।

দুপুরবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ফুলপিসিকে চেপে ধরলাম আমি।

তুমি মাকে মিথ্যে কথা বললে কেন? তোমার শরীর খারাপ না তো কি? খেতে পারছ না, বমি করছ—তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ছ, তোমার তো ডাক্তার দেখানো দরকার!

চুপ কর তো। হুট বলতেই কেউ অমন ডাক্তার দেখায় না। হাতিশালা হ'লে আমি ভাবতামই না।

তবে সেখানেই চলে যাও। না হ'লে মরে যাবে তুমি!

মৃত্যু মানে যে এক জীবনের দূরত্ব, এটা কল্পনা করেই আমি ফুলপিসির আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালাম। দুহাতের বেষ্টনীতে আমার মাথাটা নিজের বুকের ওপর রেখে ফুলপিসি বলল,

হ্যাঁরে, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, তাই না ঝির্মলি? আমি মরে গেলে তোর কষ্ট হবে, খু-উ-ব?

আমি তার হৃদপিন্ডের লাব্ ডুব শুনতে শুনতে ফিসফিস করে বললাম, মরার কথা বলতে নেই, ফুলপিসি। তুমি চিরদিন বেঁচে থাকবে।

আর তোর বিজনমামা? সে আর আসবে না?

হায়রে আমার পোড়া কপাল, তুমি বুঝি তার জন্যে বসে আছ?

এরকম করে কথা বলার ঢঙটা আমি ফুলপিসির কাছ থেকেই শিখেছি।

চিঠিপত্র দেয় তোদের? কোন ফোন-টোন? আমার কথা বলেনি একদিনও?

যতই গোপন করতে চাক ফুলপিসি, গোপন কিছুই রইল না। প্রথমটায়

বিজনমামার দোষ মা কিছুতেই মানতে চাইছিল না। মা-র বক্তব্য এটা ফুলপিসির তরফে বিজুকে ফাঁসান'র চেষ্টা। বামন হয়ে চাঁদে হাত? কলকাতায় আসতে পেরে হয় না, আবার আমেরিকা যাবার শখ!

বাবা ফুলপিসির সঙ্গে সোজাসুজি কথা কমই বলত। সেই বাবাও, ফুলটি তুই এরকম? তোর বিয়ে দেব বলে আমি হাতিশালা থেকে নিয়ে এলাম, হন্যে হয়ে পাত্র খুঁজে যাচ্ছি, আর তার প্রতিদান তুই এই দিলি? মায়ের কাছে আমাকে চিরকালের পাতক করে রাখলি?

বিজনমামাকে কিছুতেই ধরা গেল না। দায়মুক্ত হবার জন্য খরচ পত্রের দায়টা সে নিতে চেয়েছিল, এই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ফুলপিসি কিছুতেই রাজী হয় না। তার যেন বিশ্বাসই হয় না, এটা বিজুদার কথা। সে বসে থাকে একটা চিঠি, নিদেন একটা ফোন!

অপেক্ষা করতে করতে মা-বাবা ক্রমশঃ অধৈর্য, নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। একদিন তো চুলের মুঠি ধরে সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিল মা।

তুমি আর কত মুখ হাসাতে চাও আমাদের? ঝিমলির কথাটাও তো ভাববে? ও কিছু না বুঝতে পারলেও কেমন মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেখ না?

মা-র অজ্ঞতায় আমার হাসি পায়। আমি কিছু জানি না তা নয়। কিছু জানি কিন্তু সবটা নয়। কি যে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটা, তা আমার কাছে তখন রহস্য। বিজনমামা তো একদিন আমারও বুকে হাত—। তবে কি আমিও ফুলপিসির মত অসুস্থ হয়ে পড়ব।

এটা শুনেই পাথর প্রতিমা ফুলপিসি এককথায় রাজী।

সেই ফুলপিসির চলে যাওয়া। আমাদের বাড়িতে, এমনকি অন্য আত্মীয়রাও তাকে কেউ মনে করে না, বিয়ের জন্য তোলা ফটো আছে একটা, মাথার পিছনে স্টুডিও-র পাহাড়ের ছবি, পাইন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, সামনে বসে আছে ফুলপিসি একটা কাঠের হাতল-ওয়ালা চেয়ারে—সেটাও চলে গেল গুমঘরে। যেন আমার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়, যেন আবার সব কিছু ধোয়া তুলসীপাতা বনে যায়!

শেষবারের মত ফুলপিসির সঙ্গে আমার দেখা, ডিলেরিয়াম শুরু হয়ে গেছে, সেপ্টিসেমিয়া এক মোক্ষম থাবার আঘাতে ছিঁড়ে ফেলেছে বৃন্তডোর। একটা ভগ্নপ্রায় হাসপাতাল বাড়ি, বারান্দার একধারে উনুনের ওপর বসান ডেকচিতে ফুটছে ছুরি, ইন্‌জেকসনের সূঁচ, ঘরের ভেতরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গন্ধ জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব, বিছানার চাদরের সাদাটাও ঠিক তত সাদা নয়, ধারের জানলা বন্ধ, তার ওপর আড়াআড়ি করে মারা আছে

বাঁশের কঞ্চি। নিমীলিত অবস্থা থেকে মাঝে মাঝে ঘোর লাগা চোখ তুলে কিছু বলছে ফুলপিসি, শোনা যাচ্ছে না কিছু শুধু বিড়বিড় করে ঠোঁটের নড়াটুকু দেখা যাচ্ছে। বড়-পিসিমা পাশে একটা টুলে বসে, নিচে ফুটপাথে ন-কাকু, মেজ পিসেমশাই, ছোটকাকু।

মা তাড়াতাড়ি আমাকে সরিয়ে আনতে চায়।

কি মেঘ করেছে, দেখেছিস ঝিমলি? আকাশ লাল হয়ে গেছে, এখুনি ঝড় উঠবে।

যেন এখানে যা ঘটতে চলেছে তার চেয়েও দুর্বিপাকের আকাশের ঐ ঘনঘটা। শক্ত মুঠোয় হাত চেপে ধরে মা দৌড়তে থাকে সিঁড়ির দিকে। যেন এই ঘটনাস্থল থেকে পালাতে পারলেই আমি রয়ে যাব অপাপবিদ্ধ। কিন্তু মা-র সঙ্গে তাল রাখতে আমার কষ্ট হয়। কেননা তখনই প্রথম আমার উরুসন্ধি ভিজে ওঠে রক্তে।

।। পাঁচ ।।

বিজিত আমার কোচিং ক্লাশের বন্ধু। আমাদের বাড়ির ওপর দিয়েই ওকে বাসরাস্তায় যেতে হয়। সে বারান্দা থেকেই গ্রীলের ফাঁকে হাত গলিয়ে কেমিস্ট্রি খাতা নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, এসো না ভেতরে, দু একটা চ্যাপ্টার তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নেব।

আমি? আর লোক পেলে না! বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে এল বিজিত। ফাঁকা ফাঁকা ঘরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি একা আছ?

হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকে মা-বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে আমি একাই থাকি।

দুর্ঘটনা? কি হয়েছিল, চুরি-টুরি?

নিজেই কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে সোফায় বসে বিজিত।

জানতে পারবে সবই। তার আগে বল কি খাবে, চা না, বাইরের আগ্নেয় দুপুরের দিকে তাকিয়ে বললাম, সরবৎ?

কিছু না। খাতাটা দাও। আমি এখুনি বাড়ি চলে যাব।

ভয় পেয়েছ? ওর অবস্থা দেখে ভয়ানক মজা লাগল আমার।

ভয়? না ভয়ের কি আছে? এই আমি বসলাম। যাও, চট করে চা নিয়ে এস। বলার ভঙ্গিতে বেশ একটা পুরুষালি মেজাজ নিয়ে এল বিজিত।

চায়ের ট্রে নিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন আমি সালোয়ার কামিজ পাল্টে শাড়ি পরে নিয়েছি। ম্যাগী হাতা ব্লাউজ, গরমের দিনে ভালই লাগছে বেশ, খসে

পড়বে কি পড়বে না আঁচলের প্রান্ত ধরে রেখেছি এক হাতের ভাঁজে, কপালের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছি কালো বিন্দি, সামনের দিকের চুল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ক্লিপ আটকে দিয়েছি। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল বিজিত। তার দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলাম সে ফুলপিসিকে দেখছে। আমার কেমন যেন আত্মবিশ্বাস এল।

চায়ের কাপ ওর হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম, ঘটনাটা তোমাকে বলতে গেলে, প্রথমেই তোমার অনুমতি নিয়ে নিই। তোমাকে আমি 'বিজু' বলে ডাকব।

'বিজু'? আচ্ছা বেশ। কিন্তু কেন?

বিজিতের কথা শুনেই বুঝতে পারছিলাম, সামান্য একটা খাতা চাইতে এসে আচ্ছা বিপাকে পড়েছে সে। কিন্তু ততক্ষণে নেশা পেয়ে বসেছে আমায়। খেলতে নেমে মাঝখান থেকে উঠে যায় যারা আমি তাদের দলে নই। ওর কেন-র উত্তরে আমি বললাম, ঘটনাটা বুঝতে তোমার সুবিধে হবে তাই।

শুরুটা ছিল এইরকম। ধর, আমি চা নিয়ে এলাম। তুমি বললে, না, আমি চা খাব না।

সবেমাত্র চায়ের কাপটা মুখে তুলেছে বিজিত, অপ্রস্তুতের একশেষ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল।

না, না, আমি তা বলিনি। তুমি একেবারে খাবেই না সেরকম নয়। একহাতে কাপ ধরে আর একহাতে ধরতে পার আমার হাত। কিম্বা খুব বেশি অসুবিধা না হয় যদি, তাহলে জড়িয়েও ধরতে পার আমার কোমর।

যন্ত্রের হাত বাড়িয়ে বিজিত আমার হাতটা ধরতে পারল শুধু, তার বেশি এগোতে পারল না। প্রথম দিনের পক্ষে মাত্রাটা ভারী হয়ে যাবে বিবেচনা করে আমি ছেড়ে দিলাম।

পরদিন 'অনেক অফিস করেছি, আজ আর যাব না' বলে বেমক্কা ছুটি নিয়ে নিল মা। বিজিত যথাসময়ে এসে হাজির। আমি আর ওকে ঘরে ডাকলাম না, গ্রীলের ফাঁক গলিয়ে একটা এলেবেলে খাতা পাচার করে দিলাম ওর হাতে। একটিমাত্র সার কথা লেখা আছে ওখানে, কাল অবশ্যই এসো। ঘটনাটার এখনো অনেক বাকি।

মার ঘরপোড়া মন, ঠিক দেখতে পেয়েছে। অমনি জেরা।

কে রে ছেলেটা?

আমাদের কোচিং-এ পড়ে।

নাম কি ওর?

ক্যাবলাকান্ত বললেই ঠিক মানায়, তার বেশি কিছু জিজ্ঞেস কর না।

অনার্স নিয়েছে কোন সাবজেক্টে?

অনার্স? স্বপ্ন দেখছ মা! পাস কোর্সে পাশ করলেই বলে ওর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য!

মুখের ভাব দেখে মনে হল প্রত্যুত্তরে মাকে খুশি করতে পেরেছি।

তারপর দিন বিজিত এল। সঙ্গে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের কতগুলো প্রবলেম। আমি তাড়াতাড়ি সেগুলো ড্রয়ার বন্দী করে রেখে বললাম, যাবার সময় মনে করে চেয়ে নিয়ে যেও। আজকে তোমায় লুকোচুরি খেলার নিয়মটা বলে দেব। আমি যেখানে ইচ্ছে লুকিয়ে পড়ব আর তুমি মনে মনে একশ' গুণে নিয়ে আমায় খুঁজতে বেরোবে। শুধু খুঁজে বার করলেই হবে না, আমাকে ছুঁয়েও দিতে হবে। আমি দৌড়ে পালাতেও পারি, তখন তুমি আমার পিছু ধাওয়া করবে। যদি ধরতে পার, তবেই কিন্তু জিতে নিলে তুমি আমাকে। যে কোন জায়গাই ছুঁতে পারবে তখন আমার। ও হরি, আসল কথাটাই তো বলা হয় নি তোমাকে, পিছমোড়া করে বাঁধা থাকবে তোমার হাত। শুধুমাত্র ঠোঁট দিয়েই স্পর্শ করতে পার তুমি আমাকে।

খেলার বিবরণ শুনেই পাংশুবর্ণ ধারণ করে বিজিত।

গা থেকে আমার ওড়নাটা খুলে নিয়ে আমি ওর দুটো কাঠের হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধতে থাকি। ও মুখে মৃদু 'মিচ্‌মিচ্‌' আওয়াজ তুলে ভাঙা ভাঙা বাক্যে আপত্তি জানায়।

এরকম করে? কি করে? আচ্ছা ছোঁওয়া যায়?

আমি পাত্তাই দিই না। পিছমোড়া করে বেঁধে রাখার ভঙ্গিতে হাত পিছনে রেখে শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিই। আমার মাথা পৌঁছয় বিজিতের মাথার নীচে। আমি ঠোঁট সরু করে ছুঁয়ে দিই ওর কণ্ঠা। ঢোঁক গিলে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিয়ে ও বলে, এরকম একটা অর্থহীন খেলা খেলবার কি দরকার ঝিমলি? তার চেয়ে তোমাকে একটা অন্য খেলার কথা বলি শোনো।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। এখনো তো চিলেকোঠার পর্বটা পুরো বাকি।

সেটা হচ্ছে খেলার একদম অন্তিম পর্ব। আশ্চর্যজনকভাবে তারপরই ঘটনাটা অন্য দিকে বাঁক নেয়।

।। ছয় ।।

আচমকা একদিন ছুটির সময় মা আমার কলেজের গেটে। মাঝেমাঝে এরকম হানা দেওয়া মা-র অভ্যেস আছে। আমার গতিবিধির ওপর নজরদারি করার এ-ও একটা পন্থা। তবে সেটা নেহাত-ই পুলিশি কঠোরতার সঙ্গে না। তার মধ্যে পাপড়ি কোমল ফুরফুরে ভাবও মিশে থাকে। আমি ভেবেছি সেরকমই কিছু।

লেকের গাছপালার ফাঁকে তখন বিকেল লুকিয়ে পড়েছে। নৈশ অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সন্ধ্যে। রাতবাতি জ্বলে উঠেছে কিন্তু তার চমক নেই। গাছের ছায়াও হয়নি তত ঘন। নীচে মগ্ন যুগল মূর্ত্তি, মাথার ওপর অজস্র পাখির কলতান। পাখিদের কলোনিতে জায়গা দখলের লড়াই, ঝটাপটি, দু-একজনের ছিটকে বেরিয়ে আসা। পরিচিত রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়াতে যাব, হতে পারে পূর্ব-পরিকল্পিত, তার সঙ্গে দেখা, আশ্চর্য, মা একবারও বলে নি কেন? ভেবেছিল কি, আগে জানলে সঙ্কোচ, লজ্জায়, জবুথবু হয়ে পড়ব আমি? কি যে ভাবে মা আমাকে! আমার মুখে প্রশ্ন পড়ে পরিচয় করিয়ে দিলে মা, এ হচ্ছে অভিষেক, অভি। ডলি মাসির ভাগনে। আর অভি বুঝতেই পারছ, আমার মেয়ে—নমস্কার আর প্রতিনমস্কারের মধ্যে আমি মনে মনে খুঁজে চললাম, ডলি মাসি কোনজন আর ইতিপূর্বে তাকে আমি দেখেছি কিনা। এরপর আমাদের চেনা জায়গায় আমার পছন্দের ডাক্ রোস্ট আর হাক্কা চাউ খেতে খেতে মা বলল অভি যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন আমেরিকায়, নিউ জার্সিতে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে আছে। আমি তো জানি মা-র আমেরিকা প্রীতি কিরকম। জানতাম না আমার মধ্যে কখন তা সঞ্চারিত হয়েছে। আমি পূর্ণ প্রাণে অভিবাদন জানালাম।

সেই অভিষেকের সঙ্গে আজ আমি শ্বশুরবাড়ি চলেছি।

ন-মামা নিচে সদর দরজার মুখে হাতের মুঠোয় ঘড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হলেই আমাদের রওনা করিয়ে দেবেন। ফুল সজ্জিত বাহনও প্রস্তুত। বাড়ির কুচো-কাঁচারা ভিড় করে ঘিরে আছে তাকে। কে একজন একটা ফুল ছিঁড়ে ফেলেছে বলে ধমকও খেল ন-মামার কাছে। আসলে শুধু ন-মামা কেন, বাড়ির সবাই অতি সতর্ক, যাতে পান থেকে চুন খসার মত কোন ত্রুটি, যত অনিচ্ছাকৃত, যত অযৌক্তিকই হোক না কেন, আমার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনে কোনরকম ছায়াপাত না ঘটায়। হয়ত এর মূলে কালকের ফোনটা।

তখন সবেমাত্র গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছে। সবার সঙ্গে আমিও দেখছি, কি কি শাড়ি পাঠিয়েছে শ্বশুড়বাড়ি থেকে। হলুদ পাড় লাল কাঞ্জিভরম সুন্দর খুবই। কিন্তু ঠিক এইরকম পোড়া লাল রঙের একটা আমার আগেই কেনা হয়ে গেছে। তবে ব্রোঞ্জ রঙের ব্যোমকাইটা একেবারে নিখুঁত। এই শাড়িটা আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল। আর এই পাটোলাটা—ঘিয়ে রঙের জমির ওপর মেরুন সবুজের নক্সাকাটা—এত অপূর্ব, আমার কল্পনাতেও ছিল না। একটার পর একটা ট্রে সরাচ্ছি, উত্তেজনায় আনন্দে ধকধক করছে আমার বুক। ওয়াল কলাম, ঘরছোড়া, জামেবার, বালুচরী—এত, এত রকমের শাড়ি আমার,

আমার শুধু আমার। অন্যদের জন্যও আছে। দিদি, বৌদি, মাসি, মামীদের নাম লেখা লেখা আর সঙ্গে নানাবিধ সরস মন্তব্য।

"ওমা, এই দেখ এখানে আবার কি লেখা।" বলতে বলতে একটা ট্রে লিলিদি আমার মুখের সামনে তুলে ধরল। দেখলাম, মুঠো মুঠো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ছড়ান, তার মধ্যে কাগজের চিরকুট— "সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি, বাছতো দেখি।"

লিলিদি আমার চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, চাঁদ বদনী ধনি, বাছো এবার, দেখি কত সোহাগ!

আমি বললাম, বয়ে গেছে আমার বাছতে। ফুলশয্যার তত্ত্বে এই ট্রে এরকমভাবেই ফেরৎ দিয়ে দিও। শুধু চিরকুটটায় বদলে লিখে দিও, বাছাবাছি জানি না, পরের ছেলে মানি না।

কেমন না মেনে পারিস, দেখবো। অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে তো পদসেবা করতে বসে যাবি।

সমরদাকে তুমি তাই করো বুঝি?

কি আর করব ভাই, তোর সমরদা যা কিপটের হদ্দ। এইসব পদসেবা-টেবা করে যদি এরকম একটা কাঞ্জিভরম আদায় করা যায়! রসিকা লিলিদির মুখে ছদ্ম দুঃখ ফুটে ওঠে।

ওদিকে আবার কলাতলায় দিদি, বৌদিরা গায়ে হলুদ মাখাবে বলে ডাকাডাকি করছে এইরকম ব্যস্ততার মধ্যে ফোনটা এল।

মা ধরেছিল। আমি কোন আগ্রহও বোধ করিনি। কত ফোনই তো আসে! মাউথ পীসটা বাঁ হাতে চেপে ধরে মা ডাকল, ঝিমলি, এদিকে একটু শোন তো। মা-র গলা শান্ত, গম্ভীর। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে অজানিত কি যেন ছমছম করে উঠল। আমি পায়ে পায়ে মা-র পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মা সোজাসুজি আমার চোখে চোখ রেখে বলল, বিজিতের দাদা ফোন করেছে।

হ্যাঁ, ওর দাদা-বৌদির কাছ থেকেই লেখাপড়া করত ও। নাহলে ওদের বাড়ি তো সীতারামপুর। কোলিয়ারী। সেখানে স্কুল-কলেজের এত সুবিধে কোথায়? কেন, কি হয়েছে তার? এই শেষের কথাটা বলতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে জিভ্ জড়িয়ে যায় আমার।

বরফে জমান হিম কনকনে দুটি বাক্য মার শরীর থেকে বেরিয়ে আসে, সে এখন হাসপাতালে। কাল রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়েছে একগাদা।

আমাকে ঐ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে মা আবার ফোনে ফিরে গেল— তা, আমার মেয়ে এখন কি করবে সেখানে গিয়ে? আপনি জানেন, আজ

তার বিয়ে। এখন এসব কথা তুলে আপনি কি ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছেন? জানেন, আমি পুলিশে খবর দিতে পারি?

ওপাশে গলার আওয়াজ ক্রমশঃ মিইয়ে যায়। মা ফোনটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ফেরে। আমি তখন অসহায়, চোখের জলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছি। কি করছে এখন বিজিত? মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে? এত বোকা ও, খেলাটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেছে? মা-র কাছে কি উত্তর দেব এখন আমি!

সেই প্রথম মা আমার কাছের মানুষ হয়ে যায়। আমার পিঠে হাত রেখে কাছে টেনে নেয়। মা-র বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আমি নিঃশব্দে চোখের জল ফেলি। মাকে আমি কখনও দেখিনি কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে। সব সময় মনে হ'ত মা বাস্তবের মত কঠোর। সে-ই মা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে আমাকে, কি চাস তুই, ঝিমলি? তোর মন যদি বলে, এখনও বল, এই বিয়ে ভেঙে দেব আমি।

ততক্ষণে চোখের জল মুছে ফেলেছি। অভিযেকের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দেব? আমি? আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে, ভিসাও তৈরি হতে চলেছে। মাস খানেকের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে আমিও আমেরিকার পথে পা বাড়াব। সে-ই বিজনমামার আমেরিকা। দ্বিরাগমনের আগেই ব্রিটিশ হাইকমিশনের অফিসে একটু দেখা করতে যেতে হবে। যাওয়ার পথে লন্ডনটাও যদি ঘুরে নেওয়া যায়—কত স্বপ্ন! এখন আবার ঘুমের ওষুধ খাওয়া-টাওয়া, এসব কি গন্ডগোল। এতে আমার দায়ই বা কি? আমি বিজিতকে একটা দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে দেখিয়েছিলাম মাত্র, এরকম অদ্ভুত সমাপতন তো আমি চাইনি।

ঐ ন-মামা ডাকছে। সময় হয়ে গেছে। আমিও প্রস্তুত। লিলিদিকে দিয়ে দিয়েছি আমার নিজের কেনা লাল কাঞ্জিভরমটা। আর সেন্ট, পাউডার, লিপস্টিক, শ্যাম্পু তো অকাতরে বিলিয়েছি। কি হবে আমার এসব দিয়ে? এতসব কিছু আমি ব্যবহারও করি না। এখন আর নিজেকে সুচিত্রা সেন সাজাতে ইচ্ছে করে না। বরং মাধুরী দীক্ষিত বললেই খুশি হই বেশি। এবং এতেও যে আমি সফল তার প্রমাণও আমি দিয়েছি। অমন যে পৃথিবী-চরা ছেলে অভিষেক তাকেও কব্জা করতে আমার সময় লাগেনি। প্রাপ্তি উশুল করে দিয়েছে আমার পাওনা। তাহলে আর এসব ছিঁচকে জিনিষে আমার কি দরকার? বাবার কাছে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। মা-র আঁচলে কড়ি ও তন্ডুল ঢেলে দিয়ে যথাবিধি ঋণশোধ করে দিয়েছি।

শুধু এইটুকু থাক, বিজনমামা থেকে বিজিত—এর মধ্যে পড়ে রইল যে কৌটোভরা প্রিয় ভালবাসা আমার, ফুলপিসি, তোমার জন্য।

নপুংসক

শবরী ঘোষ

-ও বন্‌-ধুউ...তুমি সুন্‌-ন্‌তে কি পাও... (টাক ডুম টাক ডুম)
এ গা-আন আ-মার (টাক ডুম)
ও-ও বন্‌-ধু-উ-উ-উ... (ডুম ডুম ডুম ডুম)

মেডিক্যাল জার্নালের কার্ডিও ভাসকিউলার ডিজিজ থেকে চোখ তুলল জয়দীপ। খাইসে রে! সর্বনাশ করেছে! কি বেধড়ক গলা রে বাবা! কি আসুরিক সুর! আচমকা এ গানের একটি গুঁতো খেলে স্বয়ং ভীষ্মলোচন শর্মাদাও যে হার্টফেল করতেন বাবা! আর কি সাংঘাতিক উস্‌চারণ! 'তুমি সুন-ন-তে কি পা-আও...'? হেসে ফেলল জয়দীপ। —অবশ্যই বস্‌। না শুনে আর উপায় কি? যা শোর মাচিয়েছে!

গান ততক্ষণে রে রে করে প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। বাজনদারের তুমুল উৎসাহও আর বাগ মানছে না একেবারেই। সব মিলিয়ে সে এক উদুম বাওয়াল। —নাঃ। হবে না। ইম্‌পসিবল্‌! জার্নালটি বন্ধ করে ফেলল জয়দীপ। এই ভয়াবহ সঙ্গীত চর্চার মধ্যে ফেলে দিলে স্বয়ং ডক্টর রায়ও, কার্ডিও ভাসকিউলার ডিজিজকে কালাজ্বর বলে ডায়াগনোসিস করে ফেলতেন নির্ঘাৎ! আর সে তো সামান্য একটা...

পাড়াপড়শীরা উঁকিঝুকি মারতে শুরু করেছে ততক্ষণে। সামনে দোতলাবাড়ির বারান্দায় রিমি আর মণিকাবৌদি হেসে কুটিপাটি। এদিকে রাণীকাকিমা প্রায় আত্মহত্যা করার ভঙ্গিতে ছাদ থেকে ঝুঁকে পড়েছেন। লালবাড়ির দরজায় সুমনের ঠাকুমা এবং মা। সকলেরই খুব হাসি হাসি, মজা পাওয়া মুখ।

শুধু বাপিদাদের বাড়িটিতেই কোনো সাড়াশব্দ নেই। জানলা দরজা এঁটে বন্ধ করা। এপ্রিলের দুপুর বলেই হয়ত বা! রাস্তার ধারেই ওদের দোতলা বাড়ি। সামনে গ্রিল ঘেরা বারান্দা। কলিং বেলের সুইচ টিপে টিপে হাতে

ব্যথা করে ফেলছে তিন আগন্তুকের মধ্যে একজন। সঙ্গে ঢোল পেটানোর শব্দ। হাতে ফটাফট স্পেশ্যাল তালি; এবং বিদঘুটে গলার কোরাস চ্যাঁচানি; দরজা খোলবার জন্য পরিত্রাহী আবেদন। কিন্তু সে বাড়িতে তখন শ্মশানের নৈঃশব্দ বিরাজমান। ঝুমা বউদি নবজাত পুত্রসহ বাপের বাড়ি। বাপিদা অপিসে উধাও এবং ইত্যাকার তুচ্ছ পার্থিব তথা লৌকিক বিষয়সমূহে সে বাড়ির বাসিন্দাদের — মানে উপস্থিত দাসজেঠু এবং জেঠির কোনো কৌতূহলই যেন অবশিষ্ট নেই আর। যেন তাঁরা দুজনেই একযোগে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। অথবা, বাড়িটি যেন বা একেবারেই পরিত্যক্ত, জনমানবশূন্য!

বেল বাজিয়ে বাজিয়েও যখন কোনো লাভ হয় না এবং পরোপকার স্পৃহায় কাতর পড়শিনীরা যখন প্রবল ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে, দাসজেঠুদের বাড়িতে থাকার ব্যাপারটি কনফার্ম করে দেন — তখন গান বাজনা থামিয়ে, সুরেলা বিনতি থামিয়ে মুখ খোলে ওরা — স্বাভাবিক নবজাতকের জন্মের ট্যাক্স কালেকটারগণ।

—কি গো? কি করছ গো ও? কত্তা-গিন্নীতে সুইয়ে রইয়েছ? এই দিন দুক্কুর বেলাই বুঝি...

এঃ! রাম রাম! জয়দীপের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, থলথলে ভুঁড়ির নিচে চেককাটা লুঙ্গিপরা খিটকেল দাসজেঠু এবং চিরকেলে আমাশারোগী দাসজেঠির সিড়িঙ্গে মার্কা চেহারা দুটি। ...যাঃ। ভাবাই যায় না। তবুও হেসে ফেলে জয়দীপ এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা পাড়ার তাবৎ জানলা দরজা ছাদ বারান্দা সমস্ত কিছুই খিক খিক, খুক খুক, খ্যাক খ্যাক করে হাসতে থাকে সমস্বরে। কিন্তু দাসবাড়ি তবুও নির্বিকার।

এমন সময় সহসাই দশদিক স্তব্ধ করে দিয়ে, ওদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বাচওড়া যে, নেত্রীসুলভ — বোধহয় দলের মধ্যে গাইয়ে হিসেবে খুবই নাম ডাক আছে তার — সে সহসা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কালোয়াতি ভঙ্গিতে এক গান ধরে দেয় :

আকাস্‌সে চাঁদ উটেচো
বাগান্‌নে ফুল ফুটেচো
বাবু বিবি সুয়ে আচে সোনার খাটিয়ায়
আহা! বাবু বিবি সুইয়ে আচে সোনার খাটিয়ায়...

সেই গান শুনে পাড়ার আদ্ধেক লোক বোধহয় হাসির দমকে মরেই যেত তক্ষুণি, যদি বারান্দার ওপাশের দরজাটি খুট্‌ করে খুলে না যেত; যদি না সেই দরজার পিছনে দেখা যেত জেঠুর থলথলে, থমথমে, ভয়াবহ রকম গম্ভীর মুখখানি — এবং তার পিছনে দাসজেঠির রোগা আভাস।

—কি হচ্ছেটা কি! চিৎকার করে ওঠেন জেঠু। বাঁদরামি পেয়েছ? দুপুরবেলা এভাবে জ্বালাতন করছ কেন ছোটলোকের মত? —তাঁর ক্রুদ্ধ চোখজোড়া খুবই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে একবার পরিক্রমা করে নেয় প্রতিবেশিনীদের মুখগুলিতেও। মুহূর্তে অপ্রতিভতা নামে সেখানে।

—ওম্ মা গো! কি বলে গো? মুহূর্তে প্রতিবাদ আসে এ তরফ থেকে। আমরা অসভ্য না তোমরা গো?...

আগে কতকগুলি নিদারুণ অসভ্য কথা বলে এ ওর গায়ে চাপড় মেরে হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকে ওরা। আর সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা ভুলে বেসামাল হাসির অসভ্য অবৈধ ছুঁচোবাজি দৌড়তে থাকে সারা পাড়ার মধ্যে দিয়ে। নিষিদ্ধ হাসি যে কি বিষম বস্তু!

জানলার পর্দা ফেলে সরে আসে জয়দীপ। নাটকটা জমেছে মন্দ না। তেনাদের স্টেজ পারফর্মান্সও একেবারে এ-ওয়ান। কিন্তু তাই বলে জ্যাঠা জেঠির সম্বন্ধে ওই রকম সব প্ররোচনামূলক কথাবার্তা! ছিঃ! জার্নালটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ে জয়দীপ। দুষ্টু ছাগলছানার মত অবাধ্য মনটার কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনবার চেষ্টা করতে থাকে বইয়ের পাতায় — হৃদঘটিত সমস্যার কঠিন ফাটকে।

কিন্তু জয়দীপ কি অবিচলচিত্ত মুণিঋষি নাকি? তাছাড়া, তাঁদেরও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেই থাকে: হামেশাই। আর তারই ফলে পুরাণে, রামায়ণ, মহাভারতে দুম্ করে জন্মে যায় কত সব বাস্টার্ড! তাই, জয়দীপ না চাইলেও যথারীতি উৎকর্ণ এবং উচাটন হয়ে থাকে তার মন।

বেশ বোঝা যায়, স্বামীকে নাজেহাল অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এবার দশপ্রহরণধারিনী হয়ে যুদ্ধে নেমেছেন জেঠি নিজে। ব্যাপক হেক্কারি দেখিয়ে এক হাত নিচ্ছেন এদের। প্রতিপক্ষও বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ের মধ্যেই স-কার মুগ্ধ সেই কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে দেয়

—চলে যাব বই কি গো। তুমার ওই বুড্ঢা ভালুকটার সঙ্গে সুতে তো আসি নাই। আমাদের পাওনাটা দিয়ে দাও।

—পাওনা? পাওনা আবার কিসের! ইঃ...! রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ওদের পাওনাগন্ডা সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ সাজার চেষ্টা করেন তিনি।

—কেন, পাওনা কিসের জানো না? লাতি হয় নাই তুমার? ছেলের ঘরের লাতি। সগ্‌গে দিবে বাতি। লাতি হয় নাই?

—হয়েছে তো আমার কি? কোণঠাসা বেড়ালের মত ফ্যাঁস করে ওঠেন ভদ্রমহিলা। বাচ্চা তো তার মামার বাড়িতে আছে। টাকা নিতে হয় তো তাদের কাছে যাও। আমরা কেন দেব?

—আহ্‌হা গো, আহ্‌হা! তালু এবং জিহ্বার ঘর্ষণে চুক চুক করে গভীর সমবেদনার শব্দ ওঠে একটি। —তা মামারা কি তুমার লাতির বাপ হইছে নাকি গো, তোমার বউকে... যে তারা টাকা দিবে?

ছিঃ! অশ্রাব্য। ধড়মড় করে উঠে বসে জয়দীপ। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘর থেকে ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে ভিতরে শোবার ঘরে চলে আসে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। এখানে শব্দদূষণ তবু আবছা শোনায় অনেকটা।

বাস রাস্তা থেকে অনেক দূরে একটি গলির মধ্যে জয়দীপদের এই পাড়া। এখানে রাস্তাটি পরিষ্কার। বাড়িগুলি বেশি পুরনো নয়। নতুন গড়ে ওঠা মফস্বলী টাউনের মধ্যবিত্ত পাড়া যেরকম হয় আর কি। বাপিদাদের আর জয়দীপদের বাড়িদুটি ঠিক মুখোমুখি। দিন কয়েক আগেই ঝুমা বউদির প্রথম সন্তান হওয়ার খবরটা শুনেছিল জয়দীপ। বউ-বাচ্চার খবরাখবর নেবার পর বেশ খুশি খুশি গলায় মা বলছিল

--তা, কি গো নমিতাদি, তোমার নাতি হল, আর আমাদের মিষ্টি খাওয়ালে না?

—তুই আর মিষ্টি খাবি কি করে রানু? তোর যা ব্লাড সুগার! প্রম্পট আনসার জেঠির।

—বা রে! তা আমি না হয় নাই খেলাম। মাও অবশ্য ছাড়বার পাত্রী নয়। তা আমার ছেলেদুটোর তো আর ব্লাড সুগার নেই। বা তোমার দেওরের!

—আহা, খাবি'খন খাবি'খন। মিষ্টি তো আর পালাচ্ছে না রে বাবা। দাঁড়া না, নাতির অন্নপ্রাশনের সময় তোদের সব্বাইকে নেমতন্ন করব তো। তখন খাস না যত পারিস।

হাড় কেপ্পণ বলে পাড়ায় খুব নাম ডাক আছে ওনাদের। জেঠু মোটা টাকা পেনসন পান। ছেলে বউ দুজনেই খুব ভালো চাকরি করে। তবু স্টেশন যেতে কিংবা আসতে দেড় কিলোমিটারের বেশী পথ হাঁটা দেন যখন তখন। একা থাকলে মাঝপথে চেনা লোকের রিকশয় উঠে পড়ার ধান্দায় থাকেন সর্বদা। বাজার যান শেষ বেলায় — মাছ সবজির দাম পড়ার সুযোগ দিয়ে। অতিথিকে একটু চা বিস্কিট দিতেও খুব কষ্ট হয় ওঁদের। অথচ লোকের বাড়ি গিয়ে আপ্যায়িত হতে পছন্দ করেন খুবই। —ওঁদের কিপটেমি নিয়ে হাজার একটা গল্প প্রচলিত আছে পাড়ায়। ইদানীং অবশ্য হিজড়েদের আসার ভয়ে খুবই আতঙ্কিত ছিলেন ওঁরা। তবে আশাও ছিল, নার্সিংহোমের খরচের মত এদের মাশুলটাও নিশ্চয়ই বউদির বাপের বাড়ি থেকেই উশুল হয়ে যাবে। বুঝতেই পারে জয়দীপ, ওরা আচমকা এসে পড়ায় নাটকটা আজ জমবে ভালো!

বিরক্ত লাগছিল জয়দীপের। এসব নোংরা নাটক না শুনে দুপুরটা শাওনের সঙ্গে কাটাতে পারলে কি চমৎকার যে হত! কিন্তু শাওন তো নিরুপায়। কদিন পরেই পার্ট টু পরীক্ষা ওর। পাশবালিশটা আঁকড়ে নিয়ে শোয় জয়দীপ। পড়াশোনা যখন হবেই না, তখন না হয় ঘুমনোই যাক একটু।

আর ঠিক তক্ষুণি কলিংবেলটা বেজে ওঠে। উঃ! কি জ্বালাতন রে বাবা! কে যে এল এই অসময়ে! অপ্রসন্ন মুখে দরজা খোলে জয়দীপ। দাসজেঠি দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখ। প্রচণ্ড উত্তেজিত।

—জয়, আয় না বাবা একটু আমার সঙ্গে। দ্যাখ না, এই দুপুরবেলা বাড়িতে একটা ব্যাটাছেলে নেই দেখে কি বজ্জাতিই যে শুরু করেছে ওই হিজড়েগুলো —

—সে কি? জেঠু বাড়ি নেই? খুবই নিরীহ ও সরল প্রশ্ন জয়দীপের।

—না, মানে, আছে... মানে, ওই, যাবে আর কোথায়? ঢোঁক গেলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু, তোর জেঠুর যে ভীষণ শরীর খারাপ। বুক ধড়ফড় করছে খুব। তুই একটু সামলা না বাবা হতচ্ছাড়াগুলোকে?

—জেঠুর বুক ধড়ফড় করছে? একটু উদ্বিগ্নই হয় জয়দীপ। কেন? কখন থেকে?

—কখন থেকে আবার? এই তো, এক্ষুণি। ...আর, করবে না? বলে কিনা আ-ট হাজার টাকা দিতে হবে! অ্যাঁ! আট হা-জা-র!

আঁচলে চোখ মোছেন তিনি। ঠিক বোঝা যায় না, স্বামীর সহসা অসুস্থতার কারণে, না আট হাজার টাকা গচ্চা যাবার আতঙ্কে! —অতঃপর মিনতি — আয় না বাবা, দরদস্তুর করে একটু কমা না টাকাটা।

যাক। আশ্বস্ত হয় জয়দীপ। জেঠুর বুক ধড়ফড়ানিটা কার্ডিও ভাসকিউলার নয় তাহলে, নিতান্তই একটি সোশিও-ইকোনমিক ডিজিজ! মজা লাগে। কিন্তু হাসা যাবে না। গম্ভীর গলায় বলে — ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি আসছি এক্ষুণি।

বাবা অফিস। ভাই স্কুল। মা দিদুনকে দেখতে গেছে। সুতরাং গেটে তালা লাগিয়ে বেরোয় জয়দীপ। আশপাশের বাড়িগুলিতে পরম উৎসাহী কাকি জেঠি বউদিদের খুশিমাখা মুখ সব। কেউ কেউ হাসিমুখে ইশারা করেন তাকে; উশকানি দেন। জেঠুদের টাকা খসানো উশকানি। প্রবল আমোদে ম ম করতে থাকে চৈত্রদুপুরের নিঝুম পাড়াখানি।

বাপিদাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় জয়দীপ। বারান্দায় শুধু ওরা তিনজন। মেঝের ওপর ঢোলটি শোয়ানো। কয়েকটি চকচকে লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ। লেস

বসানো একটি গোলাপি রুমাল। ওদের মধ্যে সেই সঙ্গীত বিশারদই দেখা যায়, সব চেয়ে বয়স্ক। এতক্ষণ পিছন থেকে ওর ক্যারিশমা দেখেছে জয়দীপ। এবার মুখোমুখি। যথেষ্ট লম্বা চওড়া শরীর। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ। পুরুষালি ছাঁদ। চওড়া কপালে অতি বেমানান প্রকাণ্ড এক লাল টিপ। কানে নকল সোনার বড় বড় দুল। শিরাওঠা হাতে কড়া নেলপালিশ এবং আধ পোড়া সিগারেট। সভানেত্রীর গাম্ভীর্যে মধ্যমণি হয়ে বসে আছে।

জয়কে দেখে সে হাসে হঠাৎ। পরিচিতের হাসি। প্রথমটা অবাক; কিন্তু পরক্ষণেই চিনতে পারে জয়দীপ। আরে! সোদপুরে বি.টি. রোডের ধারে একটা চায়ের দোকানে এই-ই না চা খেতে চেয়েছিল সেদিন! ...প্রত্যুত্তরে হাসে ও। বারান্দায় উঠতে উঠতে বলে

—কি মাসি, ভালো আছ?

জয়দীপ শুনেছিল, হিজড়েদের সংসারেও নাকি 'মা' থাকে একজন। যে দুর্ভাগা শিশুটি মায়ের কোলে আকাঙ্খিত পুত্রসন্তান হয়ে জন্মাতে পারেনি, এমনকি হেলাফেলার কন্যাসন্তানও না — সেই সব 'না-পুত্র না-কন্যা' সন্তানের জন্য লজ্জা, গ্লানি অপমানবোধ আর অবহেলার অবধি থাকে না, এমন কি গর্ভধারিণীর মনেও। সেই সব নিরপরাধ অথচ অবাঞ্ছিত শিশুদের তুলে এনে লালন করে, গভীর মায়ায় বড় করে তোলে এক অর্ধনারীশ্বর মা। নিজের ব্যর্থ জীবনের ও অসম্ভাব্য মাতৃত্বের তাবৎ বেদনা ও মমতা নিয়ে আগলে রাখে নিজেরই মত আরেকটি বিফল জীবনের অঙ্কুরকে। দলের সবাই মানে তাকে। — এও কি সে রকমই একজন?

বোধহয় জয়দীপের এই 'মাসি' সম্বোধনেই খুশি হয় সে। খইনির ছোপ ধরা দাঁতে একগাল হেসে বলে

—দে না বেটা, দুটা টাকা পাইয়ে দে না? তোরা না দিলে আমরা পাব কোথা থিককে?

উত্তর দেয় না জয়দীপ। একটু হেসে ভিতরে চলে যায়। --বিছানায় বসে ছিলেন জেঠু। সহধর্মিনীর সঙ্গে চাপা গলায় কি যেন পরামর্শ চলছে। জয়কে দেখেই একটা চেত্তা খেয়ে লাফিয়ে ওঠেন প্রায়

—এই যে, খুব তো সকালবেলা উঠে জগিং টগিং করো দেখি। খুব তো... কি যেন বলে, হ্যাঁ, জিমে যাও। ওই ছ্যাঁচড়া মাগীগুলোকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াও তো দেখি, কেমন বীরপুরুষ?

ভদ্রলোকের কথার এমন অভদ্র ভঙ্গিতে চড়াৎ করে ওঠে জয়ের মাথার মধ্যে। তবু রাগটা গিলে নেয়। জেঠু অত্যন্ত অসহিষ্ণু গলায় আবার বলেন

—আঃ! অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? বুঝতে পারছ না, প্রেসার উঠে গেছে, এক্ষুণি একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে আমার! কি যে ছাই পাঁশ শেখায় আজকাল তোমাদের! ...আরে যাও না, ওদের একটু বোঝাও না গিয়ে। বলো গে, আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে আমি কিন্তু কেস করে দেব। জেলে দিয়ে ছাড়ব শুয়োরের বাচ্ছাদের।

এবার কাঁদো কাঁদো গলায় জেঠি বলেন — যা না জয়, তুই তো বলতে গেলে ডাক্তার হয়েই গেছিস। তোর কথার একটা দাম আছে না? যা বাবা, ওদের বল গে, ওদের অত্যাচারে তোর জেঠুর একটা কিছু হয়ে গেলে ওরাই বিপদে পড়ে যাবে শেষকালে। তার চে' শ পাঁচেক টাকা নিয়ে বিদেয় হোক

—আ খেলে যা! খেঁকিয়ে ওঠেন জেঠু। পাঁচশই কি কম হল নাকি? রোজগার তো করলে না জীবনে। চিরটাকাল তো আমার ঘাড়ে বসেই...

ভীষণ বিরক্ত লাগছিল জয়দীপের। এসব কি নাটক হচ্ছে এখানে? বাইরে ওরা যা করছে তা না হয় ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। ওদের বেঁচে থাকার লড়াই সেটা। ওদের অস্বাভাবিক জীবন, ওদের অকারণ ধিকৃত লাঞ্ছিত সামাজিক অবস্থানই ওদের বাধ্য করেছে এরকম হতে। কিন্তু এই ভদ্রলোকদের এ কিরকম খাইসট্যামি? ...তা ছাড়া তাকেই বা এরকম একটি নাটকে দূতের রোল প্লে করতে হবে কেন? চরম বিতৃষ্ণায় ও একবার ভাবে, একটি কথাও না বলে চুপচাপ বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু নিকটতম প্রতিবেশী। তার ওপর জেঠি নিজে গিয়ে ডেকে এনেছেন তাকে। এভাবে কাটিয়ে দেওয়াটাও খারাপ দেখাবে। অগত্যা বাধ্য হয়েই বারান্দায় চলে আসে জয়দীপ।

দেখা যায়, এদের পাওনাগন্ডার ব্যাপারে পড়শীদের উৎসাহ -- প্রাপকদের চাইতে বিন্দুমাত্র কম নয়। হাতের ইশারায় টাকার অঙ্ক বোঝাতে থাকেন তাঁরা। আট, নয়, দশ, কারো কারো ইচ্ছা — বারো। টাকার গরমে প্রবল দাম্ভিক অথচ হাড়হদ্দ কৃপণ দাসজেঠুদের টাকা খসানোর সম্ভাবনায় সবারই মুখে আহ্লাদ একেবারে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে!

—ঠিক কত হলে চলবে মাসি তোমাদের? জিজ্ঞেস করে জয়দীপ।

---এদের তো হেভি মাল আছে। মাসি বলে। কিন্তু লোকগুলো স্‌সালা একদম খচ্চর। আমাদের বহুত গালি দিচ্ছে। পিচ করে খইনির থুতু ফেলে মাসি গ্রিল গলিয়ে। নিজেও এনাদের উদ্দেশ্যে বাছা বাছা কটি গালি দিয়ে নেয়। অনুনয় করে বলে --- গরীব অভাগীনদের আট হাজার টাকা দিতে বোল না বেটা?

---আ-ট হা-জা-র! বল কি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আট হাজারই দিতে আমাদের। কম টম হবে না। — মাসিকে সমর্থন জানায় বেশ অল্পবয়সী, রোগা মত একজন; নীল শাড়ি পরা, এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি যে।

জয় লক্ষ্য করে। মাসির কথায় প্রবল 'স' কার এবং বাংলার মধ্যে বিহারী টান মিশে থাকলেও এর কথা একদম পরিষ্কার বাংলা। ছিন্নমূল এইসব হতভাগ্য মানুষেরা কে যে কোথা থেকে আসে!

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অবশেষে পাঁচশ নয় — পাঁচ হাজারে রফা করে জয়দীপ। রেট নাকি এইরকমই। মধ্যবিত্তদের জন্য। পুত্রসন্তান জন্মালে কোথাও কোথাও নাকি দশ বারো হাজার টাকাও আদায় করে ছাড়ে এরা, অবশ্য পার্টির অবস্থা বুঝে। এখন নাকির মাসির 'বেটা'র খাতিরেই শুধু পাঁচ নিতেও রাজী!

দর ঠিক হওয়ামাত্রই, দলের আরেকজন, যার মাথায় মেল টাইপ অ্যালোপেশিয়া দেখা দিয়েছে —কপালের দুপাশের চুল তেকোণা হয়ে উঠে যাচ্ছে ক্রমশঃ — গাঁ গেরামের সস্তার যাত্রাপার্টিতে 'সখী সাজা' ভবতারণ এর মত চেহারা যার — সে হঠাৎই এবার দুলে দুলে নামতা পড়ার মত হাঁকতে শুরু করে

—ফাইব থাউজ্যান ওয়ান হানড্রেড... ফাইব থাউজ্যান ওয়ান হানড্রেড... ফাইব থাউজ্যান ওয়ান হানড্রেড

কিন্তু জয়ের কাছে এই পঞ্চহাজারি পরিকল্পনাটি শোনা মাত্রই হার্ট অ্যাটাকের রোগীর পার্ট বেমালুম ভুলে মেরে দিয়ে স্রেফ ভাংড়া নাচতে শুরু করে দেন জেঠু।

-বলো কি! পাঁ-আ-আ চ হাজা-র!! বলি, তোমরা কি আমার গলায় ছুরি দেবে?

—আমরা নয় জেঠু। ওরা। আমি টাকা নিচ্ছিনা। গম্ভীর হয়ে যায় জয়। ওদের রেট ফেট আছে। ওরা বলছে, আপনাদের স্ট্যান্ডার্ডের লোকের জন্য এটাই ওদের মিনিমাম রেট।

—মিনিমাম রেট? মিনিমাম? বলি, 'মিনিমাম' কথাটার মানে বোঝো? মাগীরা রেট শেখাচ্ছে আমায়? ...শাল্‌লা নপুংসক যত্তো সব। হিজড়ে। শাস্ত্রে কি আর সাধে লিখেছে, যে একশ মানুষ খুন করার পাপ করলে তবেই না হিজড়ে জন্ম হয়!

প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করে যায় জয়দীপ। কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নয় — নিতান্তই ভ্রূণের গঠনগত ত্রুটির জন্যই যে অর্ধনারীশ্বর মানুষের জন্ম হয়, সে কথা বোঝানো যাবে না এঁকে।

এদিকে গোটা ঘরময় দাপাতে দাপাতে জেঠু বলতে থাকেন

—থাক। ঢের হয়েছে। বুঝে গেছি, কত বড় একটা অপদার্থ তুমি! যাও। আমার ম্যাও আমিই সামলাব এখন। আমিই কথা বলছি ওদের সঙ্গে। তুমি যেতে পার।

—ঠিক আছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে জয়দীপ। ঘর থেকে বেরোতে যায়। কিন্তু তার আগেই বারান্দায় ছুটে যান জেঠু; লুঙ্গির কষিটা কোমরে কষে বাঁধতে বাঁধতে। পিছনে তাঁর সমপ্রাণা সহধর্মিনী।

—অ্যা...ইই! প্রবল এক হুংকারে সম্ভবতঃ নিজের পেটের পিলেটিকে পর্যন্ত চমকে দেন তিনি। তোরা নাকি পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিস? অ্যাঁ? মগের মুল্লুক নাকি?

—হাঁ গো, পাঁচ হাজারই নিব যে। লাতি হইছে না তুমার? মাসি কিন্তু একদম অকুতোভয়।

—চো ও ও প! ইয়ার্কি হচ্ছে? মামদোবাজি? যত্তো সব গুন্ডা বদমাসের দল! দাঁড়া, তোদের আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করব আজ। এক্ষুণি পুলিশে ফোন করছি।

—আরে যা যাঃ! তড়পে ওঠে তারাও। উঠে দাঁড়ায়। রনং দেহি মূর্তি। অকথ্য গাল দিয়ে বলে, যাঃ! কর গিয়া ফোন। ডাক তোর বাপেদের। আমাদের লাইসেন আছে!

তিন জোড়া হাতে ফটাফট তালি বাজতে থাকে। কোমর দুলে ওঠে। দেশের যাবতীয় পুলিশের সঙ্গে দাসজেঠুর আশ্চর্য পিতা-পুত্র সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে। নর্দমার ঢাকনা খুলে যায় এবং কাদা বেরোতে থাকে হুড়মুড়িয়ে।

—ওরে থাম তোরা। থাম থাম। দুহাত তুলে আর্তনাদ করে ওঠেন দাসজেঠি। এক হাজার টাকা দেব। আমি একহাজার টাকা দেব তোদের। এবার চুপ কর তোরা।

—হবে না, হবে না। হাতের তীব্র এক ঝটকায় যাবতীয় সন্ধিপ্রস্তাব নিমেষে ছত্রখান করে দেয় মাসি এবং ভবতারণ। — আরে, তোর ওই বুড়া জাম্বুবানটা আমাদের গাল দেয়! আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিবে বলে! পুলিশে দিবে? ...দস্ দস্ হাজারের এক পইসা কম নিব না তোদের কাছে।

—দেব না। কিছুতেই দেব না। কেটে ফেললেও দেব না। ডাঙায় তোলা বৃহৎ কাৎলার মতই ছটকাতে থাকেন জেঠু।

—টাকা নেই। বিশ্বাস কর। টাকা নেই আমাদের। গরিব ছাপোষা লোক।

কোথায় পাব অত টাকা? — টাকার অভ্যস্ত দেমাক ভুলে আচমকাই করুণ কণ্ঠে গরিবির প্রবল দাবিতে সোচ্চার হন দাসজেঠি।

—টাকা না-ই? সে কি গোও? সোনো কতা! বলে, রাজার বাড়ি মুকুতার অভাব! খ্যা খ্যা করে হাসতে থাকে ওরা। বুঢ়া লোক, মিছা কথা বলতে লজ্জা নাই তোর? লজ্জা নাই!

বেদম বাওয়াল শুরু হয়ে যায়। কোনো পক্ষই বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রমেদিনী ছাড়তেও প্রস্তুত নয় আদৌ। জয়দীপ পালাতে চায়।

দরে না পোষানোয় নিজের শাড়ি টাড়ি প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি তুলে ফেলেছে মাসি। ছড়া কেটে, কোমর দুলিয়ে, ঘোর সন্ত্রাস তৈরি করছে সে

—দস্ হাত সাড়ি / এক টানে খুলতে পারি। ...দিবি না টাকা? কি গো? দেখবি না কি তাহলে? ...দেখাব? সুধু আমার বেটা সামনে আছে তাই সরম লাগছে; না হলে...

ব্যাপক চিল্লামিল্লির মধ্যে এতক্ষণে কোনো মতে একটু পথ করে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে জয়। একে ওকে পাশ কাটিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগোতে চায়। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নিরাপদ নয়। জেঠি চ্যাচান — যাস না জয়, যাস না। উত্তর দেয় না জয়দীপ। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে নামে। আর ঠিক তক্ষুণি প্রবল এক আলোড়ন ওঠে চতুর্দিকে। এবং তৎক্ষণাৎ, স্রেফ দর্শক-প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝে যায় জয়দীপ, সে পিছন ফেরা মাত্রই শাসানির কর্মটি অবিকল সম্পাদন করে ফেলেছে মাসি। তুমুল হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করছে

—এখুন লাচ হবে। লাচ। অতঃপর প্রিয় কমরেডদের প্রতি তোর সংগ্রামী আহবান ঃ এ্যাই! তুরা সব কাপড়া খোল রে। এই বুঢ়া সকুনটাকে লাচ দেখাতে হবে।

সহসা বিপন্ন একটি গলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে কেঁপে ওঠে চারিদিক।

—আ মরণ! তুমি এক্কেবারে হাঁ হয়ে গেলে যে? বলি, এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে এখানে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ওইসব নাচ দেখবে না কি?...যাও। ভেতরে যাও বলছি! স্বভাববিরুদ্ধ হুকুমের ভঙ্গিতে জেঠুকে ঘরের দরজা দেখান জেঠি।

মাসির দুষ্কর্মটির ফলে সমবেত দর্শকমন্ডলীর মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য যে লজ্জিত বিহ্বল আপাতঃ স্তব্ধতা নেমেছিল — এই প্রবল আর্তনাদে সহসাই ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায় সেটি। 'ওঃ! নমিতাদি এখনও বর সামলাচ্ছে রে।' ...উচ্ছ্বসিত হাসিতে উথলে পড়ে অডিয়েন্স!

গেটের তালা খুলতে খুলতেই শুনতে পায় জয়দীপ, নাচ দেখার ভয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করছেন দাসজেঠি। এখন পাঁচ দিতেই খুব প্রস্তুত তিনি।

—উঁ হুঁউ। সাত হাজার। স্‌সাত হাজারই্‌ নিব। এখুন সাত হয়ে গেছে।

—কেন কেন? এই যে পাঁচ বললি তোরা! আঁকুপাঁকু করে ওঠেন জেঠি।

—আরে সে তো বললাম আমার বেটা রিকোয়েস করলে বলে। আরে ভদ্দরলোকের ছেলে সব্বার সামনে 'মাসি' ডাকছে না আমাকে! ...তা ওর কথা তো তোরা সুনিস নাই বুঢ়িয়া। এখন তো সাতই লাগবে। পুরা সাত হাজার।

প্রতিপক্ষকে মোটামুটি শুইয়ে ফেলার আনন্দে, সেই যে সখী সাজা ভবতারণ টাইপ — সে তার নিজস্ব স্টাইলে নিলামে দর হাঁকার মত হাঁকতে শুরু করে

—সেভেন থাউজ্যান ওয়ান হানড্রেড... সেভেন থাউজ্যান ওয়ান হানড্রেড...

টাকার শোকে কাতর হয়ে পড়েন জেঠি। জেঠুর গলা শোনা যায় না। পাড়ার মহিলামহলের সামনে জেঠির অমন বেমক্কা ধমক খেয়ে শয্যা নিয়েছেন সম্ভবতঃ। ধমকানোটা চিরকাল তাঁরই মনোপলি কিনা।

টাকা নেই শুনে এবার আর রণচন্ডী হয়ে ওঠে না মাসি। অতি শীতল গলায় বলে

—টাকা নাই? ঠিক হ্যায়। গঙ্গাজল আছে তো। তবে এক ঘটি গঙ্গাজলই লে আ। ঢোল ভিজিয়ে নিয়ে চলে যাই আমরা। যাঃ, লে আ। —অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গি মাসির। যেন 'টাকা মাটি-মাটি টাকা' না হোক, অন্ততঃ টাকা এবং গঙ্গাজল — এই দুইই নিতান্তই সমার্থক ও সমমূল্য তাদের কাছে।

এই ঢোল ভিজিয়ে, যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাবার প্রস্তাবটি এমনিতে খুবই নিরীহ এবং আশাব্যঞ্জক মনে হলেও, আসলে কিন্তু খুব সুবিধার নয়। ব্যারাকপুরে রুদ্রদের পাড়ায় এরকমই একটি ঘটনার কথা শুনেছিল জয়দীপ। দরদস্তুরে একান্তই না পোষালে জল দিয়ে ঢোলের চামড়াটি ভিজিয়ে নেয় ওরা। ভেজা ঢোলের অদ্ভুৎ শব্দ ওঠে: ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্ ঢিব্। সবাই মিলে দুহাতে দমাদম বুক চাপড়াতে থাকে। টাকা নেয় না আর। কিন্তু বাপ চোদ্দপুরুষের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়ে একেবারে। অবশেষে প্রাণ খুলে গলা তুলে শাপমন্যি করতে করতে চলে যায়। সারা এলাকার কারো আর জানতে বাকি থাকে না — কারা, কোন পরিবারের লোকেরা দুর্ব্যবহার করেছে, এবং বঞ্চিত করেছে এই সব অভাগাদের।

ভয় পেয়ে যান জেঠি। জেঠুকে ডেকে আনেন। কাকুতি মিনতি করেন দুজনে। কিন্তু মাসি অটল। তার সেই এক কথা

—অত গাল দিয়েছিস, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবি বলেছিস, পুলিশে দিবি বলেছিস, আর টাকা দিবি না? হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে মাসি। যাঃ। ঘরে রূপিয়া নাই তো উধার লে। ব্যাঙ্কমে যা। ...সেভেন থাউজ্যান্ড ওয়ান হানড্রেড। এই বসছি আমরা। যা বাবু যাঃ। রূপিয়া লে আ...

ঘরের ভিতর থেকেই বুঝতে পারে জয়দীপ — জেঠিকে এবার পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। সেই আলোচনাই হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। সাতহাজারী শোকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দেন জেঠি।

মাসি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল সব। সিগারেট খাচ্ছিল। এবার এক মুখ ধোঁয়া উড়িয়ে কেমন যেন অন্য এক রকম গলায় আস্তে আস্তে বলে

--আরে কাঁদিস না রে বেওকুফ্ বুঢ়িয়া। কাঁদিস না। স্রিফ রূপিয়া কে লিয়ে কাঁদতে নাই রে...। আরে, লাতিই তো হইছে তোর — বেটাছেলে হইছে তো... হামারা মাফিক হিজড়া তো হয় নাই...

আন্না

অনিতা অগ্নিহোত্রী

জাগরি পূর্ণিমার রাতে আন্না বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছেন। রাগের মাথায় বেরিয়ে পড়েছেন তাই কোথায় যাবেন ঠিক করা হয়নি। দরজার মাথায় ছোট্ট আলোটা টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছে। কুলুঙ্গিতে তেল-ফুরনো, সলতে-পোড়া একটি মাটির প্রদীপ বসে আছে। দেবীপক্ষের গোড়ায় সাঁজবাতি দেখানো হত, তখন থেকেই রয়ে গেছে। ছোট্ট ঝাঁকড়া তুলসীগাছটা দরজার ডানপাশে। পথের চেয়ে সামান্য উঁচুতে বাড়ির ভিত। সিঁড়ির বালাই নেই। দরজার সামনে ঢিবির মতন মাটি ঢালু হয়ে রাস্তায় মিশেছে। বাইরে দিব্য জ্যোৎস্না। খান্দেশের কালো মাটি, আখ, অড়হর, তিসির ক্ষেত, গাঁ-গঞ্জ--- জ্যোৎস্নার মৃদু বালাপোষ মুড়ি দিয়ে ঘুমের তোড়জোড় করছে।

এবার দশহারা দেরিতে ছিল। আশ্বিনের শেষে। এখনই তাই সন্ধের বাতাসে হিমের ছোঁওয়া। এরপর ঠান্ডা বাড়তেই থাকবে। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি টুপি ছাড়া পথে বেরোনো যাবে না। গলায়, ঘাড়ে, চোখে, মুখে বাতাসের ছোঁয়া একরকম মিঠেই লাগছে। একটু আগে রান্নাঘরের মেঝেতে পিঁড়ে পেতে বসে চন্দনপাটায় জায়ফল ঘষতে ঘষতে ঘেমে যাচ্ছিলেন আন্না। এখন মনে হচ্ছে, কীসের জায়ফল, কার বা কী, সবই মায়া!

চর্তুদশীর চাঁদ একটু আগে পূর্ণযৌবন পেয়েছে। ঝলমলে একখানি কাঁসির মত সে তখন ধীরেসুস্থে নিজের আহ্লাদি মুখখানা দেখাবে। জ্যোৎস্নায় কেমন কুহক মাখা মনে হয় সামনের অনন্তদের বাড়ি, আর ওই দীর্ঘ, বাঁকা গলি। কাঁচা পথটা ক্রমশ নিচু হয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে গেছে। বাড়িগুলো পুরনো, হতকুচ্ছিত। কোনওটার টিনের মরচে ধরা চাল, কোনওটার পাঁচিল ফাটিয়ে অশ্বত্থ চারা উঠেছে। দু-একটা প্লাস্টারবিহীন দেওয়ালে সেই ষোলো শো ষাট সালের সবু, হাড়-জিরজিরে ইট। শায়েস্তা

খাঁর সময়কার। এইসব কুচ্ছিত জ্যামিতি ধুয়ে মুছে ভরাট করে দিয়েছে জ্যোৎস্না। মৃদু কস্তুরীগন্ধে আকীর্ণ হয়ে আছে বাতাস। এ কী কোনও অপ্সরার দেহগন্ধ। অথচ কোনও ফুলের গাছ তো নেই কাছে-পিঠে। পাটিলদের শিউলি গাছটাও বেশ দূর। শেফালিকে অবশ্য এদেশে বলে পারিজাত। নিমফুলের গন্ধও তো নয়! নিমগাছটা ছিল বাড়ির একেবারে কাছে, অনন্তদের দোরগোড়ায়। কাঁচা সবুজ-হলদে মেশামেশি পাতা পায়ে ঠেকত আসা-যাওয়ার পথে। অনন্তরা নতুন কোঠা তোলার সময় কেমন নির্দ্বিধায় নিমগাছটা কেটে ফেলল। একশো বছর বয়স হয়েছিল গাছটার। ওই নিমফুলের গন্ধ কতবার অন্ধকার মাতিয়েছে আন্নার যৌবনকালে।

এগোতেই ডানহাতে বিনায়ক ধনগরের ভাঙাচোরা বাড়ি। বিনায়ক একনম্বরের গোঁয়ার। মোষ দুটোকে বাঁধবে রাস্তার ওপরেই। বারণ শুনবে না। বাপ ছিল অন্ত্যজ, ভূমিহীন। ছেলে পরের জমি নিজে চষে লংকা, আখ, জোয়ার বেচে আসে অমলনের বাজারে। ভাগের ফসল। ব্রাহ্মণের ললাটচন্দন আর উপবীতে তার ভয়-ভক্তি কোনওটাই নেই। জাবনার কাঠের গামলা, কুচোনো আখের ছিবড়ে, জোয়ার বাজরার শুকনো খড়— সবকিছুর মিশ্র গন্ধ উপচে চাঁদের আলোর সুগন্ধ ভাসছে। এমন পূর্ণিমায় নাকি চাঁদের কিরণ পান করতে চলে আসে চকোর। জ্যোৎস্নায় স্নান করে বাতাসে লুটোপুটি খায়। চাতক যেমন বর্ষার জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটায়, চকোর তেমন চন্দ্রকিরণ ছাড়া অন্য কিছু পান করে না। এ কি কখনও সত্যি হয়? এ গাঁয়ের চকোরটিকে অবশ্য কেউ চোখে দেখেনি। তবে অন্নপূর্ণার কিছু বিশ্বাস, কল্পনা আছে ছেলেবেলা থেকে— চকোর তার মধ্যে একটি।

অন্নপূর্ণার কথা মনে পড়তেই একটা ছোট্ট ঘূর্ণি কণ্ঠার কাছ পর্যন্ত এসে আটকে গেল। রাগটা বেড়ে গেল। কষ্ট হল। বাড়ি ছেড়ে বেরোবার মুহূর্তটা মনে পড়তে লাগল। কারণটাও। আর তক্ষুণি শিউরে উঠে আন্না অনুভব করলেন, কী মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, দাঁত ফেলে এসেছেন। ওপরের আর তলার ছোট বড় দুই পাটি দাঁত। রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে দাঁতেদের মগের জলে ভিজিয়ে রেখে এসে জায়ফল ঘষতে বসেছিলেন। এখন তিনি সর্বহারা, বাক্‌শক্তিহীন। এর চেয়ে আন্ডারওয়্যার পরে বেরিয়ে এলেও ভাল ছিল। বুড়ো মানুষ, লোকে দেখলেও গা করত না। পাজামা পরেছেন, গেঞ্জি না পরেই শার্ট। রাগে শার্টের বোতাম লাগানো হয়নি, না হাতের, না বুকের! কিন্তু দাঁত? দাঁতের জন্য কি এখন ফিরে যাওয়া যায়? নাকি পিছনের দরজায় দাঁড়িয়ে পুত্রবধূ শান্তাকে ডাক দেবেন! শান্তা ইন্দোরের মেয়ে, বাপ গজাননরাও

দেশমুখ গত হয়েছেন, মেয়েটির গোলগাল শান্ত মুখে এখনও বিষাদছায়া। আন্না চাইলে মগ সমেত দাঁতের পাটি এনে দিতে পারে, আবার আটকেও দিতে পারে। বলতে পারেন, এখন কোথায় যাচ্ছেন? আজ না কোজাগর! মা লক্ষ্মী এই সময়ে নেমে আসেন। পথে ঘুরে গৃহস্থের ঘরের সামনে ডাক দেন, কে জাগে রে! কে জাগে!

পাছে ঘুম আসে, এই ভয়ে কোজাগরির রাতে সবাই জেগে থাকে। নইলে এই গাঁয়ের মানুষ কি রাত ন'টার পর জাগার পাত্র! আজ পথেঘাটে লোকজনের আনাগোনা, ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। রোয়াকে বসে পুরুষমানুষেরা তাস পিটছে, মেয়ে বউদের ব্যস্ততা—চলাফেরা, বাইরে থেকে আবছা বোঝা যায়। আন্না এগিয়ে চললেন। ডানদিকে বেঁকে, আবার বাঁদিকে ঘুরছে গলি। এই রাস্তাটা পাথরবাঁধানো, ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। দু'ধারে মনোহারি দোকান, খাবারের, কাটা কাপড়ের, মোটর পার্টস ও ডিজেল পাম্পের। এবার রাস্তার মাঝখানে শিবাজি মূর্তি আর ফলক। এইভাবে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল গলির প্রত্যন্ত। ডানদিকে ধুলো-ওড়া বাসস্টেশন। এখানে রাজ্য পরিবহণের বাসে আসে চোপড়া, এরণ্ডোল, পালধি, জলগাঁও, ভুসাওল থেকে। দিনরাত মাইকে বাসের নাম, নম্বর, কন্ডাক্টরের নামের অ্যানাউন্সমেন্ট চলছে। বাসস্টেশনের মুখোমুখি একটু ধুলোওড়া খালি মাঠ, এখানেই শীতে অপেরা কনসার্ট বসে, কখনও বা ম্যাজিক আসে, সার্কাস। দশহরার দিন রাবণের কুশপুত্তল দাউ দাউ জ্বলে ওঠে।

মাঠের বুক চিরে পায়েচলা এক পথ আপন মনে গাছগাছালির ভিড় ও আখের ক্ষেতের বুক চিরে চলে গেছে। ফসল কাটাই শেষ। এখন আকাশের নীচে টান টান শুয়ে আছে কালো মাটি। খরিফে জোয়ার, বাজরার চাষ হয়েছিল। তারই ফাঁকে কিছু সবজিও ফলিয়েছে উদ্যমি কৃষাণ। এই অঞ্চলে বেশ কিছু বড় বড় কুয়ো আছে। কুয়োকে এদেশে বলে বিহীর। কোথাও কোথাও কাঁচা পথ কেটে ক্ষেতে জল নিয়ে গেছে চাষি। ওখান দিয়ে হাঁটতে গেলে ঠাহর করে কাদাজল দেখে নিতে হয়। এখন ওপথে যাওয়া কি ঠিক হবে? এমনিতে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় পথ চলতে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু আন্নার দৃষ্টির জোর আগের মতন নেই আর। তাছাড়া চন্দ্রালোক এমন এক কোমল আভায় পথঘাট, ঘরবাড়ি, উঁচুনিচু সমান মসৃণ করে দিতে থাকে যে হোঁচট খাবার ভয়।

ভুসাওল-সুরাত প্যাসেঞ্জার গাড়ি চলে গেছে সেই সন্ধে সাতটায়। ডাউন-গাড়ি আবার কাল ভোরে। আমেদাবাদ মেল এই ছোট্ট স্টেশনের হাতছানি

শোনেনি। ঝমঝম চলে গেছে একটুও স্পিড কম না করে। ওই বাজরা ক্ষেতের মাঝামাঝি কোথাও ট্রেন লাইনটা শুয়ে আছে, কারণ চাঁদের আলো চিকচিক করছে একটি অস্ফুট সরলরেখায়।

আচ্ছা, অন্নপূর্ণা ওরকম করল কেন? ছোট ছোট ব্যাপারে এত জেদ ভাল লাগে? এই বয়সে মানুষ আর বদলায় না, আন্না জানেন। কচি বয়স থেকেই ও মেয়ে একরোখা। নিজে যা ঠিক করবে, তাই। আঠারো বছর বয়সে এ বাড়িতে এসেছিল। কোকণ দেশের কটা সবুজ চোখ, কানে মুক্তোর দুল, নাকে মুক্তোর নথ, তখন ন'হাত শাড়ি কাছা দিয়ে পরে। বিয়ের দু'দিন পর। রান্নাঘরের মেঝেতে পিঁড়ি পাতা হয়েছে। খড়ির গুঁড়ো, রং দিয়ে রঙ্গোলী করা হয়েছে মাটিতে। ওই নকশার মধ্যে ভারি ভারি পিতলের থালা বসবে। প্রথমে খেয়েছিলেন আন্না, ওঁর খুড়তুতো ভাই গজানন, অনন্তের বাপ। এ ছাড়া তিনজন ভাইপো, অমলনের রঘুকাকা। তারপর ক্ষিদে পেয়ে গেছে নতুন বউয়ের, এই মনে করে বড় মাসি অন্নপূর্ণাকে ডেকে বলেছিলেন, কই বসো ওই পাতে!

ঘন নীল শাড়ির পুণেরী পাড়ের ঝলক তুলে তরুণী বধূ ক্ষিপ্র হাতে আন্নার এঁটো থালাটা কেমন তুলে ফেলল, বলল, দাঁড়ান, মেজে নিয়ে আসছি।

—ও কী, থালা মাজবে কেন? স্বামীর পাতেই তো বসতে হয়।

—ওঁর পাতেই বসবো, তবে এঁটো থালায় না। ধুয়ে নিলে কি ভক্তি কমে যাবে?

মাসি তো হতবাক। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কানাকানি। শাশুড়ি নেই, চলে গেছেন অনেকদিন হল। এখন তো এ মেয়ে ঘোড়ার মতো সংসার দাপিয়ে বেড়াবে!

পাশের ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে আন্না বলেছিলেন, মাসি, ওকে মাজা থালাতেই খেতে দাও, আমার এঁটো থালা মাজতে হবে না।

এ মেয়ে বদলায়নি। মুম্বই থেকে লোনাভোলা। নাগপুর থেকে বিরণগাঁও। অচেনা বসতে কতবার সংসার পাতা, অচেনা মানুষজন প্রতিবেশী। কোনদিন নিজের রোখ ছাড়েনি। লুকিয়ে কেঁদেছে, অথচ বাইরে কোনদিন এক ফোঁটা জল কেউ দেখেনি চোখে।

পূর্ণিমা যদিও পৌনে আটটাতেই লেগেছে, তবুও কোজাগরির আসল মুহূর্ত মধ্যরাত বলেই মেনে এসেছেন আন্না। এ বাড়িতে বরাবর তাই মানা হয়। মাকে হারিয়েছেন ছ'সাত বছর বয়সে। মায়ের মুখ, অবয়ব—স্মৃতিতে একেবারেই ঝাপসা। ছোটবেলা থেকেই দেখছেন, বাপ কোজাগর পালন

করেন মধ্যরাতে। চালুনি চাপা দিয়ে নৈবদ্য সারারাত চাঁদের আলোয় রেখে দেন। ওই প্রসাদ সকালে খেলে নাকি যক্ষ্মারোগের ভয় থাকে না। কিন্তু অন্নপূর্ণার অত ধৈর্য নেই। নৈবেদ্য রেঁধেছি, পুজো সেরেছি, ব্যস, এবার রাত জাগতে হয় তুমি জাগো—আমি চললাম শুতে। তাহলে জাগবে কে? আন্নার এখন আর শরীর বয় না—সন্ধেবেলা খাওয়াদাওয়ার পর চোখের পাতা জুড়ে ঘুম দৌড়ে আসতে থাকে।

আজ বিকেলে জিজা, মানে জিজাবাঈ কুয়োতলায় বসে ঝকঝকে করে ডেকচি মেজে দিয়ে গেছে। গায়কোয়াড়কে কালই বলা হয়েছিল, তিন সের দুধ দিয়ে যাবে। ও ভোলেনি। সন্ধের মুখে ঘরের সদর চৌকাঠে গোবরছড়া দেওয়ার সময়ই সাইকেলের টিং টিং টিং। ছোট্ট একচিলতে ভাঁড়ারঘরে কাঠের আগুনে ঘন করে দুধ জ্বাল দেওয়া হয়েছে। মোষের দুধে চিরঞ্জী ও এলাচের গুঁড়ো, চন্দনপাটায় জায়ফল ঘষে একেবারে শেষে দুধে ফেলা—এ হল আন্নার নিজস্ব সংযোজন। এলাচ তো দেওয়া হয়েছে, আবার জায়ফল কেন---এই বলে অন্নপূর্ণা আপত্তি করেছিলেন। কোন কৌটোয় আছে--আমার মনে নেই, বলে কাটাতে চেয়েছিলেন। আন্নার মন ভরেনি। নৈবেদ্য বলে কথা! একটু কাজুবাদাম ভাঙাও পড়েছে। যদিও গত বছরের দীপাবলির সময়কার—একটু গুমো গন্ধ হয়ে গেছে, তা হোক।

আন্না কেমন হুট করে বেরিয়ে চলে গেলেন। দরজার ছিটকিনিতে মশারির দড়ির ফাঁস টাঙাতে টাঙাতে শান্তা ভাবছিল। কিসে যেন গোলমালটা বাধল--বোধহয় ওই মাঝরাত পর্যন্ত জাগার কথা। অন্নপূর্ণা মাথা নেড়ে সাফ বলেছিলেন, আমি ওর মধ্যে নেই। এমনিতেই দুধের হাতা নেড়ে কাঁধ টনটন, ঘাড়ে ব্যথা। ওই কুয়োতলায় টুল পেতে নৈবেদ্য রেখেছি। এখন সাড়ে আটটা। এক ঘন্টা পরে চাঁদকে নমস্কার করে ঘরের ভিতর নিয়ে আসব। শুতে হবে তো, না কি?

কুয়োতলাটা বিজন। বাঁ হাতে একটু দূরে গোটু কাঁসারদের ভাঙাচোরা পাঁচিল। ডান হাতে কুয়োটা একেবারে আন্নার ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য বাইরের ঘরের জালের জানালাপথে এত শীত আসে কার্তিকের পর থেকে। কুয়োর কালো জল থেকেই বুঝি উঠে আসে পুঞ্জ পুঞ্জ শৈত্য। অন্নপূর্ণার পুরনো শাড়ি দু'ভাঁজ করে জানলায় রেখেও সে শীত ঢাকা যায় না। কাঁসারদের গোবদা মোটা হুলোটা ওইখানে ঘোরে। বাসি ভাতবুটিতে বেশ চেহারাখানা হয়েছে। তবু জিজাবাঈ যখন বাসন মাজে তখন কিছু খাবার হাসিল করার তালে থাকে। একবার জ্যৈষ্ঠের মধ্যরাতে কুয়োর জলে ঝপ করে শব্দ। উৎকর্ণ আন্না ঘুমের মধ্যেই বলে উঠেছিলেন, আঃ, হুলোটা পড়েছে।

অন্ধকারে হুলোটা জলে পড়ে গিয়েছিল সে রাতে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী ছিল। তবে মরেনি। মরলে গৃহস্থের মহা অকল্যাণ। পাথরের গায়ে কুয়ো-সাফাই-ওয়ালাদের পা রাখার জন্য যেসব ঢালাই লোহার আংটা আছে, সাঁতরে এসে তাদেরই একটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। সকালে গোটু বালতি ফেলে বেড়ালকে তুলে আনল।

ওই বেড়াল এ ক'বছরে আরও মোটাসোটা হয়েছে। আরও হিংস্র, হ্যাংলা। কুয়োতলার সামনে থইথই চাঁদের আলো। ওখানে ক্ষীরের ডেকচি রাখলে কৌতূহলি বেড়াল সব উলটে দুধ ছড়িয়ে চলে যেতে পারে। মাঝরাত পর্যন্ত কাউকে তো আগলাতে হবে?

—আমি জাগতে পারি। আম্মি, আমার ঘুম পাচ্ছে না। শান্তা চিবুকের নীচে ধরা চাদরের পাট খুলতে খুলতে বলেছিল।

—একদম না। অন্নপূর্ণা আঙুল তুলে বললেন, মশারি খাটিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়বে তুমি। শরীর ভাল না, পা ফুলেছে, রাত জাগার শখ! দেখছ না, এখনই হিম পড়তে লেগেছে আকাশ থেকে। চন্দ্রে যাঁর অচলা ভক্তি, তিনিই জাগবেন।

শেষ কথাটাই মর্মান্তিক হল। তপ্ত ঘিয়ে হিং-সবষে ফোড়ন পড়ল। দড়ির চারপাইয়ের ওপর পাতলা কাপাসতুলোর তোশক। তার ওপর সাদা চাদর পেতে নিজের হাতেই বিছানা করে নেন আন্না। সবশেষে টাঙানো হয় সুতোর মশারি। মশারির ছাতটি হতে হবে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আয়তক্ষেত্র, অন্য কোনও আকার বা চরিত্রের চতুর্ভুজ আন্নার সয় না। মশারির দরজা আলতো করে ফেলা ছিল। দরজা সরিয়ে বিছানায় হামাগুড়ি দিতে দিতেই কানে এল --''চন্দ্রে যাঁর অচলা ভক্তি—'', কারণে অকারণে বাঁকা কথা কেন? নীচে নেমে এলেন আন্না। সদ্য ছেড়ে রাখা পাজামা, তার ওপর খালিগায়ে সার্ট গলিয়ে চটি পরে চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেন। কাঠের ফ্রেমে লোহার তার আর জালি দেওয়া সদর দরজা। বাইরে থেকে হাত গলিয়ে হুড়কো লাগিয়ে দিলেই আবার বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে যাবে, শান্তা বুঝতে পারেনি। আজকাল তার শরীর শ্লথ, ভারী। পায়ের দুই পাতা ফোলা। অঘ্রাণের মাঝামাঝি পাকা ফসলের একটু আগেভাগে যে এসে হাজির হবে, তার ঘনঘন পাশবদল আর পা ছোঁড়ায় রাতে ঘুমোনো মুশকিল। এ বাড়ির ছাতগুলি খুব নিচু, আশ্চর্য সব জায়গায় চৌকাঠ, প্রত্যেক ঘরের মেঝের লেভেল আলাদা। তাছাড়া মেঝেও অমসৃণ, গ্রানাইট ব্লক দিয়ে তৈরি। অল্প শীতে পায়ে ফাট ধরে এই

শুকনো দেশে। পায়ের ফাট মেঝেতে ঘষা লেগে পা আটকে যাবার ভয়, তাই আস্তে এগিয়েছিল শান্তা। দরজার কাছে এসে দেখে, আন্না হনহন হেঁটে গলির বাঁক পেরিয়ে যাচ্ছেন, ছোট্ট বারান্দায় টাঙানো শাড়ির পাড়ের দড়ি অল্প অল্প কাঁপছে। হয়তো বেরোনোর মুখে আন্নার হাত লেগেছিল দড়িতে।

বাইরে ঝলমল করছে দিব্য জ্যোৎস্না। দরজার কাছে ধনগরদের বাচ্চা ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা বাটি।

—কী রে ওতে? শান্তাবাঈ জিজ্ঞেস করল।

—চিনি। মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাটি নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে শান্তা বলল, আন্না চলে গেছেন।

অন্নপূর্ণার ভ্রূ সামান্য কুঁচকে গেল। বললেন, বাটিতে কী দেখি? ও ধনগররা চিনি ফিরিয়েছে বুঝি? দেখেছো, ওদের দিলাম বাজারের ভাল চিনি আর আমাকে ফিরিয়েছে এই রেশনের মোটা লাল দানা! রান্নাঘরের ভিতর থেকে হেঁকে বললেন, অ্যাই, যা বাটি নিয়ে যা, ভাল চিনি আনবি।

ছেলেটা মিনমিন করে চৌকাঠের ওধার থেকে বলল, আজী, আমাদের তো আর চিনি নেই। আখের গুড় আছে, আনব?

ঘটনা এইভাবে নিকটতম অতীতকে ছেড়ে দূরে বাঁক নেওয়ায় শান্তাবাঈ অস্থির হয়ে উঠেছিল। এত রাত, আন্নাকে খুঁজতে যাবে কে, ওকে তো আর অন্নপূর্ণা তখন বেরোতে দেবেন না! তাই ছেলেটার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, এই তুই পালা তো এখান থেকে। গুড়টুড় আনতে হবে না। ছেলেটা অপ্রত্যাশিত ভাবে ছাড়া পেয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

শান্তা বলল, এখন কী হবে আঈ?

অন্নপূর্ণার মুখ গম্ভীর অথচ মোটেই চিন্তাকুল নয়। বললেন, কী আর হবে? এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো আনো, একটু চাল আর ঠাকুরের কৌটো থেকে একটু সিঁদুর দাও তো? আচ্ছা, আংটি? হ্যাঁ, আংটি তো আমার আঙুলেই আছে। এইসব একটা বড় পিতলের থালায় গুছিয়ে নিয়ে অন্নপূর্ণা কুয়োপাড়ে চলে গেলেন। পেছন পেছন শান্তাবাঈ গেল ডেক্‌চি ভর্তি ক্ষীর নিয়ে। আকাশের ঝলমলে চাঁদকে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন অন্নপূর্ণা। তারপর ডান হাতের তিন আঙুলে করে ধরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন অক্ষত আলোচাল সিঁদুর হলুদ সবকিছু। আংটিসহ থালাটি ঘুরিয়ে দেখালেন চাঁদকে। তারপর ইশারায় শান্তাকে বেঁকতে বারণ করে ক্ষীরের ভারি পেতলের পাত্রটাও একবার বামাবর্তে আর একবার দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়ে নিবেদন করলেন। অতদূর থেকে চাঁদ কী কিছু বুঝল—মন্ত্রোচ্চারণ, ঘ্রাণ, নমস্কার, ইচ্ছাপূরণের

প্রার্থনা? কিন্তু সে আগের মতোই উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে চেয়ে রইল।

ফেরার সময় হঠাৎ শান্তাবাঈ-এর চোখে পড়ল খিড়কি দরজার খোলা চৌকাঠের দিকে। ওইখানে ছোট্ট অ্যালুমিনিয়মের মগে জলের মধ্যে ডুবিয়ে আন্না ওঁর বাঁধানো দাঁতের পাটি রাখেন। জলে ডোবানো দুই পাটি অট্টহাসি দেখে শান্তা আস্তে করে বলল, আঈ, আন্না কিন্তু দাঁত ফেলে গেছেন।

—তাই নাকি? বলে খুশিমনে অন্নপূর্ণা থালা ডেকচি সব রান্নাঘরের মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। বললেন, দাঁত ফেলে গেছেন যখন, বেশি দূর যেতে পারবেন না। ফোকলা মুখ নিয়ে ওঁর ভারি লজ্জা।

মেসোজয়িক যুগের শেষে পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বুক জুড়ে বিশাল লাভার প্রবাহ বয়ে গেছিল। দক্ষিণ মালভূমির একেবারে উত্তরভাগে এই পূর্বখান্দেশ অঞ্চল। পৃথিবীর উপরিত্বকের দীর্ঘ, সূক্ষ্ম সব ফাটল এবং সূচিপথ বেয়ে সেই লাভা অনুভূমিক পাথরের স্তরের চেহারা নিল। সমস্ত খান্দেশ এই লাভা-ব্যাসাল্টে ঢাকা। মাটিতে বোর-হোল খুঁড়লে নানা অনুভূমিক প্রবাহকে আলাদা করে চেনা যাবে। একদা বহমান লাভা আজ স্তব্ধ, স্থির। পাহাড়ের দিকে তাকালেও ঈষৎ স্বতন্ত্র, প্রায় অনুভূমিক লাভা স্তরগুলিকে চেনা যায়। কোথাও কোথাও দুই স্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম বনাতৃণের রেখা চোখে পড়ে। এত লতা পাথরের মধ্যেও আছে দীর্ঘ পলিমাটি ঢাকা উর্বর চাষের জমি। কারণ পূর্বখান্দেশের হৃদয় চিরে বহে যায় তাপী নদী। আশি মাইলের মতন পথ এই নদীর সঙ্গে চলতে চলতে পূর্বখান্দেশ তার মেসোজয়িক লাভা যুগকে ভুলে গেছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য।

তাপী নদীটি কিছুটা সৃষ্টিছাড়া। কারণ দক্ষিণ মালভূমির অন্য নদীগুলির মতন সে পশ্চিম থেকে পুবে বয়নি। তাপী ও তার শাখা নদীরা পূর্বখান্দেশকে বিধৌত করে পুব থেকে পশ্চিমে গিয়ে আরব সমুদ্রে পড়েছে। সুরাতের বারো মাইল পশ্চিমে, কাম্বে উপসাগরে।

পূর্বখান্দেশের উত্তরে সাতপুরা পর্বতমালা। উত্তরপূর্বে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যপর্বতসঙ্কুল অঞ্চল। পূর্বে বিদর্ভ, দক্ষিণে মারাঠাওয়াড়া। অজিণ্ঠা, সাতমালা ও চান্দোর পাহাড়শ্রেণী খান্দেশকে মারাঠাওয়াড়া থেকে আলাদা করে রেখেছে। পশ্চিমে নাসিক ও ধুলিয়া জেলা। ধুলিয়াই স্থল এককালের পশ্চিম খান্দেশ। পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ অবিভক্ত অঞ্চল ছিল, ১৯০৬ সালে তারা প্রশাসনিক সুবিধের নামে আলাদা হয়ে গেল। পূর্ব খান্দেশের মধ্যে তাপী নদীর দুটি বিচিত্র রূপ। অনেকটা দূর পর্যন্ত তাপীর দুই কূল উঁচু, খাড়াই; পাড় বেয়ে গভীর

বেহড়। চাষের কাজে অথবা নদীপথে চলাচলের কাজে নদীকে এখানে লাগানো সম্ভব হয়নি। কোথাও কোথাও নদীতীর নদীতল থেকে যাট ফুটের মতন উঁচু, ধাপে ধাপে উঠে গেছে। নীচের হলুদ মাটি কেটে, খইয়ে জল বয়ে গেছে। ওপরের পাড় আরও উঁচু হয়ে শেষে ওপিঠে গড়িয়ে জনবসতের সীমায় মিশেছে। এরপর কিন্তু নদী বয়ে গেছে ধীরে, বালুময় খাত নিয়ে। বর্ষায় নদীজল তোড়ে বয়, বড় বড় পাথর, ছোট নুড়ি, বালি সবকিছু সঙ্গে নিয়ে। নদীর বাঁকে পাথর, বালি জড়ো হয়ে পড়ে থাকে, জল এগিয়ে চলে। অন্য ঋতুতে নদীজল শান্ত, বালিয়াড়িগুলি তখন বাঁধের মতন শান্ত জলকে ধরে রাখে। তাপীর ওপর দুটি ব্রিজ—ভুসাওলের রেলব্রিজ আর সাওখেড়ার ব্রিজ—চোপড়ার কাছে। বর্ষার দিনে এত জল থাকে যে পেরোনো যায় না। অমলনের, চোপড়া, এদলাবাদ, ইয়াওল—এইসব এলাকায় ফেরি নৌকো চলে। অন্যত্র গাঁয়ের মানুষ খাটুলি ভাষায়, গরুমোষদের সাঁতরে পার করায় নাইয়ারা।

বেহড়ের পর নদীর পলিমাটিসমৃদ্ধ এলাকাটি আরম্ভ হয়েছে; এই পলিমাটির এই আঁচলখানিই খান্দেশকে ধনধান্যে ভরে রেখেছে। চাষ-আবাদ ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমায় তৈরি হয়েছে ছোট ছোট বাজার শহর। উত্তরে রাভের, সাওড়া, ফৈজপুর, চোপড়া। দক্ষিণে অমলনের, পারোলা, নাস্‌রাবাদ, ভুসাওল, বিরণগাঁও। শহর-গ্রাম মিলেমিশে আছে এইসব বাজার কেন্দ্রে। তুলো, সুতোকল, রেলজংশন, আখ, চিনিকল, চিনি সমবায় সমিতি—এরাই শোরগোল তুলে বাতাস মাতিয়ে রেখেছে। আরও দক্ষিণে গির্‌না নদী। তার উপত্যকায় ক্যানাল দিয়ে জলসেচন চলে সারা বছর। আখমাড়াই করে জমজমাট হয়েছে ভাঁদ্‌গাও আর পাচোরা। গির্‌না নদীর সবুজ কর্ষিত উপত্যকা পেরোলে দক্ষিণ সীমান্তের অজিণ্ঠা, সাতমালা, আর চান্দোর পর্বতমালা।

উত্তরে সাতপুরা পর্বতশ্রেণী। কেবল দৈর্ঘ্যে নয়, প্রস্থেও সে বিশাল। পূর্বখান্দেশের উত্তর সীমানার পুরোটা যদি একনজরে দেখা সম্ভব হত, তাহলে এক খাড়াই দক্ষিণ ঢাল বিস্ময় জাগাত। তাপীর কূলবর্তী পলিমাটির যে দীর্ঘ সবুজাভ আঁচল, যেন তার একেবারে কোল ঘেঁষেই উঠে দাঁড়িয়েছে এই পাহাড় দেওয়াল। ওই দেওয়ালের ওপারে কত যে শৃঙ্গ, টিলা, পাথরের ঢেউ—তার অন্ত নেই। আনের আর সুকি নামের দুটি ছোট, খর নদীর উপত্যকাকে সাতপুরা তার বিশাল বুকের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। কোথাও অরণ্য গভীর, ঠাসবুনোট, যেখানে অরণ্য ক্ষয়ে এসেছে, সেখানে মালভূমি ব্যাসাল্টের নানা স্তর, নানা কৌণিক জ্যামিতি ঠাহর করা যায়। যোগাযোগ বলতে এ অঞ্চলে পায়ে চলা পথই, কোথাও কর্ষিত ভূমির এক ঝলক,

কোথাও ছোট দু-একটা পাহাড়ি গ্রাম চোখে পড়ে। আধ্‌গাঁও থেকে ঠপ্‌নি একটা চলা-পথ গেছে, আর একটা পথ গেছে লাসুর থেকে ভার্‌লা। এই অরণ্যে থাকে ভীলেরা, পূর্বখান্দেশ জেলার আদি মালিকানা যাদের ছিল।

উত্তরে, আরও উত্তরে, সাতপুরার ঢাল ক্রমশ নেমে গেছে নর্মদার অববাহিকার দিকে। বিচিত্র, গম্ভীর, সুন্দর নর্মদা নদীর জলপ্রবাহ অভিমুখে।

কে জানে কারা থাকত এখানে, বহু আগে, যখন কেবল নদী পাহাড়রা ছিল, অরণ্য ছিল, তখনও তাদের নামকরণ হয়নি, অথবা ছিল অন্য নাম।

নিঝুম দুপুরে তুলোর ক্ষেতে কাজ করতে করতে কিষাণ কখনও কী ভাবে, কাদের হাসিখেলার নানা রঙের টুকরো মিশে আছে কালো মাটিতে? গ্রানাইট দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় খটাখট ভারি খুরের শব্দ তুলে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খিলার বলদ, কমলা রঙে রাঙানো তার শিঙে ছোট মেয়ের বাঁধা ঘুঙুর। বাতাসে নাক তুলে সে আসন্ন বৃষ্টির ঘ্রাণ নেয় আর মস্ত কালো চোখে ধরা পড়ে না-দেখা সময়ের টুকরো ছবি।

ভাকড় নদীর ওপর ব্রিজ যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন পাহুড়-অজিণ্ঠা রোডের মাটির তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল আশ্চর্য সব প্রাচীন প্রত্নচিহ্ন— একজোড়া মস্ত মাটির জালা, নকশা করা পাত্র, ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র। ওই জোড়া পাত্রে যমজ শিশুকে কবর দিয়ে মাটির নীচে শোওয়ানো হয়েছিল একদিন। গির্‌না আর তাপীর অববাহিকার মাটির বুকে এমন কত চিহ্ন ছড়িয়ে গেছে প্রত্নযুগ। লালের ওপর কালো রং করা মাটির পাত্র, পাথরের পুঁতি কত আর ঝিনুক। তেমনই সাতপুরার পাদদেশের মাটি থেকে বেরিয়েছে প্যালিওলিথিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র, হাতকুঠার আর ভোঁতা ছোরাছুরি। আন্না বলেন, বিরণগাঁও-এর উত্তরের বালুকা-শহর এরণ্ডোলই নাকি একচক্রা নগরী—ওখানে ভীমের পুরোনো গড় আছে আজও। বকাসুরকে মেরেছিলেন ভীম। বকাসুরই নাকি আদি ভীলদের গ্রাম নেতা ছিলেন। ভীলদেরই আর্য-লিখিত ইতিহাস অসুরে পরিণত করেছে।

রাজা আসে যায়। রাজা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আনুগত্যের স্নায়ুকেন্দ্র গড়ে ওঠে, নতুন দলপতিরা জন্মায়, রাজস্ব আদায়ের নতুন কারিগরি তৈরি হয়। জনপদ বিজয়ের অভিযান তার অভিমানতাড়িত স্বাক্ষর রেখে যায় পাথরের বুকে, শিলালিপিতে। কখনও বিজন পর্বতমালার গুহাকন্দরে মশালের আলোয় আঁকা হতে থাকে চিত্র ইতিহাস। রাজনীতির দানবদলের খেলায় যাদের অস্তিত্ব সংকট দীর্ণ হয়ে পড়ে সেইসব সাধারণ মানুষ, কৃষক, বনপর্বতচারী ভীল, নাহাল, তাড়্‌বি, বনজারি অথবা পাটিলদের জীবনযাপনের ইতিহাস কোথাও লেখা হয়নি, লেখা হয়নি তাদের সুখদুঃখের বারোমাস্যা।

—ওই দেখ, ওইসব ছিল তাণ্ট্যা ভীলের জমি। আন্না আঙুল তুলে শান্তাকে দেখিয়েছিলেন একদিন—রেললাইনের ওপারে দুপুরের খররৌদ্রে জ্বলতে থাকা জোয়ারের ক্ষেত, আখের দুর্গপ্রাকার, ময়লাটে সবুজ রঙের; আর বাবলার খর্ব ছায়ায় পড়ে থাকা কালো নগ্ন অকর্ষিত মাটি। অনন্তদের ফর্সির দোকান। মেঝেতে লাগানোর গ্রানাইট ফর্সি। দোকানঘর থেকে রেলস্টেশনের পেছনের একটু অংশ দেখা যায়, আর রেললাইন। লাইনের ওপারে বিস্তৃত ক্ষেত, নিরঙ্কুশ আকাশ। স্টেশনের খুব কাছে একটা অশ্বত্থ গাছ, তার হালকা সবুজ পাতা রোদে ওলটপালট হয়ে কোমলতর রং দেখায় বুকের। পঞ্চাশ বছর আগেও দেখাত।

অনন্তের বাবা, ওদের কাকাসাহেব, মোটা পায়ের পাতায়, হাত বোলাতে বোলাতে শুধিয়েছিলেন,—আচ্ছা, খাজা নাইক-এর সমাধি আছে না এই কাছেই কোথাও?

আন্না বলেছিলেন, আছে, আমিও শুনেছি, তবে জায়গাটা কোথায়, এখন খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। আগে যেখানে 'গোচর' ছিল, শ্মশানভূমি ছিল, দিয়ারা ছিল, সেখানেও তো রম রম করে চাষআবাদ চলছে।

—আমিও শুনেছি। বোড়সকাকা বলেছেন। শান্তা বলে উঠেছিল। বৃদ্ধ বোড়স, আন্নার কৈশোরের বন্ধু কাঁপা হাতে চা করতে করতে, কিছু চা কাপের বাইরে ফেলতে ফেলতে শোনাচ্ছিলেন, সাত-পুরোনো গল্প, বাড়ির রান্নাঘরে বসে। সিলিং থেকে মোটা দড়ি দিয়ে ঝোলানো আমকাঠের পোক্ত দোলনায় বসেছিল শান্তাবাঈ, গ্রামের মধ্যিখানে কোথায় ঔরংজীবের দরগা, কোথায় জেমস উট্রামের বুরুজ—এইসব। অনেকদিন ধরে জ্বলছে খান্দেশ। দশহরার দিন বিজয় অভিযানে বেরোত মারাঠা সৈন্যদল। ইংরেজ-এর ছাউনি এখানে, এই বিরণগাঁওতে। মারাঠাদের ছোবল এসে পড়ত বার বার। ১৬৮০ পর্যন্ত শিবাজি আসতেন, তারপর ১৬৮১-তে শম্ভাজি। শিবাজির মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের পথের কাঁটা সরে গেল। দশ হাজার মোগল সৈন্য রায়গড় থেকে এসে খান্দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছাউনির ইংরেজরা ঘন্টাদুয়েক সময় পেয়েছিল পালাবার। ছিন্নভিন্ন, আগুনে পোড়া বিরণগাঁওকে পিছনে রেখে চলে গেছিল মোগল সৈন্যবাহিনী। রাজাদের আসা-যাওয়ার পথের ধারে মারা পড়ল উলুখড়েরা। তবু হাল ছাড়েনি। মড়ক, যুদ্ধ, ধ্বংসের স্মৃতি কাটিয়ে উঠে নতুন করে ঘরবসত করতে চেয়েছে এই প্রাচীন গ্রাম। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ। ঔরংজীব মারা গেছেন। তখনও ঐতিহাসিক বার্ণ লিখছেন, ধিকিধিকি ধোঁওয়া উঠছে খান্দেশের বুক থেকে।

সারি সারি দগ্ধ গাছ, উৎসন্ন ক্ষেত, মানুষের কংকাল, পশুর হাড়গোড় পথেঘাটে। মাঝের এই ক'বছরে বছরে একলক্ষ করে মানুষ মারা গেছে যুদ্ধে, বছরে তিন লাখেরও বেশি উট হাতি আর ভারবাহী বলদ। তারপর এল কালান্তক মহামারী প্লেগ। কুড়ি লক্ষেরও বেশি প্রাণ ধোঁওয়া হয়ে উড়ে গেল।

১৮১০। অনাবৃষ্টির খান্দেশে তখন পাহাড়ি ভীলেদের দখলদারি—পাহাড়ের কন্দরে থাকে, গিরিপথগুলি তাদের কব্জায় আর উল্কার মত হানা দেয় গ্রামে, গ্রামান্তরে। ভীল উত্থান চলেছিল গত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত। বিরণগাঁও তখন ভীলেদের শক্ত ঘাঁটি। গভর্নর এলফিনস্টোন হুকুম পাঠালেন---জেনারেল উট্রাম এসে ১৮২৫-এ ছাউনি ফেললেন। তৈরি হল ভীল রেজিমেন্ট। খাঁচার বাজ দিয়ে বনের পাখি ধরার বাঁকা ষড়যন্ত্র। রেললাইনের লাগোয়া ওই জমিতে যার সমাধি আছে বলে জনশ্রুতি, সেই খাজা নাইক ছিল এক দুরন্ত বনের পাখি। বিচার আর কি হবে, ইংরেজদের হাতে খাজা নাইকের বিচারের প্রহসন হয়েছিল, তারপর ফাঁসি। ওই দূর মাঠে কোথাও তার জীর্ণ হাড়গুলির ওপর দোলে কচি বাজরার শীর্ষ, পাখি প্রজাপতি বসে উড়ে যায় তার সমাধিস্থল ছেড়ে। না, আন্না খাজা নাইকের সমাধি খুঁজে পাননি।

—তবে মড়ক আমিও দেখেছি, প্লেগ। দুপুরে বাড়ি ফিরে ঘন অড়হর ডালের বাটিতে ফোঁটা ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে আন্না বলেছিলেন, প্লেগ আসত চৈত্রের শেষে। গ্রাম থমথম করত। আমরা তখন ছোট। বাড়িঘর ছেড়ে ক্ষেতে মাচা বেঁধে থাকতে হত কটা মাস। রাতের তারা ফোটা আকাশ দেখতাম ক্ষেতের মাচা থেকে। তারপর বর্ষার শেষে গ্রামে ফেরা। নর্দমায়, রাস্তায়, চৌকাঠে ইঁদুরেরা মরে পড়ে আছে দেখতাম। সব ফেলে, নিকিয়ে গোবরছড়া দিয়ে নতুন করে ঘরকন্না আরম্ভ হত।

বিরণগাঁও সত্যিই পুরনো গাঁ, জিরজিরে হয়ে গেছে এর সব কটা হাড়পাঁজর।

---ওই যে আনন্দ গুজরাতির কাটাকাপড়ের দোকান, তার পাশে ডিজেল পাম্পের গোদাম, ওখানেই দেখবে উট্রামের বুরুজ। আর আখমাড়াই-এর সারি সারি দোকানগুলোর জন্য তুমি ঔরংজীবের দরগা দেখতেই পাবে না।

মেঝেতে গদি পাতা, তার ওপর বিছানা। শান্তা হাত-পা মেলে শুয়ে চোখ বুজে ভাবছিল, আন্না এখন কোথায়? হয়তো বাসরাস্তা পেরিয়ে সরু পায়ে-চলা-পথটা ধরে আখের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সাবধানে চলেছেন গণপতি দেউলের দিকে। আজ সন্ধে থেকে থেকেই শান্তাবাঈ বড় উতলা, আনমনা হয়ে আছে। সে কি ইন্দোর থেকে মায়ের চিঠি এসেছে বলে? কোজাগরি পূর্ণিমার বিকেল ছিল আজ। রেডিওর ঘড়ঘড়ে খবরে বলল, পাঁচটা বেজে

কুড়ি মিনিটে সূর্যাস্ত। আর তক্ষুণি এসেছিল এক আশ্চর্য বৃষ্টি। এই সময়ে আবার বৃষ্টি পড়ে নাকি? শাশুড়ি বললেন, এ হল স্বাতী নক্ষত্রের জল। এ বছরের শেষ বৃষ্টি।

বৃষ্টির স্পর্শে মাটির বুক চিরে প্রথম আষাঢ়ের সোঁদা গন্ধ হঠাৎ পাখা মেলে উড়ে চলে এল। আকাশে ধূসর-কমলা রঙ। এক পাশে মেঘ সরে দাঁড়িয়ে লালচে আলোর জন্য পথ করে দিয়েছে—অনন্তদের বাড়ির সামনে হালকা বেগুনী ফুলে ছাওয়া খর্ব গাছটা আপন মনে দুলছে, অকালবর্ষণে তার ছোট ছোট পাপড়ি ছড়িয়ে গেছে পথে। দুঃখীরাম কাকার মোষটা ডেকে উঠল বাঁ-আঁ-আঁ করে। এমন সন্ধ্যা যেন কত দিন, কত কাল আসেনি। আর তখনই নাভির নীচে একটা সিরসিরানি, একটা টান—গর্ভজলের মধ্যে ছোট্ট মানুষটা ছলাৎ করে হাত-পা ছুঁড়ল।

শান্তা দেখল অন্নপূর্ণা আলতো টানাটুনি দিয়ে নিজের শাড়িজামা ঠিকঠাক করছেন। আন্নার জন্য একটা কাচা ধুতি, জামা আর কৌটোয় দাঁতের পাটি ভরা হল চটের থলেতে। আমি আসছি। তুমি গড়িয়ে নাও একটু। ধনগরের বউকে বলে যাচ্ছি নজর রাখবে—

—একা যাবেন?

—একা? বলে হাসলেন অন্নপূর্ণা। দুদিকে মাথা নেড়ে—যেমন ভাবে মানুষ 'হায় অদৃষ্ট' বা 'হায় কপাল' বলে—এই এইটুকু রাস্তা। গণপতি মন্দিরে খুঁজবো কিংবা দেউলবাসায়—

—রাত হয়েছে তো—

—তা হয়েছে, তবে দাঁত ফেলে না গেলে আরও কতদূর যেতে হত।

গণপতি মন্দিরে যান নি আন্না, যদিও লাল পাথরে গড়া তিন বছরের পুরনো এই থান তাঁকে সময়ে-অসময়ে ডাক দেয়। ভরা শ্রাবণে যখন চারিদিকের মাঠ সবুজে থইথই করে আর জোয়ার ক্ষেতের উত্তর প্রান্ত দিয়ে ভাঙা ডাক ছেড়ে ঝক ঝকা ঝক চলে যায় কয়লার রেলগাড়ি, গ্রামগঞ্জের মানুষ ট্রেনের জানলা দিয়েই হাতজোড় করে গণপতি বাপ্পাকে নমস্কার করে। সবুজের মাঝদরিয়ায় জেগে থাকা লাল গ্রানাইটের ওই দ্বীপটুকুকে তখন মনে হয় জীবনযাত্রার পরম আশ্রয়। হেমন্তের কালো মাঠে যখন ফসলের শিস আর দোলে না, আকাশ থেকে ফেটে পড়ে ঘন নীল, স্বাতী নক্ষত্রের জল ফুরোনো সেইসব অপরাহ্ণেও কিন্তু ছোট মন্দির তার গরিমা হারায় না এক তিল। নিকট ও দূর থেকে যাত্রীরা আসে—এরণ্ডোল, জালনা, অমলনের...নারকোল ভেঙে মেঝের কালো পাথর জলে ধুইয়ে দেয়। পেতলের উঁচু ঘন্টাটা বাজিয়ে দেয়। সিঁদুর নেয় বিগ্রহের

পায়ের কাছ থেকে, তারপর কপালে টিপ পরে মন্দির প্রদক্ষিণ। এখানে পূজারি নেই, নিজেই মন্ত্র বল, নিজেই নারকোল ভাঙ আর খাও। দেবতা ও মানুষের মাঝখানের ফাঁকটুকুতে আর কেউ নেই। বড় ভাল লাগে এই উদ্দেশ্যহীন নির্জনতা, তাই পুজো শেষেও বুঝি তীর্থযাত্রীরা যেতে চায় না। পাথরের চাতালে পা ঝুলিয়ে বসে দেখে—দূরে কেমন ফসলের শিস দুলছে, রাঙা সূর্য অস্ত যাচ্ছে, চাঁদ উঠছে। আর একটু পরে শত সহস্র তারা এসে অন্ধকারে কলতান তুলে দেয়। আন্না কি ওখানেই গেলেন?

বাসরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আন্না কিছুক্ষণ পায়ে চলা পথটার গতিবিধি দেখছিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বাঁদিকে বেঁকে গেলেন। গণপতি মন্দিরে না গিয়ে চলে গেলেন দেউলবাসায়। বড় রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে বাঁহাতে সখারামের লন্ড্রি আর মিষ্টির দোকান পাশাপাশি। সেখান দিয়ে সরু একটা গলি বালাজির দেউলবাসায় চলে গেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কেল্লা। পেতল বসানো ভারী কাঠের দরজা। সামনের দেওয়াল ও খিলান কালো পাথরে তৈরি। খিলানের ওপর কারুকাজ করা কাঠের তোরণ। জ্যৈষ্ঠের দুপুরেও দেউলবাসার ভিতরটা একেবারে ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ থাকে। চাতালের সামনেটা গ্রানাইটের ফর্সি বাঁধাই। চাতালটুকু বাদ দিলে দু'পাশে সরু লম্বা, টানা বারান্দা। কোণায় কোণায় দূরাগত তীর্থযাত্রীদের জন্য ইঁটের উনুন আর কাঠকুটুরি রাখা। গ্রামান্তর থেকে মানুষ এসে ওখানে দিনমানে রান্না করে। পুজোআর্চা শেষ করে রাতে আধনেভা আগুনের পাশে বিছানা করে ঘুমোয়।

বালাজি বুয়া বুড়ো হয়ে গেছেন বড্ড। প্রপিতামহের আমলের পুরনো এই বসতবাড়ির বেশিটাই দেউল। একটিমাত্র ঘর ওঁদের থাকার জন্য। আর রান্নার একচিলতে জায়গা। দেবতারা বালাজিদের গৃহদেবতা-ই। ছোট ছোট শ্বেতপাথরের রাম লক্ষ্মণ সীতা। রঙিন রেশম কাপড়ে, রূপার গহনায় সেজে আছেন। বালাজি বুয়া আর রমাতাঈ সারাদিন আপন মনে মালা গাঁথেন, চন্দন ঘষেন, নৈবেদ্য সাজান। নিঃসন্তান দম্পতির এইটুকুই আছে। বালাজির বয়স নব্বই ছোঁবে। শিথিল চামড়ার ওপর সময়ের বয়ে যাওয়ার আঁকিবুঁকি। তবু এখনও হাঁটুতে চিবুক প্রায় ঠেকিয়ে জিভে সুতো ভিজিয়ে চোখের সামনে ধরা ছুঁচে পরান। আন্নার মোটে বিরাশি, তবু এখন আর ছুঁচের ফুটো চোখে দেখতে পান না, এই কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে বুড়ো বালাজি আনন্দ পান, মিটিমিটি হাসেন।

দেউলবাসার ডান দিকের প্রথম থামে হেলান দিয়ে একতারা বাজিয়ে গান করে একজন সুরদাস। ভারি মাজা, সুন্দর কণ্ঠ। সাতারায় বাড়ি, কবে ছেড়ে

চলে এসেছে, এ গাঁয়েই থাকে। ভক্ত মানুষ তাকে পয়সা দেয়, তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। শান্তার চোখে একটু অবাক লাগে, তবু এটাই খান্দেশের রীত। সুরদাসের পিঠ লেগে থামের উপরকার নীল পালিশ খানিকটা উঠে গেছে। কোজাগরের রাতে আজ দীপ জ্বলছে অনেকগুলি। দেবতাদের গলায় ফুলের মালা। দূর থেকে যারা এসেছে, কাঁথা চাদর টেনে ঘুমের তোড়জোড় করছে। আজ, এখন, সুরদাস নেই। তবু হঠাৎ ঢুকে আধো অন্ধকারে তাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন আন্না। কামানো মাথায় ছোট ছোট চুল, গলায় তুলসীমালা, হাতে খঞ্জনি, দুটি চোখে আলো নেই, ওষ্ঠাধর গানের ভঙ্গিতে সামান্য ফাঁক। তারপরেই মাথা নেড়ে চোখ কচলে নিলেন। নাঃ নেই তো সে।

তখনই অন্ধকার থেকে বালাজি ডেকে উঠলেন, ওহে ও আন্না, আবার রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ নাকি! এসো, এসো, এইখানে এসে বসো।

কাঁচা শালপাতার ওপর একরাশ পারিজাত নিয়ে বসে ছিলেন রমাতাঈ। চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে চোখ দুটিকে ঠাহর করা যায় না। আঙুলে হলুদ বোঁটার রং মাখামাখি। শেফালির নাম এদেশে পারিজাত। দেউলবাসার বায়ুস্তরে ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে পারিজাত-গন্ধ।

বহুক্ষণ নাকি অল্পক্ষণ, সুখ দুঃখের গল্প করতে করতে সবে আন্নার হাই উঠতে লেগেছে, দেউলবাসার দরজার কাছে—ও কী? কে ও?

অন্নপূর্ণা ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, তোমার ধুতি জামা এনেছি আর দাঁত।

বালাজি বুয়া হেসে কুটিপাটি হয়ে বললেন, মা লক্ষ্মী নিজে নিতে এসেছেন, যাও হে বাড়ি যাও। রমাতাঈ কোলের ওপর হাত দুটি জড়ো করে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর, চাঁদের আলো মুড়ি দিয়ে দুই মূর্তি হেঁটে যাচ্ছে মাঠ ভেঙে। আন্না আগে, হাতে থলি। তাতে জামাকাপড়, দাঁতের শিশি। পিছনে অন্নপূর্ণা।

—শান্তা একা রইল!

—ধনগরের বউকে বলে এসেছি, খেয়াল রাখবে।

আবার চুপচাপ। মাটির নীচে আড়মোড়া ভাঙে তাণ্ট্যাভীল। আকাশ থেকে হিম ঝরতে লেগেছে, খুব সঙ্গোপনে। বহু দূরে নর্মদার অববাহিকায় জলভাসি গাঁয়ে জেগে আছে তাণ্ট্যাভীলের বংশধরেরা। বিরণগাঁও ছেড়ে তারা ধুলিয়া গেছিল। নর্মদার বাঁধ এবার তাদের ধুলিয়া-ছাড়া করবে। এই ভাবে দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলে, তারপর কোথায় যাবে? উট্রামের বুরুজের পাশ দিয়ে মহল্লার ভাঙাচোরা রাস্তা। দুজনে দু রকম দুঃখ নিয়ে বারান্দার হলুদ আলোটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

শিকড়ের জীবন

অঞ্জলি দাশ

পর্দাটা দুলছে বলে বুঝতে পারলো নরম রোদ নিয়ে ঘরে ঢুকছে হাওয়া। সোনা থেকে রূপোর রঙে পালটে যাচ্ছে। থেকে থেকে নীল আকাশের টুক্‌রো এসে চোখে লাগছে, তবু ঝিম ধরা ভাবটা কাটছে না। আধঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙেছে শ্রীনন্দার অথচ উঠতে পারছে না। স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝামাঝি এই অবস্থানের অভিজ্ঞতা নতুন নয়। যখন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেই হেরে গেছে, অথবা নিজের কাছ থেকে আত্মগোপন করার প্রয়োজন হয়েছে, তখনই স্বেচ্ছায় ওই দশ মিলিগ্রামের বিষের টুক্‌রো শরীরে নিয়েছে। কাল রাতেও সেভাবেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আর সেটাই, এখন এই ঝকঝকে শরতের সকালে কুয়াশা দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে। বিরাট পাথরের মতো ভারি হয়ে চেপে আছে মাথায়, সমস্ত বোধ জুড়ে।

পাথরটা কাল রাতে ভারি হয়ে চেপেছিল বুকের ওপর। সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে যখন বিট্টুকে নিজের বিছানায় দেখল। ঘুমিয়েছিল। বোধহয় স্বপ্নটপ্ন দেখছিল—মুখখানা বাঙ্ময় হলো। ঠোঁটের কোণ মাঝে মাঝে কাঁপছিল। ওকে নিশ্চিন্ত লাগছিল।

এমনিতে দাদুর কাছে ঘুমোয় বিট্টু, দাদুর ছায়াসঙ্গী। গত দুবছরে হাতে গোনা আট কি দশদিন এ ঘরে ঘুমিয়েছে। তার মধ্যে ছ'দিন বিজনবিহারী কলকাতায় ছিলেন না, আর বাকি ক'দিন বিট্টুর সর্দিজ্বর মতো হয়েছিল সেইজন্যে। অসুস্থতা ছাড়া মায়ের কাছ ঘেঁসে না খুব একটা। আসলে বিজন এবং রমলা দুজনেই নাতির ব্যাপারে বড্ড বেশি সচেতন এবং স্পর্শকাতরও। বিট্টুর মাথার ওপর সুবর্ণর ছায়াটা যখন থেকে সরতে শুরু করেছে, তখন থেকে ওঁরা দুজনেই বিট্টুকে বুকে আগলাতে শুরু করেছেন। আসলে সুবর্ণ নিজেই প্রায় জীর্ণ গাছের মতো হয়ে যাচ্ছিলো। অন্যকে ছায়া দেয়ার মতো

সুস্থতা, সজীবতা ওর মধ্যে ছিল না। অন্তত শ্রীনন্দার তাই মনে হয়েছিল। মৃগতৃষ্ণার মতো একটা বিভ্রান্তি ওদের দাম্পত্য থেকে সমস্ত শ্যামলিমাগুলোকে শুষে নিচ্ছিল। একদিকে যখন সম্পর্কের এই জীর্ণতা, ভাঙন, অন্য কোথাও তখন নতুন বনভূমি রচিত হচ্ছে। শ্রীনন্দা টের পেয়েছিল খুব ধীরে, সন্তর্পণে। এবং প্রায় নিঃশব্দে, নিঃশর্তে, বিনা রক্তপাতে সেই মৃগতৃষ্ণার দিকে বারবার গড়া বারবার ভেঙে ফেলার এই খেলায় চলে যেতে দিয়েছিল সুবর্ণকে।

রাতে বিট্টুকে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে প্রথমে একটু উদ্বিগ্নই হয়েছিল। রমলা বললেন—ব্লেডে আঙুল কেটেছে। সামান্যই রক্ত বেরিয়েছে, তাতেই তোমার বীরপুরুষ কেঁদে কেটে অস্থির।

ঘুমন্ত ছেলের কাছে বসে বুকের ভিতর মৃদুচাপ অনুভব করল। ঠিক সেই দিনগুলোতেই বিট্টু কিছু না কিছু কষ্ট পায়, যেদিন নিজের অন্য এক আইডেনটিটি খোঁজে। মা ওর একান্ত নিজস্ব। এটাই কি তবে সেই নাড়ির টান? রক্তসূত্রের বন্ধন? তাতে টান লাগে? কোথাও অন্য সুর বেজেছিল বলেই....কষ্ট হল, অপরাধবোধও।

বিট্টুর বাঁ হাতের তর্জনীতে ব্যান্ডএড লাগানো। আস্তে করে স্পশ করল। আঙুলটা একটু কেঁপে স্থির হল, নিশ্চিন্ত হল বুঝিবা। ঘুম কি স্পর্শ চেনে! কষ্টের মুহূর্তে শুধু মাকেই প্রয়োজন সম্ভবত। ছ'বছরের ছেলের মধ্যে শ্রীনন্দা নিজে কতখানি আছে সবসময় বুঝতে পারে না। তবে বিশ্বাস করে যে, অন্যত্র ওর চিহ্ন মুছে গেলেও বিট্টুর মধ্যেই শুধু খুঁজে পাওয়া যাবে। আবেগ বাদ দিলেও জৈবিক নিয়মে।

আবেগকে এখন আর প্রশ্রয় দেয় না, গুরুত্ব দেয় না। খানিকটা অঙ্কের হিসেবে ছকে নিয়েছে জীবনযাপন। একটা সময় ছিল যখন নিজের দ্বিগুণ বয়সী একজন মানুষকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেকে প্রায় অলৌকিক করে তুলেছিল। তারপর তার প্রতারক ভূমিকায় দিশেহারা হয়ে বাস্তব আর অবাস্তবের টানাপোড়েনে ভেঙে যেতে যেতে আঁকড়ে ধরেছিল একটা ধোঁয়ার জীবনকে। নেশা, অন্তহীন নেশা। প্রায় তলিয়ে যাওয়া অন্ধকার। এমন কোন নেশাবস্তু নেই যা ও গ্রহণ করেনি। সেই ভয়ঙ্কর ঘোরের মধ্যে দেখা পেয়েছিল সুবর্ণর। দুজন দুজনকে আঁকড়ে সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

রমলা রাতে খুব সামান্য খান। তবু যত রাতই হোক শ্রীনন্দার জন্যে অপেক্ষা করেন। বিট্টুকে নিয়ে বিজন নটায় খেয়ে নেন। সুবর্ণর ফিরতে রাত এগারোটা পেরিয়ে যায়। ওর খাবার টেবিলে ঢাকা থাকে। শ্রীনন্দার সঙ্গে

খেয়ে নিয়ে রমলা নিজের ঘরে চলে যান। কিন্তু জেগে থাকেন ছেলে না ফেরা পর্যন্ত। সুবর্ণ ফিরলে নিজেই দরজা খোলেন। এ নিয়ম চলছে বছর খানেক।

খাওয়ার টেবিলে রমলা বললেন—সুবর্ণ ফোন করেছিল, রাতে ফিরবে না।

ব্যাস ওইটুকুই। তবু দুজনের মধ্যে অনুচ্চারিত অন্য কোন পটভূমি অন্য কোন নামকে ঘিরে আরো অনেক কথা হয়ে গেল। শ্রীনন্দা লক্ষ্য করেছে, এইসব মুহূর্তে রমলা নিজের বয়স, মাতৃত্ব সব ছাপিয়ে শুধুই একজন নারী হয়ে ওঠেন। দৃপ্ত আর সহমর্মী। অনেক বেশি মানবিক। যে বন্ধনটা সহজেই খুলে ফেলা যেত, শ্রীনন্দা তাকে খুলতে পারেনি রমলার জন্যেই। ওঁর স্নেহ ও সখ্য দুই-ই খুব প্রয়োজন মনে হয়েছিল। সুবর্ণর সঙ্গে শ্রীনন্দার সম্পর্কের টানাপোড়েনটাকে রমলা নিজের অস্তিত্বের যুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন।

অথচ এ বাড়িতে শ্রীনন্দার আসার সূচনাতে রমলা ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। সুবর্ণকে বাধা দিয়েছিলেন—নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটা ধোঁয়ার পুতুল, ও তোর জীবনে অন্ধকার ছাড়া আর কোন উপহার আনতে পারবে?

—মা জীবন ওকে এত বেশি অবিশ্বাস আর অপমান দিয়েছে বলেই ও নেশার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। আমি ওর সেই অপমানের ক্ষতগুলোকে মুছে দিতে চাই।

—এতখানি দায় তুমি বহন করতে পারবে তো?

—আমি ওকে ভালবাসি বলেই এ দায় বহন করব। ওকে আমারও প্রয়োজন।

সুবর্ণ তখন এতটাই আলোকিত ছিল, এতটাই আত্মবিশ্বাসী। এসব কথা রমলাই বলেছেন ওকে, অনেক পরে। যখন কুয়াশা কেটে শ্রীনন্দা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। মুঠো মুঠো রোদ্দুর, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি দিয়ে এক টুক্‌রো নিজস্ব আকাশ গড়ে নিতে পেরেছে। এই সংসারে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। সবার নির্ভরতা অর্জন করেছে।

বিট্টু এসেছে বিয়ের প্রায় তিনবছর পর। সিদ্ধান্তটা শ্রীনন্দার—শরীরের বিষগুলো সব ধুয়ে মুছে যাক, আমি শুদ্ধ হয়ে উঠি, তারপর আমাদের সন্তান আসবে।

সুবর্ণকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। নিশ্চিন্ত হয়েছে—ঘোর লাগা দিনের সামান্য ছায়াও সন্তানের ওপর পড়বে না। তারপর বিট্টু।

সুবর্ণ রাতে ফিরবে না এটা কোন বিশেষ ঘটনা নয়। জানিয়ে দেয়া

এইজন্যে যে এ বাড়িতে আজ রাতের মতো আর কোন অপেক্ষা নেই। এমনিতে অপেক্ষা যেটুকু তা রমলার দিক থেকে। ছেলে ফেরার পর নিজে দরজা খোলেন, দরজা বন্ধ করেন। 'খেয়ে নাও' – এই রুটিন কথাটুকু বলে নিজের ঘরে চলে যান।

শ্রীনন্দার কোন অপেক্ষা থাকে না। রাত বেশি হলে সামান্য উদ্বেগ। ফেরার পর দু'চারটে কথা, খুব সাধারণ আটপৌরে, দুজন সহযাত্রীর মতো। বন্ধনটুকু দায়মুক্ত। দুজনের আলাদা জানালা, আলাদা আকাশ। এ নিয়ে কখনও কোন বিতর্ক, কোন অভিমান, অভিযোগ করেনি। জোর করে ধরে রাখা বা কেড়ে নেয়া ব্যাপারটা ওর স্বভাবে নেই। আর প্রত্যাশা নেই বলে তিক্ততাও নেই। মেনে নিয়েছে এভাবেই নিজেকে, সুবর্ণকে এবং এই ছদ্ম দাম্পত্যের সামাজিক গ্রন্থিটাকে। বিট্টুর জন্যে, যাতে ও একটা পরিপূর্ণ পারিবারিক আবহ অনুভব করতে পারে।

এমনিতে শ্রীনন্দা কোন ব্যাপারেই কখনও ওভার রিঅ্যাক্ট করে না। নাটকীয়তা ওর ঘোরতর অপছন্দ। সেজন্যেই সামাজিক ভাবে ও হয়তো জিতে গেছে। সবাই মিলে ওর মাথার চারপাশে একটা কাল্পনিক আলোর বৃত্তও তৈরি করে দিয়েছে। একসময়ে সেই জ্যোতিবৃত্তকে মেনেও নিয়েছিল শ্রীনন্দা। একটা নিষ্ঠুর তৃপ্তি, অহঙ্কার, প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ওকে। অহঙ্কারটা বাড়তে বাড়তে এতটাই উঁচু হয়ে উঠেছিল, ও নিজেই ছুঁতে পারছিল না নিজেকে। প্রায় অতিমানবিক লাগছিল, স্বাভাবিক নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছন্নতাটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা ক্রমেই উঁইপোকার মতো ঢেকে ফেলছিল ওর অস্তিত্বকে। তখনই, ও নিজেই সেই বল্মীকস্তূপে গোপনে ছিদ্র করে বার করে এনেছিল নিজেকে।

খাওয়ার টেবিলে বিট্টুকে নিয়ে দু'চারটে কথা হল, নভেম্বরে জয়পুর যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে দুজনে আলোচনা হল। একবারও রমলা জানতে চাইলেন না শ্রীনন্দার ফিরতে এত রাত হল কেন। মুখ ধুয়ে ঘরে যাওয়ার আগে একটা জলের বোতল নিজে নিলেন, একটা শ্রীনন্দাকে দিতে দিতে সহজ গলায় বললেন- - বাবার ছবিটা কতটা বাকি? সামনের শনিবার বরুণ নিতে আসবে।

চমকে উঠলো শ্রীনন্দা। চমকানিটা সামলে নিতে একটু সময় নিল। ও আজ অনিকেতের কাছে গিয়েছিল, রমলা বুঝেছেন।

—বৃহস্পতিবার ও নিজেই দিয়ে যাবে। সাংঘাতিক রকম ড্যামেজ হয়েছিল, তাই বোধহয় এতটা সময় লাগল।

—হ্যাঁ, ওটা যে আদৌ পুনরুদ্ধার করা যাবে, ভাবিনি।

সুবর্ণর দাদুর একটা অয়েল পেইন্টিং উই লেগে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাড়ায় একটা লাইব্রেরি করে দিয়েছিলেন তিনি। লাইব্রেরিটা এখন বেশ সম্পন্ন হয়েছে। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে তাঁর একটা ছবি ওখানে রাখবেন। সেই উদ্দেশ্যে ছবিটার পুনর্জীবনের কথা ভাবছিলেন রমলা। তখনই শ্রীনন্দা ডেকে এনেছিল অনিকেতকে। পরে ফোনে দু'একবার ছবি বিষয়ে রমলার সঙ্গে কথা হয়েছে অনিকেতের। ওটুকু ছাড়া রমলার কাছে অনিকেত অনুচ্চারিত, প্রায় যেন অজ্ঞাত, শ্রীনন্দার তাই মনে হত। ধারণাটা কেঁপে উঠলো। অনিকেতের অস্তিত্ব যে খুব তীব্রভাবে উপস্থিত ওদের এই অদ্ভুত পারিবারিক বৃত্তে, টের পেল। কিছু বলার দায় অনুভব করল শ্রীনন্দা।

—স্কুল ছুটির পর ছবিটার খোঁজ নিতেই গিয়েছিলাম। ও কাজটা করছিল, দেখতে এত ভালো লাগছিল, খেয়ালই করিনি বড্ড রাত হয়ে গেল।

খুব পানসে দুর্বল অজুহাতের মতো শোনালো নিজের কানেই। রমলা সস্নেহে ওর বাহুতে হাত রাখলেন।

—হ্যাঁ অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়।

একবার বিট্টুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কপালে হাত রেখে উত্তাপ নিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত মুখে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

শ্রীনন্দার জীবনে অনিকেত একটা জায়গা নিলে রমলা কি খানিকটা স্বস্তি পান! ওরও কি কোন অপরাধবোধ আছে? অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় এলো শ্রীনন্দা। মিথ্যেটা কেন বলতে হল? জ্যোতির্বলয় কি তাহলে মুছে গেছে? যাক ধুয়ে মুছে যাক মিথ্যে মহিমা। রক্তমাংস লাগুক ওর আরোপিত দেবী ইমেজে।

এই অধ্যায়টির সূচনা করেছিল সুবর্ণ। অনিকেতের একটা ছবির এক্সিবিশনে সুবর্ণই ওকে নিয়ে গিয়েছিল। হতে পারে অনিকেতের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ওকে এগিয়ে দিচ্ছিল সুবর্ণ। একটা শোভন অভ্যেস, একটা মৃদু নিশ্বাসের আকাশের মতো শ্রীনন্দাও একটু একটু করে মেনে নিচ্ছিল এই সাহচর্যকে।

কাজে মন বসছিল না। ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক শূন্যতা। কিছুদিন থেকে এটা অনুভব করছে। মনে হয় যুদ্ধান্তের মাঠে পরিজন হারানো একজন একা মানুষ। চারপাশে কোথাও কোন বন্ধু নেই, শত্রুও না। এতটাই একা। বিরোধ নেই, ভালোবাসা নেই এতটাই নিস্তরঙ্গ, নিরুত্তাপ। বাতাসহীন শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বটাই মূলহীন ঠেকছে। রীতিমত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। অদ্ভুত এক বিপন্নতা। গন্তব্যহীন চলা। পথ আছে, পথের প্রান্তে কোন

বিরাম নেই, ছায়া নেই। যাকে ছুঁয়ে দু'দণ্ড নির্ভরতার সুখ পাওয়া যায়। নিজের যন্ত্রণা, আবেগকে উন্মোচিত করা যায়।

মাঝে মাঝে মনে হয় অনিকেত আছে—পথের প্রান্তে। মহীরুহ নয়, দেবদারুর মত। ঘন সবুজ, কিন্তু ডালপালাহীন। ঋজু, আকাশমুখী। ওর পাশে গেলে খোলা আকাশের স্পর্শ মেলে। ছায়া নেই, ডালপালা মেলে জড়িয়ে ধরা নেই।

ফোর্থ পিরিয়ডে টুয়েলভ-এর ফিজিক্স ক্লাসটা সুপর্ণাকে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্রীনন্দা। সূর্য মাথার উপরে। বাস থেকে নেমে পাঁচ মিনিটের দূরত্ব তিন মিনিটে পেরিয়ে এল।

দরজাটা খোলার অপেক্ষায় ছিল। হাত ছোঁয়াতেই সামনে সেই নিবিড় বিরামটুকু পেল। ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ার মতো আবেগের তীব্রতাও অনুভব করল। কিন্তু সংযত হল।

সবে স্নান করে বেরিয়েছে অনিকেত। পাজামার ওপর হাতকাটা সাদা পাঞ্জাবি, কপালের ওপর ভেজা চুল ইতস্তত ছড়ানো। ভীষণ ফ্রেশ লাগছে ওকে। দশ বাই বারোর এই এলোমেলো ঘরটার একটা অদ্ভুত প্রাণময় চরিত্র। পুবদিকে জানালা ঘেঁসে একটা বড় কাঁচঢাকা টেবিল। তার উপর একদিকে দেয়াল ঘেঁসে প্রায় দু'ফুট উঁচু পর্যন্ত বই। টেবিলে একপাশে একটা বেতের ট্রেতে পনের কুড়িটা বিভিন্ন চেহারার কলম। লোকশিল্পের ছোট ছোট মাটির মডেল ইতস্তত ছড়ানো। টেবিলের পাশে ডিভান। তার উপর তিন চারটে বই, সবগুলোই খুলে রাখা। কিছু স্কেচ, দুটো কুশন। পশ্চিম দিকে একটা সরু জানালা, তার নিচে মেঝেতে একটা খেজুরপাতার পাটি। তার উপর একদিকে একটা সুদৃশ্য মাটির পাত্রে বিভিন্ন সাইজের ব্রাশ, তুলি, রঙের টিউব। অন্যদিকে একটা অর্ধসমাপ্ত ছবি কাত হয়ে পড়ে আছে। সরু জানালাটার ঠিক বাইরে একটা বকুল গাছ। ঘরের মেঝেতে তার পাতার ছায়া। অল্প বাতাসে মাঝে মাঝে দু'একটা পাতা জানলা গলে ভিতরে চলে আসছে। প্রাণ লুটোপুটি খাচ্ছে সমস্ত ঘরময়।

কাঁধের ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ডিভানে বসল শ্রীনন্দা।

—দরজা খোলা ছিল কেন?

—জানালা দিয়ে দেখলাম, মাথায় রোদ্দুর বয়ে নিয়ে তুমি আসছ।

—পুড়তে পুড়তে।

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রাখল শ্রীনন্দা।

—তোমাকে দেখে কিন্তু সেটা বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যায় না কখনো। এত শীতল, বরফের মতো নিভাঁজ, নির্বিকার।

ভিতরটা আলোড়িত হচ্ছে। টের পাচ্ছে শ্রীনন্দা—বরফ গলছে। গলতে দিচ্ছে। ও চাইছে—শ্যাওলাধরা পাথরে রোদ্দুর লাগুক। কিন্তু কিভাবে তা জানে না। ভেঙে লুটিয়ে না পড়লে কেউ হাত ধরবে না। গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে না গেলে কেউ তুলে নেবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না ওর হাহাকারকে। কি অদ্ভুত অসহনীয় একটা বলয় তৈরি হয়েছে চারপাশে! সত্যি সত্যি ভেঙে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো।

না, ভাঙলো না। শুধু আস্তে করে ক্লান্ত বিপন্ন মুখটাকে নামিয়ে রাখলো দু'হাতের পাতায়। মেঝের দিকে চোখ। তবু স্পষ্ট মনে হলো, আজ মনে হলো, মনে প্রাণে চাইছিল বলেই মনে হলো—সেই ঋজু আকাশমুখী দেবদারু আজ ডালপালা মেলছে, এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তার ছায়াময় স্পর্শ প্রথমে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। বুক ভরে নিশ্বাস নেয়ার জন্যে, নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলো শ্রীনন্দা। বৃক্ষশাখা একসময় ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল। কতক্ষণ কতযুগ ধরে তার পত্রগুচ্ছে মুখ ডুবিয়ে নিশ্বাস নিল শ্রীনন্দা। সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিল ওর কাঙ্ক্ষিত দেবদারুটির সবটুকু সবুজ।

—তুমি চলে এসো শ্রীনন্দা।

তখনো নিশ্বাস ঘন, তখনো বোধ জুড়ে প্লাবন।

—এসেছি তো। বারবার তো ছুটে আসি।

—না, এভাবে নয়।

—কিভাবে?

—এই যে তুমি একটু এসে আলোড়িত করে দিয়ে, প্রত্যাশা জাগিয়ে দিয়ে চলে যাও। এভাবে নয়। সেই ভাবে এসো, যাতে আমরা একসঙ্গে নিশ্বাস নিতে পারি, একসঙ্গে দুঃখ পেতে পারি, একবিন্দু সুখকে দুজনে ভাগ করে নিতে পারি।

—সম্ভব নয়। এভাবে ওখান থেকে আমার চলে আসাটা খুব কঠিন অনিকেত। তুমি বুঝবে না।

অনিকেত মরিয়া। উদ্ধত এবং কিছুটা রূঢ়ও।

—দেখ শ্রীনন্দা আমি এটুকুই বুঝি যে, সুবর্ণ অন্য একটা জীবন শুরু করতে চাইছে। তোমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। তবু কেন তুমি অকারণে একটা জায়গা দখল করে বসে আছ?

চমকে উঠলো শ্রীনন্দা। ছুরির মতো কেটে বসে গেল ওর শেষ কথাটা। এ কোন অনিবার্য শূন্যতার মধ্যে ওকে টেনে আনছে অনিকেত! এটা ঠিক

যে, একটা আবেগের হাত ধরে ওদের যৌথ জীবনটা শুরু হয়েছিল। তাকে ঘিরে আরো কিছু সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাকে রং রূপ মায়া দিয়ে যত্নে লালন করেছে। আজ আবেগটা যদি মুছে গিয়েও থাকে, জীবনটাতো মিথ্যে হয়ে যাবে না। একটা সম্পর্কে মালিন্য লাগলেও অন্য সম্পর্কগুলো কি মুছে যাবে! সুবর্ণই একমাত্র সত্যি, আর সব মিথ্যে এ তো হতে পারে না।

ভিতরে তোলপাড় চলছে। সুবর্ণকে ও বিদায় না বলেও দরজা খুলে দিয়েছে, যাতে সে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে চলে যেতে পারে। কিন্তু শ্রীনন্দা পারেনি চলে আসতে। বিট্টুকে ওখান থেকে ছিঁড়ে নিতে পারবে না বলেই দুই বিপরীত টানাপোড়েনে নিজে ছিন্নভিন্ন হয়েছে। ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অসহায় লাগছে। তবু সহজ হতে চেষ্টা করল।

—ওখানে জোর করে জায়গা দখল করে আছি, আর এখানে তুমি আমার অভিষেকের জন্যে রাজাপাট সাজিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছ?

-- আমার রাজাপাট নেই। এই খেজুরপাতার পাটি আছে, ওই বকুল গাছের ছায়া আছে, রং তুলি আছে। আর আছে স্থির স্রোতহীন ভালোবাসা।

অনিকেতের কথার ভিতর বকুলপাতার দোদুল্যমান ছায়া মিশে গেল। আর সেই কথার মায়ায় জড়িয়ে পড়তে পড়তে একসময় রক্তের কণায় কণায় চুপ করে থাকা তৃষ্ণারা জাগতে শুরু করল। শ্রীনন্দা তাদের জাগতে দিল। এবং একসময় চারপাশের চেনা পৃথিবী-- এমনকি বিট্টুর মুখও মিলিয়ে গেল। সবকিছু ছাপিয়ে রক্ত মাংসে গড়া মানবী তার সমস্ত ইচ্ছে আর মরুভূমি নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অনিকেত পরম যত্নে ওর ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিল। মরুভূমিতে বৃষ্টিমেঘের সঞ্চার করল।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা চরম নির্বুদ্ধিতা। কোন একটা প্রান্তে তো যেতেই হবে।

--যে গাছ মাঝপথে শিকড় ছড়িয়েছে, সে প্রান্তে যাবে কি করে?

--সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না বলে নিজেকে ঠকাচ্ছো।

শরৎকাল বলেই সন্ধে হওয়ার অনেক আগেই রোদ হামাগুড়ি দিয়ে বকুল গাছের আড়ালে চলে গেল। হালকা অন্ধকার উড়ে উড়ে এসে ঘরের ফাঁকা কোণগুলোকে ভরিয়ে তুললো। অনিকেতের মুখ আবছা হতে হতে একসময় একটা অবয়বহীন বোধের মতো, বিবেকের কুটিল কামড়ের মতো জেগে রইল।

দিন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সূর্যকে উপরে তুলছে। ঘরে আলো বাড়ছে, সঙ্গে

উত্তাপও। বিট্টুর আবছা গলা পাওয়া গেল। রমলাকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে---আঙুলে ব্যান্ডএড নিয়ে স্কুলে গেলে ম্যাডাম বকবে।

ঘোরটা কাটছে, স্পষ্ট হচ্ছে বিট্টু, রমলা, এই ঘর, ঘরের যাবতীয় বস্তু ছায়া। সবকিছুর গায়ে জড়িয়ে থাকা নিজের পছন্দ, রুচি এবং একটা হালকা বাতাসের মতো ভালোবাসা ছুঁয়ে গেল। এমনকি ঘরের ফাঁকা জায়গাগুলোকেও ভরাট করে রেখেছে কিছু মায়া কিছু বিষণ্ণতাও। অনুভব করল শিকড় অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে। শাখাপ্রশাখা পত্র পুষ্পে বিরাট ব্যাপ্তি নিয়েছে, তাকে ঘিরে আরো কিছু মানুষ তাদের স্নেহ ও আশা আকাঙ্খাকে স্বর্ণলতার মতো জড়িয়ে দিয়েছে। আজ জায়গা ছাড়তে গিয়ে শিকড় তুলে নিলে, আরো অনেক কিছু ছিঁড়ে যাবে, নষ্ট হবে। এভাবে ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে টেনে তুললো নিজেকে। বাথরুমে ঢুকে নিজের মুখোমুখি, শরীরের মুখোমুখি। কোথায় লুকিয়ে আছে বিপরীত শরীরের জন্যে তৃষ্ণা- খুঁজতে চেষ্টা করল। নিজের এই উত্তাপটুকু অনুভব করে নিশ্চিন্ত হল। থাকে যদি থাক না, তৃষ্ণা থাকলে জীবনে উত্তাপ থাকলে জীবন চলবে, আকাঙ্খা মরে গেলে শাওলাধরা পাথরের মতো পড়ে থাকবে। তৃষ্ণাও থাক, সঙ্গে থাক সেই জ্যোতির্বলয়ও। এটুকু ছলনা জীবন বইতে পারবে।

স্নান করে বারান্দায় দাঁড়াচ্ছে। বিট্টু ছুটে এসে জাপটে ধরল।

--মা, তোমার স্নানের গন্ধ নেব।

এই ওর এক খেলা। স্নান করে বেরুলেই এসে জাপটে ধরে। লাফিয়ে বিছানায় উঠলো। ওর সারা শরীরে উচ্ছ্বাস।

মা কাল রাতে আমি তোমার কাছে ঘুমিয়েছিলাম।

রোজ কেন ঘুমোস না আমার কাছে?

-আমি কাছে না থাকলে রাতে দাদুর ভয় করে যে। দাদু বলেছে।

অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তার ভয় সবার মাথার উপরে ছায়া ফেলছে। আবার সজল হয়ে উঠছে বুকের ভিতরটা। বিট্টুকে নিয়ে লিভিং রুমে এলো শ্রীনন্দা।

পূর্ব পশ্চিমে লম্বা দশ বাই কুড়ির এই ঘরটার পশ্চিম দিকটা বসার জায়গা। একদিকের দেয়ালে ভবেশ সান্যালের একটা পেইন্টিং, এখানে আসার পর থেকে ওটা দেখছে।

উল্টোদিকের দেয়ালে আট দশটা মুখোশ, বিভিন্ন সময়ে শ্রীনন্দাই ওগুলো সংগ্রহ করেছে। পূর্বদিকটা ডাইনিং স্পেস। ডাইনিং টেবিলের ওপর প্লান্টপটে রাখা ছোট্ট বনসাই লেবুগাছ। তার পাশে একটা মাটির থালায় একরাশ

শিউলি ফুল। রমলাই হয়ত রেখেছেন। ভোরবেলায় উঠে প্রাতঃভ্রমণে যান প্রতিদিন। নরম গন্ধে ঘরটা ভরে আছে। মনটা ভালো হয়ে উঠছে।

ডাইনিং টেবিলের পাশের জানালাটা বন্ধ বলে অল্প আলোয় বিষণ্ণ হয়ে আছে ঘরটা। জানালাটা খুলে পর্দা সরিয়ে দিল শ্রীনন্দা। আলোর সঙ্গে খানিকটা আকাশ ঢুকে এলো ঘরে।

সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন বিজন। ডাইনিং টেবিলে রমলা চা ভিজিয়ে অপেক্ষা করছেন শ্রীনন্দার জন্যে। এটা প্রতিদিনের ছবি।

—আমার সুগারের ওষুধটা ফুরিয়েছে।

— আমি স্কুল থেকে ফেরার সময় নিয়ে আসব।

চা ঢালছে শ্রীনন্দা। প্রসন্ন বৃক্ষশরীর জেগে উঠছে।

বিজন উঠে এসে ডাইনিং টেবিলে চেয়ার টেনে বসলেন।

—দু'তিনদিন ধরে রাতে ঘুম হচ্ছে না, প্রেসারটা কি একবার চেক করা দরকার?

—আমি ফিরে এসে সন্ধেবেলায় নিয়ে যাবো ডাক্তারের কাছে। ওঁর দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল শ্রীনন্দা।

ডালপালা মেলছে। পত্রবিন্যাস স্পষ্ট হচ্ছে। সবুজ—নির্ভরতা—আরো পত্রগুচ্ছ —নিবিড় হচ্ছে ছায়া। না, শিকড় তুলতে চায় না শ্রীনন্দা। প্রান্তে নয়, এই পথের মাঝখানেই একটু তৃষ্ণা একটু মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। সবাই এসে দাঁড়াক তার ছায়ায়। ক্লান্ত ডানা পাখি, ক্রীড়াপরায়ণ কাঠবিড়ালি দু'দণ্ড বসুক না তার ডালে। পথ ভুল করা পাখিও যদি ফিরে এসে মুখ লুকোতে চায়, তার জন্যেও প্রস্তুত রাখতে চায় একটি গোপন পত্রকোরক।

প্রবাহ

বীথি চট্টোপাধ্যায়

আকাশের ভাব দেখে মনে হল দারুণ বৃষ্টি নামবে। বিকেল চারটেতেই কালো মেঘ প্রায় সমস্ত উত্তর কলকাতাকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিল।

দীপা শ্যামবাজারের কে. সি. দাশের দোকানের সামনে খুব চিন্তিত মুখে বারবার ঘড়ি দেখছিল, ভাবছিল নীল আসবে তো? আসতে পারবে তো এমন ঝড়জলে? কী হবে না এলে, কী করবে সে, বাড়ি ফিরে যাবে? কতক্ষণ অপেক্ষা করবে নীলের জন্যে? সাড়ে চারটে বাজে, অলরেডি আধঘন্টা লেট, একটা ফোন করলে কেমন হয়, হয়তো অফিসে কোনো কাজে আটকে পড়ছে, তাই দেরি হচ্ছে।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে শুরু করেছে, ধুলো, ময়লা, ছেঁড়া কাগজ, ঝরাপাতা হু হু করে উড়ছে। ঝড় উঠল, কড়কড় করে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। দীপা কে. সি. দাশের দোকানে ঢুকে বললো, একটা ফোন করা যাবে?

কাউন্টারে লোকটি দীপাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, এটা পাবলিক টেলিফোন নয়।

সে জানি, আসলে আমার ভীষণ দরকার, আর এত ঝড় হচ্ছে, দূরে যেতেও সাহস হচ্ছে না, আমি চার্জ দিয়ে দেবো, যদি একটু দয়া করে একটা ফোন করতে দেন .. কী ভেবে ভদ্রলোক ফোনের তালা খুলে দিলেন। বহুবার ফোন করেছে হয় এনগেজ না হয় রং নাম্বার। দীপার খুবই সংকোচ হচ্ছিল, তবুও তাকে পেতেই হবে। হঠাৎ রিং বাজল।

হ্যালো, আচ্ছা নীলাঞ্জন সুর আছেন?

কে বলছেন?

আমি, মানে আমি ওর বাড়ি থেকে বলছি।

উনি অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন? ও আচ্ছা।

ফোন রেখে দীপা জিজ্ঞাসা করে, কত করে একটা কল?

দু-টাকা পার কল।

দীপা টাকা মিটিয়ে বাইরে আসে, কী করবে ভাবতে থাকে। এই দুর্যোগ, মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দোকানের নিচে মাথা বাঁচাতে দলে দলে জড়ো হয়েছে মানুষ। দীপার পাশেও বেশ ভীড়, বোটকা ঘামের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে দীপার। তারমধ্যে আবার একজন সিগারেট ধরালেন। অসহ্য। দীপা মাঝেমাঝেই হাতিবাগানের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু একেবারে কাছে না এলে কাউকেই বোঝা যাবে না, কী যে করবে। বাড়িতে চিঠি লিখে এসেছে সে আর বাড়ি ফিরবে না। কারণ ছোটবেলা থেকে যাকে বন্ধু বলে ভেবেছে, একসঙ্গে খেলা করেছে তাকে স্বামী হিসেবে ভাবা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এত বোঝানো সত্ত্বেও যখন বিয়ে ঠিক করা হয়েছে, তখন নিজের রাস্তা নিজেই তৈরি করবে। একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সে ফিরে আসবে। অহেতুক খোঁজাখুঁজি করে লোক হাসানোর চেষ্টা, অথবা পুলিশের কাছে গিয়েও কোনো লাভ হবে না, কারণ দীপা এখন প্রাপ্তবয়স্ক।

কিন্তু নীল কী করছে, আজকে দীপা বিয়ের আসর ছেড়ে কোনো মতে পালিয়ে এসেছে, নীল সবই জানে, অথচ এত দেরি করছে কেন? কী দারুণ অসহায় এখন দীপা, তার একমাত্র শেষ আশ্রয় ওই নীল। বিয়ের কার্ড দেখে নিরুত্তাপ হেসে নীল বলেছিল, করে ফেলো, বাঃ বেশ তো, বিয়ের পরে একেবারে ট্যাং ট্যাং করে সাগরপার।

বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে, ছাতা মাথায় লোকজন রাস্তায়, দীপার চারপাশটাও বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। দোকানদার বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে, দীপার খুব অস্বস্তি হয়। একবার ভাবে তাপসীদের বাড়ি কাছেই, ওকে গিয়ে সব কথা খুলে বললে কেমন হয়? আবার ভাবে আর একটু দেখি সবে তো বৃষ্টি থেমেছে, নীল হয়তো কোথাও আটকে পড়েছে, এমনওতো হতে পারে।

আরে দীপা যে, এখানে হঠাৎ কার জন্যে অস্থির?

ও সুখময়দা আপনি, কেমন আছেন?

যেমন দেখছ তেমনই, বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল, আগের থেকে অনেক সুন্দরী হয়েছো, তা কী করছো এখন?

কিছুই না, আমি আসলে একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। একটু দাঁড়াবেন আমার সঙ্গে?

তা না হয় দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু বন্ধু কখন সময় দিয়েছিল?

আমি বলেছিলাম বিকেল চারটের সময় আসতে, ও রাজীও হয়েছিল। কিন্তু যা ঝড়বৃষ্টি হল, হয়তো কোথাও আটকে পড়েছে...।

এখন তো সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, একটা ফোনটোন..

করেছিলাম অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে ও।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দীপা ভাবে, সুখময় যতই বখাটে হোক, রাস্তার মানুষজন যেভাবে তাকে গিলছিল, যাবে নাকি? সিটি, রেখা যে... এসবের হাত থেকে তো বেঁচেছে। সুখময় পড়াশুনো তেমন করেনি মনে হয়। খিস্তি-খেউড় করতো। মাঝেমাঝে কলেজে এসে শিক্ষকদের ভয় দেখাতো। ওদের কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের কলেজে নিতে হবে। এইসব নানান বদ কাজকর্মের নায়ক ছিল সুখময়।

আড়চোখে দেখে দীপা, সুখময় আরো একটু মোটা হয়েছে, খোঁচা খোঁচা চুল দাড়ি বুক খোলা পাঞ্জাবি, বেশ খানিকটা গোটানো প্যান্ট, মিশকালো রোমশ পা, গোল গোল চোখে উদাস দৃষ্টি, কিছু ভাবছে আর সিগারেটের ধোঁওয়া ছাড়ছে। মাঝেমধ্যে ঘড়ি দেখছে।

দীপা যেন অকূল সমুদ্রে। আর কতক্ষণ দাঁড়াবে? সুখময়কে চলে যেতে বলবে? কোনো বিপদ হয়নি তো নীলের? আর এখন কোথায়ই বা যাবে সে?

শোন দীপা পায়ে ব্যথা হয়ে গেল, বলিহারি তোমার প্রেম। চলো সামনের রেস্টুরেন্টে বসে চা খাই, ততক্ষণে যদি তোমার তিনি আসেন ভালো, না এলে আরো ভালো, বাড়ির বাসে উঠে পড়ো।

দীপা আর সুখময় চা খেতে খেতে প্রায় ঘন্টাখানেক কাটালো, যদিও দীপার কিছুই ভালো লাগছিল না, দীপার ভেজিটেবিল চপটাও সুখময় খেয়ে বিল মিটিয়ে বললো, চল উঠি, তিনি আজ ভুলে গেছেন আসতে।

এখান থেকে ফোন করা যাবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো এস.টি.ডি. বুথ, চলে যাও।

ফোন করে একবার দেখি সত্যি ভুলে বাড়ি চলে গেল কিনা।

দেখ, আর একটা সিগারেট ধরায় সুখময়।

হ্যালো, নীলই ফোনটা ধরেছে।

দীপা রাগে, লজ্জায়, উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিল না, ওধার থেকে ভেসে আসে টিভির আওয়াজ, টুংটাং কাপের শব্দ। নীল বলে, নীলাঞ্জন সুর স্পিকিং।

আমি দীপা বলছি।

হ্যাঁ বলো।

বলো মানে? রাগে ফেটে পড়ে দীপা, তোমার না আজ চারটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল?

আসলে অফিসের কাজে এমন আটকে পড়লাম যে...

অফিসের কাজ! তুমি তিনটের সময় অফিস লিভ করেছ।

হ্যাঁ সেটা অফিসের কাজেই।

তুমি জানো না? আজ আমি বিয়ের আসর ছেড়ে তোমার জন্যে...

কেঁদে ফেলে দীপা, এখন আমি কী করবো বলে দাও।

লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে বাড়ি ফিরে যাও।

কী বললে? তার মানে তুমি ইচ্ছে করেই আসোনি?

তুমি একটা পাগল, বাড়ি গিয়ে বিয়ে করে আমাকে মুক্তি দাও প্লিজ।

ও, আর এই যে দু'মাস কনসিভ, এর কী হবে?

আরে বিয়ে করলেই তো সব সমস্যা সমাধান, বোকা মেয়ে, তোমাকে তো অনেক বলেছিলাম অ্যাবরশন করে নাও, আমার জানা ভালো নার্সিং হোম আছে, তখন তুমি রাজি হলে না, এখন আমার কিছুই করার নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শেখো, না হলে পস্তাবে, এখন ক্যারিয়ার বিল্ডের সময় তা না বেবি, বিয়ে, বোগাস।

তুমি আমাকে ভালবাস না?

বাসি কিন্তু আর ন্যাকামি নয়। হাড়ভাঙা খাটুনির পরে এসব ভালো লাগে? ছাড়ছি, বাই।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে দীপা।

কি হল, এখন প্রেমিক অস্বীকার করছে তো?

দীপা জিজ্ঞাসা করে, কটা বাজে?

প্রায় নটা হতে চললো, চলো তোমাকে বাসে তুলে দিই।

না আমি বাড়ি যাবো না।

সে কি, কোথায় যাবে তাহলে? ঝগড়া করে বেরিয়েছ বাড়ি থেকে, সবাই চিন্তা করবে, শোন ওরকম মান অভিমান সবারই হয়ে থাকে, যাও বাড়ি ফিরে যাও।

দীপার মনে হয় সুখময়কে যতটা খারাপ ভাবতো হয়তো অতটা খারাপ সে নয়। কতটুকুই বা বোঝে সে, এই যে নীলকে সে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত, সে কিনা একটা মুখোশধারি, জানোয়ার। আর এই সুখময় তো বাড়ি ফিরে যেতে বলছে, এতক্ষণ সময় কোনোরকম অসভ্যতা করেনি।

কী ভাবছো?

আচ্ছা সুখময়দা আজ রাতের মতো আমাকে একটা থাকার জায়গা দিতে পারেন?

বল কী? তোমাকে রাতে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়বো যে। না ভাই আমি ওসবে নেই, আমি চললুম।

সুখময়দা---যাবেন না প্লিজ, আমার যাবার কোনো জায়গা নেই। আজ রাতটা যদি একটা কিছু...

দাঁড়াও দাঁড়াও ভেবে দেখি, আমিও তো প্রায় বেঘর, বাড়িতে বরাদ্দ একটা খাটিয়া, বৃষ্টি এলে তাকে টেনে সিঁড়ির নিচে নিয়ে যাই। না হলে, মশা, ইঁদুর, ব্যাঙ, গরম ঠাণ্ডা সব সহ্য হয়ে গেছে। তোমার কেসটা কী খুলে বলো তো।

এখন না। আগে একটা থাকার ব্যবস্থা করুন, তারপর সব বলবো।

আচ্ছা তোমার বাবাদের কে যেন একজন বড় পুলিশ অফিসার?

হ্যাঁ তাতে কী? আমি তো এখন এ্যাডাল্ট।

ওসব ছাড় ভাই। আগে তো শ্রীঘরে বন্ধ, তারপরে কোর্টে প্রমাণ কর তুমি কী।

তাহলে উপায়?

আমার মাথায় তো ঘোড়া দৌড়চ্ছে, চলো আগে এখান থেকে বেরুই, কারণ অনেকক্ষণ আমার একসঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

কোথায় যাবো?

চল ওই শিয়ালদার মিনিটাতে উঠি।

সুখময়ই টিকিট কেটেছিল, এবং ওরা সিদ্ধান্তে এসেছিল যে কলকাতায় থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। তার জন্যে ঠিক করলো সুখময়ের এক বন্ধু ফুলবনি বলে ওড়িষা জেলার এক জায়গায় কাজ করে। বেশ খানিকটা দূর কলকাতা থেকে আর জায়গাটাও বেশ সুন্দর পাহাড় জঙ্গল ঘেরা। সুখময় অবশ্য যায়নি কোনোদিন, ওর বন্ধুর মুখে গল্প শুনেছে, এবং ওর বন্ধু শ্যামা, তাকে অনেক বার যেতেও বলেছে, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দীপা ভাবছিল সুখময় নিজের বিপদ ডেকে আনছে? লোকটা হয়ত খুব খারাপ, দীপার অবস্থার সুযোগ নেবে, এখন ভালোমানুষ সেজে আছে। আবার ভাবে এরকম ভবঘুরে পাগলও তো আছে যারা সব ভুলে পরোপকারে লেগে যায়। আর দীপা এখন করবেই বা কী? আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি গেলে সেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠাবে অথবা বাড়িতে খবর দেবে, বন্ধুদের বাড়িতেও তো তাদের মা-বাবারা জ্ঞান দেবেন, কতদিনই বা থাকা যাবে বন্ধুদের বাড়িতে? যে লোকটার ওপর

ভরসা করল, বিশ্বাস করল, সে কিনা... যাক গে। দীপা একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবে, হারিয়ে যাবে. ভগবান হয়তো তাই এই সুখময়কে পাঠিয়েছেন।

এই দীপা কী ভাবছ, পাক্কা তো? আমরা ফুলবনি যাচ্ছি?

হ্যাঁ।

তাহলে নামো।

এখানে?

আরে হ্যাঁ, একটা ট্যাক্সি ধরে নিই।

কেন?

চলো নামো বলছি।

ট্যাক্সিতে উঠে সুখময় বলে, হাওড়া স্টেশন চলো. হাওড়া থেকে ফুলবনির ট্রেন পাওয়া যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরী এক্সপ্রেসটা ধরতে পারলে আর কোনো চিন্তা নেই।

হাওড়ায় সুখময় কোথা থেকে বোধহয় দালাল টালাল ধরে দু'খানা থ্রি-টায়ার বার্থ-এর টিকিট কেটে দীপাকে বসিয়ে বলল, খিদে পেয়েছে তো?

যাই কিছু খাবারটাবার নিয়ে আসি।

না না আমার তেমন দরকার হবে না. যদি একটু জল পাওয়া যায় . এক বোতল।

সুখময় ফিরে আসে, এক বোতল জল, কেক, মিষ্টি আর সিঙাড়া নিয়ে। দীপার একেবারেই খেতে ইচ্ছে করছিল না, তবুও সুখময় জোর করায় অল্প কিছু খেল।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, ওরা জানলার পাশেরই সাইড সিট পেয়েছিল বলে বসেই ছিল। কামরার অন্যান্য লোকজনেরা দিব্যি ততক্ষণে নাক ডাকাচ্ছে।

দীপা জানলার বাইরে অন্ধকার দেখছিল, কান্না পাচ্ছিল খুব, কত স্বপ্ন ছিল, নীলের সঙ্গে ট্রেনে করে বহুদূর বেড়াতে যাবে। দারুণ শীতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াবে কেন যে নীল এমন ব্যবহার করল।

আচ্ছা দীপা শোন, এখন তুমি বাড়ির সবার ওপরে রাগ করে আমার সঙ্গে যাচ্ছ, ঠিক আছে, কিন্তু তোমাকে একদিন না একদিন বাড়ি ফিরতেই হবে।

না আমি আর কখনো কলকাতায় চেনাজানা মহলে ফিরব না।

তাহলে তো তোমার রাগটা সাধারণ রাগ নয়। বেশ ভালোমতই ভাঙচুর হয়েছে মনে হচ্ছে, তা তুমি আমাকে সব খুলে বলো, তারপর ভেবে দেখি কীভাবে রাস্তা বের করা যায়। কারণ যেখানে যাচ্ছি সেখানে বড়জোর দু'চার দিনের আশ্রয় মিলতে পারে, তারপর কোথায় যাবো, এসব ভাবতে হবে তো?

আগে চলুন, পৌঁছে ঠিক করা যাবে কী করবো।

কী যেন নাম তোমার... ওই নীল, ওখানে গিয়ে যদি নীলকে কোনোরকমে আনা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

ও আসবে না, আমার মৃত্যুসংবাদ শুনলেও আসবে না।

তা এইরকম একটা ঢ্যামনার... সরি কিছু মনে কোরো না, বিশ্বশুদ্ধ লোকের ওপর অভিমান করে দেশ ছেড়ে পালায় কেউ?

আমি আর নীল আজ প্রায় ছ'বছর প্রেম করছি। ও বরাবর ভালো ছাত্র, ভালো চাকরিও পেল গতবছর। আমার তখন এম.এ ফাইনাল ইয়ার, এখানে, ওখানে, নন্দনে, সিনেমা নাটক দেখার সময় ও বড় চঞ্চল হতো। নাটক বা সিনেমার থেকেও অন্ধকার ওর যেন বেশি প্রয়োজন ছিল।

তারজন্য পয়সা খরচ করে নাটক সিনেমার দরকার কী, আলো নিভিয়ে দরজা জানলা দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই তো ভালো ছিল।

না, তা ঠিক নয় আসলে, নীল ভীষণ শরীরী ব্যাপারে আগ্রহী, আমি বলতাম ওসব বিয়ের পরে হবে, অথবা এখন নয়। নীল তখন খুব রাগ করতো, কথা বলতো না, ফিউরিয়াস হয়ে যেত, বলতো, যাকে ভালবাসো তার কাছে এত কৃপণ কেন?

এরপরে মা-বাবার অনুপস্থিতিতে আমরা বেশ কয়েকবার দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছিলাম। তারপর কখন যে, কনসিভ্ করলাম ঠিক বুঝতে পারলাম না। নীলকে বলতে, ও বললো, ছেটে ফেলো, পাগল, এখনই এসব!

আমি বললাম, ঠিক আছে বিয়ে করে নিই আমরা, কারণ বাড়িতে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে, পুরোদমে, ও বলেছিল, ডোণ্ট ওরি, তবে, ওটাকে অ্যাবরশন করতেই হবে। আনওয়ান্টেড বেবি ক্রিপলড হয়।

আমি বলেছিলাম তোমার ভুল ধারণা, তবুও ঠিক আছে আমাদের বিয়ের পরে, তুমি যা করার কোরো।

তারপর আজকের এই ঘটনা, আপনার সঙ্গে চোরের মত পালাচ্ছি। বাড়িতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে।

তা তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো বিয়েটা করে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

না তা আমি পারি না, মরে যাবো সেও ভালো, কারুর কাছে মাথা নিচু করার থেকে।

কিন্তু আমি এখন কী করি তোমাকে নিয়ে?

সত্যি আপনাকে বড় বিপদে ফেলেছি, আমার মার্কসিটগুলো নিয়ে এসেছি, খুব চেষ্টা করব একটা কাজের, টিউশনিও করতে পারি, বেশ কয়েকটা

ছাত্রছাত্রীকে পড়ালে নিশ্চয়ই চলে যাবে। কিন্তু সেটাও নির্ভর করছে কলকাতা থেকে দূরে একটা নিরাপদ আশ্রয় পেলে... সুখময়দা আপনি শুধু কয়েকটা দিন আমাকে একটু দাঁড়াতে সাহায্য করুন।

আমি আর কী সাহায্য করব, আমার বন্ধু যদি তোমাকে থাকতে দিতে রাজি হয়, তাহলে তো সমস্যা শেষ, ওখানে তোমার খোঁজ কেউ পাবে না। আর গ্রামগঞ্জের ব্যাপার ছাত্র-টাত্রও পেয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, ও আনম্যারেড, ও কীভাবেই বা তোমাকে রাখবে? আমি যতদিন থাকব, ততদিন নাহয় একরকম, তারপর? আমিই বা কতদিন বাড়ি ঘর ছেড়ে বৌ-বাচ্চা ছেড়ে থাকব?

কেন, ওনাকে সব খুলে বলব, উনি নিশ্চয়ই সব বুঝবেন?

শোন, সবাই তো সুখময় নয়, যে মেয়েদের দুঃখে পাগল হয়ে যাবে, আর তাছাড়া ওটা ওর কর্মস্থল, সবাই একসঙ্গে একই ক্যাম্পাসে থাকে, লোকে কী বলবে? নানান আজগুবি গল্প চালু হবে, ও বেচারার বাড়িতেও সে সব গল্প ডানা মেলে উড়ে হাজির হবে। ও শুধু শুধু কেন ঝামেলায় পড়বে বলো?

তাহলে তার বাড়ি যাচ্ছেন কেন?

কারণ ওর ওখানে গেলে তোমার খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর সুন্দর পরিবেশ, তোমার মনটাও ভালো হয়ে যাবে। আগে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাই, তারপরে ভেবে দেখা যাবে কী করবো আর কী না করবো।

আচ্ছা সুখময়দা শুধু তো আমার কথাই বলে যাচ্ছি, আপনার কথা কিছু বলুন।

ধুর, আমার আবার কথা, পড়াশুনোও করলাম না, জমি, বাড়ির দালালি করি, পৈত্রিক বাড়িটায় দেড়খানা ঘর, কোনোদিন ভেঙে পড়বে, সেখানে আমার মা, আমি, বৌ আমার তিনটে মেয়ে নিয়ে থাকি কোনোরকমে।

আপনার তিনটে মেয়ে?

কেন, আকাশ থেকে পড়লে যেন, বড় মেয়েটা ছয়, তারপর চার আর দুই। সব দোষ বৌটার, ছেলে ছেলে করে পুষ্যি বাড়ল।

আপনি এভাবে আমার জন্যে চলে এলেন ওনারা খুব চিন্তা করবেন?

না না চিন্তাফিন্তা কিচ্ছু করবে না, দু'সপ্তাহের র‍্যাশন মানি কালই দিয়েছি ব্যাস নিশ্চিন্ত।

ওঃ আপনি আপনার বৌকে, বাচ্চাদের, আপনার মাকে ভালোবাসেন না?

সময় কোথায় ভাই, সকাল থেকে টো টো করে ঘোরা, আর বৌটাও বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। এখন তো বেশি রাতে ফিরে ঘুম দিই, সকালের চাটাও দোকানে...

নানা এমন করা উচিত নয়, ওই টুকটুকু বাচ্চা মেয়ে বৃদ্ধা মা সবাইকে সময় দেওয়া আপনার...

দীপার কথা থামিয়ে সুখময় ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, চুপ করো, বেশি কপচো না তো, ওদের সময় দিলে, তোমাকে উদ্ধার করতো কে?

দীপার খুব রাগ হয় কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।

শোনো দীপা, যা বলছি মন দিয়ে শোন, এতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। তপু মানে আমার বন্ধু শ্যামার কাছে আমরা স্বামী স্ত্রী, না হলে হয়তো ও থাকতেই দেবে না।

তা কী করে হয়, স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে...?

হয় না তো হয় না, তুমি বুঝবে এরপরে। শোন, আমি বলব বাড়ির অমতে, আমরা বিয়ে করেছি, কাজটাজ নেই, ওই একটা কিছু জুটিয়ে দেবে, আর আমি বলব ও এখানে থাক, আমি মাঝে মধ্যে আসব, তারপর বাড়ি ম্যানেজ হলে ওকে নিয়ে যাবো, কী কেমন প্ল্যানটা?

চুপ করে দীপা ভাবে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, ঠিক আছে তাই হবে।

হবে বললেই হলো না, স্টেশনে নেমে সিঁদুর, শাঁখা পরে ঘোমটা দিয়ে যেতে হবে।

এসব কী বলছেন, না না আমি এসব পারব না।

আরে ভাবো না নাটক করছো।

ফুলবনি পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। সুখময়েব বন্ধু শ্যামাচরণ কেমন সন্দেহের চোখে দেখছিল ওদের। যাই হোক দীপার মন দারুণ খারাপ, জানলায় দাঁড়িয়ে সে দেখছিল অন্ধকার টিলা, আর দেহাতি মেয়েদের যাতায়াত। একবার মনে হচ্ছে সুখময়কে খুব বিপদে ফেলেছে সে, বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, আবার ভাবছে কী দরকার ছিল বাড়ি থেকে এভাবে পালাবার, মাকে যদি সব খুলে বলতো। অথবা সুখময়ই বা হঠাৎ তার সঙ্গে চলে এলো, লোকটার কোনো মতলব নেই তো?

কী দেখছো দীপা? দারুণ না? জোনাকির মত টিমটিমে আলো দূরে দূরে জ্বলছে, তোমার ভালো লাগছে?

হুঁ... কেমন উদাস হয়ে যায় দীপা।

আচ্ছা আপনার বন্ধু কেমন যেন ব্যাজার মুখ করে রয়েছে। ওর বোধহয় আমাদের এখানে আসাটা পছন্দ হয়নি।

না তেমন কিছু নয়। ও ব্যাটা আসলে হাড় কিপটে, এই এখন কিছু বাজার ফাজার করে দেব দেখবে খুশি।

আমার কাছে কিছু টাকা আছে। আপনাকে দিচ্ছি, দাঁড়ান।

তোমারটা এখন থাক, যতদিন পারি আমি চালাই, তারপর তো নিতেই হবে।

পথে তো আপনার অনেক খরচ হলো, আর তাছাড়া আপনিও তো সেভাবে সলভেন্ট নন।

ঠিক আছে, কত আছে তোমার কাছে, দাও।

জানি না, দেখছি, আসার সময় মায়ের আলমারি থেকে নিয়ে এসেছি, গুণে দেখিনি।

দাও, শুনি, দেখি কতদিনের রসদ হবে।

দুটো একশো টাকার নোট, রেখে পুরো টাকাটা সুখময়ের হাতে তুলে দিল দীপা।

সুখময় গুণে বলল, বাহঃ, তুমি তো বেশ কাজের মেয়ে হে, এখানে, পাঁচ হাজার সাতশো টাকা আছে। এটা ফুরোতে ফুরোতে তোমার চিল্লে হয়ে যাবে।

সুখময় বাজারে চলে গেল। রাত প্রায় আটটা নাগাদ একজন মাঝবয়সী দেহাতি মহিলা, রান্না সেরে ফিরে গেলে, তার চোখেও যেন কী এক রহস্য ছিল, মনে হচ্ছিল দীপার।

পাশের ঘরে সুখময় এবং শ্যামা পান করে চলেছে। দীপার অসহ্য মনে হয় সবকিছু, কিছুতেই সহজ হতে পারছিল না সে। একবার মনে হয় ওদের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করে, আবার মনে হয় কী-ই বা গল্প করার আছে দুটো মাতালের সঙ্গে।

সুখময় ডাকে, দীপা এই দীপা, এ ঘরে এসো, শ্যামা ভাবছে আমরা বোধহয় ঝগড়াটগড়া করেছি।

দীপা পাশের ঘরে গিয়ে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে চৌকির এক কোণে বসে।

কী হলো? খাবে না কি একটু, অমন রেগে তাকাচ্ছ কেন? আরে আমি এমনি বলেছি। তুমি যে এসব একদম পছন্দ করো না তা আমি আগেই শ্যামাকে বলেছি, কীরে বল না বাবা, শ্যামাচরণ বল।

হুঁ।

হুঁ হুঁ আবার কী? তোর বৌদি তো বলছিল আমাদের এখানে আসাটা তোর পছন্দ হয়নি।

ঠিক তা নয়, আসলে কেমন যেন মনে হচ্ছে তোরা কিছু লুকোচ্ছিস।

কী আবার লুকোবো? এই দেখ লুকোবার আছেটা কী?

তোরা কি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিস?

আলবাৎ, অফকোর্স, কই দীপা ওঠো তো ওই যেখানে তোমার কাগজপত্র গুলো নিয়ে এসো তো, ওরমধ্যে আমাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা রেখেছি। যাও নিয়ে এসো।

দীপা তো ভূত দেখলেও এত চমকাত না, হাঁ করে দেখতে থাকে দুজনকে এবং বলে, কিন্তু ওই কাগজ...!

কোনো কিন্তু নয় দীপা, কাগজপত্রগুলো ওকে দেখানো দরকার। ও ভাবে কী?

দীপা সুখময়ের মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সুখময় চোখ টিপে ইশারা করে। বলে, আনোই না কাগজগুলো।

দীপা ইতঃস্তত করে তার মার্কসিটের খামটা নিয়ে আসে, সুখময় প্রায় দীপার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় খামটা এবং ছুঁড়ে দেয় শ্যামাচরণের দিকে, বলে, দেখ দেখ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ, আমার বৌ কত শিক্ষিত আর বিয়ের কাগজ দেখেনে ভালো করে।

এসবের দরকার ছিল না।

সুখময় আবার দীপাকে চোখ টেপে, ভাবখানা কেমন বোকা বানালাম শ্যামাকে?

দীপার অসহ্য লাগে, চোখ চলে যায় চৌকির ওপর ছড়িয়ে যাওয়া তার এ্যাকাডেমিক রিপোর্টগুলোর দিকে, দীপার তার বাবার কথা মনে পড়ে; বাবা খুব যত্ন করে এগুলো গুছিয়ে রাখতো। চোখ ছলছল করে ওঠে।

দীপা তোমার জন্যে কোক আছে ফ্রিজে খাও, আমার খাব আর তুমি দেখবে ভালো লাগে না।

দীপার কোক খেতে খেতে কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। সারাদিনের ধকল।

ওকি দীপা? ঘুমোলে নাকি, ওঠো খেতে দাও, তোমার জন্য অনেক কষ্টে মুরগি এনেছি, মুরগির ঝোল আর ভাত, দিয়ে দাও, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

দীপা থালা ধুয়ে ভাত বাড়ে, ওদের অনুরোধে নিজেও খায়। আবার গুছিয়ে তুলে রাখে সবকিছু।

শ্যামা বলে, তোরা ওই ঘরে শুয়ে পড়, আমার আবার নিজের বিছানা না হলে ঘুম হয় না।

দীপা সুখময়ের দিকে তাকায়, সুখময় আবারও চোখ মারে। অসহ্য লাগে দীপার।

সুখময় বলে, আচ্ছা বেশ শীত শীত করছে, ও ঘরে একটু চাদর ফাদর আছে তো?

বিছানার তলায় পেয়ে যাবি।

সুখময় দীপার হাত ধরে, চলো দীপা শুয়ে পড়ি।

দীপা হাত ছাড়াতে চায়, কিন্তু এক ঝটকায় দীপাকে ঘরের মধ্যে এনে ধমকের সুরে, বলে, ওকে বুঝতে দিয়ে কী লাভ? লাথ খাবার ইচ্ছে? কাল সকাল হলেই চলে যাবো, তুমি তোমার ব্যবস্থা কোরো।

দীপার কান্না পেয়ে যায়।

কেঁদে কী হবে? সত্যি স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে হবে বুঝলে?

নাও শুয়ে পড়ো।

কোথায় শোব?

কেন ওই চৌকির ওপরে তুমি শোও, ভয় পেও না আমি এই টেবিলের ওপরে দিব্যি কাটিয়ে দেবো।

বালিশ, চাদর, কম্বল নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে সুখময় টেবিলের ওপরে শুয়ে পড়ল, দীপা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। আর ভাবতে পারছে না, জানলা, দরজা ভালো করে বন্ধ করল, যাতে শ্যামা না দেখতে পায় তাদের আলাদা শোয়া। তারপর নিবিড় ঘুমে দীপার মনে হচ্ছিল ডুবে যাচ্ছে। ঘুম না আচ্ছন্নতা নিজেই বুঝতে পারছিল না। শীত করছিল অথচ সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। মায়ের মুখটা মনে পড়ল, বড্ড মায়া হল দীপার, কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

তারপর কখন যেন সত্যি সত্যি ঘুমে ডুবে গেল। হঠাৎই দীপার দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল, কী যেন পাষাণের মত চেপে ধরেছে, তার গলা, আওয়াজ বেরুচ্ছে না, চিৎকার করে বলতে চাইছে আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচতে দাও।

শালিকে ভূতে পেয়েছে নাকি? এমন গোঁ গোঁ করছে কেন? দেখ সুখময় কোনো ঝামেলা হলে আমি সোজা তোকে দেখাব, যা যা এ শালা বাপের ব্যাটা কোনো ইয়ের ছেলেকে ভয় পায় না, তুমি তো বাপু আগেই চেটেপুটে খেলে উপোসি ছারের মত, তারপরে আমি তো শালা এঁটো কাঁটা উচ্ছিষ্ট পেয়েই খুশি। যাই বল শ্যামা হেভি মাল মাইরি। আমার ঘুম পাচ্ছে আমি শুলুম।

আরে শ্যামা এক বোতল জল অন্ততঃ দিয়ে যা, জিভ শুকিয়ে আসছে।

এই কথপোকথন পুরোটাই দীপা শুনেছে, অথচ মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে। শিউরে উঠছে এই শয়তানদের নোংরামি ভেবে। মনে হল বমি হবে। চোখ খুলে আস্তে আস্তে উঠে বসে দীপা, বুঝতে পারে স্বপ্ন নয় সমস্তটাই বাস্তবে ঘটেছে, এবং সেটা সম্ভব হয়েছে গতকাল ওষুধ মেশানো কোক খাওয়ার জন্য।

দীপা মন শক্ত করে, সে হেরে গেছে, তার বাঁচার কোনো অধিকার নেই। শাড়ি ঠিক করে নিয়ে সে আধো অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে, একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঝাপটা মারে দীপার মুখে। চোখ থেকে অঘোরে জল পড়ছে। ছুটতে

থাকে দীপা রেললাইন ধরে। একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পাশের লাইনে বসে পড়ে দীপা, চিৎকার করে কাঁদে সে, বাবার মুখটা মনে পড়ে দীপার, আরো কান্না পায়, মনে পড়ল মায়ের জোড়া ভুরু, দুর্গাপ্রতিমার মতো মুখ। ঠাকুমা, পুষি বেড়াল, সাদা জবা, শিউলি গাছ, টুকরো টুকরো স্মৃতিতে দীপার নিজেকে বড় অসহায় লাগে, এখন একটাই ইচ্ছে তারা সবাই যেন ভালো থাকে আর দীপাকে যেন সব্বাই ভুলে যায়।

ট্রেন আসছে...

দরজায় কলিং বেল বাজতেই সচকিত হয়ে উঠল দীপা, সন্ধ্যার মা দরজা খুলতেই রুমি দ্রুতগতিতে কিছু বলে। রুমি দীপার বাইশ বছরের মেয়ে। নাঃ মেয়েটাকে একটু বকাবকি করতে হবে, রাত্তির সাড়ে দশটা বাজে।

রুমি বেশি রাত করলেই দীপা যেন কাঁটা হয়ে যায়। তার নিজের জীবন যেন তাকে মেয়ের ব্যাপারে বেশি ব্যাকুল করে তোলে।

ঘরে ঢুকল রুমি, আয়নায় চট করে নিজের মুখটা দেখল একবার।

কী ক্লান্ত অথচ কী মায়াবী এখন রুমি। দীপার মুখের রেখা কঠিন হতে থাকে। রুমি ওয়ার্ডড্রোব খুলে হাউসকোট বার করে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, গুডনাইট।

দীপার চোখ মুখ দিয়ে গনগনে রাগ বেরুচ্ছে, তুমি খাবে না?

রুমি দীপার দিকে উজ্জ্বলভাবে তাকাল, সকালেই তো বলে গেলাম, রাতে ডিনার আছে, তুমি খেয়ে নিও।

ক্রোধে দীপার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। ক্ষিপ্তভাবে বলল, সুমিত্রা ফোন করেছিল, বলল তুমি আজ ইউনিভার্সিটি যাওনি, অথচ সকালে অত তাড়া করলে, ফার্স্ট পিরিয়ড আছে বলে। পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়ে দিনরাত এসব কী হচ্ছে ? এসব অবাধ্যতা আমি টলারেট করতে পারবো না।

রুমির অসহ্য লাগল, কী ভেবেছে তার মা, কথায় কথায় তার লাইফস্টাইল, পড়াশুনা নিয়ে খোঁটা দেওয়া! সেকি ক্লাস সেভেনের ছাত্রী নাকি? রুমি মাকে চুপ করাতে চাইল, ডোন্ট ডিসটার্ব মাই পারসোনাল লাইফ। আই হ্যাভ অলসো অবজেকশনস্ অ্যাবাউট ইউ...। আমি সাধারণত তোমার ব্যক্তিগত চলাফেরা নিয়ে প্রশ্ন করি না, বিকজ আই হ্যাভ দ্য সেন্স অব ডিগনিটি।

ফুঁসে ওঠে দীপা. কী বললে আমার ডিগনিটি নেই? আমার বাড়িতে তুমি কখন ফিরবে এটা আমি ঠিক করবো। আমার নিয়ম পছন্দ না হলে বেরিয়ে যাও।

রুমি কাঁধ ঝাকিয়ে বলল. তুমি যেতে বললে যাবো।

দীপা ক্ষীণ হেসে বললো, কোথায় যাবে?

ঝুমি স্পষ্ট চোখে মায়ের দিকে বলল, কেন যেতে পারি না? তুমি তো তোমার বাবা-মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, আর তার জন্যে সাফার করতে হয়েছে আমাকে। কোনোদিন বাবা কাকে বলে জানলাম না। বন্ধুরা যখন বাবার গল্প করত, আমি চুপ করে যেতাম, পালিয়ে আসতাম। যখন এইভাবে আমি বাবাকে মিস করছি তখন তুমি তোমার কাজ তোমার নিত্যনতুন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। এখনও তো বেশ হেসে খেলে বেড়াও, মাঝে মাঝে যখন ফ্রি হও, আমার পেছনে লাগো।

দীপার চোখে জল, কালো হয়ে গেছে মুখ, তুই আমাকে এইভাবে বলছিস, তোর জন্য সারাটা জীবন স্ট্রাগল করলাম, মানুষের হাজারটা প্রশ্ন, তুই যে সব বয়ফ্রেন্ডদের কথা বললি, তাদের কুপ্রস্তাব, কতকিছু সহ্য করলাম, তার প্রতিদানে আজকে তুই... আমার নিয়তি কোনোদিন বদলালো না, আজকেই ভাবছিলাম তুই জন্মাবার আগেই কেন মরে যাইনি।

ঝুমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, নিজের দুঃখ তুমি নিজেই ডেকে আনো। যা সহজ তাকে মানছো না, তুমি কী ভাবো, আমি ওয়ান পেরেন্ট চাইল্ড বলে সবসময়ে তোমার আঁচলের তলায় থাকব? এটা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? আমিও তো আমার জীবনটা এনজয় করবো, আমি জানি জীবন কাকে বলে। আমি কোনো বয়ফ্রেন্ডের ওপর ডিপেনডেন্ট নই, তোমার মত অস্বাভাবিকভাবে বিয়ের আসর ছেড়ে পালাবো না। আর সারাজীবন লুকিয়ে কাঁদবোও না।

দীপা ভারী গলায় বলল, কে কাঁদে লুকিয়ে?

তুমি প্রত্যেকদিন কাঁদো, একটু বড় হওয়ার পর থেকেই দেখেছি, রাত্তিরে বালিশে মুখ লুকিয়ে প্রতিদিন তুমি কাঁদো। ছোটবেলায় আমার কাছে ব্যাপারটা অ্যামব্যারাসিং ছিল, আমারও ভীষণ কান্না পেত, মন খারাপ হতো, তবু কিছু বলিনি, কারণ ওই বয়েসেই মনে হত আমি কিছু বললে তুমি কষ্ট পাবে।

সব মানুষই কখনো কখনো কাঁদে ঝুমি, তাতে হয়েছে কী?

ঝুমি আস্তে আস্তে বললো, তেমন কান্না নয়, তুমি ভুল করেছিলে এতদিনেও বোঝনি তুমি সুইসাইড করতে ভয় পাও তুমি বেসিকালি ভীতু... ভুলে ভরা তোমার জীবন, তাই আজও চোখের জল ফেলো। আমি নিজে যা ভুল মনে করি তা করি না, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজিন আই হ্যাভ নেভার গট টিয়ার্স।

একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল ঝুমি। শাওয়ারের নব ঘোরালো। কান্নার দোলায় কেঁপে উঠছে ঝুমির শরীর। তার অশ্রু মিশে যাচ্ছে স্নানের জলের সঙ্গে। আলাদাভাবে একবিন্দু অশ্রুরও চিহ্ন নেই ঝুমির চোখে...।

চেনা ছবির ভিতরে

বিনতা রায়চৌধুরী

লাল চক্‌চকে সিঁড়ি। তার পেছনে লাল চাতাল। সেটাও কেমন চকচকে। দুর্দান্ত পালিশ হয়েছিল। ভুড়ি মেবে মোজাইক মেঝেকে হারিয়ে দিতে পারে। সূর্যশেখর তাই-ই চেয়েছিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মোজাইকের বদলে লাল মেঝে, লাল সিঁড়ি করিয়েছিলেন।

বারান্দার একধারে ইজিচেয়ারে দোল খেতে খেতে মেঝের দিকে তাকিয়ে এই লাল ইতিহাস স্মরণ করছিলেন সূর্যশেখর। জমিটা কেনা ছিল বাবার আমলে। ভাগ্যিস্। না হলে বাড়িটা তিনি বানাতেই পারতেন না। বাবা বলেছিলেন, তোর মায়ের পায়ের ব্যথা, আমারও হাফ্ ধরে, তাই একতলায় আমাদের ঘর করিস। ওপরে তুই বউমা আর বাবলু। বাবার কথা মেনে নিয়েই একেবারে নিখুঁত প্ল্যানে বাড়িটা বানিয়েছিলেন সূর্য। একতলায় রান্নাঘর খাবার ঘর, বাবা-মায়ের ঘর আর বসার ঘর। আর দো-তলায় দু-খানা ঘর। বাবলু, কবিতা আর তার জন্য। বাবলুর বিয়ের পর অবশ্য বড় ঘরটা ওদেরই ছেড়ে দিয়েছেন। ছোট্ট ঘরটায় কবিতাকে নিয়ে তাঁর দিব্যি চলে যায়।

ইজিচেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে ছাদে উঠে এলেন তিনি।

চৌবাচ্চার মতো টব বানিয়ে ছাদের কোণে এই শিউলি গাছটা লাগিয়েছিলেন। কবিতা বলেছিল, 'শিউলি গাছ কেন?'

'আমার কবিতার জন্য!'

'মালা গাঁথব নাকি?'

'মালা গাঁথো, অঞ্জলি ভরে ছড়িয়ে দাও, ফুলের বাসর সাজাও। তোমার যেমন ইচ্ছে। জানো তো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জীবনের মানে বদলে যায় তেমন জিনিসের ব্যবহারও পালটে যায়। যৌবনে ফুলের রূপ একরকম, বয়স হলে অন্যরকম।'

'সেটা কিরকম?' কবিতা গালে টোল ফেলে হেসেছিল। সে সময় কবিতার ওই গালের টোলের জন্য একটা শিউলি গাছ কেন? শিউলির বন বানিয়ে ফেলতে পারতেন সূর্যশেখর।

কবিতার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন, 'যৌবনে ফুল তুলে মনে হয় প্রিয়তমার চুলের অরণ্যেই এ মানাবে ভাল, আর বয়েসে মনে হয়, ফুলটি নিয়ে মন্দিরে দিয়ে আসি, ঠাকুরের পায়ে।'

কথাটা যে কত সত্যি আজ বোঝা যায়। কবিতা তখন ভোরবেলায় শিউলি ফুল কুড়িয়ে তাঁর ঘুমন্ত শরীরে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বলত— 'আমার সখার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে।' সূর্যশেখর হেসে ফেলতেন। উঠে পড়তেন, ফুল ভর্তি কবিতার হাতখানা ধরে কাছে টেনে... কত রঙিন স্মৃতি। এখন কবিতা শিউলি ফুলের মালা গেঁথে রাধা-কৃষ্ণের গলায় দেয়। সকালে পুজো করে। বাজার থেকে কিনে আনা ফুলে ও পুজো করতে চায় না।

পেছন থেকে কবিতা হঠাৎ বলে উঠল,— 'কী ব্যাপার ছাদে একা একা কী করা হচ্ছে?'

'শিউলি গাছটা দেখছি। এখনও কত ফুল হয়, না?'

'তা হয়, কিন্তু কতদিন আর এর আয়ু? বাবলুর প্রস্তাব শোনোনি?'

'আচ্ছা কবিতা, ছাদে এই জলের রিজার্ভারটা বানানোর সময় আমি অফিসে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?'

'মনে নেই আবার? রাত থাকতে উঠে সিমেন্টে জল ঢালতে, লাল মেঝের পালিশ যাতে ভাল হয় তাই নাওয়া খাওয়া ভুলে দাঁড়িয়ে থাকতে। এই বাড়ি বানাতে অফিস থেকে যে-লোন নিলে তাই শুধতেই তো...'

'তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে না?'

'কিসের কষ্ট। আমার বাড়ি হবে আর একটু কষ্ট সহ্য করতে পারব না। এই বাড়ি তো শুধু একটা বাড়ি নয়, এর পেছনে রয়েছে একশোটা গল্প। মেঝেতে বারান্দায় ছাদে ঘরের কোণে কোণে কত যে কাহিনি লুকিয়ে আছে।' হেসে ফেললেন কবিতা, ঠিক আগের মতো গালে টোল ফেলে।

সেদিকে তাকিয়ে রইলেন সূর্য, ছবিটা কত পুরনো কিন্তু কী প্রিয়! এ বাড়ির খাঁজে খাঁজে কত ছবি। কত চেনা-কত প্রিয়।

'বাবলুর প্রস্তাবটা কি ভেবে দেখেছ?'

'ভাবছি, জানো, খুব ভাবছি।'

'ভেবে কী হবে, সন্তানের সুখই বাবা-মায়ের সুখ। রাজি হয়ে যাও।'

—'আমারও তাই মনে হয়। এছাড়া আর কীই-বা করতে পারি। তবু—'

।। দুই ।।

ট্রেন দুললেই কেমন একটা ঘুম ঘুম পায়। বাবলু রাংতাকে বলল, 'খাবার দিয়ে দাও। খেয়ে শুয়ে পড়ি। কাল সকালে একেবারে ঘুম ভাঙবে। হোটেল তো বুক করাই আছে। চিন্তা কী?'

রাংতা প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে বলল,— 'তোমার কী মনে হয়, বাবা সইটা করে দেবেন?'

—'না দেবার কী আছে? আমার প্রস্তাবটা তো খারাপ নয়। যতদিন না প্রমোটর ফ্ল্যাট-টা হ্যান্ডওভার করছে, সে কটা দিনই তো বাবা-মাকে বৃদ্ধাবাসে থাকতে হবে। তারপর তো নিয়ে আসব বলেছি।'

— 'হ্যাঁ, ততদিন তো আমাকেও বরানগরে থাকতে হবে, তোমাকে আর টিংকুকে নিয়ে। বিয়ের পর বাপের বাড়িতে থাকতে আর কার ভালো লাগে?'

—'তোমার দাদারই দেওয়া প্রস্তাব, ভুলে যেও না।'

— 'না, না, ভুলব কেন। দাদা সাদা মনের মানুষ।'

পরোটা আর মাংস খেতে খেতে বাবলু বলল,— 'অনেক জায়গায় মাংস খেয়েছি কিন্তু মায়ের হাতে রান্না মাংসর মতো খাইনি।' রাংতাও সায় দিল,— 'ওই জন্যই তো, মা যখন বললেন ট্রেনের খাবার আমি বানিয়ে দেব তখন আর না বলিনি।'

'টিংকুকে শুইয়ে আমার বিছানা করে দাও।'

রাংতা আগে হাত ধুয়ে এল। তারপর বাবলু।

'বাবা মা হয়তো ভাবছেন আমরা ওনাদের আর বৃদ্ধাবাস থেকে আনবই না।' আপার বার্থে টিংকুর বিছানা পাততে পাততে রাংতা বলল।

'দেখো না, বৃদ্ধাবাসে ওদের এমন মন লেগে গেল যে আর আসতেই চাইবে না। শত হলেও এখানে তো ওদের কোনও সঙ্গী নেই। আমরাও সময় দিতে পারি না।'

'আমার যা মনে হল মায়ের কোনও অমত নেই। কিন্তু বাড়িটা তো বাবার নামে, সইটা তো ওনাকেই করতে হবে।

'আমি যথেষ্ট বুঝিয়ে বলেছি, আশাকরি পুরী থেকে ফিরে গিয়ে দেখব বাবা মনস্থির করে ফেলেছেন।'

'বলা যায় না, বাড়ি নিয়ে বাবার দুর্বলতা আছে। নিজের হাতে গড়া! কিন্তু কোনও প্ল্যান নেই। বাড়ির সামনে অতটা জায়গা কেউ ছেড়ে দেয়? গ্যারেজ করা যেত, অফিস করা যেত।'

'না, আসলে আমারই ছুটোছুটি করে খেলার জন্য ফাঁকা জায়গাটা রেখেছিল

বাবা। একটা দোলনাও ছিল আমার জন্য। খুব প্রিয় ছিল সেই দোলনাটা আমার। ভেঙেচুরে কোথায় যে গেল!'

'ছোটবেলার প্রিয় জিনিস ওরকম ভেঙেচুরেই হারিয়ে যায়। তার জন্য শোক না করে নতুন প্রিয় জিনিস বানিয়ে নিতে হয়।'

'সত্যিই তাই। বাবার সেই সাধের বাগান এখন ঝোপ ছাড়া আর কিছুই না, দেখলে বিরক্তিই লাগে।'

'যাকগে, এখন শুয়ে পড়ো। টিংকু তোমার কাছে থাকল। ইচ্ছে হলে আমার কাছে দিতে পারো।'

'না, না, ও আমার কাছেই থাক।' বাবলু তাড়াতাড়ি বলে উঠল। ছেলেকে ও চোখের আড়াল করতে পারে না। চায়ও না। টিংকু ওর চোখের মণি। রাংতা সব জানে, মুখ মুচকিয়ে হাসল।

'হাসার কি আছে? আমি ওর বাবা না? ছেলেকে ছেড়ে বাবা থাকতে পারে?'

'বেশ শুয়ে পড়ো। সকালবেলা সমুদ্র।'

নিজের বার্থে বিছানা সাজাতে সাজাতে রাংতা বলল, 'এই, শোনো, বাবা-মা যদি বৃদ্ধাবাস থেকে আর না আসেন তাহলে টিংকুর জন্য আলাদা একটা ঘর হবে, কেমন?'

বাবলু ঘাড় নেড়ে হাসল।

।। তিন ।।

'কী ভাবছ অত?' কবিতা এসে সূর্যশেখরের পাশে দাঁড়াল।

'ছবি দেখছি। ছবি খুঁজছি।'

'কার ছবি? কিসের ছবি?'

'সকালের ছবি, দুপুরের ছবি, সন্ধ্যার ছবি আর রাতের ছবি।'

'সে কী? তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

'কবিতা, তোমার সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা করতে পারি? সত্যিই আমি ছবি দেখছি। নানা রঙের ছবি। হাসি-কান্না, মান-অভিমান-মাখা সুগন্ধি ছবি।'

কবিতা স্বামীর কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়াল। বাহুতে মুখ গুঁজে বলল, 'বুঝিয়ে বলো না, অত কঠিন করে বললে আমি বুঝতে পারি?'

'যেমন ধরো, ওই চাতালে তুমি বাবলুকে তেল মাখাচ্ছ কিংবা সন্ধেবেলা ঘুরে ঘুরে ওকে ঘুম পাড়াচ্ছ। ছবি দুটো মনে করতে পারছ না? না পারলে চোখ বোজ, দেখতে পাবে।'

কবিতা হাসল, 'চোখ খুলেই দেখতে পাচ্ছি।'

'কিংবা ধর, শীতের দুপুরে তোমার প্রিয় বারান্দায় বসে তুমি উল বুনছ। এই ছবিটা ওই বারান্দা থেকে আলাদা করা যায়? রোজ সকালে তুমি শিউলি তলায় ফুল কুড়োচ্ছ। এ ছবি মুছে ফেলা যায়?'

'না, তা যায় না। আমি একটা চেনা ছবির কথা বলব?' ঠোঁট টিপে হাসল কবিতা। —'তুমি প্রত্যেকদিন অফিসে যাবার সময় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে...'

'কবিতা, এদিকে তাকাও।'

'যাঃ কি করছ? কেউ দেখে ফেলবে যে।'

'কেউ দেখবে না, কেউ তো বাড়ি নেই।' সূর্যশেখর দুহাতের পাতায় টেনে আনলেন কবিতার মুখ। তারপর নামিয়ে আনলেন ঠোঁট, কবিতার ঠোঁটের ওপর। কতদিন পর এমন গভীরভাবে।

রেশ কাটতে না কাটতেই সূর্য বললেন, --'এবার সব গোছগাছ করে নাও। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। বৃদ্ধাবাসে বেশি জিনিস তো নিয়ে যেতে দেবে না। অনেক কিছু বাদ দিতে হবে।'

---'হ্যাঁ জানি কিন্তু কিছু বাদ দিতে পারছি না। গোছাতে গেলে অনেক জিনিস হয়ে যাচ্ছে জানো।'

'বাদ দিতে হবে কবিতা, বাদ দিতে হবে। অনেক কিছু ছাড়তে হবে।'

'কিন্তু আমরা তো আবার এখানে ফিরে আসব। প্রমোটার বাড়ি বানিয়ে বলেছে না, আমাদের একটা বড় ফ্ল্যাট দেবে।'

'হুঁ, তা তো বলেছে। কিন্তু ..'

আমাদের জিনিসগুলো অন্য কোথাও রেখে যাই, ফিরে এসে নিয়ে নেব।'

'হুঁ, ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'কোথায় রেখে, কোথায় যাই! বাবলুটা ভারি ছেলেমানুষ, ওর ওপর বোঝা হতে চাই না। ছোট থেকেই যা চায় তাই দিয়ে এসেছি।'

'বাবলু আমাদের একমাত্র সন্তান। সে যাতে সুখী হয়, তাই তো করব।'

--'সে তো করবই। কিন্তু ওরা কেন আমাদের মনের দিকে একবারও তাকায় না, কেন বোঝে না যে ওদের ছেড়ে থাকতে আমাদের কত কষ্ট হবে।'

—'জানো না, স্নেহ নিম্নগামী।'

---'শিক্ষাও একদিক থেকে নিম্নগামী। উত্তরসূরিকে ঠিকঠাক শিক্ষা দেওয়াও পূর্বসূরির কর্তব্য।'

।। চার ।।

পুরী থেকে ফিরে এসে বাবলু আর রাংতা দেখল সূর্যশেখর বসে বসে অতীনকাকুর সঙ্গে দাবা খেলছে। বাগানটা বেশ সাফসুতরো করে ওখানে টেবিল-চেয়ার পেতে বসেছে দুজনে।

রাতে খাবার টেবিলেও অতীনকাকুকে দেখে ওরা একটু চমকে গেল। অতীনকাকু বাড়ি যায়নি? ওরা লক্ষ করে দেখল, একতলার দাদুর ঘরটায় অতীনকাকুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

তিন-চারদিন পর সূর্যশেখর রাংতাকে ডেকে ওর হাতে এক হাজার টাকা দিলেন,—

'অতীনের খাওয়া খরচ, প্রতি মাসে দেবে।'

'তার মানে? অতীনকাকু?'

'এখন থেকে এখানেই থাকবে। নিচে বাবার ঘরটা তো ফাঁকাই পড়েছিল। অতীনের থাকার কোনও জায়গা নেই।'

'তাই বলে আমাদের বাড়িতে একেবারে বরাবরের মত এসে জুটবেন নাকি?'

সূর্যশেখর সোজা তাকালেন রাংতার দিকে— 'অতীন আমার বন্ধু, সম্মান করতে ইচ্ছা না হয় করো না কিন্তু অপমানজনক কথা বলো না।'

—'তাই বলে এই বাড়িতে... রাংতা তো কথাটা ঠিকই বলেছে বাবা।'

বাবলুর দিকে তাকালেন সূর্য— 'বাড়িটা এখনও আমার নামে।' বাবলু বাবার গলায় এমন কৌতুক মিশ্রিত কাঠিন্য শোনেনি। কথা না বাড়িয়ে চলে এল ঘরে। পিছু পিছু রাংতাও।

সাতদিন সব চুপচাপ কাটল। সামনের বাগান পরিষ্কার। রোজ বিকেলে দাবা খেলা চলে। সকালে চা-পর্ব। ভোরে অতীনকাকু আবার ব্যায়াম করেন। বাবাকেও টানাটানি করেন।

হঠাৎ বাবলু লক্ষ করল দাদুর ঘরের পাশে পুরনো বসার ঘরটা ঝাড়া-মোছা চলছে। রাংতাই এসে বলল প্রথমে। তাই তো কী ব্যাপার। বাবলুর রাগ হয়ে গেল— কাগজটায় সই করছে না বাবা, অতীনকাকুর সঙ্গে দাবা খেলছে। মর্নিং ওয়াক করছে। ব্যাপার কি?

'তুমি আজ একবার বলবে?'

'বলবই তো। প্রমোটার তাড়া দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মেটাতে হবে।'

দলিলটা হাতে নিয়ে বাবলু বাবার ঘরে গেল।

—'বাবা, সইটা করে দেবে না?'

সূর্যশেখর ছেলের দিকে তাকালেন।

'সইটা করে দাও বাবা। অনেক ভালো ফ্ল্যাট দেবে ওরা। মস্ত বড়। অনেক টাকাও দেবে।'

—'হুঁ, ভাবছি।' সূর্যশেখর অন্যমনস্কভাবে বললেন।

বাবলু হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'নিচের বসার ঘরটা পরিষ্কার হচ্ছে কেন?'

'অংশু আর অচলা আসছে, ওরা থাকবে। বন্ধ ঘরে গুমোট তৈরি হয়। ওরা থাকলে আবহাওয়াটা ভালই হবে।'

'অংশুকাকু? তোমার কলেজের বন্ধু?'

ঘাড় নাড়লেন সূর্যশেখর। বাবলু ঠিকই চিনেছে।

বাবলুর কেমন মেজাজ বিগড়ে গেল, বলে ফেলল,—'তা ওনাদেরও কি পার্মানেন্ট ব্যবস্থা নাকি?'

—'হুঁ, ভাবছি।'

ঘরে ফিরে এল বাবলু। রাংতাকে সব বলল। রাংতাও বেশ অবাক। 'বাবা তো ভেবে ভেবে অনেক কিছু করছেন। এত ভাবছেন কেন? আমরা ভুল করেছি জানো। বাইরে যাওয়া উচিত হয়নি। আগে সইটা করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।'

'শেষ পর্যন্ত করবেন তো? নইলে আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। এই পচা বাড়িতেই একখানা ঘর নিয়ে থাকতে হবে।'

'বউমা' কবিতা ওদের ঘরে ঢোকার সময় সব সময় ডাক দিয়ে ঢোকেন। আজও তাই ঢুকলেন। কিন্তু শেষের কথাটা তাঁর কানে গেছিল।

'বলুন মা।' রাংতা একটু বেজার মুখে জবাব দিল।

'টিংকুকে নিতে এসেছি। ওকে চান করে খাইয়ে দিই।' টিংকুকে কোলে করে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছিলেন কবিতা, হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন, 'আমার পুরনো বন্ধু অচলা আসছে। ও আবার একটু সেকেলে মানুষ। তুমি সিঁথিতে একটু সিঁদুর পরো কেমন?'

বাড়িটা কেমন পালটে গেছে। বাবলু লক্ষ করছে, মা আগের মতোই রান্না করেন কিন্তু মাঝে মাঝে অচলা কাকিমা হাত লাগান। বাবা বিকেলে দুই বন্ধুকে দুপাশে নিয়ে হাঁটতে বেরন। খুব আড্ডা মারেন বাগানে। দাবা খেলেন। বাবা যেন জীবনটাকে বেশ উপভোগ করছেন।

অংশুকাকুদের খাওয়া খরচ বাবদ দু-হাজার টাকা দিয়েছেন। বাবলু অফিস থেকে ফিরলে আগের মতোই মায়ের হাতে-করা জলখাবার পায়। টিংকুকে মা আগের মতোই যত্ন করেন। ওরা রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে

গেলে, টিংকুর সব দায়িত্ব নেন। রাংতার স্বাধীনতা একটুও নষ্ট হয়নি। যখন ইচ্ছে বেরয়। ওই একদিনই মা সিঁদুর পরতে বলেছিলেন। তাছাড়া সব মসৃণ চলছে। শুধু একটা কথা কেউ ভাবছে না। বাড়িটা নিয়ে একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

এতদিনে বাবা-মায়ের গোছগাছ সেরে ফেলা উচিত ছিল। বাবলু নিজে বারাসাতের বৃদ্ধাবাস 'সুখনীড়'-এর সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। তাদের নিজেদেরও বরানগরে যাবার গোছগাছ আছে। বাড়িটা এভাবে অতিথি পরিবৃত হয়ে থাকলে কী করে হবে এসব! বাবলু আবার বাবার কাছে গেল।

সূর্যশেখর তখন ঘরে একাই ছিলেন।

'বাবা, বাড়ির সেই ব্যাপারটা, তোমার সইটা বাকি আছে।'

'বাবলু বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। এই বাড়িটা যখন করেছিলাম ভাঙার কথা একবারও ভাবিনি। তাছাড়া গড়া জিনিস ভাঙতে বড় মায়া লাগে।'

বাবলু বুঝতে পারছে না, বাবা কি মত পরিবর্তন করেছেন! সূর্যশেখর আবার বলতে শুরু করলেন,— 'তুমি সেদিন একটা দামি কথা বলেছিলে, ভেবে দেখলাম ছোটদের কাছ থেকেও অনেক শেখার থাকে।'

—'কী কথা?'

'বলেছিলে, সব সময় সমমনস্ক আর সমবয়স্ক লোকেদের সঙ্গে থাকতে হয়। সেই প্রসঙ্গেই আমাদের বৃদ্ধাবাসে যাবার কথা বলেছিলে। কিন্তু এই বয়সে চেনা ছবির বাইরে যেতে কেমন অস্বস্তি লাগে।'

—'তাই এই বাড়িটাকেই বৃদ্ধাবাস বানিয়ে তুলেছ?' বাবলুর গলায় ব্যঙ্গ ছিল, সূর্যশেখর বোধহয় খেয়াল করলেন না। উৎসাহের গলায় বললেন, 'ঠিক তাই। ভেবে দেখলাম, আমার বাড়িটাই তো সমবয়সী আর সমমানসিক মানুষদের দিয়ে ভরে তোলা যায়। ভাবছি তোমাদের ঘরটায় প্রিয়ব্রতকে থাকতে দেব। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বেচারা বড্ড একা হয়ে পড়েছে। ওর ছেলে-ছেলের বউয়ের সঙ্গে একেবারে বনছে না।'

- 'আমাদের ঘরটায় মানে?'

—'তোমাদের একমাস সময় দিলাম, তার মধ্যে গেলেই হবে। তোমাদের তো বরানগর না কোথায় যাবার কথা ঠিক হয়ে আছে, না?'

--'তুমি আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছ বাবা?'

—'তাড়িয়ে দিচ্ছি না, উড়িয়ে দিচ্ছি। নিজে কিছু গড়ে তোলো, চেনা ছবি তৈরি করো। দেখবে, তারমধ্যে বেঁচে থাকার একটা আলাদা সুখ আছে। তবে এ বাড়িও রইল। শেষ বিকেলে যদি ইচ্ছে হয়, এসে থেকো। তোমার টিংকু যদি তোমাদের জন্য কোন 'সুখনীড়' খোঁজে, তাহলে এখানে চলে এসো।'

পাখির পালক

ঈশিতা ভাদুড়ী

কি রঙে রাঙালে এ ছবি রামধনুতে যে রঙ হারায়!

আজ সকালটা ছিল আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে অল্প মেঘ, মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি। এইসব দিনে আমার মন ভালো হয়ে যায়। আমি ছাদ থেকে সোজা আমার ঘরে এসে চেয়ার টেনে নিই। কলম খুলে কিছু একটা লিখতে হবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে যায় দুটো শালিখের দিকে এবং তখনই মনে পড়ে অনির্বাচিত মুখগুলির গল্প....

এখান থেকে আমি রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। তিনটে বছর কুড়ি বয়সের ছেলে খুব জোরে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল। আমি ভাবলাম, ওদের ভেতর কোনো একটি ছেলের মা হাসপাতালে রয়েছে তাই এত তাড়াতাড়ি। এবার একটি ঢ্যাঙা লোক এই গরমেও গায়ে চাদর মাথায় টুপি ধীরে ধীরে রাস্তা পার হয়ে গেল। মনে হয় লোকটির পঞ্জিকাতে কালের কোনো হিসেব নেই। এরপর দুজন কিশোরী হাঁটু-ঢাকা জামা পড়ে, নিশ্চয় ওরা সামান্য কথাই বলছে, কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে বেশী। আমি ভেবে নিলাম ওদের মধ্যে একজনের নাম প্রিয়াঙ্কা, বছর পনেরো বয়স...

প্রিয়াঙ্কাকে প্রণবেশ বলেছিল— তোকে আমি ভালবাসি অথবা না বাসি, যদি কখনো আমার শরীরে প্রয়োজন হয়, আমি যাবো তোর কাছে, তখন কিন্তু তুই ফিরিয়ে দিস না। প্রণবেশ পাল মূলত কবিতার বন্ধু ছিল, শরীর নিয়ে ভাবতো খুব। অত্যন্ত মামুলি একজন, গোলমুখ, মাথা ভর্তি শুকনো চুল, কলেজের গণ্ডী পার হতেই কালঘাম ছুটেছিল তার। এমন একটা মানুষকে নিয়ে প্রিয়াঙ্কা ছেঁড়া স্বপ্নও দেখে নি কখনো, তবু সেই তরুণ বলেছিল, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না, কারণ তুই সুন্দরী না। প্রণবেশ পালের দিকে পিছু ফিরে সেই কিশোরী হেঁটে যাচ্ছে।

ঢেউ এসে ভেঙে যায় পদতলে....

তারপর প্রিয়াঙ্কা নামের সেই কিশোরী তখন আর তেমন কিশোরী থাকবে না, ধীরে ধীরে জেগে উঠবে। ঠিক সেই সময় হয়তো কোনো আঠাশ বছরের যুবক তাকে বলবে— আমি মোটেই নবীন যুবকদের মতো তীব্র নই, চুল ছিঁড়ছি, জামার বোতাম লাগাতে পারছি না, নখ কাটতে ভুলে যাচ্ছি, ভুল হয়ে যাচ্ছে সব কাজে। সেই যুবক হয়তো সমর নাম তার, সহসা বলে উঠবে, যদি কিছু ঘটে ভোরে কিংবা কুয়াশায়। আরো অনেক কথা হয়তো বলতে চাইবে সে। প্রিয়াঙ্কা সেসব কিছুই শুনতে পাবে না, কারণ প্রিয়াঙ্কা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। হয়তো সে ডায়েরীও লিখছে।

....সংঘাত কাকে বলে? জীবনের এক একটা ক্ষণের আনন্দ উত্তেজনা, আর দুর্ঘটনার মতো আমরা সবাই। হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে যাই সাংঘাতিক এক স্পর্শ, মুছে যায় সমস্ত যন্ত্রণা, সেরে যায় সমস্ত অসুখ। কি হয়, কেন হয়! কোথায় যেন পড়েছিলাম, মানুষের জন্ম কত অনিশ্চিত, অথচ মৃত্যু অবধারিত; তবু আজও মানুষ মরে গেলে মানুষ কাঁদে। পৃথিবীতে আশ্চর্যের শেষ নেই। কোনো এক পাগল বৈজ্ঞানিক নাকি একবার একটি ফুলের ফুটে ওঠা থেকে ফুলটি শুকিয়ে ঝরে যাওয়া অবধি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছিলেন।

....প্রবল পুরুষকারে সিদ্ধার্থদা বিয়ে করেছিল ইন্দ্রানীদিকে, ভালবেসে। ইন্দ্রানীদি চায় নি। সিদ্ধার্থদা বলেছিল— আমার ভালবাসায় অ্যাড্‌জাস্টমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার চোখে বা আমার ভালবাসার মানুষটার চোখে ছোটো খাটো ত্রুটিগুলি ধরাই পড়বে না। সিদ্ধার্থদা বলেছিল ইন্দ্রানীদিকে, তুমি আমার হৃদয়কে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রিত করতে পারো। অতঃপর ইন্দ্রানীদির অনিচ্ছেতে এবং সিদ্ধার্থদার প্রবল ইচ্ছেতে বিয়েটা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কিন্তু ছবি বদলে গেছে, ভাষাও। তারা সুখী হয় নি। সিদ্ধার্থদা এখন বলে, সেদিনের সেই অনুভূতি আসলে মোহ ছিল।

....তবে কি কোবালাম বিচে হঠাৎ বৃষ্টি হলেও কেউ কেউ আজীবন একা থাকে, বীভৎস একা! শ্রীকুমারদা লিখেছিল, নির্লিপ্ততা চাই না, ভাঙতে চাই, প্রতীক্ষার ক্ষণ বড় অবিবেচক....

মনে করা যাক্ সেই প্রিয়াঙ্কা নামের কিশোরী কখনো যুবতীও হয়ে গেলো। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাওয়া-আসা শুরু, ঘাসের ওপর শুয়ে থাকা যুবক যুবতীর পাশ মাড়িয়ে। সহসা অমিয়দার সঙ্গে পরিচয়, মাথায় বিশাল টাক, কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত, জীবনানন্দের কবিতা কণ্ঠস্থ। সেই ভদ্রলোক স্নেহসুলভ ভঙ্গিমাতে প্রিয়াঙ্কার দেখাশুনা শুরু করলেন, প্রায় পনেরো

বছরের ফারাক তাদের মধ্যে। ভদ্রলোক ইংরেজী কাগজ পড়েন, মদ খেয়ে মাতাল হন না। সেই অমিয়দা নামের মাঝবয়সী ভদ্রলোক সোজাসুজি প্রিয়াঙ্কা নামের সদ্যযুবতীটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। প্রিয়াঙ্কা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাওয়া ছেড়ে দিল শেযমেষ।

এরপর হয়তো প্রিয়াঙ্কা কোনো বনভোজনের বিকেলে হেঁটে যাবে। শুদ্ধ দেখবে। সেই যুবক সরলতার প্রবল উদাহরণ, পঁচিশ পার হয় নি, প্রিয়াঙ্কা তখন পঁচিশ পেরিয়ে। শুদ্ধ বলবে, আমি সাতসমুদ্র তেরো নদী তোলপাড় করে মুক্তো এনে দেবো তোমার হাতে, বলে উঠবে, তোমার জন্য আমার গোপন সিঁদুরে বিকেল... প্রিয়াঙ্কা চুপচাপ শুনবে, শুদ্ধ হয়তো বলবে— আমি যে তোমাকে ভালবাসি, আমার যে তোমাকে মাঝে মাঝেই খুব দেখতে ইচ্ছে করে এসব খুব সত্যি কথা, এবং দরকার হলে এটা বিকেল পাঁচটায় শেয়ালদা স্টেশনে এক লক্ষ লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বলতে পারি। খুবই নাটকীয় সংলাপ, কিন্তু শুদ্ধর বলা-য় কোনো ভান নেই এটুকু দূর থেকেও প্রিয়াঙ্কা বুঝতে পারে। শুদ্ধ লেখে— আমার পড়ার টেবিলের পাশের জানলা দিয়ে একটা পেঁপেগাছ দেখা যায়, বড় আশ্চর্য গাছ, মাস ছয়েক আগে হয়তো পাখি বা মানুষের উচ্ছিষ্ট থেকে তার জন্ম, তারপর ছ'মাস ধরে একদিকে কঠিন দাঁত বার করা ইঁটের দেওয়াল আর অন্যদিকে পাঁচিলের মাঝখানে সে কোমল সবুজ আলাপী ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শুদ্ধ লেখে, এই গাছটার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার একটা যোগাযোগ আছে, কাল্পনিক, তবু আছে। প্রিয়াঙ্কার জানতে ইচ্ছে হয় নি সেই কাল্পনিক যোগাযোগের গল্প।

প্রিয়াঙ্কা শুদ্ধর মতো আরও একজন বালককে হয়তো দেখে থাকবে— মনোময় বিশ্বাস—ছবি আঁকে, খুব কথা বলে, নিজের কথা। অন্যপক্ষেরও কিছু কথা থাকতে পারে ভাবেই নি কখনও। মনোময় প্রিয়াঙ্কাকে কখনও ভালোবাসার কথা বলবে না, কখনও জিজ্ঞেস করবে না প্রিয়াঙ্কা মনোময়কে ভালবাসে কিনা, নিদেনপক্ষে পছন্দ করে কিনা তাও জানতে চাইবে না। মনোময় প্রশ্ন করবে, তুমি রাঁধতে পারো? মনোময় বলবে তুমি খুব বাজে ছবি আঁকো, তোমার ছবির সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। তারপর প্রিয়াঙ্কাকে নয়, প্রিয়াঙ্কার অভিভাবকের কাছে বিবাহ প্রস্তাব দেবে এবং পরে প্রিয়াঙ্কাকে চিঠি লিখবে— তোমার আমার সন্তান লিলুয়া ডনবস্কোতে পড়তে পারবে ইত্যাদি প্রভৃতি। সে তখনও জানতে চাইবে না, প্রিয়াঙ্কা এই বিবাহ-প্রস্তাবে রাজী কিনা, সে অন্য কিছুও জানতে চাইবে না।

শুদ্ধ এবং মনোময়ের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল প্রিয়াঙ্কা। কোথায় শেষ এই হাঁটা!

ঠিক কি কারণে গেলে বোঝে নি মানুষ, কিন্তু গিয়েছো যে,
দিদিভাই, ও দিদিভাই.... কিভাবে ছিঁড়েছো নিমেষে সুতো,
গেরস্থালি! তোমার ঘরে খাট পালঙ্কে কত মানুষ আজ!
তোমায় ওরা ডাকে.. দিদিভাই, ও দিদিভাই.... আমাদের
ছেড়ে লাগে না একা? কে ঘিরেছে তোমায় আজ? মহাকাশ?
ঠিক কি কারণে গেলে বোঝে নি মানুষ। কিন্তু গিয়েছো যে....
দিদিভাই, ও দিদিভাই....

এই অবধি লিখে প্রিয়াঙ্কা চুপ। দু-গালে জল। এই আশ্চর্য সুন্দর সকালেও প্রিয়াঙ্কার মনে পড়ে কখনো কখনো মৃত্যুর সঙ্গে মারা যায় কোনো প্রিয় গন্ধ, অলীক বৃষ্টিপাত, অত্যন্ত সরল চাঁদ। কখনো কখনো মৃত্যুর সঙ্গে শরীর ভস্ম হয় মাত্র। প্রিয়াঙ্কা প্রথম মৃত্যু দেখেছিল একটি কুকুরের। রাস্তার কুকুর। সেজ জ্যেঠু ওকে চা-বিস্কুট খেতে দিতেন। কবে কখন সেই কুকুর 'টমি' নামস্থ হয়েছিল মনে নেই, কবে বাড়ির সদস্য হয়ে গেল সেকথাও মনে পড়ে না। কিন্তু সে যখন মারা গেল বাড়ির উঠোনে কালো মেঘ নেমেছিল। প্রিয়াঙ্কার তখন বারো বছর বয়স। সমবয়সী দাদারাও একইসঙ্গে কেঁদেছিল।। সেজ জ্যেঠু টমিকে মৃত্যুর আগে জল দিয়েছিলেন, সে খায় নি। প্রিয়াঙ্কা দ্বিতীয় মৃত্যু দেখেছে পাশের বাড়ির পপাইয়ের দাদুর। এরপর মৃত্যু-সংখ্যা হাতে গোনে নি আর। 'মৃত্যু' শব্দটি ভীষণ ভারী। খুকুমাসীর মারা যাওয়াটা মেনে নিতেও প্রিয়াঙ্কার বেশ সময় লেগে গেল। খুকুমাসী বলেছিল "আমাকে বাঁচতে দিন ডাক্তারবাবু, আমি বাঁচতে চাই, একটা ইনজেকশন . ডাক্তারবাবু, আমি বাঁচতে চাই"....

প্রিয়াঙ্কার লেখা ডায়েরী থেকে পৃষ্ঠা ফড়ফড় উড়ে চলে...

...পদ্ম ও যতীনের গল্প। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তারা। বাড়ি থেকে পালিয়ে। হঠাৎ একদিন যতীন মারা গেল, বোমাতে। মৃত্যুর কারণ হদিশ করে লাভ নেই। মারা যাওয়ার কথাই ছিল এবং মারা যে গেল এটা-ই বড় কথা, পদ্মর তখন গর্ভাবস্থা। ছেলেটির জন্মের পর একদিন তাকে একা ফেলে রেখে অন্যত্র চলে গেল পদ্ম। ছেলেটির বুকে ভীষণ ভারী পাথর। উন্মাদপ্রায়। অথচ পদ্ম ব্যস্ত অন্য ঘরকন্নায়।

....প্রবালপাথর কেন বিষ দিলে চুম্বনে?

....শেফালি দেখে নি রঙ, শতচ্ছিন্ন শাড়িটিতে ছিল কোনোদিন, আজ

শরীরে কোনোরকম, লজ্জা লুকায় লক্ষ্মণের বিধবা পুত্রবধূ। লক্ষ্মণ আমাদের বাড়িতে মালীর কাজ করতো একসময়। ঐ ঘর, ঐ দেওয়াল. স্বামীটি 'ভাত বাড়ো, আসছি' বলে আসেনি ফিরে আর। কেন যে হঠাৎ রেললাইন টেনেছিল তাকে। ছেঁড়াখোঁড়া শরীর কারা যেন এনেছিল ঘরে। সেই ছিল সূত্রপাত, সেই শুরু. ছেলেটি মেয়েটি নিয়ে জীবনযাপন, সারা দিনমান বাঁচার লড়াই, তীব্র সংগ্রাম, এবাড়ি সেবাড়ি বাসনমাজা। রাতের অন্ধকারে কবে কখন স্বামীর ভাই কেড়ে নিল বিধবার নীরব সমর্পণ। নিত্য একই কাসুন্দিতে কবে কখন শেফালিও পেয়ে যায় গোপন প্রাণের দিশা।

বাগানে রক্তকরবী যখন, হৃদয় কাঁপে তখন হাস্নুহানার গন্ধে--কে যে লিখেছিল এমন। প্রিয়াঙ্কা ভাববে। অথবা, নীলতারা যদি খসে পড়ে কোনো, মানুষের বুঁজে যায় দুই চোখ....

...সোনালী চকচকে ফ্রেমে ঘন কালো কাচ--এইরকম একটি চশমা ছিল মেয়েটির চোখে। কানে ত্রিকোণ দুল সাদা পাথর জ্বলজ্বলে. ঠোঁটে কমলা লিপস্টিক. গায়ে কচিকলাপাতা ওড়না। মেয়েটি আমার পাশে বসেছিল এবং তিরিশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর দুটো আঙুল কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করছিল। কেন ছিল এই প্রতিক্ষণ নমস্কার? ঈশ্বর ভক্তি, নাকি. গন্তব্যের প্রতি বিশ্বাসহীনতা?

...আজ চৌদ্দ বৈশাখ. সন্ধেবেলায় এক উৎসবে কেঁপে উঠল পাঁজর। এখনও পড়ন্তবেলায় যে মুখ কাঁপায় হৃদয়, সহসা সস্ত্রীক. .

অসমাপ্ত লাইন, সাদা পৃষ্ঠা ফড়ফড় উড়ে যায়। অতঃপর কি লেখার ছিল প্রিয়াঙ্কার! কার মুখ কাঁপায় প্রিয়াঙ্কার হৃদয়! কে থামাতে পারে প্রিয়াঙ্কার এই বিরামহীন হাঁটা!

কাল সারারাত তাই রবীন্দ্রনাথ · আজ সকালে উঠে মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি। আর সেই কিশোরী মেয়েটি।

আলতো হাওয়ায় ওলটপালট পাখির পালক। পাখির পালক....

প্রতীক

মহুয়া চৌধুরী

বন্ধ কাঁচের ওধার থেকে তাদের নীল চোখ চেয়ে থাকে। তাদের লাল ঠোঁটে স্থির হাসি। তাদের গায়ের সুন্দর ফুলকাটা রেশমী জামাগুলো খুলে নিলে, গোলাপী প্ল্যাস্টিকের মসৃণ ত্বকেরও নীচে কোথাও কোনো অনির্দ্দেশ্য জায়গায় প্রতিদিন জমে ওঠে যে সব কথারা, ঐ উচ্ছল হাসি কিন্তু তার দায়িত্ব নেয় না।

ঝক্‌ঝকে গাড়ি থেকে নেমে যে সব ফুটফুটে চেহারার মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের হাত ধরে দোকানে ঢোকে, তারা কল্পনাতেও ভাবতে পারে না যে, তাদের শ্যাম্পু করা বব চুলের সুগন্ধ, নিষ্পাপ চোখের কৌতূহলী চাউনি, ফর্সা নিটোল গাল সমেত তাদের নরম উপস্থিতি, তাদের মিষ্টি অভিমানে ঠোঁট ফুলোনো এইসবই এক অভিজ্ঞতাহীন অবধারিত পরিণতির আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত করে তোলে দোকানের বাসিন্দাদের। তারপর চক্‌চকে লাল নীল ফুল আঁকা কাগজে মোড়া বাক্সয় করে প্রতিদিনই চলে যায় কেউ-না-কেউ। যে চলে যায়, হয় তো সে একজন ক্ষণ-প্রেমিক। বা একজন বন্ধু এবং কে জানে হয়তো এক প্রচ্ছন্ন শত্রুও। কিন্তু তার অন্তর্ধান তার বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকেও, ঘিরে ধরে এক নীল বিষাদে।

তবুও তারা হাসে, তখনও তারা উজ্জ্বল চোখে তাকায়। শূন্যস্থানটি অবশ্য শূন্য থাকে না বেশিক্ষণ। সেটি পূরণ করে হয়তো একজন রঙচঙে ক্লাউন, নয় আমুদে চেহারার এক লোমশ ভালুক। তখন হালকা বেগুনী সিল্কের জামা পরা একমাথা সোনালী চুলের সুন্দরী বার্বি, একটুখানি উপেক্ষার মিশেল দেওয়া বিস্ময়ে একবারটির জন্য ভুরু তুলে তাকায় পাশের নতুন সঙ্গীর দিকে, তারপর আবার সংকুচিত হয়ে মানিয়েও নেয় নিজেকে। আর কী করতে পারে সে, কাউকে অবজ্ঞা করতে হলেও যে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হয় নির্ভার

এক নিরাপত্তা। আর এক ধরনের মেয়ের দলও আসে ঐ দোকানে। দেখলেই চেনা যায় তাদের। তাদের তেল মাখানো চিটচিটে চুল, ছিটের জামার ঘন সবুজ, গাঢ় গোলাপী বা লালচে হলুদ রঙ অভিজাত রুচিতে ঘা দেয়। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের নখ খেতে খেতে তারা ঢোকে ভয়ে ভয়ে। বড় কুণ্ঠায় আঙুল তুলে দেখায় হাসি হাসি মিষ্টি মুখের বেবী পুতুলটির দিকে, যে ব্যাটারীর সুইচ অন করলেই নিখুঁত ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় আর হাসি হাসি মুখখানি কাঁদো কাঁদো করে কান্নার শব্দ বার করে। -- উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে, মেয়েটি একদিকে ঘাড় হেলিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু কথা বলে তার মাকে।

—তার মা একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত দোকানের মালিকের কাছে পুতুলটির দাম জানতে চান।

দোকানের মালিক চুপ করে থাকেন খানিকক্ষণ। যেন প্রশ্নটি শুনতেই পান নি। তারপর সামান্য ভুরু তুলে, রাস্তার ওপারের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংটাকে ভাবলেশহীন মুখে দেখতে দেখতে দাম বলেন।

মেয়েটির মা অপ্রতিভ ভাবে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকেন একটু। তারপর আরো এটা-ওটা পুতুলের দাম জিজ্ঞাসা করে শেষ পর্যন্ত সন্তানের হাতে তুলে দেন বোকা-বোকা চেহারার একটি কাপড়ের পুতুল। দোকানের মালিক এতই অবহেলা ভরে সেটি দেন, যে মনে হয় ঐ বিশেষ পুতুলটির বদলে পয়সা নেওয়া তাঁর নীতি বিরুদ্ধ।

ডাগর চোখের শান্ত মেয়েটি নীরবে তার সারা মুখে অসন্তোষ মাখিয়ে অনিচ্ছায় সদ্য পাওয়া জিনিসটি হাতে করে যেতে যেতেও বার বার ফিরে ফিরে তাকায় উঁচু তাকে সাজানো বড় বড় ঝলমলে জামা কাপড় পরা সুন্দর পুতুলগুলির দিকে। আর তার সেই অনিচ্ছার তরঙ্গ, তার হাতে ধরা সাদা-মাটা, বোকাসোকা পুতুলটিকে গ্লানিতে নুইয়ে দেয় কিনা, সে খবর কেই বা জানতে পেরেছে।

মাঝ দুপুরে নির্জন হয়ে আসে দোকান ঘরটি। শ্রান্তিতে দোকানের মালিক একটুখানি ঝিমিয়ে নেন। আর সেই সুযোগে রাস্তার ফুটপাথে খেলে বেড়ানো আদুর গায়ের হাতে পায়ে খড়ি ওঠা একদল ছেলে মেয়ে মাঝে মাঝে কাঁচের উপর তাদের কালো ধুলোমাখা মুখগুলো চেপে রেখে নির্ভেজাল বিস্ময়ে চেয়ে থাকে দোকান ঘরের মধ্যে। মাঝে মাঝে আঙুল তুলে, একজন আর একজনকে কোনো বিশেষ পুতুলটি দেখায়। সব থেকে বেশি আসে একটা মেয়ে। দোকানের বাসিন্দারা সবাই চেনে ওকে। ওর নাম রুঙলি। ঐ

বড় রাস্তা পেরিয়ে ওধারের ঝুপড়িগুলোর একটাতে ও থাকে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বুঙলির হাতে সব সময় ধরা থাকত একটা হাত কাটা ন্যাড়া পুতুল। মুছে যাওয়া চোখ তুলে বুঙলির ঘামের গন্ধওয়ালা গায়ের সঙ্গে লেপটে সেও চেয়ে থাকত দোকান ঘরের দিকে। আর তার আবছা চোখের চাউনিতে রাগ, ক্ষোভ, ঈর্ষার লাল, নীল, সবুজ যে সব ঢেউগুলি ওঠা পড়া করত, অনায়াসেই তা কাচের দেওয়াল পেরিয়ে ছুঁয়ে ফেলত দোকানের আবাসিকদের।

লাল ঘাগরা পরা সুন্দরী নর্তকী তখন তার কিমানো পরা জাপানী বন্ধুকে ডেকে বলত,--

"দেখেছ.... দেখেছ..... কেমন হিংসুটে, কী ভাবে তাকাচ্ছে দেখ.... ঐ আধখানা চোখ দিয়েই যেন পুড়িয়ে ছাই করে দেবে আমাদের।"

—এখনও বুঙলি প্রায় রোজই আসে একবার করে। কিন্তু পুতুলটাকে আর দেখা যায় না তার বগলে। নর্তকী নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বাঁচা গেল বাবা, ওর চাউনি দেখেই ভয় করত।" জাপানী পুতুলও সায় দেয় তার কথায়। আবার একটু কৌতূহলী হয়েও ওঠে, —"কে জানে কোথায় গেল?"

মাস খানেকও বোধ হয় হয়নি, তারা তিনজনে এসেছে একই সঙ্গে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দোকানের সব থেকে উঁচু তাকে। দোকানে ঢুকলে সব থেকে আগে চোখ পড়ে তাদের দিকে। তাদের দেখে মুগ্ধ হয় সকলেই। কিন্তু অধিকাংশই তাদের মূল্য জিজ্ঞাসা করতেও সাহসী হয় না। যে দু-একজন সে সাহস দেখিয়েছে, দাম শোনার পর তারাও ইতস্ততঃ অনিশ্চয়তায় হিসেব কষেছে নিজের মনে,-- "বাবাঃ, একটা পুতুলের এত দাম। যতই সুন্দর দেখতে হোক। নাঃ থাক বরং। অকারণ পয়সা নষ্ট করে লাভ কী?" --প্রকাশ্যে হয়তো সন্তানকে বলেছে,--

" না সোনা, এত বড় পুতুল তুমি কোথায় রাখবে বল আমাদের বাড়ীতে? তার চেয়ে দেখ কী মিষ্টি ক্রলিং বেবী বা ওর ডান দিকে ঐ যে সুন্দর ছোট্ট বাড়িটা। বাড়ির দরজার কলিং বেলটা টিপলেই দরজা খুলে যাবে আর বেরিয়ে আসবে সাদা গাউন পরা বেড়াল, কী চমৎকার তাই না?"

সুতরাং তারা আরো অভিজাত, আরো বিত্তবান কোনো আগন্তুকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা প্রত্যেকেই এক-একটি দু'আড়াই বছরের বাচ্চার সমান মাপের। একেবারে ডান দিকে দাঁড়িয়ে জেন, তার অহঙ্কারী সৌন্দর্য অপরূপ করে তুলেছে তাকে। তার সোনালী চুলে নীল রিবনের বো, হালকা নীল

সাটিনের গাউন, গোলাপী মুখে খয়েরী ভুরুর নীচে নীল আলোর মত উজ্জ্বল দুটি চোখ। নরম লাল ঠোঁটে ঝিল্‌মিলে হাসি।

মাঝখানে রয়েছে সুকন্যা। সেও অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু তার সৌন্দর্য ভারতীয় বলে, তা জেনের থেকে স্বতন্ত্র। তার গমরঙা শরীর, তার কালো পল্লবে ঘেরা ছায়াঘন টানা টানা দুটি চোখের মায়াবী চাউনি নিয়ে সে যে-কোনো দর্শকের দৃষ্টিকে নিমেষেই গভীর সমাহিত করে তুলতে পারে। রক্তের মত গাঢ় লাল, জরির ফুল তোলা ঘাগরা ও ওড়না তার শরীরে যেন যোগ করেছে এক বিশেষ মাত্রা। তারপর দাঁড়িয়ে আছে ওয়াম্বা। সে প্রথম দু'জনের মত শাস্ত্রীয় রীতিতে সুন্দরী নয়। তার নিকষ কালো গায়ে রঙ চঙে ফুল আঁকা জামা, কানে বড় বড় রিং। মাথার চুল খুব ছোট্টো ও কোঁচকানো। তার উজ্জ্বল চোখের সাদা অংশ, কালো মুখের পটভূমিতে খুবই সোচ্চার। তার মুখে যে বিস্তৃত হাসি, তাতে নির্বোধ অভিব্যক্তি নেই মোটেই, কিন্তু প্রকৃত অর্থেই এক ধরনের দৃপ্ত সরলতা আছে। তাই প্রথাগত ভাবে সুন্দরী না হয়েও সে বড় আকর্ষণীয়।

এই কদিনেই তাদের চোখের সামনে দিয়ে কত যে ফুটফুটে মেমপুতুল, টোপর মুকুটপরা বরকনে, তুলতুলে নরম সাদা লোমে ঢাকা চকচকে পুঁতির চোখওয়ালা কুকুররা এল আর গেল।

অনেক গভীর রাতের অন্ধকারকে আলোর রেখায় চিরে মাঝে মাঝে যখন রাস্তা দিয়ে চলে যায় বিশাল লরিদের ভারী শরীরগুলো, ফুটপাথ থেকে এক ঘেঁয়ে সুরে কেঁদে চলে রাত জাগা কোনো শিশু, তখন সেই জনহীন নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া দোকান ঘরটি আস্তে আস্তে জেগে ওঠে। কখনো কলরবে, কখনো উল্লাসে, কখনো আবার বিষণ্নতায়।

নাগরিক বর্ষায় মেঘলা আকাশকে যেমন মনে হয়, একটি বিশাল ঘষা কাঁচ, ঠিক তেমনই এক হাল ছেড়ে দেওয়া নিরাশ অনুভূতি মাঝে মাঝে ঘনিয়ে আসে ঝলমলে ঘরটিতে।

প্রতিরাতে তাকের কোণ থেকে রঙচটা মাটির বৃদ্ধ পুতুলটি নিঃশব্দে কাঁদে। এমন বিবর্ণ হয়েও শুধু দোকানদারের অন্যমনস্কতার সুযোগই সে এখনও রয়ে গেছে নীচের তাকের একটি কোণে। তার সঙ্গী-সাথীরা সকলেই চলে গেছে একে একে রঙিন কাগজের বাক্সর মধ্যে করে, কোন শহরে, নগরে না গ্রামে, কেই বা তার খোঁজ রাখে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাই তার মধ্যে উন্মুখ কোনো আতঙ্ক আর এখন নেই। বরং যাওয়া হয়নি বলে, তার শূন্যতা ভরে যায় এক চিনচিনে অপমান বোধে। তার বুকের মধ্যে

পুরানো দিনের কথারা সব ছল্‌ছল্‌ করে বয়ে চলে, কিন্তু সে জানে সে কথা শোনার লোক নেই। সামনের ঘষা-মাজা আয়নায় সে দেখে নিজের প্রতিবিম্বকে। একজন গ্রামীণ ভারতীয় বৃদ্ধ। তার বলীরেখা-পড়া মুখ, ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি, শিরা বহুল শীর্ণ হাত— এসবই, সে দেখে বড় বিধুর ভালোবাসায়।

—"আজ অবধি কেউ-ই আমাকে পছন্দ করল না।" —সে ফিস্‌ফিস্‌ করে নিজের প্রতিবিম্বকে বলে। "অথচ নিজের মত করে আমিও তো সুন্দর।"

কেউই আর এখন তার সঙ্গে কথা বলতে আসে না। এই অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীন জীবন থেকেই তো উত্তর খণ্ডের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে, কিছু স্মৃতি, কিছু রোমন্থন করার মত মুহূর্ত, তাই কারই বা এত সময় আছে নষ্ট করার জন্য।

তার জীবনের দিগন্তবিস্তীর্ণ যে হু-হু করা অবসর, তা অনর্গল অতীতের স্বপ্ন দেখে এবং বিশ্বাস করতে চায় অতীতের সৌন্দর্যে। আঁকড়ে ধরার মত কিছু যে একান্তই প্রয়োজনীয়।

এখন প্রায়ই তার মনে পড়ে টোনি নামের লাল চেক শার্ট পরা গালফুলো দুষ্টু খোকা পুতুল টিকে। কে জানে, এতদিনে হয়তো তার কায়দার বাহারী চশমাটি হারিয়ে গেছে, শার্টটি হয়ে পড়েছে রঙচটা। বুকের তুলো বেরিয়ে গেছে। মনে আছে, হলুদ শাড়িপরা খুব গম্ভীর চেহারার এক ভদ্রমহিলা। যাঁকে দেখে মনেই হয় নি, তিনি কখনও খেলনা পুতুলের দোকানে ঢুকতে পারেন, নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। সেও তো হয়ে গেল বেশ অনেকদিন। বৃদ্ধের মনে হয়, আজ টোনির ঠিকানা নির্জন এক চিলেকোঠা, কিংবা রাস্তার পাশের ময়লার স্তুপ। এই সম্ভাব্য কল্পনায় সে একটি সৎ ও দুর্লভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জেন, সুকন্যা ও ওয়াম্বাকে সে চোখের সামনে আসতে দেখেছে। একজন নিয়তিবাদী গ্রাম্য বৃদ্ধের স্বাভাবিক স্তিমিত আলস্যে সে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। নাগরিকতা তার কাছে এতই রহস্যময়, এতই দুর্বোধ্য যে প্রায় ভীতিকর। তারা প্রথম আসবার পর এক বারই সে গিয়ে তাদের সঙ্গে দু-একটি সৌজন্যমূলক কথা বলেছে। আর সেই মুহূর্তে সে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি, উচ্চারণ ও কথা বলার ভঙ্গি সম্পর্কে এতটাই সচেতন হয়ে উঠেছিল যে খস্‌খসে্‌ এক হাস্যকর আড়ষ্টতা ঘিরে ধরে ছিল তাকে। তাই সে তারপর থেকে আর কোনোদিনই তাদের সঙ্গে কথা বলে নি।

এক সুদর্শন রাজপুত্র কয়েকদিন হল এসেছে বৃদ্ধের উপরের তাকের

অপরপ্রান্তে। তার লাল পালক লাগানো পাগড়ী আর সোনালী ঝলমলে জামার দিকে তাকিয়ে থাকত, তার পাশের নীল-সাদা স্কার্ট ব্লাউজ পরা স্কুলের মেয়েটি। সেই চাউনিতে মিশে থাকত অগাধ কৌতূহল আর মুগ্ধতা। রাজপুত্র প্রথমে বিশেষ লক্ষ্য করেনি তাকে। আর কী করেই বা করবে? গোলাপী সালোয়ার কামিজে সাজা পরমা সুন্দরী পাঞ্জাবী মেয়েটি, বড় ঝিরঝিরে হাত পাখা হাতে সবুজ কিমোনোয় ঢাকা জাপানী পুতুল, সূর্যমুখী রঙা গাউনে মোড়া সোনালী চুলের সপ্রতিভ মেমসাহেব, এদের সকলের প্রগলভ মনোযোগ সে তো আসা মাত্রই স্পর্শ করে ফেলেছে। স্কুলের মেয়েটি যে এদের পাশে বড় নিষ্প্রভ। ছিপছিপে শরীর, সুন্দর এক জোড়া চোখ আর অভিমানী লাজুক কৈশোর এই তো তার সম্বল। তবুও একদিন পরিচয় হল তাদের। আর কী আশ্চর্য সব নিয়ম, সব অঙ্ক গন্ডগোল করে দিয়ে সুন্দরীরা সবাই আবছা হয়ে উঠল রাজপুত্রের চোখে। তাদের জন্য পড়ে রইল পেলব শালীনতা আর নিরাবেগ সখ্য।

রাজপুত্র ও মেয়েটি ক্রমশঃ নীল সমুদ্রের অতল গভীরে হারিয়ে যায় প্রতিদিন। দিনে দিনে তাদের ঘিরে ধরে বছরের প্রথম বৃষ্টি পড়ার স্নিগ্ধ মায়া। কত .... কত..... কত রঙের আলো জ্বলে ওঠে। রাজপুত্র মাঝে মাঝে কিছু আদিম কথা উচ্চারণ করে, চিরন্তন সব কথা। কিন্তু কথা কী প্রয়োজনীয় সেই সব মুহূর্তে? দিন যায়। তারা মনে মনে জেনে যায়, এই ভাবেই দিন কেটে যাবে নিশ্চিত, কখনো শেষ না হয়ে।

কিন্তু হঠাৎ এক কোলাহলময় সন্ধ্যায় রাজপুত্র লক্ষ্য করে মেয়েটি যেন বড় ম্লান, বড় স্তব্ধ। সে তার করুণ মুখটি তুলে ধরে রাজপুত্রের দিকে।—

"কী জানি, কী যে অস্থির লাগছে। কখন কী হয় কে বলতে পারে? আমি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি একটা সুন্দর ঘরের শোকেসের মধ্যে আর তোমার পাশে রূপালী পাখনা মেলা এক সাদা পরী।"

রাজপুত্র হেসে ওঠে,—'বুঝতে পারলে না, পরী সেজে তুমিই তো এসেছিলে স্বপ্নে, তারপরে.....' রাজপুত্রের কথা শেষ হয় না। একটি বছর তিনেকের মেয়ে ভুরু কুঁচকে দুম দাম পা ফেলে ঢোকে তার মায়ের সঙ্গে। কাল থেকে খুবই সোচ্চার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে স্কুলে যেতে হবে, তাই তার মা আজ তাকে কিছু ঘুষ দেবেন বলে নিয়ে এসেছেন।

—প্রথমে সে গোমড়া মুখে এসেছিল। তারপর চারদিকে দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উঃ কত পুতুল, কত খেলনা।

দোকানের মালিক তাকে মিষ্টি গলায় বলেন,—"দেখ খুকুমণি, কী সুন্দর,

কী চমৎকার। এই যে মুরগীটা দেখছ, প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে ডেকে ঘুরছে, এই জায়গায় একটুখানি চাপ দিলেই ও ডিম পাড়ছে দেখ। ডিম এসে পড়ছে এই টুকটুকে লাল ঝুড়িতে। আর দেখ, মিকি মাউস আর ডোনাল্ড ডাক। চাবি ঘোরালেই এরা বক্সিং করতে শুরু করবে, দেখ কেমন? কোনটা তোমার চাই বল?''

---মেয়েটি নিস্পৃহ চোখে খানিকক্ষণ দেখে মুরগী আর মিকি আর ডোনাল্ডের কাণ্ডকারখানা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। গতবারের জন্মদিনে এই দুটো খেলনাই সে পেয়েছিল। এতদিনে সেগুলো ভেঙে চুরে গেছে, আর সেই সঙ্গে ভেঙে গেছে খেলনাগুলোর মধ্যেকার মজাও। সে এদিক ওদিক তাকায়। তার মামা আমেরিকা থেকে দুটি টেডিবিয়ার পাঠানোর পর সে টেডি সম্পর্কে নিরুৎসুক হয়ে গেছে। বার্বিডলও এখন পুরানো আর বিচ্ছিরি লাগে। তবে.... তবে..... হঠাৎই তার চোখ আটকে যায় স্কুল গার্লের দিকে। সে লাফিয়ে ওঠে উত্তেজনায়।

--''মা . . মা দেখ, ঠিক আমার মত স্কুলের জামা ওর। আমি ওটাই নেব, হ্যাঁ, ওটাই।''

পরমুহূর্তেই তার মুখে আবার অসন্তোষ ঘনিয়ে আসে। সে এক ঘেয়ে নাকী সুরে বলে যায়,--'ওমা, ওর স্কুল ব্যাগটা আমার মত নয় কেন? অন্য রকম তো! ওর ওয়াটার বট্‌ল্ কই? আমিও ওয়াটার বট্‌ল নেব না। আঁ.... আঁ..... না, নেব না, আমি স্কুলে গিয়ে জল খাব না।''

--তার মা মেয়ের আবার এই ভাব পরিবর্তনে তটস্থ হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি বলেন,--

--''ঠিক আছে..... ঠিক আছে..... মুন্নি সোনা, দেখ এ কী সুন্দর হাসি মুখে স্কুলে যাচ্ছে। তুমিও কিন্তু কাঁদবে না, কেমন? আন্টিরা কত আদর করবেন, কত ভালবাসবেন। স্কুলে কত..... কত বন্ধু।''

স্কুলের মেয়েটি হাসি মুখে তাকিয়েই থাকে। আর তার আর্তনাদ স্পন্দিত করে অন্যদের। মানুষের আয়ত্ত শব্দ তরঙ্গে ধরা পড়ে না সেই আর্তনাদ। দু'খানি নিপুণ দ্রুতহাত স্কুলের মেয়েটিকে ঢুকিয়ে দেয় একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে। বাক্সটির ঢাকা বন্ধ হয়ে যায়। নিঃশ্চিদ্র অন্ধকারে সে অনুভব করে প্রথমে বাচ্চা মেয়েটির হাঁটার গতি, আর তার পর গাড়ির স্টার্ট নেবার গর্জন, গাড়ির ঝাঁকুনি।

সেদিন গভীর রাতে বৃদ্ধ উঠে যায়, নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের কাছে।

—''অত ভেঙে পড়ছ কেন? কে বলতে পারে, কোনোদিন রাস্তার

পাশের এক ডাস্টবিনের মধ্যে আবার তো তোমাদের দেখা হতেও পারে। যা ঘটেছে তাকে তো মেনে নিতেই হবে।"

—গভীর সান্ত্বনার সুরে বৃদ্ধ বলে যায়। একটি ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে মানুষও যে আজ কত বিধ্বস্ত, একথা মনে করে তার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ তোলে এক শুকনো বিনোদন।

ক্রমশঃ যেমন হয়, —একান্ত নিজস্ব সমস্যা ছাড়া আর কী-ই-বা দীর্ঘকাল আপ্লুত রাখতে পারে কাউকে? তাই মোটাসোটা গিন্নিপুতুল চশমা জোড়া নাকে এঁটে, উল-কাঁটা হাতে বুনতে বুনতে রসিকতা করে চাইনিজ খোকাটির সঙ্গে। স্কার্টপরা লাল চুল লিলি হাসি মুখে চা ঢেলে দেয় তার এগারো নম্বর প্রেমিক ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বাবুকে। লাল পাড় শাড়ি পরা সাদা মাথা বুড়ী তার পাশে বসে থাকা লাঠি ঠক্‌ঠকে বুড়োর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ভাবে —"জ্বালিয়ে খেলে"— তারপর ছাতা মাথায় তরুণী মেয়েটির সঙ্গে ফ্যাশানের একাল সেকাল বিষয়ে গল্প জুড়ে দেয়।

অনেক উপর থেকে জেন খুব মার্জিত গলায় আস্তে আস্তে বলে, —"শোনো আমাদের কী উচিত ওকে গিয়ে একটু সহানুভূতি জানানো?"

ওয়াম্বা শব্দ করে হাসে, —

"সহানুভূতি" শব্দটার কী কোনো অর্থ আছে জেন। সহানুভূতি মানে হচ্ছে "সোনার পাথর বাটি।"

সুকন্যা তার সুন্দর কালো চোখ দুটি মেলে তাকায়। তারপর অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে, —

"আচ্ছা, তোমাদের মনে আছে সেই বেদেনী বুড়ীকে? লম্বা রাস্তায় ছুটন্ত গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বিরাট অন্ধকার বাক্সর মধ্যে করে যে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। যে বলত ভবিষ্যতের দিনগুলোকে সে নাকি চোখের সামনে দেখতে পেত চলন্ত ছবির মত।"

ওয়াম্বা তীব্র তেজী চোখে তাকায়।

"হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? তুমি, জেন আরো অনেকে ভীড় করে থাকতে চারদিকে। কিন্তু আমি কখনও কথা বলিনি তার সঙ্গে। কেন বলব বলতো? ভবিষ্যৎকে তো নিজের জীবনেই জানব একদিন।"

সুকন্যা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে, —

"সে আমাকে কী বলেছিল জানো? তোমরা সকলে যখন চলে যাবে, তারও পরে আমাকে নিয়ে যাবে এক শিল্পী, সে আমাকে রেখে দেবে নিজের ঘরে। সেই যে মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার চোখ দুটো নাকি

অবিকল আমার মত। কোনো কোনো সন্ধ্যায় বিদেশী মদের বোতল খালি করে সে এসে বসবে আমার সামনে। সেই নির্জন ঘরে একঘেঁয়ে অনুনয়ের সুরে সে আমাকে জাগাতে চাইবে আর বিশ্বাস করবে সত্যিই আমি একদিন জেগে উঠব।''

জেনের দু'চোখে ঘনিয়ে আসে আতঙ্কের কুয়াশা।—''আমাকে নাকি নিয়ে যাবে ভারি সুন্দর এক ছোট্ট মেয়ে। সে আমাকে এত ভালবাসবে যে আরো অনেকদিন পরে, তার বিয়ের পরেও আমাকে নিয়ে যাবে তার নতুন বাড়িতে। আর..... আর আমি এক গহন শীতের রাতে দেখব, আগুনের হল্‌কা আর ধোঁয়ার মধ্যে পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে তার সুন্দর শরীর। আর সকলেই জানবে ওটা ছিল অ্যাকসিডেন্ট। একমাত্র আমিই জানব কী হয়েছিল। হ্যাঁ, একমাত্র আমিই। আমি চিৎকার করে সকলকে বলব..... কিন্তু কেউ তো শুনবে না সে কথা!''

—জেন উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে।

''আর তারপরে আরো..... আরো..... আরো..... পরে সময় তো থেমে যাবে না। অন্তহীন সময়ের পথে কতদূরই বা চলে বেদেনী বুড়ীর চোখ?''

—ওয়াম্বা শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে।

জেন বা সুকন্যা কোনো উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ শুরু হয় উথাল-পথাল ঝড়। দোকানের বিশাল কাঁচে শোঁ-শোঁ হাওয়া ধাক্কা মারে সজোরে। আর রাস্তার জঞ্জালরা পাগলের মত ছুটে এসে আছড়ে পড়ে কাঁচের গায়ে।

—সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই ওরা চমকে ওঠে, তারপর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ, ওরা চিনতে পেরেছে। কোনো ভুল নেই। এঁটো শালপাতা, কাগজের বাক্স, নোংরা প্যাকেটের সঙ্গে গোলাকার যে জিনিসটা এসে ধাক্কা মারে কাঁচের দেওয়ালে, আসলে তা বুগুলির সেই হিংসুটে পুতুলের ছেঁড়া মাথাখানা।

ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে রাস্তার ওপারের গির্জার বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। অনন্ত সময়-প্রবাহ ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে এগিয়ে চলে পুনরাবৃত্ত হবার অপেক্ষায়।

পাঁচিল

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস নিতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়ে ধারা। ধারা মিত্র। স্কুল বাড়িটা নেহাত কম বড় নয়। স্কুলের মাঠে গ্রীষ্মের শুরুতেই কৃষ্ণচূড়া অফুরন্ত ফুটে রয়েছে। লালে লাল। কিন্তু স্কুল বাড়িটা তত পোক্তভাবে ঘেরা নয়। গরু, কুকুরের যথেচ্ছাচরণ ঘটে যায় কখনও সখনও। সবচেয়ে বড় কথা সিঁড়ির মুখে কোনও আগল নেই। মাঝে মাঝেই এমনটা হয়। আজ সেভেন 'বি'-তে গিয়ে সেই বিপত্তিতেই পড়েছে ধারা। টেবিলের পাশেই কুকুরের পবিত্র কর্ম। দুর্গন্ধে নাক চাপা দিয়ে রয়েছে ক্লাসের ঊনসত্তরটা মেয়ে। এমনিতেই ওদের শান্ত করা যায় না। তায় আবার সমস্যা। ঘরটা ছোট। মেয়েদের শান্ত করে চোখ ফেরাতেই গাটা ঘিনঘিন করে ওঠে। নাহ্, ক্লাস নেওয়া অসম্ভব। খবর পাঠায় নিচে। সিনিয়র টিচার লতিকাদিও চিন্তিত।

এখন বর্ষায় পুরোদমে ক্লাস চলছে। একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসও ভর্তি। অন্য কোনও ঘরে বসবার উপায় নেই। নেহাত নিচু ক্লাসের মেয়ে। নইলে ঘরে বসানোই যেত না। বালি চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাইরের গেট দিয়েই কুকুর ঢুকেছে। তার মানে স্কুল ছুটির পর গেট কখনও খোলা হয়েছে, তা দিয়েই কুকুর বাবাজি ঢুকে এসে কাজ সেরেছেন। এখন সারাদিন এর মধ্যেই ক্লাস চালাতে হবে।

এতক্ষণ টেবিলে এসে বসেনি ধারা। টেবিলে বসতেই ধাক্কা খায়। টেবিলের ওপর এ কী? একটি ব্যবহৃত কনডোম! কীভাবে এল? মাথার ভিতর পোকারা অদ্ভুতভাবে বিদ্রোহ করতে থাকে। কিন্তু মেয়েদের সামনে স্থির থাকে ধারা। কোনওরকমে নাম ডেকে মেয়েদের টাস্ক দেয়। না। ইমিডিয়েটলি সব জানাতে হবে। কে বা কারা এটা করল? স্কুলের বদনামের আর কী বাকি থাকবে?

ফাস্ট পিরিয়ড শেষ হতে না হতেই তাড়াতাড়ি নামে। স্কুলে একটু

গোলযোগ চলছে। হেড মিসট্রেস আসছেন না। টিচার-ইন-চার্জ স্বস্তিকাদিকে সব দিক সামলাতে হচ্ছে। হেড মিসট্রেস নিয়েও নানা মুনির নানা মত।

—কী বলছ কী তুমি? কত নম্বর ঘরে?

তৎক্ষণে স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি এসে হাজির হয়েছেন...

—স্বস্তিকাদি, আমার মনে হয় এটা নিয়ে হৈচৈ করে লাভ নেই। একটু চুপ করে থাকা যাক। বাহাদুর পুরো বাড়িটা দেখে রাখে। আগে ওকে ডাকা হোক।

—কী অদ্ভুত লজ্জাকর অবস্থা। আমি ক্লাসের মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। একটা স্কুলের ভিতর এটা কী হচ্ছে!

স্বস্তিকাদি হতভম্ব হয়ে রয়েছেন।

—আমি বুঝতে পারছি না এমন কেন হবে? গেট আটকানো থাকে।

—না দিদি পূর্বদিকে কোনও গেট নেই। বাহাদুরের ঘরের পাশ দিয়ে যে কেউ আসতে পারে। তবে, বাহাদুরকে তো অ্যালার্ট থাকতে হবে।

পাশ থেকে অনিমাদি বলে ফেলেন, 'সেভেন 'বি' র মেয়েগুলো বড্ড পাকা।'

- না না, মেয়েদের কোনও ভূমিকা নেই এখানে, ওরা কিছু বোঝেইনি। ধারা উত্তর দেয়।

- আমাদের স্কুলবাড়িটা ইনসিকিওরড অবস্থায় থাকে। কেউ বা কারা ব্যবহার করছে।

--দাঁড়াও ব্যাপারটা ডেলিকেটলি হ্যান্ডেল করতে হবে। এ নিয়ে হৈচৈ করা মানেই ছাত্রীদের মধ্যে জানাজানি হবে। গার্জিয়ানরা জানবে। সবচেয়ে বড় কথা এ ধরনের জিনিস স্কুল বিল্ডিং এ আসবে কেন?

নাঃ। সেকেন্ড পিরিয়ডে ক্লাস আছে। ক্লাসের দিকে ছোটে ধারা।

টিফিনের সময় ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো। সকলের মুখে এক কথা, 'বিচ্ছিরি ব্যাপার'। কখন দেখলি ধারা? কোথায়?

এমনিতেই কটা দিন কাজের লোক নিয়ে একটু ঝামেলাতেই ছিল ধারা। দু'দিন হল বাচ্চা একটি মেয়ে কাজ করছে। যা হোক চা-টুকু পাওয়া যাচ্ছে। সকালে স্কুলে এসেই এই ঝক্কিতে মাথাটা ধরে আছে। বাড়ি গিয়ে চা খেতে হবে।

গত দু'দিন একটানা বৃষ্টি চলেছে। আজকের সকাল জানান দিয়েছে এ দিন আর বৃষ্টি নয়। সূর্য উঠবে, থাকবে আলো। একটু সন্ধে নামতেই স্কুল

বাড়ি ছাড়িয়ে বড় রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানের আড্ডা ভাল জমে ওঠে। পরিবার কিছুদিন হল দেশে গেছে। একা একা চা করতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে বরং দোকানের আড্ডায় গলা ভেজানো ভাল। এখানে সময়টা ভালই কাটে। আজ ত্রিশ বছর এ অঞ্চলে। লোকজন চেনে। সকাল থেকে মনটা একটু থমকে রয়েছে। ধারাদির কথাতে স্বস্তিকাদি নিজের চোখে দেখে এসে যা ধমকালেন তাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে নিবারণের। কীভাবে হল? কারা করল? নিবারণ যেন ঠিক হদিস করতে পারছে না। আসলে দিদিমণিরা বুঝবে না। বৃষ্টি-বাদলা ঝড়, নিঝুম রাতে স্কুল বাড়িটাকে বড় মায়ায় দেখে রাখে নিবারণ। কোথায় গরু ঢুকে ময়লা করে ফেলল, বা গাছ মুড়ে খেয়ে ফেলল, নিবারণ লাঠি নিয়ে ছোটে গরুর পিছন, পিছন। রাতেও কি হামলা আসেনি? বউটা কথা শোনে না। কত সময় সামাল দিয়েছে -- ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে বেশি কথাবার্তায় যাস না, অসুবিধায় পড়বি পরে।

না, শোনেনি। নিবারণের এক এক সময় মনে হয় বিয়ে না করেই ভাল ছিল সে। বেশি বয়সে এই আহ্লাদি বউয়ের পাল্লায় পড়ে জেরবার নিবারণ। দুটো ছেলে অবশ্য ভারি বাধ্য নিবারণের। সামান্য যা একটু আছে তা দিয়েই দিন চালাতে চায় নিবারণ। সৎ পথে থাকতে পারলেই হল। কিন্তু বেশ কিছুদিন হল নিবারণকে একটু দোটানার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে।

ও নিবারণদা, এত দেরি কেন? স্কুল ছুটি হয়েছে তো সেই চারটেয়। এখন সাতটা। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

- ওই স্কুলের বারান্দায় ঘাস জমছিল। পরিষ্কার করলাম।
- তোমার অত দরকার কী?
- পনেরোই আগস্টে ফাংশান হবে। এখন থেকে পরিষ্কার রাখতে হবে।
- তুমি আছ ভাল, ভারতসন্তান স্কুলের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

এসব খোঁচায় কিস্‌সু যায় আসে না। স্কুলকে বড় ভালবাসে নিবারণ। নিজের এতটুকু কষ্ট নিয়ে সে ভাবিত নয়। কিন্তু আজ যা হল। নিবারণ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেউ কি তাকে বিপদে ফেলছে ইচ্ছা করে? নাকি স্বস্তিকাদিকে? একজনকে দূর থেকে দেখে একটু অস্বস্তিতে ভোগে নিবারণ।

-- কী ব্যাপার নিবারণ? তোমার খবর কী? আজকাল আমাদের নিয়ে আর ভাবছ না কেন? বৌদি ভাল আছে?

মনটা কেমন তিক্ত হয়, চা খাবার মজাটাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। আজ দিনটা

খারাপ যাচ্ছে বটে। স্কুলের দিকে পা ফেরায়। যাকে দেখে সরে যাচ্ছিল নিবারণ সে কিন্তু পথ ছাড়ে না। ভোলা পিছু পিছু আসছে, টের পায়। নাঃ এদের হাত থেকে বুঝি রেহাই নেই। নিজের ভুলের জন্য আফশোস হয়। একথা কাউকে বলারও নয়। আসলে পুরনো বড়দি রিটায়ার করার পর নতুন বড়দি আমলে অনেক হালচাল বদলেছে। নিবারণকে জানতে হয়েছে অনেক কিছুই। ছুটির পর কখনও রাত সাতটা অবধি থাকতে হয়েছে। নিবারণ মুখ ফুটে না করতে পারেনি। ভেবেছে স্কুলের ভাল হবে। বড় বিল্ডিং হবে। নিবারণ কি ছাই জানত ভিতরে কত কারচুপি। ভোলাও তখন কনট্রাকটরির কাজ নিতে আসত। এখন অবশ্য স্কুলের টাইমে ধারে কাছে ঘেঁষে না। সুযোগ পেলেই নিবারণের সঙ্গে খুনসুটি করার চেষ্টা।

রাত ন'টা। ধীমান এখনও ফিরছে না। ধারার একটু চিন্তা হয়। এই এক লোক। কিছু বলে যায় না। ফলে বড় অস্বস্তি হয়। আগে আগে জিজ্ঞেস করত। এখন নিজেকে নির্লিপ্ত করেছে ধারা। বাড়িতে অসুস্থ শাশুড়ি। তিনি একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকবেন। উত্তর দিতে গিয়ে ভাবনা চিন্তার প্রকাশ চলবে না। মিথ্যেও বলা চলবে না। ধীমানের বক্তব্য, মিথ্যে বলবে না।

—আমার ব্যবসা নিয়ে একটু প্রবলেম চলছে। দোকান বন্ধ করার পরেও পার্টির সঙ্গে বসতে হচ্ছে। মাকে জানাবে মিটিং আছে।

—তুমি রাত এগারোটার পর ফিরছ। উনি তো চূড়ান্ত অস্থির হয়ে পড়েন। তখন বললেই তো হয় তুমি এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছ। নইলে অযথা চিন্তা করবেন তারপর বুকে ব্যথা, সে ঝক্কি সামলাতে হবে আমাকেই। বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে মত বদলায়নি ধীমান।

—যা বলেছি তাই করবে। এই আপোষবিহীন একগুঁয়ে মানুষটির সঙ্গে চব্বিশঘন্টা কাটাতে গিয়ে আরো জেরবার হয়ে পড়ছে ধারা।

রাত দশটা। ফোনের শব্দে একটু কেমন ফিকে অস্বস্তি কাজ করে।

—শুনুন ধারাদি। যা দেখেছেন, দেখেছেন। ও নিয়ে ফালতু ডাল নাচাবেন না।

—কে আপনি? কী বলতে চাইছেন?

—আমার পরিচয় জেনে দরকার নেই। স্কুলবাড়িতে পড়াতে আসেন পড়িয়ে চলে যাবেন। ব্যাস্।

—"একটা বাইরের লোকের কাছ থেকে আমি কোনও উপদেশ শুনতে চাই না। আর কখনও ফোন করবেন না।" ঠাস করে ফোনটা নামিয়ে রাখে।

কিন্তু ভিতরে এক আশঙ্কা দানা বাঁধে। স্কুলে বিবিধ সমস্যা চলেছে। কখন যে কোন ঝক্কি এসে পড়বে। ধীমানকে বলে যে হালকা হবে সে উপায় নেই। বাবুর সময় কোথায়? বরং বিরক্ত হবে। ধারার এক এক সময় সত্যিই ভার লাগে। মা অসুস্থ। মাকে দেখতে যেতে পারেনি গত দু'মাস। ধীমানের সে দিকে কোনও নজর নেই। অথচ ধারা যখন অসুস্থ, সংসার বেহাল, ছুটে এসেছেন মা। ধীমানকে বড় স্বার্থপর বলে মনে হয় এক এক সময়।

কিন্তু কে লোকটা? স্থানীয় কোনও বদ ছেলে? তার মানে খবরটা চাউর হয়েছে। কে দিল? গুটিকয় টিচার ছাড়া কেউ তো জানে না? তবে কি এদের মধ্যেই কেউ? নাকি যে বা যারা জড়িত তারা ইচ্ছে করেই স্কুলের স্ক্যান্ডাল করতে কাজটা করেছে। তারা জানতই ধারা ফার্স্ট পিরিয়ড নেবে। তারই চোখে পড়বে। রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা আর স্কুলের ক্লাসের ভিতর—ব্যাপারটা মোটেই খুব স্বাভাবিক নয়। ভাগ্যিস উঁচু ক্লাস নয়। মেয়েদের মধ্যেও একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হত। এখনও তো ভারতবর্ষ বিদেশ হয়ে যায়নি। নানা ভারোধ রয়েছে পরস্পরের মধ্যে।

পরদিন স্কুলে আসতেই তলব স্বস্তিকাদির।

ধারা, ক্লাসের মেয়েদের মধ্যেই কেউ।

-না না। অসম্ভব। আর পড়েছিল টেবিলের উপর। মেয়েদের কাছ থেকে তো কিছু পাওয়া যায়নি। তার চেয়ে বড় কথা গতকাল মেয়েরা যারা একদম প্রথমে এসেছে বলেছিল যে বেঞ্চে পায়ের ছাপ, আমি সিগারেটের টুকরোও দেখেছি।

এবার স্বস্তিকাদির মুখ সত্যিই কালচে হয়ে ওঠে।

—সকালবেলা এক গার্জিয়ানের ফোন আসে এ ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু কথাটা ছড়াচ্ছে কীভাবে? কোনওরকম গুজব চাইছি না। এসব কলোনি এলাকা। সামান্য ব্যাপার থেকে অনেক ঝামেলা আসতে পারে। থাক তুমি যাও।

ফোনে ধমকানির খবরটা চেপে যায় ধারা। বলে দরকার নেই। দেখা যাক কী হয়। নিবারণের দিকে চোখ পড়তেই বোঝে সেও একটু মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে আছে। নিবারণের মধ্যে কিছু পরিবর্তন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে। কোনওটাই প্রমাণিত নয়। কেবল অনুভব করা যাচ্ছে মাত্র।

—নিবারণদা কোন হদিস পেলে?

— কী বলব দিদি। সারাটা রাত তো আধঘুমে থাকি, কে ঢুকল? আমার

মনে হয় পাশে ডোবাটা ভরাট হচ্ছে। সারাদিন নোংরা ফেলা হচ্ছে। কারুও নিয়ে আসতে পারে। ধারার ভিতরে অবিশ্বাস দানা বাঁধে। নিবারণ কিছু একটা গোপন করছে।

মাঝে দুটোদিন বাদ দিয়ে শনিবার স্টাফ কাউন্সিলের মিটিং বসে। বিবিধ সমস্যার মধ্যে প্রধান বিষয় বাদ যায় না। সিদ্ধান্ত হয় নিবারণের ঘরের পাশ দিয়ে যেখানে ফাঁকা জায়গা সেখানে আপাতত পাঁচিল তোলা হবে। টাকা স্যাংশান হলেই কাজ শুরু হবে। সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেট বসবে। শনিবার বাড়ি ফিরে ছেলের বইপত্র নিয়ে বসে ধারা। প্রতি শনিবারের এক রুটিন। রাতের দিকে ক্লান্তিতে ঝিমুনি এসে যায়। ফোনের শব্দে ঘুমের চটকা ভেঙে যায়। কর্কশ শব্দ বড় যেন।

-- ধারাদি, আপনারা কিন্তু ভুল পথে এগোচ্ছেন। খামোখা স্কুলবাড়িটাকে বাঁধতে চাইছেন কেন? আমরা কিন্তু স্কুলের নিরাপত্তায় আছি। স্কুলের কোনও ক্ষতি হচ্ছিল না।

মাঝপথে প্রায় চিৎকার করে ওঠে ধারা।

আপনাকে বলেছি, আমাকে ফোনে ডিসটার্ব করবেন না। স্কুল আমার একার সম্পত্তি নয়।

সাবধান করে দিচ্ছি। পাঁচিল তুলবেন না।

অদ্ভুত হিসহিসে গলা। কেমন একটা ভয় করে। ছেলেটা একা একা স্কুলে যায়, কার মনে কী আছে। স্কুল ইছাপুরে, বালিগঞ্জ থেকে রোজ যাতায়াত করে ধারা। অনেকবার ভেবেছে স্কুলের কাছে থাকবে। ধীমান রাজি নয়। একটু দূরত্ব ভাল। সারাজীবন তো আর চাকরি করবে না। এখন মনে হচ্ছে স্কুলের কাছাকাছি থাকলে হয়তো কেউ অহেতুক ভয় দেখাতে পারত না।

পরদিন স্কুলে এসে টিচার্সরুমে ঢুকতেই উত্তেজনা টের পায় ধারা। কে বা কারা বাইরের দেওয়ালে পোস্টার টাঙিয়েছে -- স্কুলের ভিতর ধান্দাবাজি। মদত আছে টিচারদের।

সবাই উত্তেজিত যে যার মতো মতামত দিচ্ছে। লতিকাদির গলা শোনা যায়।

-- লোকাল পার্টি অফিসে এক্ষুনি জানানো দরকার। ব্যাপারটা কী, আমাদের এভাবে হ্যারাস করার মানে কী।

স্মৃতিকাদিকে দেখে সবাই চুপ করে. 'আপনারা সব ক্লাসে যান। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের অপমান এবং বিভ্রান্ত করার জন্য অপচেষ্টা চলছে। ঘাবড়ালে তো চলবে না। আর যে অপরাধী তাকে তো আমরা হাতেনাতে ধরতে

পারছি না। শূন্যে হাত-পা ছুঁড়ে লাভ নেই। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মেয়েদের পড়াশুনোর যেন ক্ষতি না হয়।'

টিফিন পিরিয়ডের আগে হঠাৎ নিবারণ টিচার্সরুমে ঢুকে ধারার কাছে আসে।

—একটু কথা আছে ধারাদি। ছুটির পর একটু থাকবেন?

—ঠিক আছে।

ক্লাস নেবার ফাঁকে ফাঁকে কেবলই মনে হয়, কী বলবে নিবারণ? কী এমন কথা? ফোন পেয়েও এতটুকু ভীত নয় ধারা। বরং পরদিন জোর দিয়ে বলেছে পাঁচিল তোলা হোক। রাতে স্কুলবাড়িটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বন্ধ হওয়া দরকার এসব। কাউকে তো এগোতেই হবে।

নিবারণ কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে।

—কী বলব আমি বুঝতে পারছি না দিদি।

—দ্বিধা করে তো লাভ নেই। যা বলার বলে ফেল। ভয়ের কিছু নেই। নিবারণের ভিতরে যে যুদ্ধ চলছে বোঝা যাচ্ছে।

—ধারাদি, আমাকে ভুল বুঝবেন না। কথা দিন।

—তোমাকে ভুল বুঝব কেন? আসল কথাটা বলো না।

—বলছিলাম যে আপনি স্বস্তিকাদিকে বলুন ও ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। মেয়েরাও তো কত সময় দুষ্টুমি করে। হয়তো উঁচু ক্লাসের মেয়েরাই...।

—এসব তুমি কী বলছ নিবারণ? একটা জটিল বিষয়কে হালকা করে ফল কি ভাল হবে?

—আমি আরো বেশি খেয়াল রাখব। রাতে দোতলা থেকে তেতলায় নয় চক্কর দেব। পাঁচিল তোলার ব্যাপারটা বন্ধ করতে বলেন। আপনি বললে তাও কথাটা থাকবে।

—অসম্ভব। আমি তো বলতেই পারব না।

—আপনি জানেন না ধারাদি, এখন এ অঞ্চলের কিছু উঠতি বয়সের ছেলে ভয়ঙ্কর খারাপ হয়ে গেছে। উস্‌কানি দিচ্ছে কেউ।

—তার নামটা জানাও না।

মাথা নিচু করে থাকে নিবারণ। বুঝতে পারে ধারা, কোনও একটা অসুবিধার কারণে নিবারণ বলতে পারছে না। দুর্নীতির চক্র অনেক বেশি বলশালী হয়। ব্যাপারটা নিয়ে ক'দিন ধরে এতটাই মানসিক টানাপোড়েন চলছে যে ধীমানকে বলে একটু হালকা হবার চেষ্টা করে।

—আমার মনে হয় তোমার এ ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মুখ না খোলাই ভাল। চুপ থাকো, এমনিতেই তোমার বিবিধ টেনশন চলছে।

—তা বলে একটা নোংরামি হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকব? স্কুলবাড়ি পবিত্র জায়গা। অথচ দেখো সেখানে কি হচ্ছে আর কি না হচ্ছে। আমার তো মনে হয় অনেক ধরনের কাজকারবার চলে রাতের বেলায়। এ ব্যাপারটা হয়তো অনেক আগেই শুরু হয়েছে। এখন স্কুলে যেসব অনিয়মগুলি চলছিল সব নিয়ে নাড়া পড়ছে তাই। একটু স্ক্যান্ডাল করার মতলব নিয়েই...।

ফোনের তাড়নায় কথা শেষ হয় না।

—ধারা, তোমার ফোন।

—ধারাদি, আমি জয়িতা বলছি।

—হ্যাঁ কী ব্যাপার বল?

—তোমাকে ক'দিন ধরে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

—বল না। স্কুলে বললি না কেন?

—আসলে আমি ঠিক ডিসিশান নিতে পারছি না। তোমাকে ভরসা করে বলছি।

—জানো, গতবার তো আমি নাইন সি র ক্লাস টিচার ছিলাম। তখনও তিনতলায় ক্লাসরুমে খুব বাজে জিনিস দেখেছিলাম। শুধু তাই নয় ফাঁকা মদের বোতল।

—বলছিস কী? এতদিন বলিসনি কেন?

—আমি বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িতে ফোনে একজন আমাকে অনবরত ভয় দেখিয়েছে।

—সে কীভাবে জানল?

—বুঝতে পারছি না। আমি তোমাদের কাছে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে কথা না ছড়াতে।

—একদিন নয় পর পর দু'দিন আমি দেখেছি ইউজড কনডোম, সিগারেটের টুকরো। অথচ বড়দিকে বলতে গিয়ে এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়া পেলাম...।

—তুই আমাদের যাকে হোক জানাতে পারতিস তাহলে আরো আগে বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া পড়ত। এতদূর গড়াত না।

—আসলে আমি সরব হলে নিবারণদার উপর চাপ আসত।

—কেন তোর এটা মনে হচ্ছে?

—নিবারণদাই আমাকে সাবধান করেছে।

আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনেকদিন ধরেই স্কুলবাড়িতে যা নয় তাই চলছে। কিন্তু বিষয়টা আর বাড়তে দেওয়া চলে না।

নিবারণ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে। বুঝতে পারে ধারা। কেমন রাগও হয়। অবিশ্বাসও। নিবারণ নিশ্চয়ই এর ভিতর আছে। নইলে বাইরের মানুষের

আনাগোনা স্কুলবিল্ডিং-এর ভিতরে হবে কেন? হয়তো শক্ত হতে পারেনি। নিবারণের লাস্যময়ী বউকে স্কুলের কেউই পছন্দ করে না অথচ তাকে এড়ানোও যায়নি। নিবারণের সঙ্গে কিছু একটা অশান্তি চলছে বোধহয়। মালতী অনেকদিন হল দেশে গেছে। ফেরবাব নাম নেই। স্কুলের ভিতর আড্ডা বসানোর কাজটা শুরু করেছে মালতীই। এ বিষয়ে সব টিচার একমত। কড়াকড়ি করার উপযুক্ত সময় এখনই। জয়িতাব ফোনটা পেয়ে ধারার ভিতরের জেদটা প্রবল হয়। সমস্ত ব্যবস্থাই পাকা। সামনের বুধবার পাঁচিল উঠবে। সকাল থেকেই দু'তিনজন টিচার আর লোকাল পার্টি অফিসের চার পাঁচজন হোমড়া চোমড়ার উপস্থিতিতেই পাঁচিল উঠেও যায়। সারাদিন ধরে কাজ চলে। ছুটির সময় সকলে কাছে গিয়ে পাঁচিল দেখে স্বস্তিবোধ করে। যাক, বাঁচা গেল। ধারা মনে মনে খুব খুশিই হয়। ফোনে ভয় দেখানো। যত্ত সব ফালতু ভাওতাবাজি। তবে নিবারণকেও ভাল করে ধমকে দিতে হবে।

রাতের দিকে একটু টিভির দিকে চোখ ফেলে ধারা। আজ মনটা একটু হালকা বোধ হচ্ছে। রাতে খেয়ে একটু তাড়াতাড়ি শোয় কিন্তু মাঝ রাতে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ধীমানও জেগেছে।

—''তুমি ধরো'', কেমন একটা ভয় হয়।

—ধারাদিকে দিন।

—যা বলার আমাকে বলুন। ততক্ষণে ধীমানের হাত থেকে ফোনটা টেনে নেয় ধারা।

—''ধারাদিকে বলে দেবেন পাঁচিলটা নেই''। কট্ করে লাইন কেটে যায়। দরদর করে ঘামতে থাকে ধারা। কার এত সাহস? দিনকালের হল কী? দুর্নীতির চক্র কতটা গভীরে? বুঝতে পারে ধারা স্থানীয় দুষ্টু ছেলের কাণ্ড নয়। স্কুলের ভিতর যে গণ্ডগোল তার জের। যাদের সুযোগসন্ধানী চরিত্র ধরা পড়েছে তাদেরই কারো কাজ।

খুব ভোরে আবার ফোন।

বান্ধবী চিত্রা।

—ধারা শোন, লতিকাদি ফোন করেছিলেন— বাহাদুর ইনজিওরড, তাড়াতাড়ি স্কুলে আয়।

রাগে উত্তেজনায় হতাশায় কাঁপতে থাকে ধারা। নিবারণের উপর হামলা শেষ পর্যন্ত?

স্কুলের সেক্রেটারি থেকে শুরু করে আরও অনেকেই রয়েছেন। নিবারণকে হাসপাতালে নিয়ে স্টিচ দিতে হয়েছে। মাথায় সেলাই পড়েছে। হাতের হাড়

ভেঙেছে। প্লাস্টার করা হয়েছে। প্রাচীরের একটা দিকে সব ইঁট ভেঙে দিয়েছে কে বা কারা। রাতে যে স্কুল বিল্ডিং-এ ঝড় বয়ে গেছে, বোঝা যায়।

ধারা বুঝতে পারছে এবার সত্যি কথা বলানো যাবে নিবারণকে দিয়ে। একা কথা বলতে হবে। সবার সামনে ও মুখ খুলবে না। ভিতরে ভিতরে কেমন দমে যায়। কী অদ্ভুত পরিস্থিতি। কারা এমন করছে? কী তাদের স্বার্থ? ছাত্রীদের উপস্থিতি অন্য দিনের তুলনায় কম। অনেক গার্জিয়ানের মনে সংশয়।

গার্জিয়ানদের সঙ্গে সকলেই মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর দিয়ে যায়। বেলার দিকে স্টাফ কাউন্সিলের তাৎক্ষণিক মিটিং ডাকা হয়। ভাঙা পাঁচিল আবার তোলা হবে। ধারা এবার চুপ থাকতে পারে না।

—শুধু নিবারণকে দিয়ে হবে না, স্থানীয় টিচারদের মত নিয়ে কয়েকটি দায়িত্ববান বিশ্বস্ত ছেলেকেও রাখা হোক। কথাটা অনেকেরই মনঃপূত হয়। যা হবার হয়েছে, এবার আবার হাল ধরা হোক।

—আর যারা নিবারণকে এমনভাবে মারল তাদের শাস্তির কী হবে?

— পুলিশকে সব জানানো হয়েছে। ওরাও দেখবে।

ধারা অনুভব করে সত্যের জয় অনিবার্য। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে। কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মাশুল যদি দিতে হয় নিরীহ মানুষকে তার চেয়ে অপমান আর হেরে যাওয়া কী হতে পারে?

স্বস্তিকা এক ফাঁকে একবার ডাক পাঠান।

ধারা, আজ ছুটির পর একটু থেকো। কথা আছে।

ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন আর সিনিয়র দুজন টিচার স্বস্তিকাদি, ধারা সকলেই এ মুহূর্তে সমাধান নিয়ে ভাবিত। স্থানীয় যে ক'টি ছেলেকে ডাকা হয়েছে, দেখেই বোঝা যায় প্রত্যেকেই ভদ্র।

—দিদি, আপনাদের আমরা ইনফর্ম করতে পারিনি। অনেকদিন ধরেই স্কুলের ভিতর বাজে আড্ডা বসছে। এই ভোলা অ্যান্টিসোশ্যাল। এখানে ওর বিজনেস চলে। নিবারণ ওকে সমঝে চলে নিজের বউয়ের কারণে। কী বলতে গিয়েও চুপ করে যায় ছেলেটি।

—আপনারা আজ থেকে আমাদের দায়িত্ব দিলেন, আর কোনও চিন্তা নেই। আমরা সব দেখব। কাল রাতে নিবারণদার চিৎকার শুনে আমরা ছুটে আসি। ভোলা তখন ওর দলবল নিয়ে পালাচ্ছে।

নিবারণ আর যাই করুক স্কুলের ক্ষতি মানতে পারেনি। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেয়েছে।

একই প্রজন্ম একই প্রায় বয়স অথচ এরা কতটা ভদ্র সভ্য, অন্যদিকে ওই ভোলা? এখনও শুভবুদ্ধির মানুষ আছে তাদের নিয়েই চলতে হবে। নিবারণকে একবার হাসপাতালে দেখতে যাবে ঠিক করে।

শুয়ে আছে নিবারণ। করুণ চোখে তাকায় কেমন, নির্বাক।

--পাঁচিলটা ওরা ভেঙেই দিল। রক্ষা করতে পারলাম না। দু'চোখের জলে পরাজয়ের গ্লানি।

—কাঁদবে না। আবার পাঁচিল উঠবে। ওরা আর স্কুলের ধারে কাছে ঘেঁষবে না। পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করেছে।

চোখ দুটো বুঝি জ্বলে ওঠে নিবারণের।

আমি স্কুলকে ভালবাসি দিদি। ভয়ে আপনাদের বলিনি। ভোলা বলত সবাইকে জানালে স্কুলে বোমা ফেলবে। ও সব পারে। অত সুন্দর স্কুলবাড়ি আমাদের ধ্বংস হবে এই ভয়ে আমি, চোখের জলে অপরাধবোধ তরল তর। ধারার চোখের কোল শিরশির করে। তারা তো নিবারণকেই সন্দেহ করছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বলিষ্ঠতা ওর ছিল না। কিন্তু অন্যায়ে সামিল তো হয়নি।

আবার উঠেছে পাঁচিল। স্কুলে যেখানে সেখানে আর নোংরা নেই। কিন্তু নিবারণ হাতটা আর সোজা করতে পারে না। বাঁকা হাতে পুরনো ভঙ্গিতে লাঠি ধরে গেট আগলাচ্ছে।

"মেয়েরা গেটের সামনে ভিড় করবে না। লাইন দিয়ে বের হও।" অনাবিল আন্তরিক ভঙ্গি। ধারার ভিতর আত্মবিশ্বাসের শক্ত ভিত। ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে জয়ের পথে কাঁটা আসে, ক্ষতও সৃষ্টি হয়ে যায় কখনও। যেমন হয়েছে নিবারণের, আর ধারার বিশ্বাসের শক্ত ভিতে একটু ফাটল দেখা দিয়েছে। নিবারণ যে কোনওদিনই ওই হাতটাকে শক্তভাবে তুলে ধরতে পারবে না। কিন্তু মনের জোর হারায়নি লোকটা। এই তো সেদিন বলেছে ধারাকে ---"দিদি, আমি থাকতে আপনাদের কোনও ভয় নাই। স্কুলের গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না। ওই ভোলা আমাকে বলেছিল, তোর ধারাদিকে...। আমি বলেছিলাম, খবরদার!"

ফেরা

অপরাজিতা দাশগুপ্ত

বাঁকের মুখে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল মালবিকা। লাল থোকা থোকা ফুলে যেন আগুনের আভা বেরোচ্ছে বৈশাখের খররোদে। মালবিকার রিক্সাটা ঠিক কৃষ্ণচূড়ার পাশেই এসে থেমেছে। রিক্সাচালক বয়সে তরুণ বছর কুড়ির বেশী নয়। টাকাটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে জিজ্ঞেস করল—কটা বাজে দিদি?

—প্রায় দেড়টা।

—ও, তাহলে আজ আর দেখা হল না।

—কি?

টেলিভিশনের একটা চালু সিরিয়ালের নাম করল ও।

—কোথায় থাকো তুমি?

—এই কাছেই, নগাছিতে। এমনিতে ঘর যাই না এসময়। আজ কাছাকাছি এলাম বলে ভাবছিলাম টুক করে...।

সাঁ সাঁ করে রোদমাথায় স্টেশনের দিকে ফিরে যাচ্ছে ও। মালবিকা কৃষ্ণচূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে ক্ষণিক আনমনা। প্রথমে কোথায় যাওয়া যায়? পুরোনো পাড়া- নাকি স্কুলেই আগে যাবে? আজ পুরোনো স্মৃতির আনাচে কানাচে ঘুরে দেখবে ও। কিসের তাগিদে তা ও নিজেও সঠিক জানে না। নেহাতই এক ঝোঁকের মাথায় দুপুর মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছেলেকে নিয়ে।

—মা, ফার্স্টে কি তোমার স্কুলটায় যাবো, নাকি পুরোনো বাড়িটায়? ঘোর ভেঙে মালবিকা তাকিয়ে দেখল বালকপুত্রের মুখচোখ রোদের তেজে লালচে। জিনসের ট্রাউজার আর নীল টি শার্টে ওকে ছোট্ট দেবদূতের মত দেখাচ্ছে। ঝুরো চুল ঘামের জন্য লেপ্টে রয়েছে কপালের উপর। ভাসা

ভাসা চোখদুটোতে একটুখানি বিপন্নতার আভাস। হঠাৎ খুব মায়া হল মালবিকার। আহা বেচারা বাড়িতে থাকলে কার্টুন দেখে কি গল্পের বই পড়ে সময় কাটাতে পারত। স্কুল ছুটি বলে ওকেও এতদূর নিয়ে আসাটা উচিত হল কি? কিন্তু ওকে দেখাবার জন্যই তো আসা! কিভাবে কোন পাড়ায় বড় হয়েছিল ওর মা কোন স্কুলে পড়েছিল এসব কৌতুহল তো ওরই রয়েছে।

—চল্, আগে স্কুলেই যাই। কোন্দিকে আমার স্কুল বল্তো?

—কোন্দিকে মা?

—ঐ যে হলদে পাঁচিলটা দেখছিস, ওটাই আমাদের স্কুলের কম্পাউণ্ড। গেলেই দেখবি সামনে গেটের কাছে আচারওয়ালারা বসে রয়েছে।

কথা বলতে বলতে ওরা স্কুলের গেটের সামনে পৌঁছে গেছে। সামনে সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি পথ। তারপর পোর্টিকো। এখন টিফিন নিশ্চয়ই। দলে দলে নীল ইউনিফর্ম পরা মেয়েরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। টিফিন খাচ্ছে, গল্প করছে, উনিশ বছর আগের মালবিকাদেরই মত।

—এইভাবে ঢুকবে মা? কেউ কিছু বলবে না তো?

—আরে না না, এ কি তোদের স্কুল নাকি যে দারোয়ান গেট থেকেই হাঁকিয়ে দেবে?

মালবিকা আনন্দে উচ্ছল। ওদের বাড়ি থেকে স্কুলে পৌঁছতে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগত না। পাড়ার অনেক মেয়ে পড়ত এই স্কুলটায়। দশটা বাজতে দশ-এ ওরা দল বেঁধে তৈরি স্কুলে যাবার জন্য। বিউটি, স্বাতী, মধুমিতা।

—এখনও তৈরি হোস্নি। আজকেও লেট হবে।

-দাঁড়া না, শাড়ি তো পরাই আছে। স্কুলে না হয় প্লিটটা করে দিবি।

ক্লাস টেনে শাড়ি পরাই নিয়ম। অনভ্যস্ত হাতে শাড়ি পরা গেলেও প্লিটটা কিছুতেই করতে পারত না ও। রোজই কোন না কোন বন্ধু প্লিট করে দিত। মা ওসব কস্মিনকালেও পারে না। পাউডারই মাখতে পারে না সমানভাবে!

গুছিয়ে দক্ষহাতে প্লিট করে দিচ্ছে বিউটি।

—দ্যাখ, দেখে শিখে নেবার চেষ্টা কর। চিরকাল তো তোর প্লিট করার জন্য আমি থাকব না! কি যে হবে তোর তখন!

—কেন রে? কোথায় যাবি? তোর তরুণদা কি তলে তলে সব ঠিক করে ফেলেছে নাকি রে?

—যাঃ, কি যে বলিস্— মুহূর্তে বিউটির চোখমুখ লাল। বিউটির আসল নাম শ্রীপর্ণা। বিউটি নামটা মালবিকার দেওয়া। ভারি সুন্দর দেখতে ওকে।

পানপাতার মত মুখটা। সিক্ত রসে টইটম্বুর ঠোঁট দুখানি। ঠিক চিবুকের তলায় আই-ব্রাও পেনসিল দিয়ে একটা বিউটি স্পট আঁকে ও। বিউটির অনেক ভক্ত পাড়ায়। রকে বসা বিল্টু, বকাই, বাপ্পারা চোরা চাউনি দিয়ে লক্ষ্য করে বিউটিকে যখন ওরা স্কুলে যায়। দু-একজন সিটি দেয় সাহস করে। বিউটি নির্বিকার। এরকম ছেলেরা করেই থাকে। ও তরুণদার সঙ্গে স্টেডি। তরুণদা ব্যাঙ্কের ক্লার্কশিপের পরীক্ষা দিচ্ছে সামনে। একদম মরিয়া। চাকরি পেলেই বিউটিকে বিয়ে করবে কথা হয়ে আছে।

মালবিকা ছেলেকে নিয়ে সোজা বাঁদিকের ঘরটায় ঢুকে এল। এটাই স্টাফ রুম, ওর যদি ভুল না হয়।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন কয়েকজন। অধিকাংশই অচেনা মুখ। আট বছরের নানকুকে নিয়ে সোজা ঢুকে এসেছে মালবিকা। অবাক চোখে অনেকে তার দিকে তাকিয়ে। চোখে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। সামান্য ইতঃস্তত করে মালবিকা বলে - 'ইয়ে, আমি এই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম... উনিশ বছর আগে।'

হঠাৎ ঘরের এককোণে বসে থাকা এক গোলগাল ভদ্রমহিলার মুখ উজ্জ্বল। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন—মালবিকা না? হ্যাঁ, মালবিকাই তো! চুল কেটে ফেললি কেন? মুখটা সেই একই রকম রয়েছে।

মিনুদি। মিনুদির মধ্যে একটা মা মা ব্যাপার ছিল। মালবিকা নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা টেবিলের চারপাশ থেকে উচ্ছ্বাস ও হ্যাঁ মালবিকাই তো! এ কে? ছেলে নাকি? হ্যাঁরে, তোর লেখা তো মাঝেমাঝেই দেখি কাগজে। কলকাতায় ফিরলি কবে? বাইরে গেছিলি না?

ঘিরে ধরেছেন সবাই মালবিকাকে। সুপর্ণাদি, অদিতিদি, মৈত্রেয়ীদি। সবার নামও এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না মালবিকার। কিন্তু ওঁরা এত বছর পরেও এভাবে মনে রেখেছেন ওকে? উনিশ বছর! বিস্মৃতির পলি জমা হবার পক্ষে যথেষ্ট সময়।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে টিচার্সরুমে ঢুকেছেন জয়িতাদি। চেহারায় একটু বয়সের ক্লান্তি। চুলে পাক ধরেছে।

—কই দেখি, এই তো নাকটা দেখেই চিনেছি। খবর পেয়ে তিনতলা থেকে হুড়মুড় করে নেমে এসেছি রে তোকে দেখতে। বাঃ, ছেলেটা কি মিষ্টি!

জয়িতাদি ওদের ভূগোল পড়াতেন। ওরা যখন ক্লাস সিক্স, তখন জয়িতাদি সবে ঢুকেছেন স্কুলে। দারুণ পড়ানো শুধু নয়, সরস্বতী পুজোর আল্পনা দেওয়া, 'তাসের দেশ'এর রিহার্সাল করানো, কোনও কিছুতেই জুড়ি নেই জয়িতাদির।

স্কুলের সব ছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড 'পপুলার' জয়িতাদি। পুরোনো মুখগুলো চোখের সামনে ভাসছে মালবিকার। শম্পা, ঝুমারা তাকে খুব খ্যাপাত। নাক নিয়ে। মোটা বড় নাকটা যেন মুখের উপর বিসদৃশভাবে উঁচিয়ে থাকে। নাক নিয়ে খুব লজ্জা ছিল মালবিকার। 'নাকেশ্বরী নাকেশ্বরী' মৃদু গলায় গেয়ে যাচ্ছে ঝুমারা 'ফুলেশ্বরী'র মত সুরে। গোপন ক্ষতস্থানে যেন গরম তেল ঢেলে দিচ্ছে কেউ। অপমানে মালুর মুখ চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা। ভগবান কেন এমন একটা নাক দিলেন তাকে। শম্পারা আরও মজা পাচ্ছে। একদিন থাকতে না পেরে দৌড়ে গেছে টিচার্সরুমে। —'দিদি!' ও হাঁপাচ্ছে।

— কি হয়েছে রে?

— ওরা আমাকে খ্যাপাচ্ছে।

-- ওরা মানে? আর খ্যাপাচ্ছেই বা কেন? কিছু করেছিস তুই? জয়িতাদির চোখের তারা মিটিমিটি হাসছে।

না দিদি, আমার নাক.. ওরা আমাকে নাকেশ্বরী বলে ঠাট্টা করে.

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে মালবিকা। জয়িতাদি ওর কাঁধে মৃদু আকর্ষণ করে ওকে নিয়ে গেছেন স্কুলের পিছনের মাঠে। মাঠে একটা ঘর উঠেছে কিছুদিন হল। বাচ্চাদের ক্লাশ হবে ওখানে। ফাঁকা ঘরের চৌকাঠে ওকে পাশে বসিয়ে জয়িতাদি বিলি কেটে দিচ্ছেন ওর লম্বা লম্বা চুলে।

--মালবিকা, একটা কথা বলি, মনে রাখিস সেটা। নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে কেউ তৈরি হয় না। মানুষের পরিচয় তার চেহারায় নয়, সারা জীবন সে কি করছে, কেমনভাবে কাটাচ্ছে, কি অ্যাচিভ করছে তার মধ্যে। তোর চেহারা নিয়ে যদি কেউ কিছু বলে, আমল দিবি না একেবারে। বরং তোর মধ্যে যে সব সম্ভাবনা আছে সেগুলোর দিকে নজর দে। পড়াশুনোয় ভাল তুই, এত ভাল গান করিস। হ্যাঁ রে... 'হে নবীনা'টা তোলা হয়েছে তো ঠিকমত? চুলে তেল দিস্ না কেন? দেখবি অল্প বয়সেই চুল পেকে থুনথুনে বুড়ি হয়ে যাবি, তখন বুঝবি মজা।

জয়িতাদির বলার ধরণে মজা পেয়ে হেসে ফেলেছে মালবিকা। চোখের কোলে জলের দাগ শুকিয়ে।

— হ্যাঁ রে এখনও গান করিস্? না বললে শুনছি না। আজ একটা শোনাতেই হবে। কতদিন শুনিনি তোর গান; জয়িতাদিরা বলছেন।

পাশ থেকে নানকু বলে-- আমি গান জানি। মা শিখিয়েছে।

— বটে! তবে তো তুমি গাইবে আগে। তারপর মা।

নানকুকে বেশি সাধাসাধি করতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরেছে ও 'যাবই আমি যাবই ওগো বানিজ্যেতে যাবই' কচি গলায় সুর খেলছে স্বচ্ছন্দে।

গানের পাখায় ভর দিয়ে মালবিকা নিমেষে পৌঁছে যায় অন্য কোনও সময়ে। স্কুলের 'ফাংশান' হচ্ছে। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তক্তা পেতে বানানো স্টেজে নাচছে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র।

'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।

শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা।।'

পিজবোর্ড কেটে মেঘ আর পাহাড় বানানো হয়েছে। পিছনে নীল আকাশের গায়ে দুধ সাদা সি-গাল সাঁটা সাগর বিহঙ্গ উড়ে যাচ্ছে। কিছুদিন ধরে স্নান খাওয়া মাথায় উঠেছে। দৌড়ে দৌড়ে সন্ধ্যেবেলাও রিহার্সাল দিতে যাচ্ছে স্কুলে। বাড়িতে সবসময় শ্যামল মিত্র রেকর্ডে গাইছেন--

'ভিখারী মন ফিরবে যখন ফিরবে... এ এ,

ফিরবে রাজার মত আমি যাবই...'

অনুষ্ঠান শেষে ঘুম ঘুম চোখে মার সঙ্গে বাড়ি ফিরছে মালু। হাতে অনেকগুলো প্রাইজ ফার্স্টগার্ল হবার সুবাদে। পথে এক অচেনা বৃদ্ধ ভদ্রলোক জড়িয়ে ধরেছেন মালুকে। 'কি গাইলি রে ভাই, প্রাণটা ভরে গেল। দেখো মা, তোমার এ মেয়ে অনেকদূর যাবে।' পরের বাক্যটা মালবিকার মার উদ্দেশ্যে। আলোদির বাবা উনি, মালবিকারা শুনেছে আলাপ হবার পর। আলোদি আরেক শিক্ষিকা মালুদের। মেয়ের স্কুলের 'ফাংশানে' মালবিকার গান শুনে বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত। উনিশ বছর! অনেকদূর কি চলে এসেছে মালু? আরও কি যেতে হবে অনেকটা পথ!

● ● ●

পুরনো পাড়ায় যখন ঢুকল মালবিকা, তখন বিকেল পড়ে এসেছে। গ্রীষ্মের বেলা। তাই এখনও রোদ মরে নি। আগে কোথায় যাবে? নন্দিনী মাসিকে একবার চমকে দিলে কেমন হয়? পাড়ায় সব বাড়িতেই তো চেনাশুনো। সবার বাড়িতে যদি গিয়ে দেখা করতে শুরু করে তবে ওদের আজ আর ফেরা হবে না। তার চেয়ে এই ভাল। চুপি চুপি এসে নিঃশব্দে ফিরে যাওয়া। পাড়ায় ঢোকার মুখে কদম গাছটার জন্য সন্ধানী দৃষ্টি দিল মালবিকা। দেখতে পেলেই নানকুকে বলবে--- 'এই দ্যাখ নানকু, এই গাছটা আমার ছোটবেলার বন্ধু।'

কদমতলা দিয়ে মাধুর বাড়ি যাচ্ছে ফ্রক পরা মালু। মাধুর ভাল নাম কি

মাধুরী? জিজ্ঞেস করা হয় নি কোনওদিন। মাধু ছিল মালুর শৈশবের বন্ধু। ওদের বাড়িটা মালুদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা - অন্যরকম। মাধুদের একটামাত্র ঘর। সেই ঘরে মাধুর বাবা শুয়ে শুয়ে কাশছে। মাধুর মা ভিজে কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা একটা করে - মেলে দেয় বাইরের এক চিলতে উঠোনের তারে। বাড়ির পাশে কুয়োতলা। কুয়োর ভিতরে উঁকি মারলে সবুজ শ্যাওলা ভর্তি জল। মাধু একবার মালুকে তাদের কুয়োর ভিতরে থাকা এক বন্ধু ভূতের গল্প বলেছিল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামার মুখে মাধুদের উঠোনে এক্কা-দোক্কা খেলার শেষে বাড়ি ফেরে মালু। আসার পথে কদমতলাটা একছুটে পার। তাদের বাড়ি দূরে কদমগাছটা দেখা যায়। বর্ষাকালে ফুলে ফুলে ভরে যায় গাছটা। বর্ষায় গাছে ফুল এলেই মা বলে ওই দ্যাখ মালু 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।' মালু জানে মার খুব প্রিয় গান ওটা। মার গলায় সুর নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে মা খুব ভালবাসে। রাজেশ্বরী দত্তের গাওয়া রেকর্ডে মা প্রায়ই শোনে ওই গানটা।

যাইবলুক মা, সন্ধ্যেবেলা ঝুপসি হয়ে আসা কদমতলা দিয়ে ফিরতে একটু গা ছমছম করে মালুর। ঠিক যেমন করে আরেক বন্ধু অসিতের বাড়ি গেলে ফেরার সময় ঝিলের কাছ দিয়ে ফিরতে। অসিতের বাড়ি অবশ্য মাত্র দু একবারই গেছে। অসিত মালুর প্রাইমারি স্কুলের বন্ধু। অসিতের বাবার দোকান আছে। মুদীর দোকান। মা বুঝিয়েছে - কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলার মত মুদীকে মুদী বলা পাপ। মা বাবাও তো অসিতের বাবাকে 'সাহামশাই' বলে ডাকে। 'সাহামশাই, এক কেজি মুসুর ডাল। সর্ষের তেলও দেবেন পাঁচশো।' অসিতের বাবার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। কালো দোহারা চেহারা। অনেক সময় দোকানে অসিতকেও বসে থাকতে দেখেছে মালু। বাবার দোকানের ভার তো ওকেই বুঝে নিতে হবে।

---দিদির তো বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। তোরও হবে --গম্ভীর ভাবে বলতে গিয়েও অসিত শেষে ফিক করে হাসে। ইঁদুরের মতো দাঁতগুলো দেখা যায়--পোকায় খাওয়া দাঁতটাও। ক্ষয়াটে চেহারা। গর্তে বসা চোখ। মালবিকাও জানে মেয়েদের বিয়ে হয়, হতে হয়। তবু অসিতের মুখ থেকে বিয়ের কথা শুনবে কেন ও?

—তোকে বলেছে! সব মেয়ের মোটেই বিয়ে হয় না। আমি পড়াব।

--কোন স্কুলে?

—স্কুলে কেন, কলেজে পড়াব আমি, মার মত।

অসিত একটু ভাবে। ঘটনাটা যে অসম্ভব নয়, জানে ও। সত্যিই মালুর মা

কলেজের দিদিমণি। মালুদের বাড়ি গেলে কি সুন্দর মিষ্টি হেসে মুড়ি নারকেল মাখা খেতে দেয়। তবু থামবার পাত্র নয় ও—কিন্তু বিয়ে তোর একদিন হবেই, কেউ না করলে আমিই করবো—অসিত সদর্পে হাতের বলটা মাটিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে আবার হাতে ফিরে আসার জন্য।

মালবিকা ঈষৎ অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক তাকায়। সব ঠিকঠাক চললে অসিতের এখন তার বাবার দোকান বুঝে নেবার কথা। কিন্তু সাহামশাই-এর দোকানটা যেখানে ছিল সেখানে এখন জুলজুল করছে মুখার্জী অ্যান্ড কোং— ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের দোকান। এটা অসিতদের দোকান হতে পারে না। ওরা ছিল সাহা। নানকু অসহিষ্ণু—'মা, তুমি যে বলেছিলে লাল ইঁটের বাড়ি ছিল তোমাদের। সামনে একটা বাঁকা রাস্তা ছিল গেট অবধি— সেসব কিছুই কি নেই?' নাঃ নেই, চোখের সামনে থেকে সেই সেই বাংলো প্যাটার্ণের বাড়িটা। সেই মোরাম বিছানো বাঁকা পথটুকু দুপাশের অজস্র গাছ—সব ভোজবাজির মত উধাও। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া - সেই বয়ে যাওয়া ঝিলটাও বেমালুম উবে গেছে। ঝিলের জায়গায় এখন বাঁধানো রাস্তা। গাড়ি যাওয়ার জন্য। বাড়িটার জায়গা নিয়েছে বহুতল ফ্ল্যাট। কংক্রিটের জঙ্গল। বাড়ির মালিক ছিলেন গাঙ্গুলিমেসো। মালবিকারা ভাড়া থাকত একটা অংশে। গাঙ্গুলিরা এখন কোথায় থাকেন কে জানে? আচ্ছা ঝিলের অত জল কোথায় গেল? জলের ধারে ঝুঁকে থাকা সেই জোড়া গাছদুটো? রাধাচূড়ার হলদে ফুল হত, কৃষ্ণচূড়ার - লাল। কৃষ্ণচূড়া হল রাধাচূড়ার নাগর, কৃষ্ণ যেমন রাধার—গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে লতিকাদি চোখ নাচিয়ে বলেছিল। পাশের বস্তিতেই থাকত লতিকাদি। ওকে ওর বর নিত না, তাই বাবার কাছেই থাকত ও। লতিকাদির বাবার কাশরোগ। কাচের কাজ করত। কাচ কাটতে হীরে লাগে। তাই লতিকাদিদের বাড়িতে হীরে ছিল। কাচকাটা মেশিনের গায়ে লাগানো প্রায় বিন্দুর মত সেই হীরে দেখতে লতিকাদির ঘরে একদিন নিয়েও গেছিল মালুকে। সেই পথেই মালু প্রথম শুনেছিল 'নাগর' শব্দটা।

- নাগর কি, লতিকাদি?

- বোঝবানে পরে। রসের দিনে যারে দেখলি শরীল রসে ভরে, তারে কয় নাগর।

মালুকে দেখে পাশের ঘরের দুটো বউ মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল—কি রে, এ আবার কে? লতিকাদি বলেছিল—কাজের বাড়ির বাচ্চা।

শুনে বউদুটোর আঁচল চাপা দিয়ে কি হাসি। ঘোলাটে চোখে লতিকাদির বাবা তাকিয়েছিল মালুর দিকে। তারপর আসার কারণ শুনে বলেছিল—

'হীরা দেখনের লগে আসলা? দ্যাখ, বেশ কইরা দেইখ্যা লও।' ফেরার পথে একটা লোক লতিকাদিকে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন বলেছিল। লতিকাদির কথাও ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু ওর পানের মত মুখখানা থেকে থেকে কিসে যেন ভরে উঠছিল—মালু দেখতে পেয়েছিল। রসে কি? তাহলে ওই লোকটা লতিকাদির নাগর। বাড়ি এসে মাকে বলায় মার মুখ গম্ভীর। প্রচণ্ড বকুনি খেয়েছিল লতিকাদি। তার কিছুদিন পরেই লতিকাদির আবার বিয়ে হয়ে গেল। ওই লোকটার সঙ্গেই। মা লতিকাদির জন্য সিল্কের জরিপাড় শাড়ি কিনেছিল আর কানের দুল। সিঁদুর টিদুর পরে ডগোমগো লতিকাদি চলে গেল নতুন বরের ঘর করতে। মালুও আস্তে আস্তে ভুলে গেল লতিকাদিকে।

শুধু শীত পেরিয়ে যখন হাওয়ায় নতুন টান। যখন ফুলে ফুলে নিজেকে ভরিয়ে নিয়েছে রাধাচূড়া গাছটা, পাশে কৃষ্ণচূড়াটাও লালে লাল, তখন হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে মালু বোঝে কৃষ্ণচূড়ার জন্য রসে ভরে টইটম্বুর রাধাচূড়া। মনে মনে বলে 'নাগর'। মুখে বলে না —কারণ ওটা খারাপ কথা মা বলে দিয়েছে। কিন্তু বোঝে লতিকাদির কথা একেবারে ঠিক। 'নাগর' ছাড়া কি? ভীষণ বন্য একটা কৌতূহল ঝাঁপায় বুকের মধ্যে। শরীরে নতুন টান। পাড়ায় ঝিমলি বলে নতুন আসা মেয়েটাকে গোপন ঈর্ষা নিয়ে দেখে মালু। ওর নাকি এর মধ্যেই সাতটা প্রেম হয়ে গেছে। দার্জিলিং এ বেড়াতে গিয়ে নাকি পনেরো দিনের মধ্যেই আরেকটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে নিয়েছে ও। পাড়ায় মালুর অনেক বন্ধুরই 'লাভার' আছে। রিঙ্কুর 'লাভার' ওর সামনের বাড়িতে থাকে। একটা দাড়িওয়ালা উড়ু উড়ু দেখতে ছেলে। সময় নেই, অসময় নেই, রিঙ্কু ওই ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখে কি কথা হয় কে জানে! তবে বন্ধুদের জেরার মুখে স্বীকারও করেছে রিঙ্কু - ছেলেটা নাকি ওকে চুমুও খেয়েছে। গালে। ভাবতে গেলে মুখচোখ লাল হয়ে যায় মালুর। সৌরভ - যার সঙ্গে ফোর অবধি ওর প্রাণের বন্ধুত্ব ছিল, তার সঙ্গেও এখন আর সহজভাবে কথা বলতে পারে না মালু। ক্লাস ফোরে মালু টিফিনের সময় একদিন টিচারের চেয়ারে বসেছিল। সৌরভ এসে চেয়ারটা ধরে দোলাতে দোলাতে খুব গর্ব গর্ব গলায় ক্লাসের সবাইকে বলেছিল —দ্যাখ দ্যাখ ঠিক কাকুর মত করছি। ওর লতাপাতায় কাকু সিনেমার নামী হিরো। কিন্তু মালু কেন ওর নায়িকা হতে যাবে? শোনামাত্র ক্লাসে হি হি হাসি। তারপর থেকে গা জ্বলে যায় মালুর সৌরভের নাদুস নুদুস ফর্সা বেড়ালের মত চেহারাটা দেখলে। এখন এক স্কুলে পড়ে না বটে, কিন্তু রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে গেলেও স্বাভাবিক হতে পারে না মালু।

এখন হাইস্কুলে ওর বন্ধুরা সবাই মেয়ে—রুমা, অনুশ্রী, চন্দনা, মউ। অনেকে এক পাড়ারও। নতুন রুটিন, নতুন গল্প। টিফিনের সময় মাঠের এককোণে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে চন্দনা।

—শোন, তুই কিছু জানিস?

—কি জানার কথা বলছিস? মালুর পাল্টা জিজ্ঞাসা। প্রেমের কথা তো সবই জানা ওর। তবে চন্দনা আর নতুন কি শোনাতে চাইছে মালুকে? চন্দনা নিজেও তবে প্রেম করছে? বিচিত্র নয়। আস্তে আস্তে মালুর চোখের উপর দিয়ে ওর সব বন্ধুদেরই প্রেম হবে। মালুরই শুধু প্রেম-ট্রেম কিছু লেখা নেই কপালে।

না, তা নয়। চন্দনা ওকে প্রেমের থেকে আলাদা এক অদ্ভুত অজানা জগতের কথা শোনাচ্ছে। যা ও নিজেও সদ্য শুনেছে। মানব জন্মতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকাহিনী। মানুষ সত্যিই এভাবে জন্মায়? এর মধ্যে তবে রোম্যান্টিসিজম কই, প্রেম কই? পাড়ায় মুনিয়া বৌদির বাচ্চা হবে। মুনিয়া বৌদিকে তবে বঙ্কুদা ওইভাবে... চন্দনা যেমন বলছে। না না, অসম্ভব, এর মধ্যে ভালবাসা কোথায়? তবে কি দরকার ওই প্রাণান্তকর খেলায়? কিশোরী মালুর ফ্রক-ইজেরের তলায় অসহায় লাগছে। ওকে মার কাছে যেতে হবে। মা তো মালুকে কোনও কিছু গোপন করে না। কিছুদিন আগেও মালু যখন গোপন অঙ্গে রক্তের ছোঁয়া দেখে ভয় পেয়ে মাকে ডেকেছিল—তখনও তো মা এসে সযত্নে ঠিকঠাক করে দিয়েছে ওকে। বলেছে মেয়েদের এই রক্তক্ষরণই স্বাভাবিক। ও বড় হয়ে গেল এবার। পুরোদস্তুর মেয়ে হয়ে গেল। 'কেন, আগে কি মেয়ে ছিলাম না?' মালু প্রতিবাদ করেছিল। মা তবুও ওকে বলেছিল প্রতি মাসের এই গোপন ক্ষরণের সঙ্গে নারীত্বের, মাতৃত্বের সম্পর্কের কথা। কিন্তু এখনও তো এসব বলেনি। চন্দনা বলেছিল—'সঙ্গম'। দুই নদী যেখানে মেশে, একাকার হয়ে যাবার জন্য তারই নাম তো 'সঙ্গম'। হঠাৎ শব্দটাকে খুব অশ্লীল মনে হচ্ছে মালুর। সেইদিন রকে বসে বিল্টু আর বকাই হঠাৎ মালুকে দেখে গাইছিল—বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি?—তার মানে তবে এই?

মালু আর পারছে না। সমস্ত শরীর-মনে মুচড়ে উঠছে কান্না। উদ্গত অশ্রু চেপে ছুটেছে বাড়ির দিকে। মা দরজা খুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা'র বুকে—তুমি আমাকে বলনি কেন মা, বলনি কেন?

—কি হয়েছে মালু? আমার দিকে তাকা। কেউ কিছু বলেছে তোকে? মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করছে।

মালু সব বলেছে মাকে। চন্দনার কথা---বকাইদের গান-সব। মা'র চোখে হাসির বিচ্ছুরণ সব শুনে। জেদী, একগুঁয়ে, অবুঝ মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা বলছে—'যা শুনেছ সব সত্যি। তোমাকে বলিনি কারণ...' মা একটু সময় নিচ্ছে। তুমি বলে বলছে মানেই সিরিয়াস মুড। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, যেমন পরীক্ষায় ভাল করা, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখা---এসব আলোচনার সময় মা মালুকে তুমি বলে ডাকে। মা বলছে — বলিনি কারণ জানতাম সময় হলে এসব কথা তুমি নিজেই জেনে যাবে। সব মেয়েই তাই যায়। আর যেমন খারাপ বলে তুমি ব্যাপারটাকে দেখছ, আসলে তেমন নয় মালু। শরীরের মধ্যে লুকনো ভালবাসা থাকে। মনের ভালবাসা শরীরেও উপচে পড়ে কোনও কোনও সময়। তখনই তা থেকে সৃষ্টি হয়। নারী পুরুষ পরস্পরকে ভালবেসে সৃষ্টি করে। সন্তানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সব অসম্পূর্ণতাকে সংশোধন করে সম্পূর্ণ করতে চায়।

মালবিকা তাকিয়ে আছে - কংক্রিটের জঙ্গল পেরিয়ে অন্য কোন সময়ে। লাল ইটের বাংলো প্যাটার্ণের বাড়িটার জানলায় পাশাপাশি বেতের চেয়ারে বসে মা ও মেয়ে। টেবিলে ছোট্ট টকটক করা টেবিলঘড়ি। মা মেয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে মনে মনে একটিমাত্র নারী হয়ে যাবার সেই কি শুরু যে নারী উত্তরাধিকারের মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে চায় সময় থেকে সময়ান্তরে। উত্তরাধিকার তো বেঁচে থাকা, বয়ে যাওয়ারই আরেক নাম।

'মা! কি হল? যাবে না' - নানকুর প্রশ্নে সময়যান হঠাৎ খেই হারায়। মালবিকা সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে --এই যাই রে। চলতো দেখি অনুশ্রী মাসির বাড়িটা খুঁজে পাই কিনা। পাড়ার অন্যপ্রান্তে ছিল অনুশ্রীদের বাড়ি। মালবিকার মা অসময়ে আকস্মিকভাবে চলে যাবার পর অনুশ্রীর মা সস্নেহে মালবিকাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কতদিন অফিসের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা ভাল-মন্দ খাবার করে দিয়েছেন 'মা মরা' মেয়েটার কথা ভেবে। মার মৃত্যুর পর বছর ঘুরে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন সময় হয়ে গেল স্কুল ছাড়ার।

মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। একসঙ্গে দল বেঁধে গেজেট দেখতে যাচ্ছে মালবিকা, অনুশ্রী, ঝুমা, মউ সবাই। রোল নম্বর মিলিয়ে নিজের নম্বরটা দেখে মালবিকার চক্ষু চড়কগাছ, ভাল করবে জানত, তা বলে এত নম্বর! অনুশ্রীও স্টারের উপর পেয়েছে। পরদিন মার্কশিট আনতে স্কুলে যেতে জয়িতাদি, আল্পনাদি, রীতাদিরা ওকে জড়িয়ে ধরেছেন---তুই তো আমাদের স্কুলকে জাতে তুলে দিলি রে মালবিকা!

শরতের আমেজ আকাশে, বাতাসে। মালু প্রতিটি ঋতুর গন্ধ চেনে। এখন ভাদ্রের শেষ। মাঝে মাঝে গুমোট। মালুর গরম লাগে না। ও সেদিন দেখেছে ঝিলের পাড়ে কাশ ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। চোখ ধাঁধানো নীল আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মত নির্ভার সাদা মেঘ। এবার শরতটা অন্যরকম। এবারের শরতে মালু আর স্কুলের মেয়ে নয়—পুরোদস্তুর মালবিকা মিত্র কলেজের মেয়ে। দক্ষিণের বিখ্যাত মেয়েদের কলেজেই ভর্তি হবে—ঠিক করে ফেলেছে ও। ওটাই ওর বাড়ি থেকে কাছে। বাড়ি মানে নতুন বাড়ি। এই শরতেই ওরা এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে নতুন পাড়ায়। দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি করেছেন বাবা। এতদিন ওর স্কুলের জন্যই অপেক্ষা ছিল। বাবা এখন নতুন বাড়িতে গিয়ে গুছিয়ে নিতে চান। বাড়িওয়ালা গাঙ্গুলি মাসিমাদের নোটিশ দেওয়াও হয়ে গেছে। শুনে তাঁর কি হাহুতাশ। বারবার বলছেন—আজ যদি দিদি থাকতেন, তবে তো আপনারা এ পাড়া ছাড়ার কথা ভাবতেন না। বলছেন বটে, কিন্তু আর উনি ভাড়াটে বসাবেন না—পাশের বাড়ির বেলুদিদের কাছ থেকে শুনেছে মালবিকা। এতখানি জমি, বাগান সামনে, ফেলে রাখা মানে তো নষ্ট। উনি নাকি বিয়েবাড়ি হিসেবে এখন কিছুদিন ভাড়া দেবেন বাড়িটা। তারপর আস্তে আস্তে অন্য প্ল্যান আছে।

—কি প্ল্যান বেলুদি?

বেলুদি ভাঙেনি- সে দেখবি 'খন, তোদের আসা তো আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না একেবারে। কলকাতা থেকে কত দূরেই বা? তা বটে। এখন যাতায়াত একটু কষ্টকর। কিন্তু নন্দিনীমাসিরা বলছিল—পাতালরেল চালু হয়ে গেলে এটা নাকি কোনও দূরত্বই না। তখন এ পাড়াটাও কলকাতারই অংশ হয়ে যাবে। 'তখন মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলেই চলে আসবি মালু'- নন্দিনীমাসি বলেছিল। মালু ঘাড় নেড়েছে। মনে মনে ভেবেছে কেনই বা আসব? মা ও তো নেই আর। কোনও পিছুটান নেই। এবার শরতে মা নেই।

সকাল থেকেই গোছগাছ। আর কয়েকদিন বাদেই যাওয়া। কত যে জিনিস জমেছে সংসারে। নেই নেই করেও। পুরনো কাপড়চোপড়, বই রাশি রাশি, মার কলেজে পড়ানোর জন্য হাতে লেখা গাদা গাদা লেকচার নোট ফেলা যাবে না কিছুই। মালুর গানের সব খাতায় মা'র হাতের লেখায় গান লেখা, সেগুলোও নিতে হবে। মা'র সেলাই-এর বাক্স, টিনের বাক্সের গায়ে একটা বাচ্চার - ছবি আঁকা মরচে ধরে মুখটা প্রায় দেখাই যায় না আর - সেটার কি হবে? মালুর বুকের মধ্যে দমচাপা একটা শূণ্যতা — কে ওকে বলে দেবে কোনটা ফেলতে হবে। মা যে ওকে ফেলতে শেখায়নি কিছু। অথচ খালি

মনে হচ্ছে কি যেন একটা ফেলে যাচ্ছে। সকাল থেকেই মালু ভাবছে। কোথাও কিছু রয়ে গেল কি? ওদের এই বাড়িটায় এরপর অজানা ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে। সানাই বসবে নিশ্চয়ই পূবের বারান্দাটায়। বাড়িটা লোকের ভিড়ে গমগম করবে। বাড়িটার কি তখন মালুদের কথা মনে পড়বে একবারও। বাড়িটা কি বুঝতে পারছে মালুরা ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

সকাল গড়িয়ে যাচ্ছে বিকেলের দিকে। আজ সন্ধ্যেয় মালুর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। স্কুলের হলে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। প্রচুর প্রাইজ মালবিকার। প্রায় সব ক'টা বিষয়ের জন্য। এমনকি স্পোর্টসের জন্যও একটা স্পেশাল প্রাইজ পাচ্ছে মালবিকা খেলাধূলোয় একটুও ভাল না হওয়া সত্ত্বেও। অনুশ্রীর মা'র কাছে — এক একবার প্রাইজ নিয়েই রেখে এসে আবার লাইনে দাঁড়াচ্ছে ও। 'এতগুলো প্রাইজ নিয়ে বাড়ি যাবি কি করে? দু'হাতে তো ধরবে না' কে যেন বলল। মালবিকা ওসব ভাবছে না। ও 'চিত্রাঙ্গদা' দেখছে মন দিয়ে। সুরূপাবেশী গার্গী নাচছে -

'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।

আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।...'

সদ্য ঘুম ভাঙা কোন এক আলো খেলা করছে ওর চোখে মুখে।

পুষ্পবিকাশের সুরে, দেহ মন উঠে পূরে

কী মাধুরী সুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি... কে বাজায়...।

মালবিকা যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াচ্ছে।

বহুবার শোনা চেনা গানও ঘোর লাগিয়েছে মাথার ভিতর।

সহসা মনে জাগে আশা

মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা

আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে.

এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি।

অনুশ্রীরা অন্যদিকে গল্পে মত্ত। চুপিসারে বাইরে বেরিয়ে এসেছে মালু। চাতালের শিউলি গাছটা থেকে টুপটাপ ফুল ঝরে পড়ছে একটা দুটো। সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগছে। আকাশে গোল চাঁদ। পূর্ণিমা? হবেও বা। মা থাকলে ঠিক বলত — পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভুলে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মালবিকা। একা, নির্বাক। হঠাৎ পিছন থেকে অজানার গলা—'মালু, তোকে একটা জিনিস দেব। ...একজন পাঠিয়েছে, ...যদি তুই রাগ না করিস।'

— কি জিনিস? মালবিকা রাগ করতেও ভুলে গেছে।

---দেবাশিসদার চিঠি। তুই চলে যাচ্ছিস শুনে আমাকে অনেক কাকুতি মিনতি করল তোকে এটা পৌঁছে দেবার জন্য। অঞ্জনা এদিক ওদিক দেখে একটা খাম সন্তর্পণে দিচ্ছে মালবিকার হাতে।

খামটা নিয়ে মালবিকা পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রাইজগুলো মাসির কাছে রইল। থাকগে! পরে পৌঁছে দেবে নিশ্চয়ই। বকবে মালুকে— 'ভুলো পাগলি মেয়ে! প্রাইজগুলো অবধি নেবার কথা মনে থাকে না।' মালুকে এখন যেতেই হবে ঝিলের পাশটায়। রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া তাকে ডাকছে পাতায় ঝিরঝির আওয়াজ তুলে। মালু একটু ইতঃস্তত করে রাধাচূড়ার নিচে বসে পড়ল। অনেক বদলে গেছে পাড়াটা। দূরের মাঠটায় - আগে রাতে শেয়ালের ডাক শোনা যেত। এখন ওখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ভিতের গাঁথনি হয়ে গেছে। শেয়ালগুলো কোথায় গেল কে জানে? মালু নিজেও কি বদলে গেছে অনেক? শহরতলির সেই ছোট্ট মালু অদৃশ্য টানে হঠাৎ বদলে যাওয়া সম্পূর্ণ এক নারী। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে প্রান্তর। আলোর বন্যায় ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। মালুর হাতে সদ্য পাওয়া খাম। ও জানে কি আছে ওর মধ্যে। ওর জীবনের প্রথম প্রেমপত্র। অঞ্জনার জ্যাঠতুতো দাদা দেবাশিসদার কাছ থেকে।

দেবাশিসদা যে কলেজে ডাক্তারি পড়ে সেটা মালু যে কলেজে পড়বে ঠিক করেছে -- তার খুব কাছেই। যদি চিঠিটা পড়ে, যদি সাড়া দেয়, তবে পরের ঘটনাগুলো পরপর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মালু এখন থেকেই। ওরা খুব ঘুরবে --- গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া -- সব প্রেমিক প্রেমিকারাই যেমন ঘোরে। তারপর হয়তো একদিন দেবাশিসের বউ হয়ে যাবে, ফিরে আসবে পুরনো চেনা পাড়ায়। দেবাশিসকে খারাপ লাগে না ওর। কিন্তু তারপর? এই সব কিছুই তো বাঁধা পড়া নিরূপদ্রব জীবনের গন্ডীর নিশ্চিন্ত ছক। ছকের বাইরে সবে মুক্তি পেয়েছে মালু। পরীক্ষা শেষের ফুরফুরে মুক্তি। মা না থাকার অনন্ত শূন্যতার মধ্যে মুক্তি, ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার হাতছানির দিকে পা-বাড়ানো মুক্তি। আবার যেচে ধরা দেবে মালবিকা? চুপ করে বসে আছে মালু। মনে মনে কথা বলছে জলের সঙ্গে।

- জল, কি করব আমি? পড়ব চিঠি? যদি জড়িয়ে পড়ি? যদি ফিরতে না পারি?

জল বলল—যদি বাঁচতে চাও, তবে ধরা দিও না। খুলো না ওই চিঠি। ফেলে দাও।

--কোথায় ফেলব? কেউ যদি দেখে ফেলে। পড়ে ফেলে আমিও দেখিনি যা---আমাকে লেখা গোপন মনের সেই ভাষা?

জল বলল—ভাসিয়ে দাও আমার মধ্যে। ভেসে যেতে দাও। দেখবে স্রোতই বহন করছে তোমাকে, তোমার প্রথম প্রেমপত্রকে। দেখবে কেমন করে আমার মধ্যে ধরে রাখি তোমার গোপন কথাকে।

মালু জলের কথা শোনে। পায়ে পায় এগিয়ে যায়, ঝিলের জালে ভাসিয়ে দেয় ওর জীবনে আসা প্রথম প্রেমের চিঠিকে। মুছে যেতে থাকে কালিতে লেখা প্রাচীন শব্দমালা। অথবা মোছেও না। গুঁড়ো গুঁড়ো বিন্দু বিন্দু প্রেমোচ্চারণ ছড়িয়ে পড়ে, ভাসতে থাকে ঝিলের জলে। সেই প্রথম ভাসিয়ে দিতে শেখা, সেই প্রথম ভেসে যাওয়া। জলের সঙ্গে।

খুঁজছে মালবিকা। ওই তো অনুশ্রীদের বাড়িটা। দুটো সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবুজ দরজা। অনেক কড়া নাড়ার পর উল্টোদিকের দরজা খুলে এক অচেনা ভদ্রমহিলা বেরিয়েছেন।

—কাকে চাই?

—অনুশ্রীকে। এখানে অনুশ্রীরা থাকত না?

—ও আপনি বোধহয় মিসেস মৈত্রদের কথা বলছেন? ভদ্রমহিলা এবার বুঝতে পারেন।

—ওরা তো চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে। বহুদিন। বছর দশেক তো হবেই।

—কোথায় গেছে জানেন?

—তা তো ঠিক বলতে পারবো না। আপনার সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই বুঝি?

—না। অনুশ্রী আমার বন্ধু ছিল। অনেক বছর আগে। রাস্তায় নেমে নানকু শূন্যে হাত নাড়ে— 'মা তোমার বন্ধু গাওয়া?'

—'নারে, দেখি শেষ চেষ্টা করে। মামাবাড়িটা যদি থাকে।' —মালবিকা বলে।

মামাবাড়িটা একই রকম রয়েছে। এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসেছেন। অনুশ্রীর মামী। অনুশ্রীর মা দিল্লীতে ছেলের কাছে। অনুশ্রীর বাবা মারা গেছেন। তবে হ্যাঁ! অনুশ্রী কাছাকাছিই থাকে। ওর বরের সঙ্গে। যদি মালবিকা চায় তবে..

উনি সঙ্গে লোক দিয়ে দিয়েছেন। রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে দিয়ে ঢোকার রাস্তা। একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে লোকটি গুমগুম করে কিল মারছে—ও দিদি! উঠুন। দেখুন কে এসেছে। কেউ খুলছে না। তবে কি ও নেই? জানত না মালু আসবে এই

অসময়ে? হয়তো কোথাও বেরিয়েছে। কিন্তু দরজায় তালা নেই তো! তাহলে ভিতরে ঘুমোচ্ছে বোধহয়। কি ঘুম রে বাবা?

নানকু বলছে—চল মা চলেই যাই। তোমার বন্ধু বোধহয় ম্যাজিক করে ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

শেষবার চেষ্টা করে দেখা যাক ভেবে দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে ঘুমজড়ানো গলা—খুলছি, খুলছি, ভেঙে ফেলার জোগাড় একেবারে। সেই গলা! বহুযুগের ওপার থেকে অনুর গলা ভেসে আসছে—দাঁড়া, খুলছি খুলছি, ভেঙে ফেলবি নাকি দরজা!

বন্ধ দরজা খুলে যাচ্ছে। ওপাশে দাঁড়িয়ে সেই মোটাসোটা চেহারার শাড়ি পরা মহিলা। নাকি ফ্রক পরা সেই মেয়েটা? দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে বুঝি। চশমা খুলে চোখ কচলে বোঝার চেষ্টা করছে সামনে কে।

'চিনতে পারছিস, অনু?' দরজার ওপার থেকে অবাক চোখে অনুশ্রী তাকিয়ে আছে মালবিকার দিকে। কয়েক সেকেন্ড। তারপরই বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে উঠেছে অনুশ্রী—মালু না? মালুই তো?

পলকে উনিশ বছরের ব্যবধান পেরিয়ে যাচ্ছে অশ্বারোহী সময়। ভুলে যাওয়া, পেরিয়ে যাওয়া দিগন্তের দিকচক্রবাল থেকে সহসা ছুটে আসছে সহাস্য দুই ষোলোর কিশোরী, পরস্পরের দিকে। অনু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরছে মালুকে—এতদিন কোথায় ছিলি মালু? কোথায় হারিয়েছিলি? একবারও আসার সময় হল না এই উনিশ বছরে?

নানকু দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে। বাঁধ ভাঙছে। হু হু করে জলধারা ভাসিয়ে নিচ্ছে মাঝের উনিশ বছরের ব্যবধানকে—বর্তমান ও অতীতের। আকুল কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ মালবিকার—বলছে—'আমি ফিরে এসেছি রে। হারিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে পেয়েছি যখন, বাকি জীবন আর হারাব না।'

ইচ্ছেকুসুম

কাবেরী রায়চৌধুরী

ফ্রেশ লাগছে। তাজা, টাটকা। একেবারে ঝরঝরে। সমস্ত ক্লান্তি উধাও। পেছনের বাগান থেকে সবুজ গন্ধ আসছে। ঝলক ঝলক টাটকা বাতাস সঙ্গে। লম্বা করে শ্বাস নিল উর্বশী। শরীরের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ঢুকে গেল প্রয়োজনীয় অক্সিজেন।
এই অক্সিজেনটুকুর কথাই বলেন প্রতিদিন চৈতন সেন। সকালবেলায় খোলা জায়গায় রাস্তায় হাঁটুন। জোরে জোরে শ্বাস নেবেন। আর তা যদি নাও পারেন ছাদে হাঁটুন, না হলে বাগান থাকলে স্পট জগিং করুন। একই উপকার পাবেন। তারপর এক্সারসাইজ তো রইলই।

মনে মনে হিসাব করল উর্বশী, আজ নিয়ে দশ দিন হল। এ মাসের দু'তারিখে জিমে জয়েন করেছিল আর আজ এগারো। দু'তারিখ থেকে গোনা হলে ঠিক দশ দিন। এর মধ্যেই এক কেজি মতো বাড়তি ওজন ঝরিয়ে ফেলেছে সে। আজই ওজন নিয়েছিলেন চৈতন সেন।

এর মধ্যেই শীত গেছে। ফাল্গুনেই গরমের তাত। উর্বশী সোফায় টান টান করে মেলে দিল শরীর। বেশ গরম লাগছে এখন। রীতিমতো ঘাম হচ্ছে। হবেই বা না কেন? তাকে দেখলেই চৈতন সেনের কড়াকড়ি বেড়ে যায় যেন। এসি তো বন্ধ করবেনই এমনকী ফ্যানও বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন ইন্সট্রাক্টার মেয়ে দুটোকে। আর এই নিয়ে হাসাহাসির অন্ত আছে? চৈতন সেন চোখের আড়াল হলেই মেয়ে দুটো, রীনা আর সীমা হেসে গড়িয়েই খুন।

আজও তাই। ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই মিসেস পাড়ুই কেমন যেন ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলেন রীনার দিকে চেয়ে। মুহূর্তে হাসি এ মুখ থেকে ও মুখে। কীরকম অদ্ভুত একটা লাগছিল তার, তাকে দেখে অমন করে হাসার মানেটা

কী? জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা করল না। এক্সারসাইজ চটি বার করে রীনার হাতে দিতে না দিতেই দরজায় ঠক্‌ঠক্‌।

--ওই...। স্যার এসেছেন। বলতে বলতেই রীনা ফ্যান অফ করে দিয়ে দরজা খুলেই এক গাল হেসে বললেন, বন্ধ স্যার সব।

--এসি বন্ধ তো?

--হ্যাঁ স্যার।

---শোন, আজকে সবার ওয়েট নেবে এক্সারসাইজ করার পনেরো মিনিট বাদে। আমাকে রিপোর্ট দেবে। চৈতন সেন চোখের আড়াল হতেই ঘরভর্তি মেয়েরা গড়িয়ে পড়ল খিলখিল হাসিতে।

--সত্যি ভাই তুমি এলেই আমাদের স্যারের টনক নড়ে। মিসেস সেন ভাইব্রেটার রোলারে মস্ত ভুড়ি চেপে ধরে হাসলেন।

---আমি এলে? মানে? উর্জস্বী অবাক।

বোঝ না? ন্যাকা না? খুকি খুকি ভাব? পিয়ালী সেন আয়নার মধ্যে তাকে দেখতে দেখতে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

--সত্যিই বুঝি না গো। এত কথা বোঝার মতো বুদ্ধিমতী নই। যা বলার সোজাসুজি বললেই পারো। ব্যস্ত হয়েছিল সে ওয়েস্ট বেন্ডিং-এ। দাঁড়িয়ে হাঁটু ভাঁজ করে দুটো হাত মাথার পেছনে দিয়ে বাঁদিকে এবং ডানদিকে কোমর বেঁকাতে হবে যথাক্রমে কুড়িবার করে।

----আরে বাবা, তুমি বোঝ না কিছু?

---না?

--তুমি এলেই স্যারের খেয়াল পড়ে এসি বন্ধ করতে হবে, ফ্যান বন্ধ করতে হবে। বাব্বা! মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্যারের।

পিয়ালীর কথা প্রায় লোপ্পা ক্যাচ ধরে নিল মিসেস সেন, আমাদের তো চোখেই পড়ে না ওনার। তাকিয়েও দেখেন না। তাই না সাগরিকা? সাগরিকা পাড়ুই বাটার ফ্লাই মেসিনে ব্রেস্ট এক্সারসাইজ করতে করতে মুখ বেঁকালো, বলল, উর্জস্বীর মতো অ্যাট্রাক্টিভ কেউ থাকলে আমরা কি করে নজরে পড়ব বলো? পুরো ক্রেডিট গোজ টু উর্জস্বী। এমন বডি ফিটনেস। কে বলবে ও বত্রিশ? দেখে মনে হবে ষোলো। আমার ষোলো বছরের মেয়েটাকে ওর চেয়ে বড় লাগে। চৈতন সেন এমনিতেই মেয়ে ন্যাকড়া; তার মধ্যে পাগলকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে উর্জস্বী। তা তিনি বিগড়োবেন না কেন?

সাগরিকার কথার মধ্যেই রীনা উর্জস্বীর কোমরের দিকে ইঙ্গিত করল, তোমার যা ফিগার তাতে জিম না করলেও কিন্তু চলে। সব একদম মাপমতো।

—আমার বর এরকম ফিগার দেখলে কী বলে জানো?

—কী বলে পারমিতা?

—বলে খাপে খাপ, আবদুল্লার বাপ।

পারমিতার কথা শুনে আবার এক প্রস্থ হাসাহাসি গড়াগড়ি।

—এটা পারমিতা ঠিকই বলেছে সাগরিকা, মিসেস মিটার কথার মধ্যে ঢুকে পড়ল, পুরুষগুলোর ওই খাপেই ঝোঁক। নাক-মুখ-চোখ তোমার যাই হোক না কেন ওই খাপে খাপ হলেই হল। সব কটা জাত অসভ্য। আমার ভাইটা? শেষে ধরে আনল একটা নেপালী মেয়েকে। মিষ্টতা একটা আছে ঠিকই, কিন্তু আসল ব্যাপর হল ওই খাপ! প্রতিটি খাপ একেবারে মাপে মাপ।

আবার হিহি হোহোর ধুম।

—আচ্ছা তোমাকে ডায়েট চার্ট দিয়েছে? পারমিতাই জিজ্ঞেস করল।

—দিয়েছে।

আমাকে দেয়নি। অথচ তোমার সঙ্গে সঙ্গেই জয়েন করলাম। একেই বলে ভাগ্য।

গর্বিত ভ্রূ ভঙ্গি করেছিল উর্জস্বী, দৃষ্টিতে আত্মপ্রত্যয়।

—কেন ভাগ্য কেন? শ্লেষ জড়ানো উর্জস্বীর কণ্ঠস্বর।

সুজাতা নামের জলহস্তী প্রমাণ মহিলা এতক্ষণে মুখ খুলল, চৈতন সেনের দিকে চোখ তুলে দেখনি যেন?

—দেখেছি তো?

—বাব্বা! ন্যাকামি হচ্ছে না? তুমি জানো না মেয়েদের সেশানে প্রত্যেকটি মেয়ে ওর জন্য একেবারে দেবদাস?

লেডি দেবদাস? হেসে ফেললো উর্জস্বী, তাই বলো!

— কিন্তু উনি কারোর দিকে ফিরেও দেখেন না। শুনলাম এই নাকি প্রথম যে তুমি এলেই উনি খেয়াল রাখেন, ফ্যান বন্ধ হল কি না, এসি বন্ধ হল কি না। দেখছো না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে ডায়েট চার্ট ধরিয়ে দিলেন।

।। দুই ।।

সোফায় টানটান হয়ে শরীর ছেড়ে দিল উর্জস্বী। কথাগুলো মনে পড়তেই ফুরফুরে একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে মনে হাসল, চুলে আঙুল চালাল। কাঁধ ছোঁয়া চুলে ঔদ্ধত্য। আবার ভালোলাগা। খিদে পাচ্ছে এবার। সেই সকাল

সাড়ে ছটায় এক গ্লাস লেবু-মধু ঈষদুষ্ণ জল তারপর সাড়ে সাতটায় একটা হাতে গড়া রুটি আর পাঁচমিশেলী সব্জির ঝোল। ব্যাস্। আর কিছু নয়। এখন সাড়ে এগারোটা। জিম থেকে ফিরে চারটে মুসম্বির রস তার জন্য ধার্য। হাঁক পাড়ল উর্জস্বী, নারায়ণী! অ্যাই নারান? আমার লেবুর রস কোথায়?

হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির নারায়ণী. মামী গো, রূপলাগিতে আজ যা দেখালো না? পেঁপে দিয়ে চন্দন গুঁড়ো। বলল, সপ্তায় একদিন, মেখে দেখুন, জেল্লা দেবে।

---হয়েছে, তুই আগে আমাকে খাবার দে বাপ্। হেসে ফেলল উর্জস্বী। কী ছিল আর কী হয়েছে মেয়েটা! ক'মাসই বা হবে দেশ থেকে এল মেয়েটা। পিঠ খোলা জামা, রুখুসুখু চুল. হাতে পায়ে খড়ি ওঠা। ফ্রিজকে বলে ঠান্ডা মেশিন ঘর। দেখ্ না দেখ্ শহরের হাওয়ায় একেবারে ভোল পাল্টে গেল। এখন সেই উর্জস্বীর রূপচর্চার প্রধান উপদেষ্টা। কোথায় শ্রীমতি, কোথায় রূপজগৎ সব কিছু চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার দেখা চাই ই চাই। অর্ক সেদিন ইয়ার্কি মেরে বলেছিল, দু'দিন বাদে তো অ্যাডে নামছই তখন বরং ওকেই সেক্রেটারি রেখে দিও।

প্রজাপতির মতো উড়ে গেল নারায়ণী; হাতে মুসম্বির রস। ঢক্‌ঢক্ করে খাচ্ছে উর্জস্বী আর মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে নারায়ণী।

--কী দেখছিস?

--তোমার মুখটা না জুহি চাওলার মতো, জানো?

- ধ্যাত।

– হ্যাঁ গো।

-- হয়েছে।

---মামী! তুমি রূপলাগিতে নাম দেবে? পতিযোগিতা করছে ওরা. আজ দেখলাম।

----কী?

--হ্যাঁ গো। পতি মাসের সেরা সুন্দরী পতিযোগিতা। আজ যে মডেলটা সুন্দরী হয়েছে, সে এসেছিল টিবিতে। কেমন যেন দেখতে! ধ্যাবড়া নাক, দাঁত দুটো উঁচু মতন। ভাল্ না। তুমি ছবি পাঠালে. দেখবে সেরা সুন্দরী হবেই। পাঠাবে? ও মামী? আদুরে বায়না করল নারায়ণী।

—তার চেয়ে বড় কাজ আছে বাবা, সামনে! মজাদার ভঙ্গী করল উর্জস্বী।

---কী গো? হাঁটু মুড়ে গ্যাট হয়ে বসল নারায়ণী।

—আছে, আছে। এখন তুই যা। আমি স্নানে যাব। আর মামা কী করছে রে? আওয়াজ পাচ্ছি না।

— বই বুকে করে শুয়ে আছে।

শোবার ঘরে উঁকি দিল উর্জস্বী। অর্ক মগ্ন। উর্জস্বীর পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত পায়নি।

—স্নান করবে না?

— হুঁ? করব। -- বইয়ের পাতা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই উত্তর দিল অর্ক।

– তাহলে যাও। বেলা হয়ে গেল তো!

—কত কেজি আজ?

— মানে?

—কমতি না বাড়তি?

—উপহাস করছ?

–আমাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে নাকি? বই বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে উঠল অর্ক। চোখের তারায় মজার ঝিলিক। বলল, তাহলে রাস্তার পোস্টারে করে দেখতে পাচ্ছি তোমার ছবি? তারপর টিভিতে? সিনেমায়?

– অর্ক! কান্না পাচ্ছে উর্জস্বীর। খারাপ লাগছে। বলল, ওভাবে ঠুকছ কেন?

—ঠুকছি? আমি? সাহস আছে? বাব্বা!! দাঁড়াও দাঁড়াও, ভরদ্বাজ ফোন করেছিল,

আবার করবে। এনথু আছে ব্যাটার। লেগে পড়ে রাজি করাল তো তোমায়!

তারপর? ...? কেমন অদ্ভুত লাগল অর্ককে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এক্সরে আই দিয়ে জরিপ করছে যেন তাকে।

—কী দেখছ? বলতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল উর্জস্বীর। তবে কি অর্ক কিছু টের পেল: তাই বা কি করে হয়?

—তোমাকে দেখছি 'সু'। —কী নরম কণ্ঠস্বর অর্কর। আবার ও বলল. তোমাকে দেখছি। ভাল লাগছে।

—কেন?

— কারণ থাকতে হয় নাকি সবসময়? দুদিন বাদে তো...। থেমে গেল অর্ক।

—কী? দু'দিন বাদে কী, বলো। থেমে গেলে কেন?

—কিছু না। যাও ঘেমে গেছ জিমটিম করে। স্নান করে এসো। ভাবছিলাম, তুমি যখন মা হবে কেমন দেখতে হবে তুমি?

—মা? এখনি? ঢোক গিলল উর্জস্বী। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল, বলল, আগে দুজনে মিলে লাইফটা এনজয় করি, তবে তো।

—দুজনে নয়, বলো তুমি একা।

—কেন? তুমি নয় কেন?

—আমি কী করে থাকব? তুমি স্টার হয়ে গেলে আমি তো ভাঙা কুটিরে মাটির প্রদীপ।

— তুমি জেলাস হচ্ছ অর্ক। আমি মডেলিং করব, তুমি সহ্য করতে পারছ না।

— হাসালে! উঠে বসল অর্ক। সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার রিং জটিল আবর্ত তৈরি করছে ঘরের আবহাওয়ায়। আমি জেলাস! সত্যিই তুমি পাগল হয়ে গেছো 'সু'। যাও স্নানে যাও। ভরদ্বাজ ফোন করবে।

।। তিন ।।

স্নানে ঢুকল উর্জস্বী। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। তবে কি অর্ক কিছু টের পেল? না হলে মা হওয়ার কথা আসছে কেন এ সময়ে? হয়তো কথায় কথায় তার প্রতিক্রিয়া, মুখের অভিব্যক্তি বুঝতে চাইছিল। মুহূর্তে চিন্তার স্রোত বাঁক নিল। কে জানে বাবা, ভাল মানুষের মত মুখ করে এ লোক সবই সইতে পারে। এক এক সময় তো অর্ককে শয়তান মনে হয়। এত ভালমানুষী কোনও মানুষের সহজাত হতে পারে না। ছদ্মবেশে শয়তান যেন। হয়তো সব বুঝেও এই মুহূর্তে চুপ করে আছে। দেখছে উর্জস্বী কী করে।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তেই ফোন বাজছে শুনতে পেল। কে জানে ভরদ্বাজের কিনা? ভাবতে ভাবতেই বাথরুমের দরজায় করাঘাত। দরজা ফাঁক করতেই অর্ক হাত গলিয়ে কর্ডলেসটা দিয়ে দিল — 'ভরদ্বাজ'।

স্নানে আছ শুনলাম। ভরদ্বাজের কণ্ঠস্বর।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে উর্জস্বীর। কিছুটা লজ্জা। স্নান মানেই কেমন কেমন একটা ব্যাপার, আর সেই স্নানঘরে ঢুকে পড়েছে ভরদ্বাজ। হোক না দূরভাষে, তবুও তো! মানুষ চোখ বন্ধ করলেই কাঙ্ক্ষিত কত জিনিস কল্পনা করে দেখতে পায়। আর সেই স্নানঘরে সম্পূর্ণ নগ্ন উর্জস্বীর কণ্ঠস্বরে স্বর মিলিয়ে কোথাকার কে এক ভরদ্বাজ ঢুকে পড়ল অনায়াসে। মুহূর্তে প্রসঙ্গ পাল্টাল উর্জস্বী, বলুন।

—স্নান করছ?

—না।

— অসময়ে করলাম না? অর্ক যে বলল, বাথরুমে। তবে?

— আরে, না না, বলুন না।

—কত কমালে? স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েছ?

—দশ এগারো দিন হল তো। কমেছে খানিকটা।

—আসলে তোমার সবকিছুই পারফেক্ট বাট আমি যেটা চাইছিলাম, সেটা হল ট্রিমিং। ওটা হলেই চলবে। বাই দ্য ওয়ে, পরশু ইভনিং-এ আসছি আমি। বাড়িতে থেকো। আরও দু-একজন প্রোডিউসার তোমাকে মিট করতে চায়।

—আরও দুজন। মানে এখনই...। আচমকা কেমন ভয় করছে উর্জস্বীর।

—হ্যাঁ? হাসল ভরদ্বাজ, নাও শান্তি মনে এবার স্নান করো। ফোনটা কেটে দিল ভরদ্বাজ।

কীরকম ঘাম হচ্ছে। অদ্ভুত একটা ভয়ের ভাব জড়িয়ে ধরছে তাকে। এই ভরদ্বাজ... সেই বিয়ের পর থেকে লেগে ছিল তার পেছনে। এক কথা ইনিয়ে বিনিয়ে সিনেমায় নামলে তোমার হবে। প্লিজ রাজি হয়ে যাও। উর্জস্বী অবাক: বলতো, কী করে বুঝলেন?

— এমনি এমনি প্রোডিউসার হয়েছি নাকি? জহুরীর চোখ আমাদের। আসল রত্নটিকে নকলের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করাই তো আমাদের কাজ।

—আমার দ্বারা হবে না। হাসত উর্জস্বী, বলেছিল, আপনার অ্যাজাম্পশন এই বেলা ঠিক ভুল হয়ে যাবে, দেখবেন? আমার দ্বারা ওসব হবে না।

—নো। ইট কান্ট বি।

— না না, আমার হবে না। পাতি চচ্চড়ি শাক-পাতা খাওয়া মেয়ে কিনা সিনেমা করবে, মডেলিং করবে। বলতে বলতেই তবু আশ্চর্য একটা ঝিলিক দিয়ে যেত তার মনে। অর্কর দিকে তাকাত সে। অবচেতনে হয়তো ইচ্ছা হত, অর্ক তাকে প্রশ্রয় দিক। উৎসাহ দিক। ভরদ্বাজের মতোই বলুক, 'হবে না কেন? চেষ্টা করে তো দেখ।' অথচ কোনওদিন কিছু বলেনি অর্ক। ভরদ্বাজ বুঝত, তাই হয়তো অর্ককে বলত, মেয়েটার মধ্যে এত ট্যালেন্ট, একটু উৎসাহ দিলেও তো পারিস। তুই ব্যাটা চিরকেলে মেল শভিনিস্ট হয়েই রইলি। তারপর উর্জস্বীকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলত, ওকে তো স্কুল লাইফ থেকে চিনি। বরাবর এমন বইমুখো সেলফ সেন্টারড।

কতবার আর না বলবে? ছাগলকে কুকুর বলতে বলতে সে যে মুহূর্তের ভুলে কুকুরই হয়ে যায়। অতএব লাগাতার ফিল্ম অ্যাকট্রেস, মডেল শুনতে শুনতে উর্জস্বী মনে মনে নায়িকা হয়ে গেছে যে, কত রাতে। কত একলা দুপুরে। হঠাৎই কোথা থেকে মাস ছয়েক বেপাত্তা থাকার পর একদিন উড়ে এল ভরদ্বাজ— কনট্রাক্ট সাইন করো। শাড়ির মডেল হবে। অবাকের চেয়েও বেশি অবাক উর্জস্বী অর্ক হতচকিত। সই করে ফেলল উর্জস্বী। আর অর্ক

কয়েকদিন একদম চুপ। অদ্ভুত নীরবতা ঘিরে ধরেছিল গোটা বাড়িটাকে। অখণ্ড নিস্তব্ধতা। লোক বলতে তো দুটো মাত্র প্রাণী আর কাজের লোকটাকে নিয়ে তিনজন। সেই বাড়িতে শব্দ নেই, বাক্য বিনিময় নেই। খেতে বসে একদিন আর পারল না সে, বলেই ফেলল, চুপ করে আছ কেন অর্ক? ভরদ্বাজদাব সামনে বললেই পারতে, আমি সাইন করতাম না।

— মানে? নিবিষ্ট মনে খাচ্ছিল অর্ক, এবার চোখ তুলল।

— মানেটা তো স্পষ্ট। আমি ফিলম করি, অ্যাড করি তুমি চাইছ না। এটা তো একটা কাজ অর্ক। আর... আজকালকার দিনে সবাই শিক্ষিত ভদ্র পরিবার থেকেই এ লাইনে আসছে।

গভীর চোখে চেয়েছিল অর্ক। তারপর মুখে হাসি টেনে বলেছিল, তোমার মধ্যেই কমপ্লেক্স গ্রো করছে। আমার কিছু হয়নি, আমরা সবাই স্বাধীন সু, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। সবাইকে অন্যের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে হবে। আমি কিচ্ছু ভাবিনি।

—তাই কি?

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল জীবনযাপন। তবু কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে গেল। রাতের বিছানায় অর্ক আব আগের মতো নয় যেন। শান্ত শীতল স্রোতের মতো যাপিত জীবন।

মনটা কেমন বিস্বাদ লাগছে। শাওয়ার খুলে সমস্ত শরীর মেলে দাঁড়াল উর্জস্বী। অঝোরে বারিবর্ষণ হচ্ছে। মাথা থেকে জল নামছে। সমস্ত শরীর ধুয়ে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা কবল উর্জস্বী। তার আশি বছরের বুড়ি দিদিমা বলতেন, 'মেয়ে হয়েছ বলে মন বেঁধে রাখবে না। পাখি হয়ে থেকো। তবে তো জ্ঞান হবে, মনটাও আকাশের মতো নির্মল, স্বচ্ছ আর বড় হবে। নইলে জীবনটাই বৃথা যাবে মা।' দিদিমার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা সত্যি সত্যি আকাশের মতো হয়ে যাচ্ছে যেন। আকাশ স্বচ্ছ নির্মল নীলই। মাঝেমধ্যে কালো মেঘ এসে হানা দেয় বৈকি, তবে তার আর শক্তি কতটুকু?

আবার করাঘাত। সজোরে। অর্ক ডাকছে, সু, তাড়াতাড়ি বেরোও তো দেখি, তোমার মেয়ে কেমন করছে দেখে যাও।

—সাহেবা! কী করছে? পড়িমড়ি করে বেরলো উর্জস্বী।

দেখে যাও। এদিকে—

অবাক উর্জস্বী; সাহেবা ছোট্ট তুলোর খেলনা কুকুরটাকে পেটের মধ্যে চেপে রেখে থেকে থেকে সুর করে কাঁদছে।

—স্ট্রেঞ্জ! কী হল তোর সাহেবা?

টুলটুলে চোখ তুলে তাকাল সাহেবা। করুণ দৃষ্টি। আবার কাঁদছে সুর করে। এবারে বেশ করে খেলনা কুকুরটাকে দুধ খাওয়ানোর ভঙ্গিতে পেটে চেপে ধরল।

অবাক উর্জস্বী। অবাক অর্ক।

—ডাক্তার ডাকব? কল করো অর্ক। উর্জস্বী সাহেবার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

নারায়ণী জলের বাটি এনে সাহেবার মুখের কাছে ধরল। মুখ ফিরিয়ে নিল সাহেবা। দাঁত বার করে দেখাল নারায়ণীকে। অর্ক ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে ঘষতে লাগলো সাহেবার পেটে। তখনও হাত দিয়ে খেলনাটাকে চেপে ধরে আছে সাহেবা। অর্কই বলল, শি ইজ ইন প্রবলেম। তবে অসুস্থ নয়, এটা বোঝা যাচ্ছে।

তাহলেও ডঃ দাসকে কল করো প্লিজ। অর্ক সাহেবার কিছু হলে আমি...., গলা ধরে এল উর্জস্বীর। চোখের সামনে একটার পর একটা ছোট্ট ছোট্ট মুহূর্ত ভেসে উঠছে।—ছোট্ট তুলোর বলের মতো সাহেবাকে বান্ধবীর বাড়ি থেকে নিয়ে এল একদিন সে।

দেড়মাস তখন সাহেবা। মার দুধ খায়। প্রথম কটা দিন, থেকে থেকে সে কী তার কান্না। কুঁই কুঁই করে। উর্জস্বী বুকে জড়িয়ে মার স্পর্শ দেয় আর ঝিনুকে করে ফোঁটা ফোঁটা দুধ খাওয়ায়। রাতে কেঁদে উঠলে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। সেই সাহেবা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। এখন তো রীতিমতো সুন্দরী যুবতী। ভরা বয়েস, তিন। মানুষের হিসাবে চব্বিশ।

– কী ভাবছো সু?

—আমার ভাল লাগছে না অর্ক। তুমি ডঃ দাসকে খবর দেবে কিনা বলো। চিৎকার করে উঠল উর্জস্বী।

— দিচ্ছি। চিৎকার করছ কেন? তুমি রেস্ট নাও। তোমার শরীর খারাপ লাগছে মনে হচ্ছে।

—মানে? চমকে উঠল উর্জস্বী। আমার কী হয়েছে? কী হয়েছে আমার? অ্যাঁ?

—চোখ দুটো বসা ক্লান্ত লাগছে।

সাহেবার কিছু হয়ে গেলে..., কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল উর্জস্বী। আমিই ফোন করছি, বলে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল সে। অর্কর সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে যেন সে। কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! অর্ক কি সন্দেহ করছে? না হলে বলল কেন, 'তোমার শরীর খারাপ?' বমি বমি ভাবটা আবার নাভি থেকে গুলিয়ে গুলিয়ে উঠল। কাল থেকেই বমি ভাবটা হচ্ছে। কালও দু-

তিনবার টক জল জল বমি হয়েছে। তাড়াতাড়ি ডঃ দাসকে ফোন করে মুখ চেপে বাথরুমে ঢুকল সে। জোর করে কল খুলে দিল, যাতে বমির আওয়াজ জলের আওয়াজে চাপা পড়ে যায়। হড়হড়িয়ে বমি হয়ে গেল যাবতীয় খাবার। তবু যেন দমক আসছে থেকে থেকে। ক্লান্ত লাগছে এখন। কোনওমতে মুখে-চোখে জল দিয়ে বাইরে এল সে। সামনেই অর্ক। আবার সেই দৃষ্টি।

--বমি করলে?

---অ্যাসিড হয়েছে।

--কী করে বুঝলে?

--টক গন্ধ ছিল।

--ও। ফোন করলে?

--হ্যাঁ।

অর্ক তীব্র দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। চোখে চোখ রাখতে পারছে না উর্জস্বী। কোনওমতে বলল, আসছেন এক্ষুনি।

।। চার ।।

ডাক্তার দাস এসেছেন, পরীক্ষা করে দেখেছেন সাহেবাকে। তারপর বললেন,

---একে কী বলে জানেন? সিউডো প্রেগনেন্সি।

---মানে? চমকে গেল অর্ক, উর্জস্বী দুজনেই। সেটা কী? হাসছেন ডাঃ দাস, বললেন, নাথিং টু ওরি। ভয়ের কিছু নেই। খুলে বলি আপনাদের। কুকুর পুষছেন আর এগুলো জানবেন না। তা কী করে হয়? - ডাঃ দাস সাহেবার পেটের কাছে খেলনাটা আবার দিয়ে দিতেই সাহেবা তাকে পরম যত্নে চেটেপুটে আদর করে আবার পেটে চেপে বসল। ডাক্তার দাসের দিকে তাকাল। কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে তার চোখে।

---মেয়ে কুকুরদের এভরি সিক্স মান্থ সিজন হয়। এই সময় অনেক কুকুরই মনে মনে ভাবে, তারা মা হতে চলেছে। এটা এক ধরনের হর্মোনাল সিক্রিয়েশনের ফলে হয়। অনেক সময় বুকে দুধও এসে যায়। তবে সব বিচেরই যে এমন হবে তার কোনও মানে নেই। অ্যাকচুয়ালি সবটাই মেন্টাল। এক একটা বিচ তো আবার বিছানার চাদর খুঁড়ে-টুঁড়ে একেবারে ডেলিভারির জায়গা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলে। আপনাদের মেয়েটাও এখন মনে মনে মা হয়ে গেছে। ওই জন্যই খেলনা কুকুরটাকে ওর বাচ্চা ভেবে, বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য পেটে চেপে বসে আছে।

উর্জস্বী অবাক। সাহেবা মা হবে? এত শখ।

অর্ক অবাক। বললেন, এখন করণীয় কী?

—ওষুধ লিখে দিচ্ছি, খাওয়াবেন। আর উষ্ণ জলে ভিনিগার ঢেলে কমপ্রেস করবেন টিডসগুলোতে। অ্যাকচুয়ালি এ রোগের কোনও মেডিসিন হয় না, যাতে ঘুম আসে, তাই দিলাম।

— আর খেলনাটা?

—থাকুক। আর একটা কথা, এবার একটা ওর বিয়ে দিয়ে দিন, সৎ পাত্র দেখে। হাসছেন ডাঃ দাস।

নারায়ণী আর অর্কও হেসে ফেলল ডাঃ দাসের কথায়। উর্জস্বীর বমি পাচ্ছে আবার। অদ্ভুত লাগছে গোটা ব্যাপারটা। সাহেবা মা হবে? এত ইচ্ছা? আর তার?

—আগে কিন্তু কখনও এরকম ইনসিডেন্ট শুনিনি?

অর্ক যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, বলল, আমার ছোটবেলাতেও দুটো কুকুর ছিল... উঁহু ওদের কিন্তু হয়নি।

- বললামই তো, সবার হয় না। আসলে স্ট্রিট ডগেদের এরকম হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। কারণ, এই বয়েসের মধ্যে ওদের বাচ্চা কাচ্চা হয়েই যায়। দুঃখ বেচারি বাড়িরগুলোর। এদের তো মালিকের ওপর ডিপেন্ড করে থাকতে হয়। কবে আপনারা বিয়ে দেবেন, তবে ওরা মা হবে। বেচারা!

- সত্যিই। আর আমাদের মানুষদের দেখুন। অ্যাবরশনের রেট কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর প্রতিদিনই প্রায় খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে যাওয়ার গল্প। একটা কুকুরের মা হওয়ার কী প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। ভাবা যায় না।

—একজ্যাকটলি। অদ্ভুত আড়চোখে দেখল অর্ক উর্জস্বীকে।

বমি চাপতে পারল না উর্জস্বী। বাথরুমে গিয়ে উপড়ে দিল যত গলদ। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে চমকে উঠল, কী চেহারা হয়েছে এর মধ্যেই। চোখমুখ বসে টসে যা তা!

।। পাঁচ ।।

বিকেলে কিছু মুখে তুলল না সাহেবা। দুপুরেও না খাওয়া। নারায়ণী এক বাটি দুধ খেলনা কুকুরের মুখের কাছে ধরতেই ঝলমল করে উঠল সাহেবার মুখ। অর্ক মুগ্ধ হয়ে দেখছে। সোফায় শোয়া উর্জস্বীর দিকে ফিরে বলল, মাতৃত্ব কারে কয় দ্যাখো? হাসছে মিটিমিটি অর্ক। ভাবা যায়। আমাদের সাহেবার মা হবার এত শখ?

সাহেবা কুকুরটাকে নিয়ে আড়াই পাক ঘুরে নিরাপত্তার বেড়ি দিয়ে, আবার নিশ্চিন্ত মনে সোফায় বসল।

সন্ধে নামছে বাইরে। ঘরে যেন আশ্চর্য রাত্রি। মাটির ভাঁড় চিবোতে ইচ্ছা করছে উর্জস্বীর। ঠাকুমার মুখে শুনেছিল, সে হবার সময়ে নাকি তার মাও লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টির ভাঁড়, দইয়ের ভাঁড় চিবিয়ে খেত। বুকের ভেতর ঝড় বইছে তার। কালই তো মুক্ত হয়ে আসত সে নার্সিংহোমে গিয়ে। অর্ক কিচ্ছুটি টেরও পেত না। ডাক্তার বলেছিলেন, ঘন্টা চারেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন। রক্তের ঢেলা তার নিজের স্রোতে ফিরে যেত। তাহলে? কী করবে, কেমন যেন ভেবে পাচ্ছে না সে।

সাহেবা মন দিয়ে খেলনাটাকে আদর করছে চেটে চেটে। অর্ক মুগ্ধ হয়ে অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী ভীষণ মুগ্ধ দৃষ্টি। কাল ফেলে আসবে তাকে। নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে এক তাল রক্ত। ভাবতেই শরীরটা কেমন করে উঠল উর্জস্বীর। ভাল্লাগছে না কিছু। এ অনুভূতি কাউকে ভাগ করে দিতে পারবে না সে। একা একা আজীবন অনাগত ভবিষ্যতের মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে সে।

—শরীর খারাপ লাগছে সু? কী নরম কণ্ঠস্বর অর্কর।

—উঁ? ভীষণ আদর খেতে ইচ্ছা করছে উর্জস্বীর। কতদিন এমন মুগ্ধ দৃষ্টি দেখেনি সে অর্কর। যেন কোনওদিন অর্ক কারওর দিকে মুগ্ধ চোখে চায়ইনি। কোনওদিন মুগ্ধ হতে জানতই না।

—তাহলে মায়ের মেয়েরই ছানাপোনা হচ্ছে আগে? চোখ নাচাচ্ছে অর্ক? সাহেবাকে চুমু খেলো বার কয়েক। উর্জস্বীর পাশে এসে বসল তারপর। বলল, মন খারাপ করছ? কী হয়েছে? বলো, বলবে না আমাকে? সু? ও সু?

প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে উর্জস্বীর। ঝড়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে শরীর মন। মনে হচ্ছে, একবার চুমু খাক অর্ক। পেটে হাত রাখুক। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাক তার দিকেও।

—মামী! ও মামী? নারায়ণীর ডাকে সমস্ত আবিলতা ভেঙে গেল।

—মামী, রূপচেতনা দেখাচ্ছে গো। দেখবে না?

—না। তুই যা তো এখন। এখন কোনও ফোন এলেও আমাকে দিবি না।

—সে কী রূপচেতনা দেখবে না? হলটা কী তোমার? কী গো?

অর্ক অবাক। বেড়ালের মাছে বৈরাগ্য।

হঠাৎ ঘরের লাইট নিবিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল উর্জস্বী অর্কর বুকের ওপরে। এলোপাথারি ঘুষি মারছে, কিল, চড় কিছু বাকি রাখল না। বুকে মুখ

ঘষছে। কতদিন পর হারিয়ে যাওয়া প্রেম দুধের ফেনার মতো উপছে উঠল হঠাৎ। অর্ক অবাক, বিস্মিত। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে না পেরে সজোরে আলিঙ্গন করল উর্জস্বীকে। বলল, হঠাৎ এতদিন পর? এত প্রেম?

সাহেবা কেঁদে উঠল হঠাৎ। আধো-আলোতে দেখা গেল খেলনা কুকুরটা পড়ে গেছে মাটিতে।

-- তুলে দাও ওর বাচ্চাকে। আধো-আদুরে গলা উর্জস্বীর।

অর্ক হাত বাড়িয়ে খেলনাটা তুলে দিতেই আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল তাকে উর্জস্বী।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিল অর্ক, অভিভাবকদের মতো বলল, কী হয়েছে তোমার আমাকে বলবে? কিছু একটা হয়েছেই।

--আমার সাত মাস বাকি আর। রানিং টু।

--কী! কী বললে? আবার বলো।

-- সাত মাস বাকি! আবেগে থরথর করে কাঁপছে উর্জস্বী। এত আনন্দ যে জমা ছিল নাভির গোপনে, এতদিন যেন তা জানা বোঝার অগম্য ছিল।

কিন্তু তোমার কেরিয়ার? ভরদ্বাজকে কী বলবে তুমি? টাকা নিয়েছ কিছু? - আলিঙ্গন শিথিল হয়ে যাচ্ছে অর্কর। মাথার মধ্যে দপদপে যন্ত্রণা টের পাচ্ছে।

- যা খুশি হোক। আবেগ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে উর্জস্বীর ক্রমশ। মন অতিক্রম করে শরীর জেগে উঠছে অনেক দিন পরে।

বহুদিন পর জমাট মেঘ ভেঙে বারি বর্ষণ হচ্ছে। অর্কর দু'চোখে জল।

ঝড়বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে যাচ্ছে উর্জস্বী। নাড়ীর গোপনে আরও একটা নিজস্ব সত্তার স্পন্দন অনুভব করছে সে। ধুয়ে মুছে যাচ্ছে ভরদ্বাজ, চৈতন সেন, মাল্টি জিম, আর বিশাল একটা রুপোলি পর্দা। রুপোলি একটা মাছ ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে এবার উর্জস্বীর গোপন পৃথিবীতে।

--তাহলে নায়িকা হওয়ার কী হবে? উঁ?

—শাকচচ্চড়ি খেয়ে নায়িকা? গাঢ় সুখে ডুবতে ডুবতে অস্ফুটে বলল সে। আশ্চর্য একটা ইচ্ছে কুসুম ধীরে ধীরে ফুটছে উর্জস্বীর গোপন হৃদয়ে। বলল, আমাকে বারণ করনি কেন? উঁ? বারণ করনি কেন?

বিউটি পার্লার

শ্রাবস্তী বসু

আয়নায় আমি মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, খুব বেশি হলে চোদ্দো পনেরো বছর বয়েস হবে, ষোলো ও হতে পারে। পাশে গ্রাম্য চেহারার এক মহিলা বসে আছে, বোধ হয় ওর মা হবে, চেহারার আদলে মিল আছে, তার মুখ নির্বিকার, রাগত না দুঃখিত বুঝতে পারছি না -- মেয়েটির মুখ যে রাগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই, পার্লারের অন্য মেয়েদের মধ্যে চাপা উত্তেজনার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে! তবে কেউই কিছু বলছে না, একজন পৃথুলা মহিলা কাউন্টারে বসে আছেন, বক্তা তিনি একাই, তিনি সম্ভবতঃ এই পার্লারের মালকিন, তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা অসহায় ঔদ্ধত্য লক্ষ করে আমার বেশ কৌতূহল শুরু হয়েছে, কান পেতে আছি, বস্তুতঃ কান পাতার প্রয়োজন হচ্ছে না, ভদ্রমহিলার গলা ক্রমশ চড়ছে,

-- ''এখানে আমরা সবাই তোর ভালোই চাই রে ঝুম্পা, তুই বল, আমি তোকে কোনোদিন নিজের মেয়ে ছাড়া আর কিছুভাবে দেখেছি? এই যে পয়লা বৈশাখে আমি আমার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোকেও জামা কিনে দিই নি বল? তোকে এত কিছু বলার দরকার কী আমার যদি না তোর ভালোই চাইবো?''

--''একটু বকাঝকা তো করতেই পারি, আমি আমার ছেলেমেয়েদের বকি না? আমার মেয়ের বিয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তাও তো দরকার হলে বকি! তুই তো দেখেছিস! দেখো চম্পা আমি আজ তোমাকে ডেকে এনেছি কারণ তুমি তোমার মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে গেছো, কিছু হলে তো আমার কাছেই জবাব চাইবে! আমি তোমাকে বলছি আমার পার্লারের মেয়েরা সবাই ওকে দেখেছে, ওই ছেলেটার সঙ্গে, ওরা আমাকে বলেছে ছেলেটা খারাপ, তুমিই ভাবো আমি তো তোমার দিকটা ভাবছিলাম, এত খেটে খুটে

তুমি মেয়েটাকে মানুষ করেছো, তুমি তো চাও ও ভালো থাকুক, ভালো খাক পড়ুক — আমার বাড়িতে এসে ওর কোনো অসুবিধে হয়েছে কিনা ওকে জিজ্ঞেস করো। এবাই তো বলে বৌদি, ঝুম্পার চেহারাই বদলে গেছে, গায়ের রং কত— " কথা শেষ হলো না, চম্পা বলে উঠলো

—"সে তো দেখছিনি কি? সে তো আমিও চাই আপনের কাচে থাকুক, এ মেয়ে তো থাকতে চায় নে! সে আগের বাড়িতে রেতের বেলা দোকানে পাঠাতো বলে ছাড়িয়ে দেলাম---"

—"তুমি জিজ্ঞেস করো ওকে ও এতদিন আছে কোনোদিন ওকে আমি সন্ধ্যের পরে কোনোদিন কোথাও পাঠিয়েছি কিনা! তবে চম্পা একটা কথা বলছি, ঝুম্পা কিন্তু বাইরে ঘুরতে ভালোবাসে, এটা কিন্তু সত্যি, ওর খুব বাইরে বাইরে মন!"

—"হ্যা, কিন্তু ওরা তো রেতের বেলা দোকান-- ."

-- "না বাপু আমি তোমার মেয়েকে কখনো পাঠাই নি রাতে কোথাও। শোন ঝুম্পা তুই যা করেছিস তাতে আমি আর কিছু বলছি না, তুই আমার বাড়িতে যে রকম ভালোবাসা পেতিস সেরকমই পাবি, একটা অন্যায় করে ফেলেছিস, বয়েসটা খারাপ, ওসব ভুলে যা, শপথ কর যে আর কখনও করবিনা, তাহলেই হবে।"

এতক্ষণে তার গলা পাওয়া গেলো—

—"আমি তোমাদের বাড়িতে কাজ করবো না"

—"দেখেছো চম্পা, কি জেদি মেয়ে বাবা, এই পার্লারের মেয়েদের জিজ্ঞেস কর, কেউ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে কিনা কোনোদিন, এইটুকু মেয়ে, এত ভালোবেসেছি বলে -- ওকে আমি একদম নিজের মেয়ের মত দেখেছি, কিরকম পেয়ে বসেছে দেখেছো? কী বলবে তুমি? দেখ ঝুম্পা তোকে তো আমি বলছি তুই গেলে আমার অসুবিধে হবে না তাতো আমি একবারও বলিনি, বলেছি? কিন্তু তাই বলে তুই এরকম করবি? তোরা তো জানিস, ওর মাকে বল — কিভাবে আমাকে ভয় দেখায়, 'কাজ ছেড়ে দেবো' 'কাজ ছেড়ে দেবো' বলে? কে না জানে, নরম মাটি পেলে বেড়ালে, যাক গে, আমি তো এখনো বলছি তুই গেলে আমার অসুবিধে হবে, তুই জানিস আমার পায়ে ব্যথা, পা ফেলতে পারি না ঠিকমত, সেজন্য তুই আমাকে ভয় দেখাবি?

সে চুপ, নিরুত্তর। চম্পা এবার বলে,

--"সে তো আর কাজ করতে চাচ্চে নে।"

—"আর তুমি মেয়ের কথায় নাচছো? এরকম সুখে কোন বাড়িতে থাকবে বলতো? যার ছেলে যত পায় তার ছেলে তত চায়! তুমি তো চাও মেয়েটা ভালো থাকুক, ভালো বিয়ে হোক! আরে আমাদের ফ্ল্যাটের যে দারোয়ান, তার ভাইপোর সঙ্গে আমি ওর জন্য কথাও বলেছিলাম, সে ছেলেটাও আসছিলো কলকাতায় যোধপুর পার্কের একটা ফ্ল্যাটে গার্ড হয়ে, কী ভালো হতো বলোতো? ঝুম্পা যেমন আছে তেমনি থাকতে পারতো, আমার ফ্ল্যাটের সারভেন্ট রুমটা ছেড়ে দিতাম, ওরা থাকত। কত সুখেই না থাকতো? এর মধ্যে পাড়ায় দুর্নাম কুড়োলি তুই? আমার মুখটা রাখলি না?" ভদ্রমহিলার কণ্ঠে সত্যিই হতাশা ঝরে পড়লো। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো, ভদ্রমহিলা ফিসফিস করে কী যেন বলতে থাকলেন, ঝুম্পা বেঞ্চে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে, চম্পার মুখ একই রকম ভাবলেশহীন হয়ে আছে।

আমার বেশ অদ্ভুত লাগছে, ভদ্রমহিলার কন্যাসমা কাজের মেয়েটি কোনো একটা গর্হিত কাজ করেছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কোনো গোপনীয়তা রক্ষা করে হচ্ছে না দেখে খুব অবাক লাগছে, মেয়েদের কাছে মেয়েদের কোনো সংকোচ নেই এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে ঠিকই? সে ধারনার কতখানি বদল হওয়া দরকার সে নিয়ে আর ভাবতে ইচ্ছে করলো না, পার্লারের গোটা সাতেক মেয়ে ওই ভদ্রমহিলা নিজে এবং ঝুম্পা ঝুম্পার মা রয়েছে। দুপুরে এইসময়টাতে খদ্দের বেশি আসে না, সে সব হিসেব করেই হয়তো ভদ্রমহিলা সময়টা ঠিক করেছিলেন। আমিই অসময়ে এসে পড়েছি হয়েতো! আরেকটি মেয়েও এসেছে, সে চুলে মেহেন্দি করেছে, চুলটা চূড়ো করে রাখা আছে, একমনে সেলফোন নিয়ে খুটখুট করে চলেছে, মনে হচ্ছে কিছু শুনছে না, বা না শোনার ভান করছে, আমিই বরং অসভ্যের মত সব শুনছি এবং মাঝে মাঝে পেছন ঘুরে দেখছি, কিন্তু তাতে কারো বিশেষ ভ্রুক্ষেপ নেই।

ভদ্রমহিলা ফোন রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বিমর্ষ মুখে বসে আছেন, পার্লারের একটি মেয়ে বলে উঠলো—"ওকে আমরা সবাই দেখেছি ওই ছেলেটার সঙ্গে, ও যাই বলুক!" ভদ্রমহিলা যেন আবার জোর পেলেন,

—"তোরাই বল! কিরে ঝুম্পা সবাই মিথ্যে কথা বলছে? আর তুই একমাত্র সত্যবাদী?"

আবার তার উষ্মাযুক্ত কণ্ঠ শুনতে পেলাম,

—"মিথ্যে বলচে বলে তো বলিনি!"

—"তার মানে তুই বলতে চাস যে তুই সেদিন রাতে ওই ছেলেটার সঙ্গেই ছিলি সেদিন রাত্রে? কি নষ্টামি করেছিস তুই ওটা'র সঙ্গে?" ভদ্রমহিলার গলা এবার ফেটে পড়লো—"তোর লজ্জা করলো না? ছি ছি ছি! ওরে তোরা শোন কি মেয়েকে এতদিন খাইয়ে পরিয়ে রেখেছি দেখ — রাস্তার মেয়েদের সঙ্গে তোর তফাৎ কী থাকলো রে বেহায়া মেয়ে!"

এবার আমার অস্বস্তি হতে শুরু করলো। মেয়েটার জন্য খারাপও লাগছে, সত্যিই তো বাচ্চা মেয়ে, কেনই বা রাত্রিবেলা একটা খারাপ ছেলের সঙ্গে ছিলো?...

অন্যান্য মেয়েদের চাপা গুঞ্জনের স্বর ক্রমাগত বাড়ছে, সবাই বিস্মিত, কেউই ঝুম্পার পক্ষে নয় সেটা বোঝা যাচ্ছে। ওরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছে পরস্পরকে — কারো পাড়ায়, কারো আত্মীয়দের মধ্যে-পরিচিতদের মধ্যে এইধরণের ঘটনা ঘটেছে, এবং প্রত্যেক ঘটনার উপসংহার মোটামুটি একই ধরণের — মেয়েটির পরিনতি খুব খারাপ হয়েছে, তারা ভেসে গেছে এবং আরেকটি বিষয়েও প্রায় সকলেই একমত, এদের মধ্যে কারোরই এই সাহস বা রুচি হতো না। আমার চুল কাটছিলো যে মেয়েটি সে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়াতে বাধ্য হয়ে তাকে থামাতে হলো, হাতে উদ্যত কাঁচি এবং চোখ অন্যদিকে, আমার সতর্কবাণী শুনে মালকিন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মেয়েটিকে ভৎসনা করবার জন্য— "এই কাকলি কী হচ্ছে কী? তুই এবার আমায় জেলে পাঠা, কতদিন বলেছি কাজের সময়ে অন্যদিকে মন দিবি না!" জেলে যাবার কারণ যে আমার চক্ষুবিয়োগ বা ওরকম কিছু একটা, তা ভেবে আমি শিউরে উঠলাম, সঙ্গে লজ্জাও পেলাম। মেয়েটি কিন্তু সপ্রতিভ, সে আমায় বল্লে — "সরি দিদি। ভয় নেই আমার ঠিক নজর আছে" এবারে সকলে চুপ।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা নিরাসক্ত মুখে বললেন —"তোর কাছ থেকে এটা আশা করিনি ঝুম্পা, কিভাবে রেখেছিলাম তোকে, এই সেদিন তুই বল্লি তোর গায়ে র‍্যাশ বেরোচ্ছে, আমার ওরকম কত হয়, পাত্তা দিই না, কিন্তু তোকে বল্লাম, ডাক্তারের কাছে যা আমি টাকা দিয়ে দেবো, এখনো বলছি যা মার সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আয় আমি টাকা দিয়ে দেবো, তোকে তো নিজের মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবিনি কোনোদিন। এটুকু বলতে পারি চম্পা তোমার মেয়ে যে আরাম আর ভালোবাসা পেয়েছে এখানে সেটা কোথাও গেলে পাবে না। কাজের লোকের কি অভাব আছে, ভাত ছড়ালে ঠিকই কাকের অভাব হবে না। তাও তো আমি বলছিনা যে তুই কাজ ছেড়ে দিলে

আমার অসুবিধে হবে না, হবে কিন্তু তাই বলে তুই যা খুশি তাই করবি? তোকে আমি কতবার বলেছি, যে উলটো-পালটা টাকা খরচ করিস না, তোর তো মাইনের টাকাটাতে হাত দিতে হয় না, অর্ধেকটা মাকে দে আর অর্ধেকটা ব্যাংকে রাখ. কিছুটা জমলে তা দিয়ে গয়না গড়া. এভাবে কে বলবে বল? আমি তো ঠিকই করে রেখেছিলাম তোর ভালো করে বিয়ে দেবো, তোর মা যা পারে করবে আর বাকী যা লাগে আমি দিয়ে দেবো, আর তুই কিনা একটা বাজে ছেলের সঙ্গে গিয়ে নোংরামি করে এলি?''

—''আমি নোংরামি করিনি, ও খারাপ ছেলে না'' ঝুম্পা একইভাবে মাথা নীচু করে বলল, কণ্ঠস্বর দৃঢ়। আবার বাকি মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো।

ভদ্রমহিলা মরিয়া,

—''তুই নোংরামি করিসনি বেশ। তাহলে তুই বল আমি একদিন মেয়ের বাড়ি গেছি, সেই সুযোগ নিয়ে তুই রাতে পালালি কেন? তোর কাছে আমি বাড়ির চাবি রেখে গিয়েছিলাম, কতটা বিশ্বাস করলে এটা সম্ভব। তোর মামা আপনভোলা মানুষ, কিছুর খেয়াল থাকে না তাই তাকেও চাবি না দিয়ে তোর কাছে দিয়ে গেলাম! এর জন্য? তুই রাত কাটিয়ে এলি একটা বদমাইশ ছেলের সঙ্গে? তোকে ও বিয়ে করবে ভেবেছিস? ছিবড়ে করে ফেলে দেবে। অনেক দেখেছি বুঝলি?''

—''না ও বদমাইশ নয়।''

—''তুই মুখে মুখে চোপা করছিস? কেন গিয়েছিলি, যখন তোর উপর দায়িত্ব দিয়ে গেলাম? তুই কি মানুষ?''

ঝুম্পা এবার মুখ তুলেছে.

—''ও আমাকে বিয়ে করবে মাসীমা! ওদিন ওর সঙ্গে ছিলাম না, ওর দিদির বাসায় ছিলাম কসবাতে ওর দিদি আর ভাগ্নীর সঙ্গে।''

—''ঝুম্পা, কেউ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে নারে, কেউ বিশ্বাস করবে না তোর কথা। আর তাই যদি হয় তাহলে আমি তোকে বলব, তুই আমার বাড়ির চাবি নিয়ে বস্তিতেই বা গেছিলি কেন? আমাদের বাড়িতে তখন কি অসুবিধে হলো তোর? বল! উত্তর দে! তোর মামা জানতে পর্যন্ত পারেনি তুই এতো বদমাইশ মেয়েমানুষ!''

—''মামীমা তোমার খেয়েছি পড়েছি, কিতজ্ঞতা আছে. মুক খুলিও না! আমি কাজে জবাব দিলাম ব্যাস, আর কিছু বলতে চাইনে!'' ঝুম্পার গলা শুনে আমি চমকে উঠলাম এবার, ঝড়ের পূর্বাভাস! কি বলতে চায় মেয়েটা?

–"মুখ খুলবি মানে? কি বলতে চাস তুই?"

—"সেটা তুমি তোমার আপনভোলা বাড়ির লোককে জিগেস করো" ঝুম্পা উঠে দাঁড়িয়েছে, দুই চোখ বিস্ফারিত, দৃঢ় কণ্ঠ যেন একটু কাঁপলো -- "সে খারাপ, কারণ সে ছোটোলোক, তোমরা ভদ্দলোক! সেদিন আমাকে ছোটোলোকেই বাঁচালো, নালে ভদ্দলোকের হাতে তো আমার---" কথা শেষ করে না ঝুম্পা, মাকে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেলো, ভদ্রমহিলা বাকরুদ্ধ হয়ে স্থানুবৎ বসে আছেন কাউন্টারে, পার্লারের ঘরের মধ্যে অসম্ভব নীরবতা, কেউ কোনো কথা বলছে না, সকলের চোখ তাঁর দিকে, অকল্পীয় ঘটনা দেখার দৃষ্টি সকলের চোখে...

আমার পাশের চেয়ারে বসা মেয়েটি সেল ফোন রেখে পেছন ঘুরে ভদ্রমহিলাকে দেখলো একবার। আমার চুল কাটা হয়ে গেছে, কাকলি নামের মেয়েটি অভ্যেস বশতঃ আমার গা থেকে চুল সরিয়ে দিতে থাকলো একটা ব্রাশ দিয়ে, সে নিজেই একটা রশিদ লিখে আমাকে দিলো। ভদ্রমহিলা দরজার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, তাঁর মুখে আর কোনো কথা নেই।

আমি বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে চারিদিকে একবার দেখলাম, নাঃ দৃষ্টিসীমার মধ্যে ঝুম্পা বা চম্পাকে দেখতে পেলাম না...

: পরিচিতি :

।। অগ্রজা ।।

জ্যোতির্ময়ী দেবী : জন্ম : ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৪, রাজস্থানের জয়পুরে। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন। সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামেও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ছায়াপথ, রাজযোটক, মনের অগোচরে, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, হরিজন উন্নয়ন কথা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হরনাথ স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

রাধারাণী দেবী : জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৯০৩, কুচবিহারে। মূলত কবি, কিন্তু অজস্র গল্পও লিখেছেন। অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামেও কবিতা লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : লীলাকমল, বনবিহগী এবং পুরবাসিনী, বিচিত্ররূপিণী ইত্যাদি। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে শরৎচন্দ্র, মানুষ ও শিল্প, গল্পের আলপনা ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' সমাপ্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার : ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক, লীলা পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

আশাপূর্ণা দেবী : জন্ম : ৮ জানুয়ারি, ১৯০৯। ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার : জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, দেশিকোত্তম, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ইত্যাদি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

আশালতা সিংহ : জন্ম : ১৯১১, ভাগলপুর। প্রথম গ্রন্থ : অমিতার প্রেম। তাঁর দুঃসাহসী প্রবন্ধগুলি এককালে পাঠকমহলে সাড়া ফেলেছিল। পঞ্চাশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আশা পুরী নাম গ্রহণ করেন।

বাণী রায় : জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৯১৮। লেখিকা গিরিবালা দেবীর কন্যা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : জনারণ্যে এক মুখ, শ্রীলতা ও শম্পা, কনে দেখা আলো, প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ ইত্যাদি। পেশা : অধ্যাপনা।

কবিতা সিংহ ঃ জন্ম ঃ ১৬ অক্টোবর ১৯৩১, কলকাতায়। কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ সহজ সুন্দরী, কবিতা পরমেশ্বরী ইত্যাদি। উপন্যাস ঃ চারজন রাগী যুবতী, গোধূলি সন্ধির নৃত্য ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ লীলা পুরস্কার, নাথমল ভুয়ালকা পুরস্কার ও মতিলাল পুরস্কার। পেশা ঃ সরকারী কর্মচারী।

।। সই ।।

লীলা মজুমদার ঃ জন্ম ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ পাকদণ্ডী, হলদে পাখির পালক, পদিপিসির বর্মিবাক্স। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ইত্যাদি। মূলত শিশু সাহিত্যিক। রচনা করেছেন মূল্যবান আত্মজীবনী। পেশা ঃ সরকারী কর্মচারী।

প্রতিভা বসু ঃ জন্ম ঃ ১৩ মার্চ ১৯১৫, ঢাকায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মনোলীনা, মাধবীর জন্য, জীবনের জলছবি, মহাভারতের মহারণ্যে। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ আনন্দ পুরস্কার, হরনাথ ঘোষ স্মৃতিপদক ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবী ঃ জন্ম ঃ ১৪ জানুয়ারি, ১৯২৪। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা, স্তনদায়িনী, অন্যান্য গল্প ও বুদালি প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য আকাডেমি, ম্যাগসেসে এবং ফ্রান্সের লিজন অফ অনার। পেশা ঃ অধ্যাপনা, সমাজসেবা।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম ঃ ১১ মার্চ ১৯৩৭। মূলত কবি। কবিতার অনুবাদও করে থাকেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ অশ্লেষা তিথির কন্যা, ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম, শ্রেষ্ঠ কবিতা ইত্যাদি। পুরস্কার ঃ জীবনানন্দ স্মৃতি পুরস্কার, প্রবাহ পুরস্কার, ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। পেশা ঃ অধ্যাপনা, গবেষণা।

নবনীতা দেব সেন ঃ জন্ম ঃ ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৮, কলকাতায়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণসাহিত্য, শিশুসাহিত্য এবং নাটক লেখেন। অনুবাদও করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে, বামাবোধিনী, সীতা থেকে শুরু, নব-নীতা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ পদ্মশ্রী, সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা আকাদেমির লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ভারতীয় ভাষা পরিষৎ ইত্যাদি। পেশা ঃ অধ্যাপনা, গবেষণা।

বাণী বসু ঃ জন্ম ঃ ১১ মার্চ, ১৯৩৯। প্রধানত উপন্যাসিক। গল্প, প্রবন্ধও লেখেন। অনুবাদও করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ মৈত্রেয় জাতক, গান্ধর্বী, অন্তর্ঘাত, শ্বেতপাথরের থালা, অষ্টম গর্ভ, বাছাই গল্প ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ বঙ্কিম পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার ইত্যাদি। পেশা ঃ অধ্যাপনা।

এষা দে ঃ জন্ম ঃ ১৪ এপ্রিল ১৯৩৯, কলকাতায়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখেন এবং অনুবাদ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হায়না, শেষ বাঙালি, পুতলির কথা ইত্যাদি। পেশা ঃ অধ্যাপনা।

কণা বসু মিশ্র ঃ জন্ম ঃ ১০ মার্চ ১৯৪৬, আসামে। গল্প, উপন্যাস লেখেন। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ ওরা সবাই, আকাশের চাবি ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ ঃ তুলির কিছু সময়, জনারণ্যে একা ইত্যাদি। পুরস্কার ঃ প্রেমচাঁদ সাহিত্য পুরস্কার, উত্তরপ্রবাসী পুরস্কার ইত্যাদি।

কৃষ্ণা বসু ঃ জন্ম ঃ ১৭ নভেম্বর ১৯৪৭। কবিতা, গল্প লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ কার্ডিগানে কুসুমপ্রস্তাব, এই নাও মায়া তরবারি, সাহসিনী কে রয়েছ সাজো ইত্যাদি। পুরস্কার ঃ ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, সোপান পুরস্কার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ইত্যাদি। পেশা ঃ অধ্যাপনা।

নন্দিতা বাগচী ঃ জন্ম ঃ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, জলপাইগুড়িতে। গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইতি তোমার মণি, ও আলাপ। পেশা ঃ ব্যবসায়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঃ জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারি ১৯৫০, ভাগলপুরে। উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কাছের মানুষ, হেমন্তের পাখি, এই মায়া, দহন, শ্রেষ্ঠ গল্প, মেঘপাহাড় ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ঃ কথা পুরস্কার, শরৎ পুরস্কার, ভারতনির্মাণ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার ইত্যাদি। পেশা ঃ সরকারী কর্মচারী।

জ্যোৎস্না কর্মকার ঃ জন্ম ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০, পুরুলিয়ায়। গল্প ও কবিতা লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঘামে রক্তে কেরোসিনেও, হরিতকী তলায় দেখা, টুনির বারোমাস এবং খিদে। পেশা ঃ সরকারী কর্মচারী।

জয়া মিত্র : জন্ম : ১৯৫০, ধানবাদে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : হন্যমান, আত্মকথা, একটি উপকথার জন্ম ইত্যাদি। পুরস্কার : আনন্দ পুরস্কার। পেশা : সাংবাদিক।

চিত্রা লাহিড়ী : জন্ম : ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৫, কলকাতায়। কবিতা ও গল্প লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : তোমার মন নেই কুসুম, ব্যক্তিগত ভাষাগত, কথা কাহিনী ইত্যাদি। পুরস্কার : ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, উৎসব সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। পেশা : ব্যবসায়।

সুন্দ্রা ঘোষ মিত্র : জন্ম : নভেম্বর ১৯৫৫। গল্প লেখেন। তাঁর রচনাগুলি এখন দু'মলাটের ভেতর গ্রন্থিত হওয়ার অপেক্ষায়। পেশা : সরকারী কর্মচারী।

শবরী ঘোষ : জন্ম : ২ ডিসেম্বর ১৯৫৫, কলকাতায়। কবিতা ও গল্প লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : তাহলে জলের ধর্ম পেলে, ভাঙা চকমকি, ভুল করা ভালো। পুরস্কার : কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি পুরস্কার। পেশা : অধ্যাপনা।

অনিতা অগ্নিহোত্রী : জন্ম : ১৯৫৬, কলকাতায়। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও কিশোর রচনা লেখেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : চক্রব্যূহ, চন্দনরেখা ইত্যাদি। উপন্যাস : মহুলডিহার দিন ইত্যাদি। কাব্যগ্রন্থ : চন্দনগাছ, বৃষ্টি আসবে ইত্যাদি। পুরস্কার : ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি। পেশা : আই.এ.এস।

অঞ্জলি দাস : জন্ম : মে, ১৯৫৭, খুলনায়। কবিতা ও গল্প লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : পরীর জীবন, চিরহরিতের বিষ, এই মাস নিশ্চুপ তাঁতের। ঢাকা বাংলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত।

বীথি চট্টোপাধ্যায় : জন্ম : জুন, ১৯৫৭। কবিতা, গল্প ও ভ্রমণ বিষয়ক রচনাও লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : আগুনরঙা আলপনা, বাগানপোশাক, একক মেয়েলি সুখ ইত্যাদি। পুরস্কার : প্রমা, উৎসব সাহিত্য পুরস্কার, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পুরস্কার, বিভূতিভূষণ স্মারক পুরস্কার ইত্যাদি। পেশা : ব্যবসায়।

বিনতা রায়চৌধুরী ঃ জন্ম ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ঃ তোমাকে ছুঁয়ে, ডানায় রৌদ্রের গন্ধ। উপন্যাস ঃ অন্তবিহীন। প্রবন্ধ ঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য। পেশা ঃ অধ্যাপনা।

ঈশিতা ভাদুড়ী ঃ জন্ম ঃ ৪ মে, ১৯৬১। কলকাতায়। কবিতা, গল্প, ছড়া ও ভ্রমণকাহিনী লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ শব্দে রঙে আঙুলে, চিবুকে ঈশ্বর, অথবা বস্তুকমল, আজ অরণ্যপ্রবাস ইত্যাদি। পেশা ঃ আর্কিটেক্ট।

মহুয়া চৌধুরী ঃ জন্ম ঃ ৫ জুলাই ১৯৬১। মূলত গল্প লেখেন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ঃ দিনকাল। ১৯৯০ সালে যুগান্তর ও ভস্তক আয়োজিত এই শহর কলকাতা প্রতিযোগিতায় ছোটগল্পের জন্য পুরস্কৃত হন।

মিতা নাগ ভট্টাচার্য ঃ জন্ম ঃ ১৫ অক্টোবর, ১৯৬৪। গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ অভিমন্যুর মা। ছোটদের জন্য গল্পের বই ঃ চড়ুইভাতি ও তিতির। উত্তরণ ও তটরেখা পত্রিকা থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। পেশা ঃ শিক্ষকতা।

অপরাজিতা দাশগুপ্ত ঃ জন্ম ঃ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৮, কলকাতা। গল্প, প্রবন্ধ ও আত্মজৈবনিক রচনা লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুরের স্মৃতি, স্মৃতির সুর। পেশা ঃ অধ্যাপনা।